# সাহিত্য অঙ্গন

**(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)**

**ISSN : 2394 4889 Vol : XI, Issue : XXIV 27 February, 2026**

**Website : www.sahityaangan.com**

মুখ্য সম্পাদক

*ড. জয়গোপাল মণ্ডল*

সম্পাদক

ড. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০৯

**SAHITYA ANGAN**
**An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual**
**Peer-reviewed Journal**
**ISSN : 2394 4889 Vol : XI, Issue : XXIV 27 February, 2026**

**Chief Editor :**
Dr. Jaygopal Mandal

**Editor :**
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay

© Publisher

**Cover Drawing :** Krishnadhan Acharyya

**Type Setting & Cover Setting :**
Manik Sahu
Mob : 9830950380

**Printing and Binding :**
Granco Press

**Price : 250.00**

**Published By :**
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P. S. Saraidhela, Dhanbad-828109
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

**Advisory Board :**

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U. P.
Prof. (Dr.) Barendu Mondal, Dept. of Bengali, Jadavpur University
Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Sahitya Academy Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata

**Members from the other Countries :**

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh)
Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka
Nahida Ashrafi, Editor : Jolodhi, Dhaka, Bangaladesh

**Editor :**

Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay, Dept. of Bengali, Saltora N.C. College, Bankura

**Working Editorial Board :**

Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia
Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Kutubuddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W. B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Dr. Pranab Kumar Mahato, Dept. of Bengali, Saltora N.C. College, Bankura
Dr. Ujjwal Pramanik, Dept. of Bengali, Saltora Netaji Centenary College, Bankura
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Dr. Soma Mukherjee, Hridaypur, North 24 Parganas

# কৃতজ্ঞতা

সময় চলে নিজের ছন্দে, গতিতে। কখনো দাঁড়ায় না, স্তিমিত হয় না। কিন্তু জীবন পাল্লা দিতে অপারগ। কখনো শারীরিক, কখনো মানসিক বিপর্যয় তাকে বেঁধে ফেলে, গন্ডীবদ্ধ করে। মনের উপর পলি জমে। ইচ্ছে ছিল মহাশ্বেতা দেবী, মুনীর চৌধুরী, কবি রাম বসু ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ স্মরণ ক'রব ঢাকঢোল পিটিয়ে; জীবনের চড়াইটা মালভূমির তলদেশে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেখানেই আছে শালতোড়া নেতাজি সেনটেনারি মহাবিদ্যালয়, এই অধোনমনের কালে এগিয়ে এলো ড. সৌমব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. প্রণব কুমার মাহাতো এবং ছাত্রপ্রতীম ড. উজ্জ্বল কুমার প্রামাণিক। উদ্যোগ গৃহীত হলো, আন্তর্জাতিক সেমিনার উপলক্ষে সাহিত্য অঙ্গনের থেমে যাওয়া রথের রশি ধরে ধারাবাহিকতা রক্ষা করল এই তিন সৌম্যব্রতী যুবক। অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্রিকার ২৫তম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জাঁকজমক ছাড়াই। ছাড়া বা বলি কি করে! হ্যাঁ, বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ঘনঘটা এবার হলো না। তবুও খুশি এ যাত্রা বেঁচে যাওয়ায়। ধন্যবাদ সবাইকে।

**জয়গোপাল মণ্ডল**

২৭.০২.২০২৬

***We proud to know that three articals has been referred from the 'Sahitya Angan' Patrika, Vol. IV, Issue : VIII, 31st July 2018 to 'Ful Futuk', Published by Paschimbanga Bangla Academy, Tathya Sanskriti Daftar, Govt. of West Bengal, Edited by Renowned Poet Joy Goswami on 12th February 2019. Except this fact our jurnal honoured by many Researchers. They teke evidence as reference from this journal. In this rescept the 'Sahitya Angan Patrika' may be honoured as referred journal.***

# সূচি


সম্পাদকীয় : ৭

- রচনা রায়—আফসার আমেদের ছোটোগল্প : অকথিত জীবনের বুনন ৯
- আবেশ মণ্ডল —সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্প : অর্থনৈতিক সংকট ও গার্হস্থ্যজীবন ১৮
- অসীম মুখার্জি —আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটোগল্পে গানের প্রসঙ্গ ২৮
- বিশ্বজিৎ বিশ্বাস—সমরেশ বসুর শহীদের মা : মাতৃ-যন্ত্রণার এক নির্বাক প্রতিবাদ ৩৬
- সরোজ কুমার পতি—রবীন্দ্রগল্পে নারী ব্যক্তিত্বের পূর্ব সূচনা : প্রেক্ষিত মহামায়া ৪৩
- সরস্বতী বারুই—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দলিল : 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা ৪৭
- মৌসুমী সিংহ—নরেন্দ্রনাথ মিত্র : শিকড়হীন মানুষের অধিকার হারানোর গল্প ৫৫
- মৌসুমী রক্ষিত—দেবেশ রায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ রাজনৈতিক বাতাবরণ ৬১
- বিশ্বরূপ দে—'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে বিশ্বপথিক রামকিঙ্কর বেইজ ৬৫
- তনুশ্রী মণ্ডল—মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' গল্পে নিম্নবর্গের জীবন : লোকবিশ্বাস, যুক্তি ও চেতনার সহাবস্থান ৭৩
- সায়নী কুণ্ডু—সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সেকালের আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীর ও একালের বাণী বসুর 'খনামিহিরের ঢিপি'র নারীগণের জীবনদলিলে পার্থক্য অনুসন্ধান ৮১
- মোঃ আফরুক সেখ—তাপস রায়ের 'শুধু পটে লেখা' : ইতিহাস, লোকশিল্প ও সামাজ বাস্তবতার আলোকে ৮৯
- সুমনা পাত্র—মধ্যবিত্তের লড়াই ও ক্লান্তি : মতি নন্দীর কলমে যাপনের আখ্যান ৯৬
- রেহানা খাতুন—আফসার আমেদের 'জীবন জুড়ে প্রহর' উপন্যাসে মোবাইল আগ্রাসন ও দাম্পত্য সংকট ১০০
- ত্রিসপ্ত প্রদীপ—সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের নির্মাণশৈলী ১০৬
- মৌনী চ্যাটার্জী—মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পে ব্যক্তি ও সমষ্টির সংকটের নানাদিক ১১৬
- প্রশান্ত কুম্ভকার—চার গল্পকারের লেখনীতে 'চোর' গল্প : বিবিধ প্রেক্ষণ ১২৪
- মহ: নিসার সোহেল মিদ্দ্যা—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে নারী মন ও মনস্তত্ত্ব ১৩১
- ফাল্গুনী তপাদার—দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন ১৩৬
- সেখ পারভেজ হোসেন—আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী': সমাজ বাস্তবতার নিরিখে ১৪১
- সুকুমার পরামানিক—নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত সংসারে নারী চরিত্রের বৈচিত্র্য : অনুভবে ও বিশ্লেষণে ১৪৮
- মানস ঘোষ—স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বাংলা গল্পে প্রতিফলিত নারীর জীবন যন্ত্রণা ও সংগ্রাম ১৫৫

- ❐ চন্দ্রিমা মৈত্র দুবে—সমরেশ বসুর গল্পে শৈলীর অভিনবত্ব ১৬২
- ❐ মানস আচার্য—ইতিহাস চেতনার আলোকে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ১৭২
- ❐ নাফিসা ইয়াসমিন—আফসার আমেদের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' : এক নিখোঁজ মানুষের অনুসন্ধান ১৮৪
- ❐ অঙ্কিতা রায়—শৈলজানন্দের ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধ : জীবন-দৃষ্টির প্রতিফলন।১৮৯
- ❐ অনিন্দিতা মুখার্জী—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা : জীবন ও মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান ১৯৪
- ❐ তনুশ্রী নস্কর—হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নারী : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ ১৯৯
- ❐ ঈশিতা সিন্‌হা—মহাশ্বেতা দেবীর 'দৌলতি' : পুঁজিবাদ, দাসত্ব ও ভ্রান্ত স্বাধীনতার আখ্যান ২০৬
- ❐ মৌসুমী সাহা—প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ বীরসা মুন্ডা : "অরণ্যের অধিকার" ২১৬
- ❐ মিঠু রায়—অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে(নির্বাচিত) ভিন রাজ্যের প্রেক্ষাপট ও সমাজ বাস্তবতা ২২০
- ❐ বিভাস বিশ্বাস—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' : অস্তিবাদী দর্শনের স্বরূপ সন্ধান ২২৬
- ❐ মানসী কুইরী—গ্রাম বনাম শহর ভাবনার রূপান্তর: প্রসঙ্গ রমানাথ রায়ের উপন্যাস২৩৪
- ❐ রাজীব রজক—আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' ২৪১
- ❐ উজ্জ্বল প্রামাণিক—'নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা': প্রসঙ্গ কমল চক্রবর্তী ও তাঁর গল্প ২৪৫
- ❐ কৌশিক পান্ডে —জাদুবাস্তবতার আলোকে অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প ২৫২
- ❐ সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়—বোহেমিয়ান নবারুণ এবং বিকল্প বাস্তবের গল্প ২৬০
- ❐ অনিমেষ ব্যানার্জী—পরিবেশবিদ্যার আলোকে মণিশঙ্করের 'কালু ডোমের উপাখ্যান'২৭০
- ❐ অভিজিৎ শীট—সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে বাঁকুড়া অনুষঙ্গ ২৮৩
- ❐ পিন্টু দাস মোদক—স্বাধীনতা উত্তর দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব ও জটিল মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বের আলোকে সুমথনাথ ঘোষের 'মধুকরী' উপন্যাস ২৮৮
- ❐ মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা—শবর নারীর ক্ষমতায়ন : প্রেক্ষিত মহাশ্বেতা দেবীর গল্প ২৯৫
- ❐ শিখা কর্মকার—স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে ব্যতিক্রমী চরিত্র (১৯৫০-১৯৬০) ৩০২
- ❐ দেবপ্রিয়া সেন—'গহিন গাঙ'-এ আবদ্ধ মাছমারা ৩০৭
- ❐ শুভেন্দু রায়— অরণ্যের অধিকার : আদিবাসীদের অধিকারের লড়াইয়ের এক তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল ৩১৩

## স ম্পা দ কী য়—

আমাদের গল্প শোনার আদিম অভ্যেস যুগে যুগে আস্কারা পেয়ে এসেছে। প্রথমে মুখে তারপর লিখে লিখে সেই যে গল্প বলা শুরু হয়েছে, সাহিত্যের নানান রীতিকে আশ্রয় করে ভার্সেটাইল ভঙ্গিতে তা আজও চলেইছে, চলেইছে! যদি বাংলা কথাসাহিত্যের কথাই ধরি, সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন চেহারা এবং চরিত্রে তা আজ কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে! এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। পাঠকের চিরন্তন চাহিদায়, সম্পাদকের সাগ্রহ অনুপ্রেরণায় আর লেখকের নিরন্তর সাধনায় সৃষ্টি হয়েছে একের পর এক গল্প উপন্যাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে বাংলা কথাসাহিত্য আজ নির্মাণ করতে পেরেছে তার আলোকিত যাত্রাপথ!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রমানাথ রায়, বিভূতিভূষণ থেকে বিমল কর, পরশুরাম থেকে প্রফুল্ল রায়, শৈলজানন্দ থেকে স্বপ্নময়, তারাশঙ্কর থেকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক থেকে নবারুণ ভট্টাচার্য, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে প্রচেত গুপ্ত, মুজতবা আলী থেকে মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার থেকে কিন্নর রায়, ওয়ালিউল্লাহ থেকে উল্লাস মল্লিক, শরদিন্দু থেকে শীর্ষেন্দু, সত্যজিৎ রায় থেকে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অনিশ্চয় চক্রবর্তী, সুনীল থেকে স্মরণজিৎ কিংবা আশাপূর্ণা থেকে অনিতা অগ্নিহোত্রী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য থেকে সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা থেকে মৌমিতা, সেলিনা হোসেন থেকে তিলোত্তমা মজুমদার আবার দেবেশ রায় থেকে দেবর্ষি সারগী, আখতারুজ্জামান থেকে আনসারুদ্দীন, অমর মিত্র থেকে অম্লানকুসুম চক্রবর্তী, নবকুমার বসু থেকে নলিনী বেরা, হর্ষ দত্ত থেকে হামিরুদ্দিনদের হাত ধরে তিলে তিলে তৈরি হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের বর্ণময় ভুবন।

গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে যত, অ্যাকাডেমিক পরিসরে পাল্লা দিয়ে ততই বেড়েছে গবেষণার পরিসর। মৌলিক লেখার পাশাপাশি "সাহিত্য অঙ্গন" বরাবরই প্রাধান্য দিয়েছে গবেষকের অনুসন্ধানী মনটিকে। এই সংখ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সেই অনুসন্ধানী মন নিয়ে আলো ফেলেছেন আজকের গবেষকরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্দনা নয়, বিশ্লেষণের পথে হেঁটেছেন তাঁরা। ফলে "সাহিত্য অঙ্গন"-এর এই সংখ্যাটিতে সঠিক ভাবে হদিশ পাওয়া যাবে বাংলা কথাসাহিত্যের হালহকিকত। প্রত্যেক প্রাবন্ধিককে তাই বিশেষ ধন্যবাদ।

"সাহিত্য অঙ্গন" পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে। "বাংলা সাহিত্যের সেকাল-একাল: অনুভবে বিশ্লেষণে" শীর্ষক আলোচনা সভায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে পারছে সম্পূর্ণত বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. প্রণবকুমার মাহাতো সহ অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আন্তরিক উদ্যোগে। স্বীকার করতেই হবে কলেজের অধ্যক্ষ ড. কিশোরকুমার বিসওয়াল, সভাপতি শ্রী সন্তোষকুমার মন্ডল এবং আই. কিউ. এ. সি.র কো-অর্ডিনেটর ড. তুষার মন্ডল নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক ড. জয়গোপাল মন্ডল বরাবরের মতো সক্রিয় ভাবে পাশে থেকেছেন। রাতজাগা চোখ আর দশ আঙুলের আড়ষ্ঠতাকে এবারেও থোড়াই কেয়ার করেছেন মানিকবাবু। আর রইলো উজ্জ্বল! শুধু বলব দায়িত্ব নিয়ে দাদার পাশে না দাঁড়ালে পত্রিকাটি সময় মতো প্রকাশ পেত না কোনওভাবেই। তাই উজ্জ্বল বাদে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইলো; ভাইটির জন্য ভালোবাসা।

**সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

**রচনা রায়**

## আফসার আমেদের ছোটোগল্প : অকথিত জীবনের বুনন

একালের বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে একটি বিশিষ্ট নাম আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮)। তাঁর সাহিত্যবীক্ষায় ধরা পড়েছে অবহেলিত অপাংক্তেয় মানুষজন। ছোটোগল্পের দুনিয়ায় তিনি মূলত অতি সাধারণ মানুষজনকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের মনস্তত্ত্ব ও জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর ছোটোগল্পে মুসলমান সমাজ প্রাধান্য পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। আফসার আমেদের প্রতিটি গল্প ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও ভিন্ন আঙ্গিকে রচিত। তাঁর প্রতিটি গল্পকে একই ছাঁচে ঢেলে বিচার করা সম্ভব নয়, প্রতিটি গল্প আফসার আমেদের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

আফসার আমাদের ছোটোগল্প পাঠ করলে দেখা যাবে মুটে, শ্রমিক, ফুলওয়ালি, বারবনিতা, মিস্তিরি, ফুটপাথবাসী, ভিখিরি, অসহায় নারী, দোকানদার, তথা সমাজের অনাদৃত উপেক্ষিত চরিত্ররা ভিড় করেছে তাঁর গল্পে। বাস্তববাদী লেখক কঠোর বাস্তবকে তুলে এনেছেন তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে। চরিত্রগুলি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-ভালোবাসা, প্রেম-কামনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঘৃণা-হিংসা, ক্রোধ-রিরংসা সমস্ত কিছু নিয়ে গল্পে উপস্থিত। তবে মুসলমান সমাজ তাঁর সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। একথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন

"জন্মগতভাবে আমি মুসলমান। আমি মুসলমান সমাজেই বড়ো হয়েছি। অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন। আমি যাদের জানি না তাঁদের কথা লিখব কেমন করে। তাছাড়া এই জীবন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সামান্যই। মুসলমান হিসেবে নয়, আমার প্রতিবেশের প্রতিফলন আমার লেখার উপাদান। পাশাপাশি অমুসলমান সমাজ উঠে এসেছে, দেখা জানার ভেতর ভেতর দিয়ে। মুসলমান সমাজ আমার লেখায় এসেছে 'মানবিক' অন্তর্মূল সন্ধানের দিক থেকে। আমার লেখায় মানুষ হিসেবে অভিন্ন বাঙালি আত্মপরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছি। তথাকথিত সমাজ বিভাজনে আমার আপত্তি আছে।"[১]

আমেদ সাহেব দক্ষ ভাষা শিল্পী। তিনি অবশ্য মনে করতেন একজন লেখক সর্বতোভাবে বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেন এবং সেই অনুসারে গল্পের ভাষা ও আঙ্গিকের দিকে নজর দেন

"বিষয়বস্তু আমার কাছে যে আঙ্গিক ডিমান্ড করে, এমনকী ভাষাও ডিমান্ড করে, তা অনায়াসে চলে আসে। বিষয় ও আঙ্গিক আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিষয়বস্তু চিরকালীন, সেই ক্ষেত্রে আঙ্গিকের অন্য রূপ খুঁজতে হয় লেখককে। তাকে আধুনিক করে তুলতে হয়। আঙ্গিক-সর্বস্বতাতে আমার বিশ্বাস নেই। 'কেন লিখি', 'কীভাবে লিখি' এ দুটি একে অপরের পরিপূরক।"[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে অবহেলিত মানুষের জীবনালেখ্য। যার প্রমাণ মেলে তাঁর সমস্ত উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলিতে। বর্তমান আলোচনায় আমরা বেছে নেব, তাঁর মাত্র ৫টি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকে, যেখানে গল্পের বুননে মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার জীবন ইতিহাস ফুটে উঠেছে। গল্পগুলি হল 'গামছা', 'বাগদান', 'শীতজাগর', 'হাসিনার পুরুষেরা' ও 'দুই বোন'।

**গামছা**

আফসার আমেদের 'গামছা' ছোটোগল্পের বিশেষত্ব ছোটো ছোটো শব্দবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় কাহিনির অগ্রগতি। তবে অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের কারণে কাহিনি কখনো কখনো শ্লথ গতিতে এগিয়েছে। গামছা' গল্পটিতে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ। গল্পের নায়ক ইনসুল। কাহিনির প্রথম অংশে পাঠক ইনসুরের সামাজিক অবস্থান সহ তার দারিদ্র্যময় সাংসারিক জীবন নির্বাহের পরিচয় পেয়ে যান। প্রথমাংশের বেশ কিছুটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বহু কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির আগমনের আনন্দের পরিমন্ডলে। চাষীর জীবনে বৃষ্টি বড় প্রয়োজন। বৃষ্টি না হলে 'ভাঙ্গা লাঙ্গলের ফালে কাদা শুকিয়ে পাথর' হয়ে থাকে। ঠিক এই সময়ে বৃষ্টির আগমন। ইনসুরের আনন্দের সীমা থাকে না। আনন্দে সে একটা নতুন গামছা কিনে ফেলে। মনে পড়ে তার স্ত্রী আলতার কথা। বন্ধু জওসের সঙ্গে পথে যেতে যেতে সে হঠাৎ নেমে পড়ে বৃষ্টি ভেজা কাদামাখা মাটিতে। এক কাঁধে তার লাঙ্গল, আর এক কাঁধে সদ্য কেনা নতুন গামছা। মাঠ পেরিয়ে সে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে ইনসুর-আলতার দাম্পত্য প্রেমের ভালোবাসার চিত্র। আলতাকে সে বড় ভালোবাসে। কখনো কখনো মারধরও করে। তার জন্য অনুতপ্তও হয়। ভালোবাসার মাধুর্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পরিপূর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে নতুন কেনা গামছাটির গুরুত্ব বোঝা যায়। দুজনের দাম্পত্য সম্পর্কের উষ্ণতায় নতুন গামছার গন্ধ এক অন্য মাত্রা পায়

"আলতা গামছায় হাত দিয়েছে। গামছাটা আরো যেন সুন্দর হয়ে উঠেছে। রঙটা উজ্জ্বলতা পায় এই অন্ধকারে। আর সেই গন্ধ। আহা।"

তবে গামছার গুরুত্ব বোঝা যায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে। মনে রাখতে হবে গল্পের নামকরণ 'গামছা'। অতএব প্রথম দিকে গামছাটি নিরীহভাবে উপস্থিত থাকলেও শেষ অংশে এসে নামকরণের গুরুত্বের পাশাপাশি গামছাটিরও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সকাল হতেই ভোর ভোর ইনসুর ক্ষেতে চলে আসে চাষ করতে। সঙ্গে থাকে লাঙ্গল জোয়াল আর দুটো গরু। রাত্রি তখনও লুপ্ত হয়নি; 'জ্যোতায় ইনসুর পাগলের মত লাঙল করে চলে।' এমন সময় আলতা আসে মাঠে। স্বামীর কাছে। অভিযোগ করে এত তাড়াতাড়ি মাঠে এসে চাষ করার জন্য। স্বামীর কাজে হাত লাগায় সেও। হঠাৎ কাহিনির মোড় ঘুরে যায়। মাঠে এসে হাজির

হয় মহরম কাজী যে কিনা আলতাকে কুনজরে দেখে। ইনসুরে তা অজানা নয়। ইনসুর বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়। অবলা গরু দুটোর ওপর সপাং সপাং বাড়ি মেরে অব্যক্ত ক্রুদ্ধ রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অবলা পশু দুটি আর অবলা থাকে না। তারা দুটিতে আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইনসুরের কাঁধের উপর। মুখে টেনে নেয় নতুন গামছাটা। আলতা স্বামীকে বাঁচাতে মরিয়া। শুরু হয় মানুষ পশুতে অসম লড়াই। এ লড়াই আসলে মহরম কাজীর সঙ্গে ইনসুরের লড়াই এর ইঙ্গিত মাত্র। গল্পকার সুকৌশলে সামান্য এক গামছাকে কেন্দ্র করে সমাজের গভীর বাস্তবতাকে উদঘাটন করেছেন। এই বাস্তবতাই এ গল্পের মূল সম্পদ।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আঙ্গিক রচনার নতুনত্বে, সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় সর্বোপরি দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা বোঝাতে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এককথায় পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে। আফসার আমেদের বিপুল ছোটোগল্পের মধ্যে 'গামছা' যে একটি সার্থক সৃষ্টি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার ছোটোগল্পের আলোচনা কালে 'ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত?' গল্প প্রসঙ্গে স্বপ্নময় চক্রবর্তী এক জায়গায় বলেছিলেন,

"আফসারের লেখার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ বা মাইক্রো অবজার্ভেশন। এই সূক্ষ্মতাই একটা রস সৃষ্টি করে। আফসারের লেখার একটা গুণ হল আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। আরও ভালো করে বলতে গেলে নিজেকে গোপন রাখা বা আন্ডারস্টক থাকা। কিছুতেই লেখক প্রকাশ হন না যেটা বিরল গুণ। আর, আফসার খুব ছোটো ব্যাপার যা প্রতীকায়িত হতে পারে সেটা আন্ডারলাইন করতে জানেন, আর বড় ব্যাপার সেটা কম কথায় ছেড়ে দিতে পারেন।"

এ গল্পের ক্ষেত্রেও যে বক্তব্যটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

**বাগদান**

'বাগদান' কমলা আর নিতাই এর গল্প। কমলার 'দেউলিয়া বাজারে নিজের পান-সিগারেটের দোকান' আছে। আর 'নিতাই নন্দ পল্যের হোগলার দোকানে হোগলা বাঁধে ফুরনে'। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে সে যুক্ত। নিতাই এখনো বিয়ে করেনি। কমলা বিবাহিত। তার চার বছরের একটি ছেলে রয়েছে। যদিও স্বামীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কমলা নিতাইকে ভালোবাসে। বিয়ে করতে চায়। গল্পকার গল্পের শুরু করেছেন নিতাই-কমলার বাস যাত্রা দিয়ে। তারা একত্রে চলেছে পাঁশকুড়ার 'চারুলতা'য় সিনেমা দেখতে। ফ্ল্যাশব্যাকে গল্পকার নিতাই ও কমলার জীবনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে করতে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। লেখকের কলমে যেন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের সূক্ষ্ম বর্ণনা। কমলা নিতাই এর সংলাপেও যেন চলচ্চিত্রের ছায়া পরিলক্ষিত। তাদের কথোপকথনে পারস্পরিক ভালোলাগা, মন্দলাগা, পছন্দ-অপছন্দ ও ভাব ভালবাসা গল্প ফুটে ওঠে।

নিতাই কমলা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছিল। এই যাত্রা ছিল তাদের একসঙ্গে জীবন পথে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু বিধি বাম। ট্রেনে টিকিট না কেটে ওঠার শাস্তি স্বরূপ চেকার নিতাইকে ধরে এবং কোমরে দড়ি পড়ায়। চলন্ত ট্রেন থেকে কমলা তা দেখতে পায়। পরে স্টেশন পাঁশকুড়ায় নেমে কমলা দেখে পুলিশ নিতাইকে মেছেদায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত। কমলার কান্না পায়। হঠাৎ তার সাক্ষাৎ হয় পরিচিত দাশরথির সঙ্গে। দাশরথি সাহায্যের আশ্বাস দেয়। মহাদেবকে কুড়িটা টাকা দিয়ে নিতাইকে মেছেদা থেকে ছাড়িয়ে আনতে আদেশ দেয়। আর কমলাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে নিজের বাড়ি। সন্ধেবেলা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা সহ মহাদেব নিতাইকে নিয়ে ঘরে ফেরে। রাতে তারা দাশরথির বাড়িতে থেকে যায়। পরিবারের সকলের কথকতায় দাশরথির ছোট্ট ভাড়া বাড়িটি গমগম করতে থাকে। রাত বাড়ে। একে একে সকলে চলে যায়। মুখোমুখি থাকে কমলা আর নিতাই। সারাদিনের এবং বহুদিনের অকথিত নিবেদন সমাপন হয় এই অন্ধকার আকাশকে সাক্ষী করে। পারস্পরিক প্রগলভতা ও অবশেষে নীরবতার মাধ্যমে শেষ হয় তাদের 'বাগদান' পর্ব। লেখকের বর্ণনা জাদুতে পাঠক বুদ হয়ে থাকেন

"কমলা নিতাইয়ের দিকে বাঁ-হাতের তর্জনী তুলে ধরল এক মুদ্রায়। আঙুল বাড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে যেন সারা শরীরটা এক আকাশের নীচে জাগে। হ্যারিকেনের আলোয় মাটিতে তার ছায়া পড়ে। হাতের তলায় যেন বরণডালা কিংবা দেওয়ালির প্রদীপের মত কিছু। নিতাই আঙুলটার দিকে তাকায়। সন্তর্পণে আঙুলটা ছোঁয়।"

**শীতজাগর**

'শীতজাগর' গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত ফুটপাতবাসীদের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে। আলো গল্পের চালিকা। স্বপন কুমার তার স্বামী। তাদের বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে আছে ঝুমা। কলকাতার ফুটপাতে তাদের দাম্পত্য জীবন কাটে শীত- গ্রীষ্ম- বর্ষা। ফুটপাত বাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণা ও প্রতিকূলতা বর্ণনার মাঝে গল্পকারের কঠিন গদ্যের মধ্যেও কখনো কখনো যেন পদ্যের গুঞ্জন শোনা যায়। যেমন

"লাইটপোস্টের আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মিশে যায়। মিশে যায় ইটপাথরের সঙ্গে মানুষ। ইটপাথরের শীতের মত শীত হয়ে যায়। কোথাও বাদুড়ের ছায়ার মত অন্ধকার মিশে থাকে। শরীর হিমায়িত। রক্ত আরো ঠাণ্ডা, আরোও ঠাণ্ডা করে দেয়। আলোর ঠাণ্ডা বোধ।"

বর্তমান গল্পের পটভূমি এক শীতকালীন রাত্রি, যেখানে প্রবল শীতে ফুটপাতবাসীরা জরজর। সামান্য কাঁথায় তাদের শীত মানায় না। শীত থেকে বাঁচতে নানা উপায় তারা বের করে। আলো আর স্বপনের মধ্যে খুব বেশি প্রেম নেই। স্বপন বড় স্বার্থপর। আলো শীত থেকে বাঁচতে উষ্ণতা খোঁজে সারা রাত। মনে মনে উষ্ণ হতে আকুল হয়ে ওঠে। সে জানে 'রাজা বাজারের হোটেলের উনুন তার কাছে আসবে না', তাই সে স্বপনকে চায়, চায় 'স্বপন

কুমার তাকে কাঁথার ভেতর তুলে নিয়ে উষ্ণ করুক'। অন্যদিকে স্বপন নিজেকে উষ্ণ করতে কুড়িয়ে আনা কাগজে ফস্ করে আগুন জ্বালায়। আগুনের সান্নিধ্য পাবার লোভে আলো স্বপনকুমারকে জড়িয়ে ধরে, স্বপন কুমারও। তারা উষ্ণ হয় আগুনের তাপে, সোহাগে নয়। তাদের দুজনের 'কোন স্বর নেই সংলাপ নেই।' তবু আলোর শরীর চাইছে আগুনের গনগনে উষ্ণতা। এই শীত রাতে সে উষ্ণ হতে চায়। তার শরীর আগুন চায়। এই আগুনের আকাঙ্ক্ষা আসলে তাদের দাম্পত্য প্রেমের সোহাগের আকাঙ্ক্ষা। এ আগুন আসলে তার জীবনকে পূর্ণ করে তোলার আলো। এই চরম আকাঙ্ক্ষাতেই অসম্পূর্ণ জীবনের একটি দিন শেষ হয় আলোর। গল্পকার গল্প সমাপ্ত করেন।

**হাসিনার পুরুষেরা**

'হাসিনার পুরুষেরা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাসিনা। হাসিনা বিধবা। তিন বছর আগে স্বামী কাসেম ট্রেনের তলায় পড়ে মারা যায়। ঘরে আছে তার দুই শিশু কন্যা আর তার দশ বছরের একটি বোন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই কঠিন জীবন যুদ্ধে নামতে হয় হাসিনাকে। ট্রেনে ট্রেনে চাল ব্ল্যাক করে সে। এ হেন কঠিন পরিশ্রমের কাজে তাকে পুরুষদের পাশাপাশি থেকে কাজ করতে হয়। বহু পুরুষ হাসিনার জীবন বৃত্তে আসে ঠিকই কিন্তু তাদের সঙ্গে হাসিনার মধুর সম্পর্ক; প্রেমের সম্পর্ক নয়। হাসিনা সারাক্ষণ হাসিখুশি থাকতে চায়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে জীবনানন্দে পরিপূর্ণ থাকতে চায়। তৃপ্তি হোটেলের মালিক সামন্ত, পানের দোকানের আকরম বা তার সব সময়ের সহকর্মী সুবল সকলের সঙ্গেই তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সুবল কর্মসূত্রে তার কাছাকাছি থাকলেও সুবলের প্রতি হাসিনার বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই। হাসিনা পছন্দ করে অন্য আর একজনকে। পেশায় সে রিকশাচালক, নাম তার সালাম। হাসিনা মাঝে মাঝেই তার রিক্সায় চড়ে। হাসিনা মনের গহন গভীরে সালামকে বিয়ের কথা লুকিয়ে রাখে। ১০-১২ দিন আগে সালাম তাকে এক পুঁটুলি দিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। হাসিনা বুক দিয়ে আগলে রাখে পুঁটুলিটা। আর ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে। এ ব্যথা ভালোবাসার ব্যথা, ভালোলাগার ব্যথা, এ এক অন্য অনুভূতি।

সমগ্র গল্প জুড়ে ছোটোগল্পের একমুখিনতার প্রতি নজর রেখে গল্পকার সাবলীল ভঙ্গিতে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন হাসিনার জীবন যাপনের পরিচয় দিতে দিতে। হাসিনা জীবন রসিক। সে জানে জীবনে দুঃখ আছে, আবার আনন্দও আছে। সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা নিয়েই এই জীবন প্রবাহ। তাই অন্যান্য রিক্সাওয়ালাদের কাছ থেকে যখন সে জানতে পারে সালাম বাঁকুড়ার খানাকুলে গিয়ে বিয়ে করেছে, তাতে বেদনায় মূহ্যমান হয়ে যায়নি সে। পরন্তু হানিফ কুদ্দুসদের সঙ্গে সস্তা ইয়ার্কি ফাজলামিতে মেতে ওঠে, নেচেও ওঠে। আর হানিফের রিক্সায় আসতে আসতে তার মন উদাস হয়ে যায় বাংলাদেশের ঝড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সংবাদে।

হাসিনার আজ বড় আম খেতে ইচ্ছে করেছিল। নিজের কষ্টার্জিত পয়সায় ভালো জাতের মিষ্টি হিমসাগর কিনেছিল সে। তিনটে আমের মধ্যে একটা সরিয়ে রেখেছিল সম্পূর্ণ নিজের জন্য। গল্পের শেষ স্তবক জুড়ে গল্পকার হাসিনার আম খাবার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আসলে এই আম খাবার বর্ণনার মধ্য দিয়েই গল্পকার তার জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন। আজ যেমন করে সে আমের প্রতিটি স্বাদু কণা ভক্ষণ করে তৃপ্তি উপভোগ করছিল, তেমনি করে সেও স্বামী-সংসার নিয়ে জীবনের প্রতিটি স্বাদু কণার স্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। বহু পুরুষ তার জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সালামকে সে ভালোবেসেছিল অন্তর থেকে। তার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। সালাম বোঝেনি সে ভালোবাসা, মূল্য দেয়নি হাসিনার প্রেমকে। হাসিনা তাই অতৃপ্ত থেকে গেছে। বহু পুরুষ থাকলেও হাসিনার নিজের কোন পুরুষ থাকে না। এমনকি সালামও হাসিনার পুরুষ হয়ে উঠতে পারে না। লক্ষণীয় গল্পকার কী অসাধারণ দক্ষতায় নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের তুচ্ছ চাহিদাগুলিকে ছোটোগল্পের বিষয়ীভূত করেছেন। অন্যান্য ছোটো গল্পের মত এখানেও আফসার আমেদ তার সূক্ষ্ম সমাজ বাস্তবতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

গদ্য শিল্পী আফসার আমেদের শিল্প সার্থকতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো তার গদ্যের ভাষা ও রচনারীতি। অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে আফসার আমেদ নকশী কাঁথার মতো ছোটো ছোটো বাক্য বন্ধে কাহিনির শরীরে ফুটিয়ে তুলেছেন নানা ছবি। তাঁর কথাসাহিত্যের গদ্যশৈলী আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই চোখে পড়বে বাক্য গঠনের চলনের প্রতি। একই সঙ্গে বর্ণনামূলক ও ব্যঞ্জনা মূলক বাক্যের সহাবস্থানে গল্পগুলি রচিত। মনে রাখতে হবে সার্থক শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্বতন্ত্র হয়ে ওঠা। এই কারণে সে প্রতিনিয়ত প্রথাসিদ্ধ রূপ বা norm থেকে বিচ্যুত হতে চায়। আফসার আমেদের গল্পে এটি একটি অন্যতম গঠনকৌশল। প্রচলিত ভাষা বা প্রত্যাশিত বাক্যবন্ধে তিনি তাঁর গল্পগুলিকে বাঁধেননি। গল্পকে গল্পের টানে ছেড়ে দিয়েছেন। সে নিজের মতো নিজস্ব পথে এগিয়ে গেছে। ঘটনার বর্ণনার মধ্যে উঠে এসেছে চরিত্রের অন্তরস্বর, কখনোবা চরিত্রের মানসিক অস্থিরতা; সব মিলিয়ে তাঁর ভাষা বর্ণনায় এমন এক অভিনবত্ব রয়েছে, যা তাঁর লেখাকে নিজস্ব একটি শৈলী রূপ দান করেছে। বিষয়টিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করেছেন সাহিত্যিক হিল্লোল ভট্টাচার্য।

"ঘটনার আপাত বর্ণনার মধ্য দিয়ে যে প্রতীকী বাস্তবতার ক্যানভাস তিনি রচনা করতেন, তা যেন গল্পগুলির মধ্যে অন্য এক বৃত্তান্তও হাজির করত। কিন্তু তা লেখা থাকত না, পাঠককে চলে যেতে হত তার পাঠক্রিয়ার মধ্যে। ফুটে উঠত ভিতরের বাস্তবতা। কাহিনি চলছে এক ধরনের, পাশাপাশি উঠে আসছে আরেক ধরনের কাহিনি।"

একটি গল্পের মধ্যে এই 'আর এক ধরনের কাহিনি' রচনা আফসার আমেদের ছোটোগল্পে বিশেষত্ব। মনে পড়বে নোঙর, সমুদ্রের নিলয়, অপ্রেম অমরণ গল্পগুলির কথা।

আফসার আমেদ দরদী কথাশিল্পী। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তিনি। অথচ তাঁর গল্পগুলিতে দারিদ্র নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। দরিদ্র, নিরক্ষর, হতভাগা মানুষের গল্প বলার সময় দারিদ্রকে যেন অনেকটা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন লেখক। দরিদ্রকে মেনে নিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন সাজায়, স্বপ্ন দেখে, জীবনের সার্থকতার পথে এগিয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক ওঠা-পড়ায় চরিত্রগুলি জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ফরিদা, জিন্নাত বেগম, কায়েম আলি, শাকু, হাসিনারা ছোটোগল্পের চরিত্র অপেক্ষা রক্তমাংসের সজীব আবেদনে পাঠকের দিন রাত্রি যাপনের পরিচিত জন হয়ে যায়।

**দুই বোন**

অর্জিনা আর তহমিনা দুই বোন। তহমিনা বিবাহিত। তার স্বামী ইয়ারু ধনবান ও সমাজে মান্যগণ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। জামাইয়ের কারণে তাদের বাবাও প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সম্মান পেতে অভ্যস্ত। ইয়ারুর ব্যক্তিত্বের কাছে তহমিনা তুচ্ছ। মাথা নত করে স্বামীর সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মেনে নেওয়া ছাড়া তহমিনার গত্যন্তর ছিল না। মুখ ফুটে কোন কথা বলার অধিকার বা সাহস তার ছিল না। পঁচিশ বছর এমনি ভাবেই তার কেটে গেছে সব অপমান আর অবহেলা সহ্য করে। তাহমিনার সদ্য যুবতী বোন অর্জিনার  প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ছিল ইয়ারুর। অর্জিনাকে বিবাহ করার ইচ্ছে ছিল তার। অর্জিনারও আত্মসমর্পণ ভিন্ন উপায়  ছিল না। কিন্তু তাদের বিবাহ শেষ পর্যন্ত হলো না। কারণ হঠাৎ চার বিঘা জমির আলুর শোকে ব্যক্তিত্বময় ইয়ারুর মাথার সমস্যা দেখা দেয়, যার ফলে সে অনেকটা 'ল্যালাভোলা হয়ে যায়'।

বাড়ির পরিবেশ আকস্মিকভাবেই বদলে যায়। বিষয় সম্পত্তি ও পরিবারের কর্ত্রী হয়ে ওঠে তহমিনা। তহমিনার 'ব্যক্তিত্ব খুলে যায়'। প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সে। এতদিন সে যেন জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে ছিল। আজ সে প্রাণ ফিরে পেয়ে বাঁচার আনন্দে মেতে উঠেছে। বোন অর্জিনাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে নির্ভয়ে। অর্জিনাও আজ দুলাভাইকে ভয় পায় না। কারণ অর্জিনার কোন ক্ষতি করার মত ক্ষমতা বা সাহস এখন আর ইয়ারুর নেই। তহমিনা এবং অর্জিনা এখন স্বাধীন দুই নারী, দুই বোন। তারা এখন ইয়ারুর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাকে নিয়ে মশকরা করে, হাসি ঠাট্টা করে। ইয়ারুর পাগলামিগুলোকে হাসি-ঠাট্টা-মজার বিষয় হিসেবে গণ্য করে তারা তামাশয় মশগুল হয়। এখন তাদের উপর কেউ কোন প্রভুত্ব খাটাতে পারে না। তবুও কখনো কখনো ইয়ারুকে দেখে অর্জিনার বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। অবশ্য তা ক্ষণিকের জন্য। তহমিনা আর অর্জিনা মিলে ইয়ারুকে নানাভাবে নাস্তানুবুদ করে মজা নেয়। এভাবেই যেন দুই বোন তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা পালন করে। আগে ইয়ারুর দাপট ছিল।' লুঙ্গির উপর পীরান ও মাথায় টুপি থাকতো। এই পোশাকেই সে পরিচয় দিত। এখন সেই পোশাক নেই। এখন লোকটা হাড়মাস সম্বল শুধু। কোন

হাতিয়ার নেই।' অতএব তাকে আক্রমণ করতে দুই বোনের আজ কোন সমস্যা বা ভয় নেই। তহমিনা এবং মর্জিনা দুজনেই জানে ইয়ারুর অর্জিনার প্রতি কুদৃষ্টি ছিল। বিয়ে করতে চেয়েছিল অর্জিনাকে। এই ইচ্ছার কথা স্মরণ করে দুই বোন ইয়ারুর সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে এক মজার খেলায় মেতে ওঠে। লেখকের বর্ণনায় ফুটে ওঠে দুই বোনের খেলার আনন্দ

"আর্জিনা ফসকরে দেশলাই কাঠি জ্বালে, তার মুখের সামনে, তার রূপের সামনে।

আলোকিত হয়ে ওঠে আর্জিনা। দেখল, দালানের একপাশে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ইয়ারু। লোভের চোখে আর্জিনাকে দেখছে। হাত একটু কাঁপে আর্জিনার।

আর্জিনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইয়ারু।

কাঁপা হাতে কাঠিটা নিবিয়ে দেয় আর্জিনা।

অমনি হা হা হাসিতে ফেটে পড়ে তহমিনা। ছুটে এসে আর্জিনাকে একটু তফাতে টেনে নিয়ে যায়। আর্জিনাও হেসে কুটিপাটি।

দ্বিতীয় কাঠিটা জ্বালে আর্জিনা। দেখল, ইয়ারু পৌঁছে গেছে, আর্জিনার আগের দাঁড়ানোর জায়গাটায়। আর এটা দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে আর্জিনা ও তহমিনা।

দ্বিতীয় কাঠিটা নিবে যায়। আলোকিত যুবতী আর্জিনা, পুরুষটির বিগত লোভের সামনে। এই লোকটাই তাকে নিকে করতে চেয়েছিল। তৃতীয় কাঠিটা জ্বালায়। আলোকিত হয়। সরে যায়। আগের জায়গায় পৌঁছে যায় ইয়ারু। তারপর দুই বোন হেসে লুটোপুটি খায়।"

এইভাবে একের পর এক কাঠি জ্বালিয়ে আর নিভিয়ে ইয়ারুর লোভের লেলিহান শিখা জাগিয়ে তোলে দুই বোন। তাই শেষ পর্যন্ত সপ্তম কাঠিটি জ্বালানোর পর অর্জিনা দেখে ইয়ারুর 'তার পীরান ও টুপিখানা পরে ফেলেছে।' অর্জিনার বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। কারণ এই পোশাকেই ইয়ারু তার ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে জানান দিত। আজও দিচ্ছে।

এবার আমরা সুত্রকারে আফসার আমেদের ছোটোগল্প রচনায় নির্মাণকৌশলের অভিনবত্বগুলি তুলে ধরব—

প্রথমতঃ আফসার আমেদ দক্ষ ভাষা শিল্পী। ছোটোগল্পের কোথাও কোথাও তার ভাষা হয়েছে কেবলমাত্র বিবরণধর্মী। লেখক তথা কথক সেখানে পরিবেশ-পরিস্থিতি, চরিত্রের বর্ণনা করেছেন নিরাসক্ত, নির্লিপ্তভাবে অর্থাৎ সেখানে ভাষা হয়েছে কেবলমাত্র বিবরণের বাহন। এমন ভাষাশৈলী চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের সহায়ক যা চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছে।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিস্তরিক স্বর প্রক্ষেপণ আফসার আমেদের ছোটোগল্প রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চরিত্রের মনোসঞ্জাত উক্তি উঠে এসেছে কথকের বয়ানে। লেখকের সঙ্গে চরিত্রের স্বর একীভূতহয়ে গেছে। বর্ণনা ভঙ্গিতে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের মনোভঙ্গি। গোনাহ, আদিম, জিন্নত বেগমের বিরহমিলন যার অন্যতম উদাহরণ।

তৃতীয়তঃ ছোটোগল্পের চরিত্রানুপযোগী সংলাপ ব্যবহার তাঁর ছোটোগল্পের অন্যতম বিশেষত্ব। সংলাপ ব্যবহারে মুসলমান সমাজের স্বতন্ত্রতা তাঁর লেখায় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ঘটনা ভেদে, লিঙ্গভেদে, শ্রেণিভেদে সংলাপের পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য হাওয়ায় মানুষের মুখে মুখে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন স্বতঃ স্ফূর্তভাবে উঠে এসেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। ফলে সব মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ জীবন ইতিহাস বিবৃত হয়েছে তার ছোটোগল্পগুলিতে।

চতুর্থতঃ প্রতিটি গল্পের পাঠ বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা কেন এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ২১টি গল্প তুচ্ছ অথচ কোন একটি সাধারণ অথচ গভীর বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। একটি গল্প থেকে আরেকটি গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন আঙ্গিক এবং অভিনব ভাবনার প্রতিফলন। প্রতিটি গল্পের শেষ স্তবকগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নামকরণের গভীরতা বা ব্যঞ্জনা এই শেষাংশে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গামছা, দুই নারী, নোঙ্গর, রক্তলজ্জা, পানিগ্রহণ, হাসিনার পুরুষেরা, পাথর পাথর প্রতিটি গল্পেরই উদাহরণ দেওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ আমেদ সাহেব তাঁর গল্পের জাল বুনেছেন সমাজের একেবারে নিম্নবর্গের জনজীবন নিয়ে। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে অশিক্ষিত, অমার্জিত, গ্রাম্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজন। বাস্তব জীবনের গল্প বলতে বলতে আমেদ সাহেব তাঁর পাঠককে নিয়ে গেছেন এমন এক অপরিচিত জনজীবনে, যেখানে আধুনিকতার লেশমাত্র নেই। তাঁর গল্পের হাত ধরে পাঠক পৌঁছে যায় মুসলমান সমাজ ও মুসলমান পরিবারের অন্দরমহলে। গ্রাম-শহরের প্রান্তিক মানুষজন ভিড় করেছে তাঁর গল্পে। বিচিত্র সব মানুষ ও মানবিক সম্পর্ক মূর্ত হয়ে উঠেছে ছোটোগল্পের পাতায় পাতায়। মানব মনের গলি ঘুপচিতে উঁকি মেরে লেখক তুলে এনেছেন কঠিন বাস্তবকে। তাঁর শক্তিশালী কলমে উঠে এসেছে ঘামঝরানো, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, রক্তমাংসের জীবন।

ব্যক্তি জীবনে আফসার আমেদ ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি জগৎ' জীবন ও সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন। কোন গভীর, জটিল তত্ত্বাদর্শ তাঁর ছোটোগল্পে স্থান পায়নি কোথাও। অথচ সহজ কথ্য ভঙ্গিতে তিনি জীবনের গভীরতর সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

**তথ্যসূত্র:**

১. আফসার আমেদ জীবন ও সাহিত্য, সম্পাদক তৌসিফ আহমেদ, নবনীতা বসু, সমকালের জিওনকাঠি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০২২, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা-৩৪০

২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪১

**আবেশ মণ্ডল**

## সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্প : অর্থনৈতিক সংকট ও গার্হস্থ্যজীবন

সাল ১৯৩৭। বাংলা ছোটোগল্প ধারায় "বিলাতী ডাক" (অক্টোবর ১৯৩৭, ভারতবর্ষ পত্রিকা) দিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষের যাত্রারম্ভ এবং দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও কাছাকাছি পদচারণার পর "যাত্রাভঙ্গ"-র (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, "দেশ" পত্রিকা) মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি। তাঁর এই দীর্ঘ পদচারণায় চোখ রাখলে আমরা লক্ষ করব তিনি ছিলেন মূলত নগরজীবনকেন্দ্রিক সমস্যা, সংশয়, সন্দেহ ও মনোবিকলনের ছোটোগল্পকার। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকাল ১৯৩৭ খ্রিঃ। যখন সমগ্র বিশ্বে তথা ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘ অস্থিরতার স্পন্দন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা (১৯৩৯), জাপানী বোমাবর্ষণের বীভৎসতা (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলনের তীব্রতা (১৯৪২), মন্বন্তরের অসহায়তা (১৯৪৩), রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার নিষ্ঠুরতা (১৯৪৬), দেশবিভাগের হৃদয়হীনতা (১৯৪৭) এবং বাস্তুহারা উদ্বাস্তুদের ক্রন্দনময়তায় উত্তাল চল্লিশের দশক। যে দশকে মানুষের আশা-ভরসা, সুন্দর সুস্থ সুকুমার বোধগুলি ধীরে ধীরে নির্মূল হতে বসেছে; বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় গলাটিপে ধরছে আপন আপন আদর্শ ও মূল্যবোধগুলির। ফলত, দাম্পত্য, পারিবারিক, সামাজিক, প্রেম ও প্রেমজ সম্পর্কে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে কূটৈষণা যা ধীরে ধীরে পর্যবসিত হয়েছে সন্দেহ সংশয় থেকে বিশ্বাসহীনতায় তথা মূল্যবোধহীনতায়। উন্মেষপর্বের সূচনাকাল থেকে ১৯৫৭পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষের মনন ও মানসিকতায় এই উত্তাল অস্থিরময় পরিস্থিতির কঠিন কুঠার যে নির্মম আঘাত করেছিল তারই রূঢ় নিরাসক্ত বাস্তব দলিল এই পর্ব অর্থাৎ লেখকের প্রথম বা উন্মেষ পর্বের গল্পগুলি। এই সময়ে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে প্রেম বা শান্তি খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। তার গল্পগুলি আসলে সমকালীন প্রেক্ষাপটের জ্বলন্ত চিত্রায়ণ। যেখানে বারংবার তিনি প্রেম বা দাম্পত্যের ভিতর নিয়ে এসেছেন নানা সংকটজাত আলোছায়াময়তার দ্বন্দ্বযুদ্ধের ছবি। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ সর্বদাই ভাঙচুর চলেছে তাঁর চরিত্রের মননে, সম্পর্কে, সর্বত্রই। সমাজ সংকট এবং মানব জীবনের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের কারণ বা উৎস খুঁজতে গিয়ে এই সময়ে তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন-মানুষের যাবতীয় দুর্গতি ও দুর্দশার পশ্চাতে রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট। যা শুধু মানুষের জীবনকেই নয়, মনস্তত্বকেও সর্বদা প্রভাবিত করে। যে সংকটের প্রভাবে কত সম্পর্ক গেছে ভেঙে, কত প্রিয়জন গেছে বিকিয়ে। সন্তোষকুমার এর ছোটোগল্পগুলির মধ্যে এই সংকট যতদিন গেছে, ততই যেন ভয়াবহতার রূপ নিয়েছে।

সন্তোষকুমারের অনেক গল্প এই অর্থনৈতিক সংকট এর বীভৎসতা নানা বক্রতায় ধরা

পড়েছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি ছোটোগল্প হল- "কানাকড়ি" ও "পনেরো টাকার বউ"। গল্পদুটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে নানা তথ্য আমরা পেতে পারি। বিশিষ্ট সমালোচক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়-'এইসব গল্পে তীক্ষ্ণ নির্মম লেখনীর মুখে সমাজের ব্যবচ্ছেদে।

**১। কানাকড়ি**

"কানাকড়ি" গল্পটি সন্তোষকুমার ঘোষের স্বাধীনতা উত্তরকালের রচনা। এই গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনধারণ ও জীবন যাপনের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে নানান সূত্রে তাদের মূল্যবোধকেও যেন যাচাই করতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক। "কানাকড়ি" গল্পে কাহিনী কিছুটা স্থান নিলেও গল্পের মূল বক্তব্য বা লক্ষ্যের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় এই গল্পের অভ্যন্তরে ক্রমশই এক ভয়ংকর চালিকাশক্তির আসন গ্রহণ করেছে অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সংকট। এই গল্পে লেখক সচেতনভাবেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা কীভাবে ও কেমন করে আমাদের যাবতীয় চিরায়ত মূল্যবোধককে এক লহমায় ভেঙে দেয় তার চিত্রই লিপিবদ্ধ করেছেন।

"কানাকড়ি" ছোটোগল্পটি মূলত একটি পরিবার জীবনের গল্প। পরিবারের সদস্যসংখ্যা তিন-মন্মথ, সাবিত্রী এবং তাদের কন্যাসন্তান মিনু। আহিরিটোলার গলিতে তাদের বাসা। সদাগরি অফিসে কাজ করে মন্মথ, তারপর দুটো টিউশনি, বাজারের থলি ভর্তি হয় "কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাকে।" যে বাড়িতে বাস করে সাবিত্রী, সেই বাড়ি সাবিত্রীর চোখে "বেশ্যাবাড়ি"। তার এ হেন ভাবনার উৎসে রয়েছে মল্লিকা। মল্লিকা সাবিত্রীর চেয়ে বয়সে বড়, অবিবাহিতা। তার ঘরে বহু পুরুষের আনাগোনা। কখনও সে ট্যাক্সি চড়ে পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যায়, কখনও আবার তার ঘরেই বসে গানের আসর। বাসা পাল্টানো হয় না মন্মথর। এই পরিবেশে সে স্ত্রী ও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়-

'আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি।'

ক্রমে মল্লিকার সঙ্গে সাবিত্রীর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতায় থাকে গৃহবধূর দূরত্বও। এদিকে মন্মখর চাকরি চলে যায়। সাবিত্রী বাপের বাড়ি থেকে মৃত সন্তান প্রসব করে ফেরে। নানারকম ব্যবসার ফন্দি আঁটে মন্মথ এবং ব্যর্থ হয় বারবার। অগত্যা একদিন মল্লিকার দেওয়া সিনেমাতে নামার প্রস্তাব, যা একদিন ঘৃণ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার জন্যই সাবিত্রী শশাঙ্কর সাথে সিনেমা দেখে। এমনকি সুযোগ মতো প্রস্তাবটি শশাঙ্কের কাছেও তোলে। কিন্তু শশাঙ্ক তাকে ফিরিয়ে দেয়। বাড়ি ফিরে এলে মন্মথ সাবিত্রীর উপর রাগ করে। বাগের কারণ শশাঙ্কর সঙ্গে সিনেমা দেখা নয়, শশাঙ্কের সঙ্গে বসে সিনেমা দেখেও নিজের কাজটি হাসিল করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য।

গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দাম্পত্য সম্পর্ক। যে দাম্পত্য সম্পর্কটি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার হাত ধরাধরি করে মাটির ছোঁয়া ছেড়ে আশ্রয় নেয় পিচ আর পাথরে ভরা আহিরিটোলার একটি দম বন্ধকরা গলির বাসাতে। সাবিত্রী ও মন্মথর ছোট্ট সংসার যতই অর্থের কষ্টে চলুক না কেন, তবুও ছিল একে অপরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা। তার প্রমাণ আমরা পাই যখন মল্লিকার প্রতি সস্নেহে সাবিত্রী সেই বাসা ছেড়ে যেতে চায় তখন মন্মথর বক্তব্যে। সে বক্তব্যে ছিল এক অটুট বিশ্বাসে মোড়া দাম্পত্যের গভীরতা। অর্থনৈতিক কারণে তাদের সে বাসা পাল্টানো হয় না অবশ্য। তাই স্বামীর সান্ত্বনাতে সন্তুষ্ট থাকতেই হয় ভীত সাবিত্রীকে। কি আর করবে সে? অর্থনৈতিক কারণে ঘর পাল্টানো যখন গেল না, তখন দরজায় ছিটকিনির সঙ্গে খিল তুলে দিল সাবিত্রী-যাতে কোনোভাবেই ও-ঘর তার জীবনে ঢুকে না পড়ে। কিন্তু একই বাড়িতে পাশাপাশি বসবাস করে সাবিত্রী মল্লিকার থেকে কিন্তু নিজেকে আড়াল করতে পারল না। কারণ হিসেবে লেখক বলেছেন:

"এক বাসায় থাকতে গেলে দু চারবার মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয়।"

তবে সে ঘনিষ্ঠতাতে আমরা সর্বদাই দেখতে পাই এক ভীত সন্ত্রস্ত গৃহবধূর দূরত্ব তৈরির প্রয়াস। কিন্তু বারবার সেই "মানে"-র দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে টানাটানির সংসারে সাবিত্রীকে হিমসিম খেতে হয়। সাবিত্রীর আলো আঁধারি শরীরের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে মল্লিকার মামাত দাদা থেকে রাতারাতি জ্যাঠতুতো ভাইয়ে উত্তরিত খদ্দের শশাঙ্কের:

"পাতের পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছে কাঁটা, তেমনি সাবিত্রীর সারা শরীর ভয়ে শিহরণ অনুভব করল।"

শশাঙ্কের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি সেদিন সাবিত্রী। কিন্তু সে যে মল্লিকা নয়। সে যে মন্মথর স্ত্রী। তাই ঘৃণার সঙ্গেই সিনেমার প্রস্তাব নাকচ করে দিতে সে দ্বিধা করে না। একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে ক্লান্ত সাবিত্রী, তেমনি অন্যদিকে কামুক ব্যক্তিদের লালসার লালা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে থাকে ময়ালসাপের মতোই। পরবর্তী সময় মন্মথর কাজ চলে গেলে সাবিত্রীর সংসারে নেমে আসে অভাব, অনটন ও অচলতা। শুরুতে অবশ্য সে ভেবেছিল-

"গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে রাখতে হবে এই দুঃখ, এই অনটন, যা অনশনের আদর।"

কিন্তু সাবিত্রী কি সত্যিই সেই যা লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল? না পারেনি। পারা সম্ভবও ছিল না, অন্তত নিজের ছোট্ট সন্তানের কথা ভেবে। তাই অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী মল্লিকাকে শেষ পর্যন্ত বলতে প্রায় বাধ্যই হয়েছে

"আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমায়, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের। শশাঙ্কবাবুকে একবারটি বলে দেখো না মল্লিকাদি।"

এ বক্তব্য কি খুব বেশি আশচর্য্যের। সংসারের যে চলমান নৌকা আজ সময়ের কালপ্রবাহে নিমজ্জিত প্রায়, তাকে তুলে ধরতে শেষ প্রচেষ্টাটুকুও করেছিল সাবিত্রী, কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কারণ শশাঙ্ক নিজের পরবর্তী ছবির হিরোয়িনের পার্টের জন্য তার স্বাস্থ্যহীনতা আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ফিরিয়ে দিল। ফিরে এসেছিল সাবিত্রী অসহায় ও অপমানিত হয়ে। শুধু অসহায়ই নয়, ভয়েও। সে এও মনে মনে ভেবে নিয়েছিল যে, মন্মথ হয়ত খুব রেগে যাবে শশাঙ্কের সাথে সিনেমা দেখা নিয়ে, কিন্তু না মন্মথ রেগেছিল বটে তবে তার কারণ-শশাঙ্কের সঙ্গে বসে ও সিনেমা দেখেও কাজ হাসিল করতে না পারার জন্য। পাঠক হিসেবে এখানেই আমরা পূর্ববর্তী মন্মথ ও পরবর্তী মন্মথর পার্থক্য অনুধাবন করে নিতে পারি সহজেই। যে মন্মথ একদিন বলেছিল অটুট বিশ্বাস, আস্থার কথা, স্ত্রী সাবিত্রীকে সান্ত্বনা দিয়েছিল এই বলে যে-"আমরা গরীব, হতে পারি কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি।"- সেই মন্মথই যখন বলে:

"কী ক্ষতি হত তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ি করে পৌঁছে দিত। ওরা আমুদে লোক একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকারও করে। শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে?"

আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি আর কিছু নয়, এ এক অর্থনৈতিক দিক থেকে ভঙ্গুর স্বামীর অক্ষমতারই নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে সাবিত্রী, যে আজীবন সবটুকু উজার করে দিল তার সন্তান ও স্বামীর মঙ্গলে, সংসারের কল্যাণে। সেই সাবিত্রী শেষ অবধি নিজের মান সম্মানের পরোয়াটুকু না করে ছুটে গেল শশাঙ্কের কাছে। কিন্তু তার ব্যর্থতায় তার স্বামী তাকেও তার মনকে এক লহমায় ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল নিষ্ঠুর ও নির্মম প্রত্যাঘাতে। যে বিশ্বাস যে ভরসা ছিল স্বামীর প্রতি এক স্ত্রীর, তা যেমন এখানে ভেঙেছে, তেমনি ভেঙেছে শশাঙ্কের কাছে তার শরীরের মূল্য আছে-এ ধারণাও। সাবিত্রী এ কষ্ট এ "কাঁটা" কাকেই বা বলবে? কেই বা বুঝবে তার ভাঙনের ইতিকথা? তাই ফুপিয়ে ফুপিয়ে তাকে কেঁদে যেতে হয় শুধুমাত্র তার অসহায় ভাগ্যের জন্য, অর্থাভাবে আসলে সাবিত্রীর সংসারই শুধু নয়-তার মন ও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। শেষ অবধি সাবিত্রী এই চরম সত্যই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে-মান, সম্মান, মর্যাদা এসবই সমাজ বাস্তবতার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। স্ত্রী হিসেবে তার যে আর কানাকড়ি মূল্যও মন্মথর কাছে নেই বা নিষ্ঠুর সমাজের কাছে-নিজের জীবন দিয়েই সাবিত্রী তা স্পষ্ট বুঝে নিতে পেরেছে।

চরম অর্থনৈতিক সংকট যে দাম্পত্য জীবনের গভীর মূল্যবোধকে অবক্ষয়ের অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলতে পারে তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "কানাকড়ি" গল্পটি।

সাবিত্রী ও মন্মথের দাম্পত্য জীবনের চলমানতায় পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার মধ্যে দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা আর্থিক অনটনের ঢেউয়ে বালির বাঁধের মতো ভেঙে যেতেই আমরা বুঝলাম-জীবনের স্থায়ী ভিত আর কিছুই নয়। টাকা-শুধু টাকা। টাকা থাকলে জীবনের স্থায়ী ভিতর আর কিছুই নয়। টাকা শুধু টাকা। টাকা থাকলে জীবনে সব সৌন্দর্যই অব্যাহত থাকে। আর না থাকলে জীবনটা নোংরা বাজারে দ্রুত নেমে আসে। মনে রাখা দরকার এই গল্প শুধু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিই নয়, আজকের দিনেও এর প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্তর্জাতিক ও অন্তঃরাষ্ট্রীয় ঘাত-প্রতিঘাত এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে চরমভাবেই বিধ্বস্ত হয়েছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূল্য, সামাজিক ন্যায় নীতিবোধ, বাঁচার সমস্ত রকম নিষ্ঠা ও পবিত্রত। এ গল্পেও সেই অবক্ষয়িত চিত্রস্পষ্টতই ধরা পড়েছে। গল্পটি বারবারই কিন্তু আমাদের প্রথাবদ্ধ মূল্যবোধকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। হয়তো এভাবেই আমাদেরকে সচেতন রাখতে চেষ্টা করে! আসলে সামগ্রিক অর্থব্যঞ্জনার দিক থেকে ভাবলে এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে আমরা যে সব আক্রমণাত্মক ভাবনাগুলোর মধ্যে ছিটকে পড়ি, সেগুলো হল:

ক। অর্থনৈতিক সংকট ঝাঁপিয়ে এলে কোনো মানুষের পক্ষেই আর সুস্থভাবে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জলে ডোবা মানুষ যেমন ভেসে থাকবার জন্য কাষ্ঠখণ্ড আঁকড়ে ধরতে চায়, আমরাও সেইভাবে অস্তিত্বরক্ষার নিমিত্ত সর্বতোভাবে টাকার ওপর নির্ভরশীল।

খ। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ বা সম্পন্নতা না থাকলে কোনো মানুষের কোনোরকম সামাজিক গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ টাকা না থাকলে মনুষ্যজীবন সম্পূর্ণ কানাকড়িতুল্য। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ মনে করেন- 'টাকার অনুভূতি মানুষের অনুভূতি একাকার হয়ে মিশে গেল। মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক আর্থিক সম্পর্কতে পরিণত হল। কলকাতা শহরের পত্তন হল ক্যাশের উপর এবং নেক্সাস হল সামন্ত ধনতান্ত্রিক কলকাতার মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক।"

গ। শুধু মন্মথ ও সাবিত্রীর দাম্পত্যজীবন নয়-সন্তোষকুমার বর্ণিত এই দাম্পত্যজীবন আমাদের সকলেরই দাম্পত্যজীবন।

**২। পনেরো টাকার বউ**

সন্তোষকুমারের প্রথম পর্বের গল্পগুলির মধ্যে "পনেরো টাকার বউ" ছোটোগল্পটি এক অনবদ্য রচনা। বলা বাহুল্য এই পর্বের গল্পগুলির মধ্য দিয়ে সন্তোষকুমারের স্ব-বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। এই সময়কাল চল্লিশের দশকের শেষভাগ ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ এবং এর বিস্তৃতি ১৯৫৭-৫৮ খ্রিঃ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা, বাস্তুহারা সমস্যা, মন্বন্তর, দাঙ্গা, এইসব উত্তালতা তরঙ্গ সে সময় বাঙালি জীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে

তুলেছিল। এমনই এক অস্থির সময়ের মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে সন্তোষকুমার দেখলেন মূল্যবোধের ভাঙচুর, পারিবারিক সম্প্রীতির ভাঙন, প্রেমহীন যৌন বিকৃতি, অবচেতন মনের বিষক্রিয়া, অর্থনৈতিক সংকট তাড়িত মনোবিকলন ইত্যাদি। খুব স্বাভাবিকভাবেই লেখকের মনও বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিচলিত মনোভাব থেকেই সন্তোষকুমার গভীর অনুবীক্ষণের সহযোগে এও উপলব্ধি করলেন আধুনিক জীবন অমৃত মন্থনের নয়-বিষে বিষে জর্জরিত এক দুঃসহ জীবন। মুখাত এই ভাবনা থেকেই তিনি লিখলেন—"পনেরো টাকার বউ" গল্পটি।

গল্পটির মূল বিষয়বস্তুর দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব-গল্পটি পরিবার জীবনের গল্প। সদস্য সংখ্যা তিন-স্বামী, স্ত্রী এবং শিশু। গল্পটির শুরু পরিবারটির এক নতুন বাসাতে আগমনের মধ্য দিয়ে। মণিমালা ও গৌরাঙ্গের সে পরিবার। বাসা বদলের মধ্য দিয়ে আসলে পরিবারের অর্থনৈতিক ক্রমবিপর্যয়ের ইতিহাসই উঠে এসেছে। বলা প্রায় বাহুল্য যে অর্থনৈতিক ক্রমবিপর্যয়ই মণিমালাদের এনে তুলেছিল কলকাতার নোংরা বস্তিতে। স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে মণিমালার সংসার চললেও একটা সময় থিয়েটারের নেশা গৌরাঙ্গকে চাকরি ছাড়া করে। ফলে মণিমালার সংসারে দ্রুত নেমে আসে এক ধরনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে তাদের আবাসস্থল হয় "কৃষ্ণধাম", যার মাসিক ভাড়া-পনেরো টাকা-যে বাড়িতে মাছির মতো কিলবিল করছে আরো অনেকগুলি সংসার। তবে মণিমালার সংসারের ন্যায় তাদের সংসার অনিশ্চয়তায় চলে না। মেয়ে মহলে তাই মণিমালা চিহ্নিত হয় "পনেরো টাকার বউ" বলে। উল্লেখ্য, অপর বউ-দের ন্যায় তার সংসার তথা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও তার ছিল সিকিভাগ সম্মান, যা নিয়ে বেঁচে ছিল সে ও তার কোলের শিশুটিও। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই সিকিভাগ সম্মানটুকুও আর রইল না যখন দেনার দায়ে জর্জরিত তার পরিবার রাতারাতি পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় কোনো এক বস্তিতে। সংসারের এই অর্থকষ্টে বস্তিজীবন মণিমালার জীবনকে ক্রমশ করে তুলেছিল দুঃসহ। সবচেয়ে বড়ো কথা "কৃষ্ণধাম" এর আশি-চল্লিশ-ষাট টাকার দিদিদের সুখী জীবন যাপন ক্রমেই তার মনে এক ধরনের ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিতে থাকে। লক্ষণীয় তার ভাবনা:

"কীসে ছোট সে ওদের চেয়ে, লেখাপড়ায়, রূপে, গুণে কীসে। শুধু অধম অবিবেচক মানুষের হাতে পড়েই চিরটাকাল তাকে আঁচল ভরে করুণা আর উপেক্ষা করে যেতে হবে?"

এভাবে প্রতিহিংসার আগুন, জ্বলে ওঠে মণিমালার ঈর্ষাতুর হৃদয়ে। যার ফলশ্রুতি একদিকে সে "আশি টাকার বউ"-এর স্বামী অর্থাৎ প্রফেসারকে চিঠিতে তার স্ত্রী ও দূর

সম্পর্কের ভাইয়ের অবৈধ সম্পর্ক-কথা লিখে ভেঙে দেয় তাদের এতকালের গড়ে তোলা স্থায়ী সংসার, অন্যদিকে "ষাট টাকার বউ"-এর মেয়ের বিয়েও ভাঙিয়ে দিতে ঘৃণ্য এক প্রবণতায় উদগ্র ও উদ্যত হয়। গল্পের একেবারে শেষে লক্ষ্য করা যায় "নিষ্ঠুর শুষ্ক হাসি হেসে" উঠে মনে মনে অদ্ভুত মনস্তত্ত্বে ডুব দিয়েছে মণিমালা। গল্পটি এখানেই সমাপ্ত।

গল্পটির মূল বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে দেখা যায় সামগ্রিকভাবে এযেন এর সংসার ভাঙনেরও মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের জান্তব কাহিনি, উৎস মূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে "অর্থনৈতিক সংকট"। মণিমালার হাসিতেই এ গল্পের সূত্রপাত এবং মণিমালার হাসিতেই গল্পের শেষ। আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগায় এ হাসির কারণ তথা মর্মার্থ কী? এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত সংসারে যখন স্ত্রীরূপে মণিমালা গৌরাঙ্গের ওপর বিশ্বাসে শুরু করেছিল তার বৈবাহিক জীবন, তখন তার অজানা ছিল ভবিতব্যের এই ভয়াবহতা। কর্মরত স্বামীর হঠাৎই বেকারত্ব ও অনিশ্চিত এর দিকে পদচারণ ভাবিয়ে তুলেছিল মণিমালার শঙ্কায়িত মনকে। যে মানুষটির ভরসায় তার এই নতুন জীবনযাপন সেই ভরসা আর শেষাবধি রইল কোথায়? গৌরাঙ্গ এক বার্থ স্বামী তৎসহ একজন ব্যর্থ পিতাও বটে। যে একটিবারও ভাবেনি তার সন্তান, স্ত্রীর কথা। দেনার দায়ে একে একে বিকিয়ে দিয়েছে মণিমালা তার শেষ আভটুকুও। কারণ সে জানে তার সংসারের এর ভয়াবহতা, সে জানে তার স্বামীর থিয়েটার নিয়ে এই পাগলামি তার ছোট্ট শিশুটির এমনকি মণিমালার ভবিষ্যতকেও ঠেলে দেবে কালো অন্ধকারের দিকে। প্রতিনিয়ত অর্থকষ্টে ভুগতে থাকে সে এবং তার দারিদ্রের গর্তভরা সংসার। অথচ তারই সম্মুখে স্বচ্ছলতায় বেঁচে থাকে "কৃষ্ণধাম"-এর অন্য মহিলামহল ও তাদের সংসার। ফলত তার মনের অস্থিরতা অশান্তি প্রবলতর রূপ নেয় যেদিন তাদের পালিয়ে বস্তিতে দেনার দায়ে। বাসা বাঁধতে হয়। পাঠক হিসেবে সত্যি অবাক হতে হয় মণিমালার ধৈর্য দেখে। কিন্তু ক্রমশ সেই সহ্য করা, না বলা হাহাকার একদিন ভেতরে ভেতরে তৈরি করে দেয় অন্য এক মণিমালাকে। এই মণিমালা আর আগের মণিমালা নয়-এই মণিমালা অনেক হিংস্র অনেক পরশ্রীকাতর এবং অনেক বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ। বলা যায় প্রবল মণিমালার মৃত্যু হলো দ্বিতীয় নতুন স্বরূপের মণিমালার মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে দেখা দিল। ঈর্ষার বোধ। এখান থেকেই শুরু হয় ভুল। এমনটাই ঘটিয়েদিল মণিমালাও। প্রতিনিয়ত সাংসারিক অর্থকষ্ট এবং তৎসহ সুতীব্র মনোকষ্ট তার মনে জন্ম দিয়েছিল অদ্ভুত ঈর্ষার বীজ। এই ঈর্ষা থেকেই সে ভেবেছে অর্থনৈতিক দিক থেকেই তো সে কেবল দুর্ব, আর বাকিটা। "কৃষ্ণধামের" প্রত্যেকটি বউ এর জীবনে ছিল অনন্ত শান্তি ও সর্বোপরি যা ছিল তা হল অর্থগত সম্বল। এর বিপরীতে মণিমালার জীবনে যেমন ছিল না শান্তি, তেমনই অর্থগত দুর্বলতাও তার সবটুকু

গ্রাস করেছিল। তাই মনের ভিতর জন্মপ্রাপ্ত ভয়ঙ্কর ঈর্ষা থেকেই মণিমালার "কৃষ্ণধামের" "আশি টাকার বউ"-এর সুখের সংসারে ভাঙন ধরাতে দ্বিধা করে না এবং "ষাট টাকার বউ"এর মেয়ের বিয়ে ভাঙাতেও কোনোভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এই মনোভাব আসলে কার? মণিমালার? নাকি এক অর্থহীন সংসারের যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিষে মরা এক স্ত্রী, এক মা-এর? মুখ্য মণিমালার এই ভয়ায়নক ঈর্ষাই আশঙ্কিত ষাট টাকার দিদি ও তার কন্যা সুস্মিতাকে বস্তিতে টেনে এনেছিল। আমরা তারপর এও দেখলাম বিদুষী রূপসী মেয়েকে কীভাবে মণিমালার পায়ের কাছে লুটিয়ে দেয় ষাট টাকার বউ।

"এমন মরণকাঠি খুঁজে পেয়েছে সকলের ছোট, সকলের করুণার উষছকুড়নি পনেরো টাকার বৌ।"

গল্পের শেষে মণিমালা আবার হেসেছিল। প্রারম্ভের সেই হাসি আর শেষের এই হাসির তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করতে পারেন পাঠকগণ। নিষ্ঠুর শুদ্ধ কণ্ঠের এই হাসিতে মণিমালার সেই অর্থকষ্টে আক্রান্ত হৃদয়ের প্রতিশোধস্পৃহ। যেন উল্লাস করে ক্রমাগত ঝরে পড়ছে। এই হাসি ভাগ্যের প্রতি হয়ত বা তীব্র ও শাণিত ব্যঙ্গের হাসি। এই হাসিকে স্বার্থপর মনে হলেও এ হাসির অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে অর্থনৈতিক সংকটে নিঃস্ব ও নিঃশেষিত এক দাম্পত্য সম্পর্কের অসহায় ভাঙনের বীজ। সন্তোষকুমার মণিমালার দ্বৈতরূপ দেখাতে দেখাতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ থাকা ও না থাকার ওপর মানবমনস্তত্বের অনেক কিছুই সর্বদা নির্ভর করে থাকে।

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে লেখকের প্রথম পর্বের লেখাগুলি যে কালপর্বে লেখা হয়েছে তা এক অস্থির সময়ের ভেতর থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সর্বত্রই এক অর্থনৈতিক সংকট ছেয়ে গিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষে যার সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল দাম্পত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। "পনেরো টাকার বউ" শীর্ষক গল্পটিও সেই দাম্পত্য সংকটেরই মারাত্মক সময়জাত উদাহরণ। নামকরণের মধ্য দিয়েও তার আভাস আমরা পাই। লেখক সচেতনভাবেই এই কার্য্য সম্পাদন করেছেন তা বলাই যায়। তিনি মণিমালার দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন ও তার ফলাফল দুই-ই এই গল্পে যেন তুলে ধরেছেন। অতীত সময়ের কালপর্বের দিকে তাকালে হয়ত এমন বহু "মণিমালা" ওরফে "পনেরো টাকার বউ"-দের আমরা খুঁজে পাব। শুধু অতীত-কেন। আধুনিক সময়ে, আধুনিক সমাজে অর্থবৈষম্যের ফলস্বরূপ বারবারই তো জন্ম নেয় "পরে টাকার বউ"-এরা। মণিমালার এই ঈর্ষা এই ক্ষোভ সমস্ত যেন ধেয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুর সমাজ এর প্রতি। আমাদের চারদিকে এমন বহু মণিমালার দাম্পত্য ভাঙে অথচ আমরা তা টেরও পাই না। "পনের টাকার বউ"-এরা সকলের ছোট, ক্ষুদ্র, করুণার হয়েও খুঁজে পায় "মরণকাঠি"। যা "মরণকাঠি" হয়েও

মণিমালাদের নিকট একদিন হয়ে ওঠে "জিয়নকাঠি"। প্রতিহিংসা রূপ এই "জিয়ন কাঠি" "পনেরো টাকার বউ"-দের সম্মানকেই যেন উজ্জীবিত করে, হয়ত বা সেই সঙ্গে আয়ের বিকল্প পথও উন্মোচিত করে। গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, সন্তোষকুমার এক্ষেত্রে বেশ কিছুটা যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। একটা সময় মানিক বেশ কিছু বউ-সিরিজের গল্প লিখেছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল-কুষ্ঠ রোগীর বউ সন্তোষকুমারের "পনেবা টাকার বউ" পুনরায় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি সমাজ ও সময়ের আলোয় সন্তাষকুমার ঘোষের প্রতিটি ছোটোগল্পই সময়ের জ্যান্ত দলিল হয়ে উঠেছে। কীভাবে একের পর দাম্পত্য ভেঙে যাচ্ছে, প্রেম ভেঙে যাচ্ছে, বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে, আদর্শ ভেঙে যাচ্ছে, মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে- সন্তোষকুমার যেন সেইসব ভাঙনেরই সজীব রূপকার।

আমরা যে দুটি গল্প নিয়ে এই দীর্ঘ আলোচনা করলাম তাতে স্পষ্টতই অর্থনৈতিক সংকটের ভয়ালরূপ আমাদের নজরে আসে। আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে তাঁর গল্পে কোথাও চিনেমাটির মতো বিশ্বাস বা আস্থা হয়ে পড়ছে ভঙ্গুর, কোথাও আবার অর্থকষ্টে ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যের সর্বনাশ উদ্যত হয়ে উঠছে "পনের টাকার বউ" এর মতো মানুষরাও। পূর্বেই যে সময় তথা কালপর্বের কথা আমরা বলেছি, এই দৃশ্য তারই সাক্ষস্বরূপ।

লক্ষণীয়, দুটি গল্পেই সন্তোষকুমার ঘোষের তীক্ষ্ণ সমাজবীক্ষণ যেন অভিজ্ঞতা, মানসিকতার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছে। এইসব গল্পে পাশচাত্য সম্পর্কে যে অর্থনৈতিক সংকট নিষ্ঠুরভাবে প্রবেশ করেছে-সন্তোষকুমার গভীরভাবেই তার বাস্তব চিত্রাঙ্কন করেছেন। যেখানে ধরা পড়েছে বহু সংসার, বহু হৃদয়, বহুরকম বিশ্বাস, বহুরকম ভালোবাসা। কিন্তু সবকিছু থেকেই শোনা গেছে ভাঙনের কান্না। অর্থের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত এই পৈশাচিক সমাজ-এর দিকে তাকিয়ে লেখক তাই ছুঁড়ে দিয়েছেন শত সহস্র কান্নার তথা ভাঙনের তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। আজও তার উত্তর মেলেনি। কারণ মনুষ্যত্ব, মানবিকতাবোধ, মূল্যবোধ সহানুভূতি আজও অর্থের কাছে সর্বস্ব বিকিয়ে গলা অবধি নিমজ্জিত হয়ে আছে। সুতরাং আমাদের বাঁচাবে কে? এই প্রশ্নেই সন্তোষকুমার তীব্র থেকে তীব্রতর।

**তথ্যসূত্র :**

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৪৩৫

২. সন্তোষকুমার ঘোষ, গল্প সমগ্র-১, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৬৮

৩. ঐ, পৃ. ৬৯

৪. ঐ, পৃ. ৭১
৫. ঐ, পৃ. ৭৩
৬. ঐ, পৃ. ৭৬
৭. ঐ, পৃ. ৭৭
৮. সন্তোষকুমার ঘোষ, গল্প সমগ্র-১, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১৭০
৯. ঐ, পৃ. ১৭৩

**সহায়ক গ্রন্থ :**


১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটো গল্পের একশ বছর ১৮৯১-১৯৯০) প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।
২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০০৪।
৩. অলোক চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্য স্বয়ং নায়ক, প্রথম প্রকাশ, বাঁকুড়া, কবিতা চক্রবর্তী (প্রকাশক), অক্টোবর ২০০১।
৪. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।
৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১০।
৬. বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৭৩।

অসীম মুখার্জি

## আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটোগল্পে গানের প্রসঙ্গ

পৃথিবী সৃষ্ট হওয়ার পর প্রাণী জগতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। মানুষদের আর্বিভাবের সাথে সাথে প্রাণী জগতের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে মানুষ অন্য প্রজাতি থেকে পৃথক হওয়ার সুবাদে আলাদা ভাবে বাসস্থান গড়ে তুলে। আর সেই বাসস্থানে পূজিত হয় তাদের পরম আরাধ্য দেবতা, যাকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন যাজ্ঞযজ্ঞ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বিভিন্ন বনজ দ্রব্যের সমাহারে নৈবেদ্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সমর্পণ করা হতো। কারণ নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমানের এক অলৌকিক শক্তি তারা অনুভব করতো। তাই নিজেদের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণার অবস্থানকে বিভিন্ন সুরেলা ধ্বনির সহযোগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতো। মনের অগোচরে তাদের এই সুরের মধ্যে একটা স্বর লুকিয়ে থাকতো। প্রথম দিকে তাদের স্বর বৈচিত্র্যময় আকারে প্রকাশ না পেলেও, সময়ের সাথে সাথে সেই স্বর রূপান্তরিত হয়ে সঙ্গীত নামক তাল পদ্ধতির জন্ম দেয়। এরপর থেকে এই পদ্ধতি সঙ্গীতের নানা প্রণালীর পরিচয় বহন করে আসছে। আরণ্যক, সংহিতা ও ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলো সঙ্গীতের সেই প্রাক পর্যায়কে চিহ্নিত করে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সংস্কৃতির মান ও রূপের যেমন উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়, ঠিক তেমনি সঙ্গীতেরও মান ও রূপের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সঙ্গীত হয়ে ওঠে তাই এক অপরিহার্য উপাদান। প্রাচীন যুগে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার ঘটে। সাম বৈদিক যুগে সামগ- ব্রাহ্মণরা যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার সময় বিভিন্ন সুর তালের সংমিশ্রণে যে গান করতেন, তা সামগ গান হিসেবে পরিচিতি পায়। ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রে সাতটি সুর (সা- রে- গা- মা- পা- ধা- নি) প্রথম সাম বেদে লক্ষ্য করা যায়। তাই সামগ গানকে বিশ্বসঙ্গীতের মূল উৎস হিসেবে ধরা হয়।

ভাষা যেমন বিভিন্ন স্তরের সোপান বেয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ও ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে, সঙ্গীতও তেমনি বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে জারিত হয়ে ব্যবহারের উপযোগী ও শ্রবণের মাধুর্য প্রদানে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। তাই গানের চালচিত্র নির্দিষ্ট জাতির দৈনিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সর্বজনীন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এখন আমরা দেখে নেবো, বাংলা ভাষার আদি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গান কীভাবে বিবর্তিত হয়ে জনসাধরণের প্রত্যহ দিনযাপনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, কারণ সংস্কৃত সাহিত্য হল ভাষা বিবর্তনের

ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ। তবে আদিরূপ বলতে জেনেটিক বা স্তরগত বিবর্তনের কথা বলছি। সংস্কৃত থেকে পুরোপুরিভাবে বাংলা ভাষার সৃষ্টি না হলে, সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য বাংলা ভাষার মধ্যে বিদ্যমান। যেকারণে বাংলা সাহিত্য আলোচনা করার আগে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলে ঐতিহাসিকগত বিবর্তন ও কথন রীতি সর্মকে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। রাগ সংগীত থেকে গানের ঐতিহ্য কালানুক্রমিক বিবর্তিত হয়ে মার্গ সংগীত ও ধ্রুপদের মধ্যে দিয়ে বিশ্বসংগীতের ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংগীত নাট্যসাহিত্যের হাত ধরে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে। নাটক যখন শিল্প প্রকাশের প্রথম মাধ্যম হয়ে উঠে, তখনি সেই শিল্পের মাধ্যমে গানের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। আমরা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' গ্রন্থে প্রথমে গানের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করি। এই সময় পর্ব থেকে গান তার স্বকীয় গতির সাথে সাহিত্যের নানা সংরূপের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটি রাগ, তালের সমন্বয়ে লেখা হলেও মার্গ সংগীতের কোন লক্ষণ এর মধ্যে দেখা যায় না। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটির অবদান অনস্বীকার্য। মূলত এই কাব্যটিকে ঘিরে বাংলা সাহিত্যে লিরিক গান বা কাব্যসংগীতের প্রকাশ ঘটে।

চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এই পদগুলো পাঠ করলে বোঝা যায়, রাগ- রাগিনীর সংমিশ্রণে পদকর্তারা নিজেদের অন্তর্গূঢ় সাধনার জন্য পদগুলি রচনা করেছেন। তবে এই পদগুলো পাঠকদেরকে কাব্য সংগীত আকারে পরিতৃপ্তি দিলেও, সংগীতের অবয়ব থেকে পুরোপুরি বিচ্যুতি করে। কারণ এই পদগুলি পাঠ করার জন্য রচিত হয়েছিল, গাওয়ার জন্য রচিত হয়নি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রাগ ও তালের সংমিশ্রণে রচিত হলেও সংগীতের কোনো লক্ষণ সেইভাবে দেখা যায় না। কবি বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যিক ঢঙে চরিত্রদের মুখে কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন। আবার মঙ্গল কাব্যেও কবিরা একই রীতি অনুসরণ করে কাহিনির গতিকে নির্দিষ্ট কক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ প্রয়াসী হয়েছেন। তবে বৈষ্ণব পদাবলী'র ক্ষেত্রে এই চলমান রীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। পদকর্তারা কীর্তনীয় ঢঙে রাধা- কৃষ্ণের অপরূপ লীলার কাহিনি পরিবেশন করেছেন। আবার অষ্টাদশ শতকে এসে শাক্তপদে সংগীতের কুল লক্ষণ বেশ সুচারু রূপে প্রকাশ পেয়েছে। পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এই গানগুলোকে ঈশ্বরিক অপূর্ব লীলার সমন্বয়ে মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করেছেন। তাই এই গানগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বাঙালিদের একাকী দিনযাপনের নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

রামপ্রসাদীয় যুগের পরেই বাংলা গানের অবক্ষয় শুরু হয়। এই সময় পর্ব থেকে গান ব্যক্তিভাবনা থেকে সরে এসে স্থুল ইন্দ্রিয়তন্ত্রের বশবর্তী হয়ে ওঠে। গায়কেরা জনমনোরঞ্জনের

জন্য প্রচলিত গানের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে অশালীন বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হয়। কবিগান, হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, তরজা, খেউর, পক্ষীদলের গান সেই সময়ের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই সব গানে গায়কদের সৃজনশীলতা যথেষ্টভাবে প্রকাশ পেলেও সৃষ্টি তত্ত্ব তাদের হাতে বিখণ্ডিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রামনিধি গুপ্ত, রাধামোহন সেন, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় হাত ধরে বাংলা গানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এঁনারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে গানের নিত্য নতুন পরিকাঠামোকে বয়ে আনতে বিশেষ সহায়ক হয়েছেন এবং পরবর্তীতে বাংলার ভূমিতে তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রাধামোহন সেন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতজ্ঞ হওয়ার সুবাদে তিনি মির্জা খানের 'তুহফাৎ-উল- হিন্দ' নামে পার্শি ভাষায় লেখা সংগীত কোষ গ্রন্থটি অবলম্বনে 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১৮১৮) গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেন। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ। অপরদিকে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ধ্রুপদ গানের মধ্যে দিয়ে বাংলা গানের জগতে আর্বিভূত হন। তিনিই প্রথম বাংলায় ধ্রুপদ গানের প্রচলন করেন। তাঁর হাত ধরে বিষ্ণুপুরে (নিজবাসভূম) এই গানের প্রথম প্রকাশ ঘটে, পরবর্তীতে এই গান 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে স্বীকৃতি পায়। তবে গানের পরিমণ্ডল তৈরি করার ক্ষেত্রে রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধু বাবু হলেন অন্যতম। তিনি পাঞ্জাবী টপ্পা গানকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলার মাটিতে সেই রীতির সৌধ নির্মাণ করেছেন। তিনি লিরিকের মন্ময় আবেগকে বাংলায় রূপান্তরিত করতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তাই এই টপ্পা গানকে সামনে রেখে পরবর্তীতে বাংলা গানের পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রথমদিকে গান কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তিত্বদের হাতে প্রচার পেয়ে এলেও ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে তা আকস্মিক বিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ জনরুচির প্রবল কৌতূহল ও উচ্ছ্বাসের কারণে গান একক হাতে না থেকে সর্বত্রই প্রসার লাভ করেছে। পরবর্তীতে এই ধারার ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, গান শুধুমাত্র গাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পাঠকমহল তৈরিতে যথেষ্ট অবদান রাখে। সেই কারণে এই সময় পর্বে লেখকদের হাত ধরে বিভিন্ন সংগীত গ্রন্থ, পত্রিকা প্রকাশ পায়। এছাড়াও সঙ্গীত শাস্ত্র অনুরাগীদের জন্য 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয়', 'ভারত সংগীত সমাজ' প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলেও সংগীতের চর্চা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। দাদার সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সংগীত অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তারই প্রমাণ মেলে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'গীতচর্চা' অধ্যায়ে- 'এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যজাত সুরগুলিকে কথা দিয়ে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল'।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের প্রথম পর্বে কবিতা লেখে সাহিত্য আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন। তবে এই কবিতার সাধনার পেছনে গান ওতপ্রোত ভাবে তাঁর হৃদয়ে জড়িয়ে থেকেছে। যেকারণে কবিতা গ্রন্থের নামের সঙ্গে সঙ্গীত শব্দটিকে তিনি অতি কৌশলে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'প্রভাত সঙ্গীত', 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'ছবি ও গান' সেই ইচ্ছেরই নামান্তর। তিনি কবিতা ও গানের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেননি। তাই কবিতার ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে তিন ডাইমেনসেনের প্রসঙ্গ বাক, অর্থ, ছন্দ। আর গানের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে চার ডাইমেনসেন তত্ত্ব বাক, অর্থ, তাল বা ছন্দ ও সুর। তিনি গানের মধ্যে পার্থিব জগতের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে অধরা মাধুরীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

'গানের পাখা যখন খুলি    বাধা-বেদন তখন ভুলি।
যখন আমার বুকের মাঝে   তোমার পথের বাঁশি বাজে
বন্ধ ভাঙার ছন্দে আমার    মৌন-কাঁদন হয় অবসান'।[২]

অগ্রজরা নিজেদের অসীম সাহসিকতার সাথে গানের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন পরবর্তী গায়কেরা সেই ভিতকে আরও মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। এঁনারা গানের আঙ্গিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশি মনযোগী হন। দেশ ও সমাজের পারস্পারিক অবস্থান, শ্রোতাদের মুখরোচক বিষয়কে সামনে রেখে গানের কাঠামোর বদল ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুলেরা। আধুনিক গানের ছাঁদ এঁদের তৈরি করা পথে প্রচার ও প্রসার ঘটে। গান সম্পর্কে অনেক বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, কারণ গান সম্পর্কে বেশি বললে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তাই এখন আমরা খুব সংক্ষেপে দেখে নেবো কথাসাহিত্যে কীভাবে গানের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমত, উপন্যাস ও ছোটোগল্প পাঠ নিতে পাঠকেরা যাতে একঘেঁয়ামির মুখোমুখি না হয়ে পড়েন সেই কারণে সাহিত্যিকরা গানের ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত ও নির্মিত চরিত্রদের অনেক না বলা কথা গান ব্যতীত অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেকারণে তাঁরা গানকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মাণিক যে ক্ষেত্রকে সাহিত্যের জন্য ব্যবহার করেছেন ইলিয়াস সেই পথে তাঁর চরিত্রদের মুখে গানের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। এখন আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে কীভাবে গানের প্রসঙ্গ এসেছে তা গল্প পরম্পরায় দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত প্রথম গল্প হল 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। এই গল্পের মাধ্যমে লেখক রঞ্জুর জবানীতে গানের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। রঞ্জু বাস্তব থেকে বিমুখ, জগতের কোন কিছুর মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পায় না।

তাকে অনবরত ঘিরে রাখে মৃত্যু চিন্তা। ফেলে আসা অতীত স্মৃতিকে নিয়ে সে যেমন মশগুল থাকতে পারে না, তেমনি বাস্তবকে বয়ে নিয়ে যেতে সে অপরাগ হয়ে উঠে। আজিমপুর থেকে আশিকের সঙ্গে রঞ্জু সাতটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে বাড়িতে ফিরেছে। এরমধ্যে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত সে গেয়ে উঠে 'তুই ফেলে এসেছিস কারে'।[৩] এই গানের মধ্যে দিয়ে সে শৈশব স্মৃতিকে রোমন্থন করতে চাইলেও রোমন্থিত করতে পারে না। দুর্বল মন তার যে কোনো ভাবনাকে অস্থায়ীর অভিমুখে ঠেলে দেয়। তাতে তার ব্যাকুলতা আরো বৃদ্ধি পায়। তাই পরক্ষণে সে নেবুপাতার মর্মর ধ্বনি শুনতে শুনতে বিমর্ষিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সে আব্বা- আম্মার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়েও তার মানসিক অবস্থানের কোনো বদল ঘটে নি বরং কোনো এক অতৃপ্ত তাড়না তাকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যায়। অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে সে যা কিছু দেখছে সমস্তটা তার নিথর বলে মনে হয়েছে। রঞ্জু রাত্রে একলা জেগে থেকে স্বপ্নের মধ্যে কাজলা দিদির ডাককে অনুভব করলেও বাস্তবের মাটিতে তার কোনো স্পর্শ পায়নি। এই কাজলা দিদি পরক্ষণে তার স্বপ্নে নিশ্চিন্তপুরের দুর্গা দিদিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাকে নিশ্চিন্তপুরের মাঠে, রেল লাইনের মধ্যে সে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলেও খুঁজে পায়নি। পরে রঞ্জু যখন স্বপ্ন থেকে বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে, তখনি তার ভুল ভাঙ্গে। সে খুঁজে পায় হারানো দুর্গা ও কাজলা দিদিদেরকে। যারা অনেক কাল আগেই এই জগত থেকে ছেড়ে চলে গেছে। লেখক এই গল্পে রঞ্জুর ব্যক্তি সংকটকে বোঝানোর জন্য দুটি গানের ব্যাবহার করেছেন। প্রথম গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও দ্বিতীয় গানটি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর। রঞ্জুর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থানকে শুধুমাত্র গল্প দিয়ে বাঁধা সম্ভব নয়, সেইকারণে লেখক গান দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাই এই গল্পে গানের অনুষঙ্গ রঞ্জুর ভাবমোক্ষণের চরম পরিণতি রূপে বিবেচিত হয়েছে।

'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগ্রন্থের নামাঙ্কিত গল্পটিতে বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজচিত্র যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি কীর্তনীয় ঢঙে গানের অনুষঙ্গ এসেছে। ইলিয়াস প্রদীপের পিসীমার মুখে যে গানের ব্যবহার করেছেন তা তার নিজস্ব একান্তের। গল্পটি শুরু হয়েছে চণ্ডীদাসের গানের কলি দিয়ে 'আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, নয়ন ভরিয়া দেখি'।[৪] পিসীমার এই গান শুনে নারায়ণগঞ্জে প্রদীপের সকাল শুরু হয়। পিসীমা বিধবার হওয়ার জন্য সে একাকী দিনযাপন করে, অপরদিকে প্রদীপও বিয়ে না করার কারণে সেও একাকী পিসীমার মতো দিন অতিবাহিত করে। তাদের দুজনের মধ্যে একটা ফারাক পিসীমা বাল্য বিধবা আর প্রদীপ আইবুড়ো। প্রদীপ কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জে এসেছে কিছুদিনের জন্য থাকার জন্য। নারায়ণগঞ্জ তার পুরনো বাসভূমি ব্যবসার কারণে তাকে কলকাতায় থাকতে

হয়েছে। তাই এই গ্রাম সম্পর্কে তার একটা আবেগ রয়েছে, যা তার কথার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ননীদার নতুন বাড়িতে জায়গার অভাব থাকায় প্রদীপকে থাকতে হয়েছে পুরনো বাড়িতে। ওই বাড়িতে থাকে পিসীমা ও ননীদার বড় ছেলে অমিত। অমিত ক্রিকেট খেলার কারণে ঢাকা গিয়েছে, তার রুমে প্রদীপের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রদীপ এই বাড়িতে থাকতে থাকতে বাল্য অবস্থার নানান স্মৃতি তার কাছে এসে ভিড় জমিয়েছে। কখনো এই স্মৃতি থেকে সে দূরে অবস্থান করেছে আবার কখনো এর মধ্য দিয়ে মশগুল হয়ে থেকে দিন অতিবাহিত করেছে। পরক্ষণে দেখা যায়, ভাইপো অমিতের বাড়ির মধ্যে ফেলা রাখা পর্ণোগ্রাফির ছবি তার মনের কাম তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলেছে। যেকারণে সে মাস্টারবেট করে কামতৃষ্ণা থেকে সাময়িক পরিতৃপ্তি পেয়েছে। পিসীমার গাওয়া গানের মধ্যে দিয়ে তার একাকী অবস্থান যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি কাম প্রবৃত্তি থেকে তাকে নিরসন করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'সিন্দুরের দাগ আছে সর্বদাই মোরা হলে মরি লাজে'[৫] পিসীমার এই গানের মধ্যে দিয়ে সমাজের এয়োস্ত নারীদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, যারা সমাজের ভয়ে মনের ইচ্ছেকে অবদমন করে রাখতে বাধ্য হয়। অপরদিকে বিজয় সরকারের 'জীবন আমার বিফলে গেল, গোকুলচন্দ্র'[৬] গানে কৃষ্ণের জন্য রাধার আর্তির যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এই গল্পেও পিসীমার সেই গুনগুন স্বর হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ করেছে। পিসীমার গলায় শোনা গেছে তিন রীতির গান (বৈষ্ণবীয়, শাক্ত ও বিজয় সরকারের)। একটি গান শেষ হতে না হতে পিসীমা আর একটি গান শুরু করেছেন অর্থাৎ পিসীমা যেভাবে অভ্যস্ত ইলিয়াস তার মুখে সেইভাবে গানের সংযোজন ঘটিয়েছেন। আসলে দীর্ঘদিন ধরে তার হৃদয়ে লুকিয়ে রাখা ক্ষোভকে গল্পকার গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অপরদিকে দেখা যায়, প্রদীপ যেভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছে পিসীমা গান গেয়ে তার পাগল মনকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষপর্যন্ত পেরে ওঠেনি। ইলিয়াস এই গানগুলোর মধ্যে দিয়ে পিসীমা ও প্রদীপের ইচ্ছে ও অনিচ্ছের দ্বন্দ্বকে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। ইলিয়াস কৈশোর বয়সে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত শোনার পর থেকে সেইসব গানের প্রতি আকৃষ্ট হন, এইসব কথা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে জানা যায়। পরবর্তীতে তিনি যখন ১৯৮৭ সালে সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। সেই সময় পর্ব থেকে তিনি বাংলায় হারিয়ে যাওয়া গানকে উদ্ধার করার কাজে নামেন, এই জায়গা থেকে তাঁর গানের প্রতি একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই গল্পটি সেই ঝোঁকপূর্ণ আবেগের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

'খোঁয়ারি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'খোঁয়ারি' গল্পটি ইলিয়াসের সৃজন জীবনে শ্রেষ্ঠ ফসল। গল্পটির প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সামাজিক অবক্ষয়কে ঘিরে।

কিছু যুবক দেশের পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নতির জন্য নানান রকম কাজ করতে থাকে কিন্তু এই উন্নতির পেছনে দেশের স্বার্থ তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে ওঠে। ফারুক ও জাফর হল এই গল্পে ছদ্মবেশধারী জননেতা, যাদের হাতে দেশের ঐশ্বর্য বিখণ্ডিত। গল্পটি শুরু হয়েছে সমরজিতদের বাড়িতে মদ্যপান অবস্থায় চারজন বন্ধুর আড্ডা দেওয়াকে ঘিরে, তাদের কথাবার্তায় দেশের নানান প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এই আড্ডাকে একঘেঁয়ামির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইলিয়াস জাফর ও অমৃতলালের কণ্ঠে গানের অবতারণা ঘটিয়েছেন। জাফর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বন্ধুদের নানা রকম গান শুনিয়েছে- 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী'[৭], 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল'[৮] এবং গল্পের শেষে সমরজিতের বাবা অমৃতলাল নেশের ঘোরে একটানা গেয়ে চলে- 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী'[৯], কিংবা 'বলেছিলে চিঠি দাও'[১০] কিংবা 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার'[১১] ইত্যাদি। ইলিয়াস দুইজন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কণ্ঠে গান উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পে দেখা গেছে জাফর সংখ্যাগুরু এবং মানিক ভাই দলের প্রতিনিধি, তাই তার গান স্বতঃস্ফূর্ত ও উমেদারি চিন্তার পরিচয়কে বহন করেছে। অপরদিকে অমৃতলালে সংখ্যালঘু হিন্দু হওয়ার কারণে তার গানের মাধ্যে উদার ও অসহায়তার অবস্থানটি ফুটে উঠেছে। ইলিয়াস মদ্যপ নেশা ও গানের মাধ্যমে তাদের দুজনকে একসূত্রে গেঁথে তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয়কে পাঠকের সম্মুখে তুলে আনতে বিশেষ প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি মানববিরোধী অচলায়তন ভাঙ্গার যে ডাক দিয়েছিলেন, এই গল্পটি সেই দ্যোতনাকে বহন করেছে।

ইলিয়াস 'গণসঙ্গীত' প্রবন্ধে গান সম্পর্কে বলেছেন- 'এমনিতে যে কোনো ধরনের গান মানুষকে স্পর্শ করে তার ব্যক্তি-চেতনায়; মানুষের ব্যক্তিগত পুলক কি বেদনা, শোক ও সুখকে উপভোগ্য ও তীক্ষ্ণ করে বাজিয়ে তার অস্তিত্বকে তীব্রতর ও গভীরতর করে অনুভব করতে সাহায্য করে'[১২]। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চরিত্রদের মাধ্যমে গল্পে গানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর চরিত্ররা একান্ত ভালোলাগা ও নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচার জন্য গানকে ভাষার মতো উপযোগী করে ব্যবহার করেছেন। তাই গান তাদের একান্তের অভাব, অভিযোগের ডালি নিয়ে গল্পে উপস্থিত হয়েছে। ইলিয়াস দক্ষতার সাথে তার ব্যবহার ঘটিয়েছেন, এতে যে তিনি সফল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

**তথ্যসূত্র :**

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (আষাঢ় ১৪২১)। 'জীবনস্মৃতি'। 'গীতচর্চা'। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। পৃ. ৮০

২) সেন, সুকুমার (১৪০৮)। 'রবীন্দ্রনাথের গান'। কলিকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। পৃ. ১৯

৩) ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (জানুয়ারি ২০২২)। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। রচনাসমগ্র ১। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ১৩
৪) ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (জানুয়ারি ২০২২)। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'। রচনাসমগ্র ১। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ৭৮
৫) পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৩
৬) পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৩
৭) ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (জানুয়ারি ২০২২)। 'খোঁয়ারি'। রচনাসমগ্র ১। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ৯৬
৮) পূর্বোক্ত। পৃ. ১০১
৯) পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৬
১০) পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৬
১১) পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৬
১২) ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (আগস্ট ২০২২)। 'গণসঙ্গীত'। রচনাসমগ্র ৪। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ২০৮

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

## সমরেশ বসুর শহীদের মা : মাতৃ-যন্ত্রণার এক নির্বাক প্রতিবাদ

"... পরিচয় হয়েছিল শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কেন লেখো?'... খানিকটা বিব্রতভাবেই জবাব দিয়েছিলাম, 'জানবার জন্যই লিখি।' 'কী জানবার জন্য?' তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি প্রায় একটুও না ভেবে জবাব দিয়েছিলাম, 'মানুষকে জানবার জন্য।'... সম্ভবত আমার এই জবাবই শ্রীযুক্তা রায়ের পরবর্তী প্রশ্নকে যথার্থ সংকেতময় করে তুলেছিল, 'নিজেকে জানবার জন্য নয় কেন?' বিশ্বে এই জিজ্ঞাসা সেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তা মনে করি না, কিংবা নিজেও সঠিক জানি না, প্রশ্নটা সেই প্রথম শুনেছিলাম কী না, কিন্তু নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্তে আমার লেখক সত্তার ক্ষেত্রে তা এক অভূতপূর্ব ক্রিয়া করেছিল, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের সেই 'নিশীথে' গল্পের অলৌকিক আর্ত জিজ্ঞাসা 'ও কে, ও কে, ও কে গো?'- এর মতো, মস্তিষ্ক জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল নিজেকে জানবার জন্য নয় কেন?"[১]

মানুষকে জানার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং মানবজমিনকে কর্ষণের এক গভীর তাগিদ থেকেই সমরেশ বসু হয়ে উঠেছিলেন বিশ শতকের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন ব্যক্তিত্ব। মানুষকে জানতে চাওয়া এবং মানুষের সকল প্রতিকূলতাকে অনুকূলে রূপান্তরিত করতে চাওয়ার এক জেদী মনোভাব নিয়েই অতি সাধারণ স্তর থেকে ছুঁয়েছিলেন খ্যাতি তথা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষবিন্দু। জীবনকে তিনি বাস্তবে দাঁড় করিয়েই রাখতে পছন্দ করতেন তাই জীবন নিয়ে কোনো আহ্লাদ বা আদুরে ভাবনা তাঁর ছিল না। রক্তমাংসের নর-নারীরাই উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। বিশেষ করে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষরাই জায়গা পেয়েছে তাঁর সার্বিক গল্পমানসপটে। তাঁর ছোটগল্পের বিষয় ও আখ্যানরীতি বদলেছে বারবার। আঙ্গিকে এসেছে অভিনবত্ব। প্রেম, যৌনতা, রাজনীতি, সংগ্রাম, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য সহ বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে তাঁর গল্প জগতে।

জগদ্দলের চটকল কারখানায় এবং পরবর্তীকালে ইছাপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাকটারীতে নক্সা আঁকার কাজে যুক্ত থাকার সময়েই সমরেশ বসু বামপন্থী রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর কথায়—'আমার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের মধ্যে কোনো মার্কসীয় তত্ত্বজ্ঞান কাজ করেনি। বস্তুতপক্ষে ১৯৪২ সালের আগেই কার্ল মার্কস বা এঙ্গেলসের নাম শুনলেও তাঁদের কোনো রচনাই তখনও আমি পড়িনি। এবং আমার দিক থেকে অকপটে স্বীকার করতেও কোনো বাধা নেই, আজ পর্যন্ত মার্কসবাদ সম্পর্কে তেমন কোনো গভীর অনুশীলনও আমার দ্বারা হয়নি।'[২]

সমরেশ বসুর 'শহীদের মা' গল্পটি সম্পূর্ণরূপেই রাজনৈতিক গল্প বলা হলেও আসলে এই গল্পটি রাজনীতির ভিতরে পিষে যাওয়া এক সন্তানহারা মায়ের জীবন যন্ত্রণার করুণ ইতিহাস। এখানে সমরেশ বসুর নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার বা প্রচার করার কোনো প্রয়াসই আমরা দেখতে পাই না। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ সালের বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই গল্পে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের অবক্ষয়কে তুলে এনে শিল্পরূপ দিয়েছেন লেখক। আর তা করতে গিয়ে লেখক একবারের জন্যও কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো কর্মকান্ডের পরিচয় দেননি। অথচ গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠককে লেখক বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে এখানে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সব রাজনৈতিক দলই যেন দিকভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত। সমস্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপকে লেখক সাদা চোখে দেখতে চেয়েছেন। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রেক্ষিতে তা তিনি নির্ধারণ করতে চাননি। পরিবর্তে একান্তই একটি পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে রাজনৈতিক সংকটের রূপকে তুলে ধরেছেন লেখক। প্রশ্ন করেছেন বিবেকের কাছে। সেই বিবেকই যেন এখানে বিমলা। সে বাদলের মা। সে 'শহীদের মা।'

'শহীদের মা' গল্পটি সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে এক মায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। তার স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতাতেই নির্মিত হয়েছে গল্পের আখ্যান। মা বিমলার অন্তর আত্মার এক অন্তহীন যন্ত্রণার রূপ ধরা পরে এখানে। গর্ভ-যন্ত্রণার অনুভব দিয়েই গল্পের সূচনা - 'শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হলো, পেটের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়বড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে, বিমলা তথাপি নড়তে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল। বাদল রয়েছিস?'[৩]

এভাবেই কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ সময়। এক আত্মমগ্নতার মধ্যে ডুবে যায় বিমলা। সে মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই যেন নতুন করে বাদলকে গর্ভে ধারণ করার অনুভূতি বুঝতে পারে। সেই বাদল, যে মাত্র কয়েকটা দিন আগেই বলি হয়েছে রাজনীতির। জন্মের পর থেকে আজ ১৯-তম জন্মদিনের আগেই খুন হয়ে যাওয়া বাদল যেন প্রতি মুহূর্তে মায়ের অনুভবে ধরা দিয়েছে। সেই অনুভবের মধ্য দিয়েই বিমলার মতই তার মৃত কনিষ্ঠ সন্তান বাদল এই গল্পের তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে।

## দুই

গল্পের আখ্যানভাগ দেখলে আমরা লক্ষ্য করবো গল্পটি শুরু হচ্ছে মায়ের শরীরের মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের নড়াচড়ার অনুভব দিয়ে। সেই একান্ত মাতৃ অনুভব প্রৌঢ়া বিমলার। যে

বিমলা এখন সম্পূর্ণরূপেই মাতৃত্বের সম্ভাবনাহীন। জৈবিকভাবে মাতৃত্বের সম্ভাবনাহীন হলেও, এই বয়সেও তার গর্ভে নতুন জীবনের আলোড়ন। সে আলোড়ন বিমলা অনুভব করেছিল নিজের সন্তানের মৃত্যুর তিন মাস পরেও। পরমুহূর্তেই তার শরীর আর একবার কেঁপে ওঠে। গল্পে লক্ষ্য করা যায় চেতনা প্রবাহ রীতির এক ছায়া। এক মগ্নচৈতন্যে আচ্ছন্ন হয়ে বিমলা। উনোনের পাশে তরকারির কড়াটা নামিয়ে রেখে উঠে দাড়ায় সে। তারপর —

'বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে একটা জবাফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না।'[৪]

যে বিমলা তার প্রায় সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে ফেলেছে রান্নাঘর আর হেঁসেল ঠেলতেই, সেই বিমলা আজ আর নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি। এক অমোঘ অপ্রতিরোধ্য বহির্মুখী টান তাকে তার রান্নাঘর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এসেছে। স্মৃতি বিমলাকে মনে করায় বাদল তার শেষ সন্তান নয়। বাদলের পরে আরো দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারা বাঁচেনি। তাই শেষ জীবিত সন্তান হিসেবে বাদল একটু বেশিই প্রিয় ছিল মায়ের। সেই প্রিয় সন্তানের স্মৃতির টানই তাকে ঘর থেকে বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিমলা খুব ভালো করে জানেন সেই সন্তানের স্মৃতির জন্য নির্মিত শহীদ বেদীতে তার সন্তান নেই। বাদলকে দাহ করা হয়েছিল শ্মশানেই, শহীদ বেদীতে নয়। কিন্তু মাস তিনেক আগের সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল বিমলার কাছে। মাস তিনেক আগেই তৈরি হয়েছিল এই শহীদ বেদীটি। বিমলা বাদলের মা থেকে হয়ে উঠেছিল 'শহীদের মা'। সেদিন এই 'শহীদের মা'কে ডাকতে এসেছিল বাদলের জীবিত বন্ধুরা, পার্টির জীবিত ছেলেরা। তারা শুধু বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল, তার সবচেয়ে বড় কারণ সে 'শহীদের মা'। রাজনীতির কোনো দলই নেই তার। শহীদের বাবা হরপ্রসাদের প্রয়োজন সেদিন পড়েনি, কারণ হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা কৃপাল আর দয়াল দুজনেই আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। তাই তাদেরকেও ডাকতে আসা হয়নি। একটা পাঁচ জনের পরিবারের চারজন পুরুষ সদস্যই আলাদা আলাদা চারটি পার্টির মেম্বার। দলহীন শুধুই মা। মাতৃত্বই তার একমাত্র নীতি। মাতৃত্বই তার একমাত্র

জগত। কেবলমাত্র মাতৃত্ববোধই তারা একমাত্র অবলম্বন। সেটাকে অবলম্বন করেই বিমলা সেদিন গিয়েছিলেন। আচ্ছন্নের মতোই গিয়েছিলেন, আচ্ছন্নের মতোই ফিরে এসেছিলেন। একটা ঘোরের মধ্যে আবার ফিরে এসেছিলেন রান্নাঘরে। নিত্য সংসারিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ওই একটু দূরে, পশ্চিম মোড়ের রাস্তার ধারে, যেখানে কয়েকটা ইট আজও জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন এটুকুই। কিন্তু মাতৃগর্ভে বাদলের সেই আগমনের চিহ্ন আজও একই রকম গভীর।

নিহত বাদলকে দেখে স্থির থাকতে পারেনি বিমলা। ওখানেই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন একবার। সেদিন উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন বিমলা। আপন মনে পাগলের মত প্রশ্ন করেছিলেন 'কে তোকে এমন করে মারল ওরে বাদল।' সেদিন উঠোন জুড়ে প্রচুর মানুষের ভির জমেছিল, শূন্য ছিল শুধু বিমলা। ওই ভিড়ের মধ্যে দিয়েই ক্ষতবিক্ষত বাদলকে ফুল ছড়িয়ে, মালা জড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো শ্মশানে। বাদলের শ্মশান যাত্রায় সেদিন হরিবোল ধ্বনি ওঠেনি, পরিবর্তে স্লোগান শোনা গিয়েছিল 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন।' সেদিনের সেই ঘোরের মধ্যেও কথাগুলো কানে পৌছেছিল বিমলার। আরো একটা খুন। আরও একটা সন্তানশোক। আরো একটা মাতৃগর্ভ-শূন্যতা।

**তিন**

হরপ্রসাদের পুরুষতন্ত্রের পরিবারে বিমলার এই যন্ত্রণায় পাশে থাকেনি কেউ। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বা খুন হয়ে যাওয়াতে পরিবারটিতে কোনো আলোড়ন ওঠেনি। কিছুটা থমথমে পরিস্থিতি হলেও সবকিছু চলছে স্বাভাবিক নিয়মেই। সংসারের একান্ত প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া অন্যদের সঙ্গে বিমলার আর কোনো কথা হয়নি। এই বিপুল শোকের অংশীদার কেউ নয়। যেন হরপ্রসাদের সন্তান মরেনি, দয়াল ও কৃপালের ভাই মরেনি, মরেছে অন্য কোনো পার্টির ক্যাডার। এমনই এক অদ্ভুত যান্ত্রিক পরিস্থিতিতে একান্ত মানবিক সম্পর্কগুলো ম্লান হয়ে গেছে। রাজনীতি, পার্টি, এবং দলতন্ত্র গিলে খেয়েছে পরিবারের সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক গুলোকে। এই পরিস্থিতি একটি বিষয় নগ্নভাবে স্পষ্ট করে যে হরপ্রসাদ, কৃপাল বা দয়াল কেউই তাদের রাজনৈতিক অবস্থানে ঠিক নেই। দৃঢ়তা নেই। লক্ষ্যহীন অবস্থানে তারা প্রত্যেকেই সঠিক অবস্থানে থাকার ভান করে প্রতিনিয়ত। সেটাই বোঝানোর জন্য তারা বক্তৃতা দেয়, জনসভা করে, আর মিথ্যা যুক্তি খাড়া করে। রাজনীতির বিষবাষ্প কাঁচা রক্তের গন্ধে দলগুলিকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর আদর্শ শেখায়।

বিমলা একদিন বুঝতে পারে বাদলও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তার পথ পিতার বা দাদাদের পথ নয়। তার পথ সম্পূর্ণ আলাদা। বাদলের যৌবনে বাংলার

রাজনীতিতে এক নতুন মতাদর্শ উদ্ভব ঘটেছে। সেই রাজনীতিতে নবীন প্রজন্মের জোয়ার আসে। সে জোয়ারে প্রবাহিত হয় বাদল। তারুণ্যের উদ্দামতা নিয়ে নতুন মতাদর্শ নিয়ে নতুন পথের পথিক বাদল। বিমলা তার এই 'মাতৃমুখী' পুত্র কে নিষেধ করেছিল। সে নিষেধ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ কেন্দ্রিক ছিল না। সে নিষেধ ছিল শুধুই মাতৃ হৃদয়ের অমঙ্গলসূচক ভাবনা। কিন্তু তার পরবর্তী ক্ষেত্রগুলিতে স্বল্পবাক বাদলকে পেতে হয়েছিল একের পর এক পারিবারিক ও দলীয় হুমকি। তাকে বলা হয়েছিল সে এখনই যেন তার সমস্ত রাজনৈতিক মেলামেশা ত্যাগ করে, এবং পার্টি ছাড়ে। এই হুমকি পার্টির কোনো বাইরের লোকের নয়। এই রাজনৈতিক পরিবারটির প্রধান কর্তা হরপ্রসাদের তরফ থেকেই আসে এই হুমকি ও শাসানি। এই হুমকির সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হওয়া নয়, অস্থির আস্ফালন নয় এবং জোর গলায় কথা বলা নয়, বরং দৃঢ় প্রত্যয়ের দৃপ্ত কণ্ঠে বাবার চোখে চোখ রেখে নিজের রাজনৈতিক দৃঢ়তা স্পষ্ট করেছিল বাদল। এরপরেও হুমকি এসেছে দাদাদের তরফ থেকে।

"প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোন্দিন একটা কি ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

বিমলা বলেছিল, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'

'ও বোঝাবার বাইরে চলে গেছে।'

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিল, 'আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?'

কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন একরকমভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে, 'তোমার ছোট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'"[৫]

বাড়ির তিন পুরুষ সদস্য যখন বাদলকে নিয়ে বিমলার কাছে বলতো, সেদিন কিন্তু হরপ্রসাদের উপর রাগ চেপে রাখতে পারে নি সে। নিজের ছেলেকে বোঝাতে না পারার ব্যর্থতা জোর গলায় সে বলতে পেরেছিল হরপ্রসাদকে। এমনকি সেদিন হরপ্রসাদকেও পার্টি ছাড়ার কথা বলেছিল পারিবারিক দ্বন্দ্বের অস্থির পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। এ প্রতিবাদ রান্নাঘরে বন্দী থাকা বিমলার ক্ষেত্রে বেশ অভিনব। এই দৃঢ়তা বাদলের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে। সম্পূর্ণরূপে বিমলার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন আগে। এই সত্তাই ক্রমশ চাপা

পড়েছে পুরুষ তান্ত্রিকতা ও রান্নাঘরের চাপে। রান্না খাওয়া আর নিতান্ত প্রয়োজনের কথাটুকুর বাইরে বিমলা সেদিন গুরুত্ব পায়নি। আজ এই অন্তহীন মাতৃশোকের কিনারায় দাঁড়িয়েও স্বাভাবিক সান্তনা টুকুও পেল না সে।

**চার**

নিহত সন্তানের উনিশতম জন্মদিনে সন্তানের বিয়োগ-বেদনার যন্ত্রণাদগ্ধ স্মৃতি আঁকড়ে ধরে একা দাঁড়িয়ে বিমলা। যে সন্তানের প্রত্যেক জন্মদিনে পায়েস রেঁধে দিত বিমলা, আজ তার উনিশতম জন্মদিনে ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শোকাতুর। মৃত পুত্রের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে মগ্নচৈতন্যে সন্তানের পুনরাবির্ভাবের সমস্ত জৈবিক লক্ষণ অনুভব করে সে। আজ পরিবারের কারোর জন্যই তিনি রাখবেন না বলে ঠিক করেছেন। এই দৃঢ়তাই তার বিদ্রোহ। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যাদের জন্য শুধুই রান্না করে গেছে যে, প্রতি মুহূর্তে স্বামীর সংসারে শুধুই সার্ভিস দিয়ে গেছে যে, কৃপাল ও দয়ালের মা হিসাবেও কোনো কর্তব্যেই যার কোনো গাফিলতিই নেই, আজ সে সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছে। বিমলার মনে হয়েছে ওরা কেউ তার স্বামী বা পুত্র নয়। প্রত্যেকেই এক একটা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা ক্যাডার। এদের মধ্যে কোনো পারিবারিক সহজতা নেই, আছে শুধুই পারস্পরিক অন্তর কলহ। তাই এরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে বাদলের অবস্থান নিয়ে সাবধান করেছিল বিমলাকে। পুত্র বা ভাই হিসেবে বাদলকে বোঝাতে যায়নি তারা। বিপরীত পার্টি কর্মী হিসেবেই বাড়ির পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছিল তারা। এমন মৃত্যুতেও তাই তারা এত স্বাভাবিক।

'ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

কৃপাল বলল, 'মা, তুমি এখানে কী করছ?

দয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড়বৌ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।'

তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্না-বান্না করোনি, আমরা খাব কী?'

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'

তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী করব এখন?'

বিমলা বলল, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।'

অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিনজনেই দেখল। তিনজনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে।'[৬]

পরিবারের তিন পুরুষ সদস্যই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ চুপ। বিমলার বিপরীতে দাঁড়িয়ে পুরুষতান্ত্রিকতা। এখন অন্তহীন বিস্ময় তিনজনেই যেন চিনতে পারছে না বিমলাকে। কেউ চিনতে পারছে না তাদের চির পরিচিত মাকে বা কেউ তার স্ত্রীকে। এই প্রথম তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে ভয় পেল। মিতবাক বা নির্বাক বিমলাকে দেখে প্রত্যেকেই স্তম্ভিত। বিমলা যেন আজ অনেক কিছুই শিখিয়ে দিল তাদের। প্রতিদিনের রাজনীতির ভাঙন যখন একটা পরিবারকে ভেঙে তছনছ করে দেয়, তখন সত্যিই ফেলে আসা স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর তাকে আঁকড়ে ধরেই পুত্রের মৃত্যুর উনিশ বছর পরেও যে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা বিমলা অনুভব করেছে, তাই তাকে সামগ্রিক প্রেক্ষিতের সামনে দাঁড় করিয়েছে এক প্রতিবাদী মূর্তি রূপে। তিনি বুঝিয়েছেন এই অন্তহীন যন্ত্রণার শেষেও বাদলেরা আবার জন্মায়। 'মাতৃমুখী' বাদলেরা আবার ফিরে আসে। মা থেকে 'শহীদের মা' হয়ে ওঠে বিমলারা। স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর সন্তানদের মৃত্যুতে বেদনার সঙ্গে যে গর্ববোধ মিশে থাকে তা তৈরি হওয়ার কোনো অবকাশই নেই বিমলাদের ক্ষেত্রে। এখানে শুধু সন্তানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে থাকে রাজনীতির নামে হত্যাকান্ড এবং 'শহীদ' তকমা দিয়ে 'বেদী' নির্মাণ। আর জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে এই শহীদের মায়েদের জোটে সেই ভাঙ্গা বেদীর অবশিষ্ট কয়েকটি ইট আর ফেলে আশা দিনের সন্তানের আগমন অনুভব।

**তথ্যসূত্র:**


১. নিজেকে জানার জন্য: সমরেশ বসু।/ দেশ সাহিত্য পত্রিকা ১৩৮২ , পৃষ্ঠা- ১০৬
২. ভারতের কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি। সমরেশ বসু। দেশ সাহিত্য পত্রিকা, ২২ নভেম্বর। ১৯৮৬। পৃষ্ঠা- ৯৬
৩. সমরেশ বসুর বাছাই গল্প। মণ্ডল বুক হাউস, অক্টোবর ১৯৫৮ পৃষ্ঠা- ১৫০
৪. সমরেশ বসুর বাছাই গল্প। মণ্ডল বুক হাউস, অক্টোবর ১৯৫৮ পৃষ্ঠা- ১৫০
৫. সমরেশ বসুর বাছাই গল্প। মণ্ডল বুক হাউস, অক্টোবর ১৯৫৮ পৃষ্ঠা- ১৬১
৬. সমরেশ বসুর বাছাই গল্প। মণ্ডল বুক হাউস, অক্টোবর ১৯৫৮ পৃষ্ঠা- ১৬৫

সরোজ কুমার পতি

## রবীন্দ্রগল্পে নারী ব্যক্তিত্বের পূর্ব সূচনা : প্রেক্ষিত মহামায়া

আমাদের দেশে যখন কৌলীন্য প্রথা ও সহমরণ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল সেই পটভূমিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের "মহামায়া"। গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের বিষয়টি যদিও আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও এটি আলোচনার দাবী রাখে। কারণ সবুজ পত্র (১৯১৪) পর্বের রবীন্দ্র ছোটোগল্পগুলিতে (হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা) নারী ব্যক্তিত্বের যে কথা রয়েছে তার পূর্ব সূচনা হিসেবে আমরা এই গল্পটিকে ধরে নিতে পারি।

গল্পটির একটি অনন্য সাধারণ চরিত্র হল মহামায়া। মহামায়া কুলীন ঘরের চব্বিশ বছরের কন্যা। উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অভাবে এখনও তার বিবাহ হয়নি। পূর্ণ যৌবনা এই নারীর সৌন্দর্য অসাধারণ,- 'যেন শরৎ কালের রৌদ্রের মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা -সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।"[১]

মহামায়ার বাবা নেই, বড়ো ভাই ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় তার অভিভাবক। ভাই-বোন উভয়ের চরিত্রের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে মিল ছিল- 'মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমন একটা তেজ আছে, দিবা দ্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।" রেশম কুঠির বড়োসাহেবের কাছে রাজীবলোচন প্রতিপালিত, এই রাজীবের সঙ্গে মহামায়া প্রণয়াবদ্ধ ছিল। রাজীব মহামায়াকে ভালোবাসলেও মহামায়ার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সুগভীর নীরবতার জন্য তাকে ভয় পেত। সেদিন রাজীব মহামায়াকে অতিকষ্টে একটি ভাঙা মন্দিরের সামনে আসতে-রাজি করিয়েছে। কিন্তু মহামায়ার গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ভৎসনাপূর্ণ গম্ভীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে বেশি কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, "চলো তবে বিবাহ করা যাউক।" কিন্তু মহামায়া মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল এটা সম্ভব হতে পারে না। রাজীব জানত যে মহামায়ার "না" কে "হ্যাঁ" করানোর ক্ষমতা কারো নেই।

অন্যদিকে মহামায়া রাজীবকে ভালোবাসত, কিন্তু তাকে বিবাহ করার কথা সে চিন্তা করতে পারে নি। কারণ জাত্যাভিমান ছিল তার প্রবল। কলীন কন্যা হয়ে অকলীন ব্রাহ্মণকে বিবাহ করা কি তার পক্ষে সম্ভব? এই প্রশ্ন যখন তার মনে দানা বাঁধল, তখন সে স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। অন্যদিকে ঠিক সেই সময় রাজীব জানাল তার সাহেব সোনারপুরের কুঠিতে বদলি হয়েছেন তাকেও সঙ্গে চলে যেতে হবে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামায়ার মনের মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব দানা বাঁধে। সে মনে করেছিল রাজীবকে বিদায় দান করা তার পক্ষে একান্ত সহজসাধ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তা ঠিক ততখানি সহজ নয়। মহামায়া বলল- "আচ্ছা, কিন্তু সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিঃ

শ্বাসের মতো শুনাইল।' এমন সময় দেখা গেল তাদের সন্ধান পেয়ে ভবানীচরণ মন্দির অভিমুখে আসছেন। মহামায়াকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রাজীব পলায়নোদ্যত হলে মহামায়া দৃঢ় মুষ্ঠিতে তার হাত ধরে ভবানীচরণের সামনে রাজীবকে বলল- "রাজীব তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

মহামায়ার সংস্কারের উপর তার প্রেম জয়ী হল। এই দৃঢ়চেতা নারীটির অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করলে অনুভব করা যাবে যে হয়ত বা ভবানীচরণের প্রতিরোধই তার মনোভাব পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে। মহামায়া ভীরু নয়, তাই সে রাজীবকে পালিয়ে যেতে দেয়নি। ভবানীচরণের কঠিন দৃষ্টির সামনে নিজের প্রতিজ্ঞাটি সহজেই নির্ভীকচিত্তে উচ্চারণ করেছে। এই ঘটনার পরেই সেইদিন রাত্রে গঙ্গাযাত্রী এক মুমূর্ষু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথে ভবানীচরণ মহামায়ার বিবাহ দিলেন। কিন্তু পরদিনই মহামায়া বিধবা হল। তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। রাজীব যখন শুনল যে মহামায়া সহমৃতা হচ্ছে, তখন সে উন্মাদের মতো হয়ে উঠল। অন্যদিকে রাজীবের সাহেবও সোনারপুরে বদলি হয়ে গেছে, তাই তাঁর সাহায্য নিয়ে মহামায়ার উদ্ধার সাধন সম্ভব ছিল না। নিরুপায় রাজীব যখন উন্মত্তপ্রায় সেই সময় বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হল।

রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের গল্পগুলিতে "প্রকৃতি" বহুক্ষেত্রে একটি জীবন্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উক্ত গল্পটি তার ব্যতিক্রম নয়। রাজীব 'যখন দেখিল বাহ্যপ্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশ পাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।'*

বাস্তবে তাই ঘটেছিল। মহামায়াকে হাত পা বেঁধে চিতায় সমর্পণ করে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল- চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এমন সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হওয়ায় শ্মশানযাত্রীর দল গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় নিয়ে দ্বাররুদ্ধ করে দিল। বৃষ্টিতে চিতাগ্নি অচিরেই নির্বাপিত হল। আগুনে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্মীভূত হয়েছিল, সে নিজে পায়ের বন্ধন খুলে গৃহে ফিরে এল। প্রদীপ জ্বেলে একখানি কাপদে পাব সে আয়নায় নিজেরদেখল। তারপর আয়নাটি আছড়িয়ে ফেলে দিয়ে সুদীর্ঘ ঘোমটায় নিজের মুখ আবৃত করে রাজীবের গৃহে উপস্থিত হল। রাজীব মহামায়াকে দেখে পরম উল্লসিত হল। মহামায়া জানাল যে, সে রাজীবের গৃহে আসবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল বলেই এসেছে। কিন্তু তার হৃদয়টুকু ছাড়া আর সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। রাজীব যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে কখনও তার মুখের ঘোমটা খুলবে না, তাহলেই সে রাজীবের গৃহে থাকবে নতুবা সে আবার তার চিতায় ফিরে যাবে। রাজীব মহামায়ার প্রস্তাবে রাজি হল। উভয়েই রাজীবের কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

বর্তমানে রাজীব ও মহামায়া একত্রে বসবাস করছে। কিন্তু মহামায়ার ঘোমটার আবরণ উভয়ের মধ্যে একটি দূরত্বের সৃষ্টি করেছে। অবশেষে এক বর্ষারাত্রে রাজীব নিদ্রিতা মহামায়ার শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়ে মহামায়ার মুখের দিকে তাকাল- 'কিন্তু হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়! চিতানল শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।' অবশেষে রাজীবের মুখ নিঃসৃত অব্যক্ত ধ্বনিতে মহামায়া জেগে উঠল-রাজীবের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে সে চিরতরে গৃহত্যাগ করে চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্পগুচ্ছের মধ্যে মহামায়া একটি অনন্যসাধারণ নারী চরিত্র। চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে কোন যুগ ও সামাজিক পরিবেশে চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে তা আমাদের স্মরণ করতে হবে। বর্ণাশ্রম বিভক্ত ব্রাহ্মণ্য শাসিত পুরুষশাসিত সমাজে সেই সময় ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য ছিল। অন্যদিকে মহামায়ার বড়ো ভাই ভবানীচরণের ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই বিরুদ্ধ পরিবেশে মহামায়ার চারিত্রিক দৃঢ়তা অনমনীয়তা ও নীরব গাম্ভীর্য সত্যই দুর্লভ। রাজীব মহামায়াকে ভালোবাসলেও এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মহামায়াকে সে ভয় করত।

সেই সময় নারীর স্বাধীন চিন্তা বা চেতনার কোনো প্রশ্নই ছিল না- কিন্তু মহামায়া তার স্বকীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার জোরে রাজীবের গৃহে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার করেছিল এবং তার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সহায়তা করেছিল প্রকৃতি। কিন্তু চিতা থেকে নামার পূর্বেই তার মুখশ্রীর একাংশের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করেছিল অগ্নির শিখা। মহামায়া অনুভব করেছিল সে রাজীবের কাছে গেলে তাকে সে নিশ্চয় গ্রহণ করবে। কিন্তু সেই গ্রহণের মধ্যে মিশ্রিত থাকবে করুণা। রাজীব যে মহামায়াকে ভালোবেসেছিল, তার সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। অগ্নি সেই সৌন্দর্য অনেকটাই নষ্ট করেছে। রাজীবের এই করুণাকে সহ্য করা মহামায়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সে রাজীবের কাছে এই শর্ত রেখেছিল যে, সে ঘোমটা খুলে মহামায়ার মুখ দর্শন না করলে সে তার গৃহে থাকতে সম্মত। কিন্তু ঘোমটার আবরণ রাজীবের পক্ষে যে কতখানি পীড়াদায়ক হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাষায় তার বিশ্লেষণ করেছেন- 'রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে বিশেষত মহামায়া পুরাণবর্ণিত কর্ণের মতো সহজকবজধারী- সে আপনার স্বভাবের

চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর মাঝে আবার যেন আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে।.....

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।'[৬]

প্রকৃতি গল্পটিতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আবার প্রকৃতির সহায়তাতেই মহামায়া চিতাগ্নি থেকে ফিরে এসেছে। তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। ঘোমটার নিশ্ছিদ্র আবরণের অন্তরালে মহামায়া রাজীবের গৃহে বসবাস করেছে। একদিন বর্ষণধৌত

শুক্লপক্ষের দশমীর রাত্রে- 'রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।'[৭]

মুহূর্তের জন্য রাজীব সমস্ত শর্ত বিস্মৃত হয়ে নিদ্রিতা মহামায়ার মুখের দিকে তাকাল। তার মুখের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। কিন্তু রাজীবের সেই চিরপরিচিত সুন্দর মুখখানি কোথায় গেল?

"চিতানল শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।" অন্যদিকে মহামায়ার যখন ঘুম ভেঙে গেল, সে ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল। সেইসময় রাজীব বুঝিল 'এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা করো"।'

"বজ্র উদ্যত হইয়াছে"- এই কথা ক'টির মাধ্যমে মহামায়ার চরিত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। কোনো ব্যাখ্যা নয়, বিশ্লেষণ নয় স্বল্প কয়েকটি চরণের মাধ্যমে লেখক গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন—

'মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া, মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ চিহ্ন রাখিয়া গেল।'[৯]

গল্পটির মধ্যে সে যুগের ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিষ্ঠুরতার চিত্র, মহামায়ার চরিত্র, রাজীব ও মহামায়ার সম্পর্ক এবং প্রকৃতি সবকিছু যেন চমৎকার একটি সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। সবুজ পত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারীব্যক্তিত্বের যে উন্মেষ চিত্র আমরা লক্ষ করেছি তার পূর্ব সূচনা যেন আমরা "মহামায়া" গল্পটিতে লক্ষ করলাম।

**তথ্যসূত্র:**


১. গল্প সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদনা প্রশান্ত কুমার পাল, লালমাটি, ডিসেম্বর, ২০১১, কলকাতা ৭০০ ০০৬, পৃ. ১৯৭
২. ঐ, পৃ. ১৯৭
৩. ঐ, পৃ. ১৯৮
৪. ঐ, পৃ. ১৯৮
৫. ঐ, পৃ. ১৯৯
৬. ঐ, পৃ. ১৯৯
৭. ঐ, পৃ. ২০০
৮. ঐ, পৃ. ২০১
৯. ঐ, পৃ. ২০১

সরস্বতী বারুই

## বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দলিল : 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

শতবর্ষ পার হয়ে দুই দশক কেটে গেছে—১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিষদাঁত আজও ভারতবাসীকে দংশন করছে। প্রশ্ন জাগবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিষদাঁতটি কি? বলাবাহুল্য, সেটি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা লর্ড কার্জনের ঘোষিত 'বঙ্গভঙ্গ'-এর প্রতিবাদী আন্দোলনের কিছু ভুল পদক্ষেপের কারণে ভারতের রাজনীতিকে বদলে দিয়েছিল। তবে এই আন্দোলনের সময় একজন মহান ঋষি ভারতবাসীকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর চিন্তা-চেতনা আজও কত আধুনিক। তাঁর চেতনার দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য আজও ভারতবাসী প্রস্তুত হতে পারেনি। তিনি সজনীকান্ত দাসকে আক্ষেপ করে বলেছেন "এই আমাদের দেশ, ও দেশের কোনসফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি?...জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অসাধুতা তার জয়পতাকা তুলেছে; স্বার্থবুদ্ধি এবং স্বেচ্ছাচার সকল কল্যাণকে করছে বিনষ্ট।"[১] আজ থেকে একশত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর অসাধু চরিত্রের মুখোশ প্রকাশ্যে এনেছেন। কিন্তু ভারতবাসী তাদের অসাধুতার মুখোশ খুলে আসল চেহারার মানুষ হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের এই গভীর সত্য উপলব্ধি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে নতুন দর্শন দিয়েছিল। তাঁর এই দর্শন ধরা আছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে।

১৩২২ বঙ্গাব্দে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশপ্রেম, মানুষের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, এবং সমাজের রূঢ় বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে একটি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পর্যালোচনা করেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র নিখিলেশ, বিমলা এবং সন্দীপ; এদের আত্মকথনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন সমাজের দুটি প্রধান বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। এক. পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, দুই. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বাস্তবিক রূপ। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে গৃহীত বয়কট-এর সিদ্ধান্ত সমাজের মধ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তার কয়েকটি চিত্র। রবীন্দ্রনাথ এখানে সামাজিক পরিস্থিতির তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যথা—নিখিলেশের স্বদেশি শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা, বয়কটকে কেন্দ্র করে গরিব প্রজা পঞ্চুর সাথে ঘটা অন্যায়, নিখিলেশের শুকসায়রের হাটে স্বদেশি বস্ত্রবিক্রিকে কেন্দ্র করে ঘটা কিছু ঘটনা। হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনেরকিছু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সেই দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের তিনটি মুখ্য চরিত্র নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার প্রতীকছিল। নিখিলেশ ছিল একজন শিক্ষিত, মানবতাবাদী জমিদার। সেরাজনীতির প্রতি আগ্রহী, কিন্তু জাতীয়তাবাদকে নৈতিকতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায়, নইলে তা হিংসাত্মক ও বিধ্বংসী হতে পারে। তাই দেশগঠন সম্পর্কে নিখিলেশ ভাবতে পেরেছে,....“দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র প'ড়ে, যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ।”২ নিখিলেশ তার এই সত্য উপলব্ধির পথে সর্বদা অটল থেকেছে।

অন্যদিকে সন্দীপের স্বদেশপ্রেমে ছলনা, উগ্রতা এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সন্দীপ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে দেশের জনতাকে স্বদেশি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এসেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেস্ব ক্ষমতা ও লোভ চরিতার্থ করতে চায়। সে মনে করে দেশপ্রেম একটি আবেগময় আবরণ মাত্র, যার আড়ালে সে সমাজে বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিল। সন্দীপ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। সে তার স্বার্থ পূরণের জন্য সব রকম অন্যায় করতে প্রস্তুত। সে তার আত্মকথায় বলেছে, “এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্য ন্যায়, আর অসাধারণের অন্যায়।.... আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনই দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।”৩ সন্দীপ সর্বদা নিজেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অসাধারণ ব্যক্তি বলে বিচার করেছে। কিন্তু সে যে কপট ব্যক্তি, তা তার বক্তব্যেই ধরা পরে।

উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র বিমলা। শিক্ষিতা বিমলা ঘরের ঘরনী থেকে বাইরের স্বদেশপ্রেমে মেতে উঠেছে। সন্দীপের কথার জাদুমন্ত্র তার মনকে স্বদেশ চেতনায় আকৃষ্ট করেছে। সে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েস্বামীর বন্ধুর সান্নিধ্যে আলোচনায় বসেছে। দেশসেবার আদর্শে নিজেকে মেলে ধরেছে। যা তৎকালীন সময়ে গৃহবধূদের জন্য সহজ বিষয় ছিল না। কিন্তু সন্দীপের দেশভক্তির আড়ালে যে ছলনা ছিল, যে কপটতা ছিল, যে প্রলোভন ছিল তা অনুধাবন করতে বিমলার একটু সময় লেগেছিল। কিন্তু পরিশেষে বিমলা সন্দীপের সকল কপটতা বুঝতে পেরেছে। এই উপলব্ধিতে বিমলার আত্মচেতনার জাগরণ ঘটেছে। প্রথম দিকে নিখিলেশের দেশপ্রেমকে সাদামাটা ম্যাড়মেড়ে মনে করলেও পরবর্তীতে সে নিখিলেশের দেশপ্রেমের সত্যতা বুঝতে পেরেছে।

‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে

বাংলাদেশে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং তাকে আশ্রয় করে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, তার তলদেশে মস্ত একটা ফাঁকি ছিল। উত্তেজনায় যখন ভাঁটা পড়ে তখন সেই ফাঁকির দিকটা ধরা পড়ে যায়। ফাঁকিটা ছিল—দেশপ্রেমের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে স্বদেশি দলের নেতারা কেবল কথার জাদুমন্ত্রে সভাসমিতির উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কোনো কাজই করেনি। দেশের জনগণের আত্মিক জাগরণের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন তা স্বদেশি নেতাদের ছিল না। আন্দোলনের এই চরম সত্য রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল। তিনি তার তীব্র প্রতিবাদও করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রতিবাদই নয়, সেই ফাঁকি পূরণের উপযুক্ত রাস্তাও তিনি বের করেছিলেন। জনগণের মধ্যে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সেই সত্য উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউনহলে লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ'-র প্রতিবাদ জানাতে বিদেশি দ্রব্য বয়কটের শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ দেশবাসী বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই শপথ গ্রহণের সভায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় তিনিও বয়কটের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে এই বয়কটের চেতনা ধ্বংসলীলায় পরিণত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দলনেতারা বিদেশি দ্রব্য সামগ্রী দেখলেই আগুনে পুড়িয়ে ফেলতো। এখানে লক্ষণীয়, বয়কটের শপথ নেওয়া হয়েছিল বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার না করার। অথচ তা রূপান্তরিত হয়েছে আগুনে পোড়ানোর ধ্বংসলীলায়। রবীন্দ্রনাথ বয়কটের এই ধ্বংসরূপের উপদ্রবকে মেনে নিতে পারেননি। তাই পরবর্তীকালে তিনি 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে বয়কট সম্পর্কে বলেছেন—"আপনাদের কাছে আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি বাঙালির মুখে বয়কট শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচনজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গল সাধনের উপলক্ষে নিজের ভালো করিলাম না আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি। একথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে।"[৪] ইংরেজ সরকারের ক্ষতি সাধনের জন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বয়কটের শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের কোনো ক্ষতি সাধন তো হয়ই নি, উল্টে নিজ দেশেরই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। ইংরেজরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে হাতে পুঁজি পেয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় পণ্য নষ্ট করলে নিজের দেশেই পুঁজি এবং পণ্য উভয়ই নষ্ট হল। রবীন্দ্রনাথের মতে কোনো পণ্যদ্রব্য তো মানুষের শত্রু হতে পারে না। শত্রু হল ইংরেজ সরকার, যারা বিদেশি হয়ে ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। সরকারের বিরোধীতা করাই স্বদেশ চেতনার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। বিদেশি দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট করে কেবল উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে, ইংরেজ সরকারের কোনো ক্ষতিই হবে না। বরং দেশের দরিদ্র প্রজাদের আরও দরিদ্র করে তোলা হবে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে 'বয়কট শব্দের আস্ফালন'-এর স্পষ্ট চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়টি সন্দীপের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। সাধারণমানুষের ওপর বয়কটের অত্যাচারের সঙ্গে সন্দীপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সন্দীপ আত্মকেন্দ্রিক, লোভী। ছলেবলে কৌশলে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়াকেই সে জীবনের চরম চরিতার্থতা বলে জানে। আশপাশের সকলের মনে দেশপ্রেমের মত্ত আবেগ জাগিয়ে তুলে সন্দীপ কার্যোদ্ধার করতে চায়। তার জন্য সে সব রকমের হীন কৌশল গ্রহণ করতে প্রস্তুত। মানবধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বিচার তার কাছে অবান্তর উপহাসের বিষয়। তার দলে এমন কয়েকটি যুবক জুটে গিয়েছিল, যারা ছিল গ্রামের কলঙ্ক। নীতিবোধ বর্জিত সাময়িক উত্তেজনা সর্বস্ব আন্দোলনের মধ্যে আর্বজনাও এসে পড়ে। সন্দীপের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে তাই দেখা যায়। বোধহয় রবীন্দ্রনাথ এটাই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কালে স্বদেশি নেতারা সমাজের সাধারণ মানুষের ক্ষতির দিকটা কখনোই চিন্তা করেননি। স্বদেশি নেতাদের বয়কটের উৎপাতে সমাজে সাধারণ মানুষের কতটা ক্ষতি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো সেদিকেই নজর কেড়েছেন পঞ্চু চরিত্র অঙ্কন করে। উপন্যাসে পঞ্চুর পরিচয় বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

পঞ্চু হল নিখিলেশের প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর গরিব প্রজা। নিখিলেশের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবুর সূত্র ধরে নিখিলেশের সঙ্গে পঞ্চুর পরিচয় হয়। পঞ্চু চন্দ্রনাথ বাবুর একজন ভক্ত। সে নমঃশূদ্র পাড়ায় পান, দোক্তা, রঙিন সুতো, আয়না, চিরুনি বিক্রি করে দিন যাপন করে। এই সামান্য ফেরি করে সে বছরের বেশিরভাগ সময় দিনে একবেলার বেশি খেতে পায় না।

পঞ্চুর এই দুরাবস্থা দেখে নিখিলেশ তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গে মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবু নিখিলেশকে বলেছেন— "তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো, দুঃখ নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলাদেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত বাংলাদেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।"[৫] সমাজে পঞ্চুর মতো গরিব-দুঃখী মানুষদের কেবল অর্থ সাহায্যের দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সম্ভব নয় এই চিরসত্য কথাটা রবীন্দ্রনাথ হয়তো পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন। তবে পঞ্চুর দুঃখ দুর্দশা এখানেই শেষ নয়। যক্ষা রোগে তার স্ত্রী মারা যায়। স্ত্রীর রোগের চিকিৎসা এবং শ্রাদ্ধ শান্তির ক্রিয়াকার্য্য করতে গিয়ে পঞ্চু একেবারে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে সে অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে। এই দুরাবস্থার সময় মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু পঞ্চুকে কাপড়ের ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা ধার দেন। পঞ্চু মাস্টারমশাইয়ের কথামতো কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। দু'মাসের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের এক কিস্তি টাকা শোধ করে দেয় পঞ্চু। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চুর দিন ভালোই চলছিল। এমন সময় 'স্বদেশীর বান' গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কলেজের

ছেলেরা দল বেঁধে 'স্বদেশী-প্রচারে' মেতে ওঠে। নিখিলেশের আত্মকথায় বিবরণটি পাওয়া যায় "এইরকম পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী-প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এণ্ট্রেন্স পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি।"[৬]

এই স্বদেশি প্রচারের দল জমিদার হরিশ কুণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চুর বিলিতি কাপড়ের বস্তা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে একশো টাকা জরিমানা করেছে। পঞ্চু অন্যের কাছে ঋণ করে কাপড়গুলি কিনেছিল সে জমিদারের কাছে অনেক মিনতি করেছিল যে, তাকে কাপড়গুলি বিক্রি করতে দেওয়া হোক। তারপর সে আর বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা করবে না। কিন্তু জমিদার বা স্বদেশি প্রচারের দল পঞ্চুর সেই অসহায় আর্তনাদ কানেও নেয়নি। উপরন্তু তার ওপর একপ্রকার অত্যাচার করে কাপড়গুলি পুড়িয়েছে। এইভাবে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে স্বদেশি প্রচারকদের সাময়িক স্বস্তি মিলেছে এই ভেবে যে, তারা ইংরেজ সরকারের তৈরি জিনিস নষ্ট করেছে। কিন্তু পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক ক্ষতিটা যে নিজের দেশের হল, সেই সূক্ষ্ম বিচার স্বদেশি প্রচারকেরা করেননি। দেশের গরিব প্রজার ব্যবসার সামগ্রী, তা স্বদেশি হোক বা বিদেশি, নষ্ট করা মানে সেই প্রজাটিকে অর্থনৈতিকভাবে সর্বশান্ত করা হল। এতে দেশের রাজার কোনো ক্ষয় বা ক্ষতি কিছুই হল না। দেশের মধ্যে এত বড় ক্ষতিকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই প্রশ্রয় দেননি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই বাস্তব ছবি পঞ্চু চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দলনেতারা তীব্র আক্রোশে নিখিলেশের জমিদারির হাটে বিলিতি পণ্য বয়কট করতে গিয়েছিল। সেখানে এক হতদরিদ্র চাষি তার ছেলেমেয়ের জন্য সস্তা দামের জর্মন শাল কিনেছিল। স্বদেশি দলের একটি ছেলে জোর করে শালগুলি কেড়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হাটের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। স্বদেশি দলনেতারা চাষিকে দেশি গরম কাপড় কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তা সত্ত্বেও চাষি নিখিলেশের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছে। নিখিলেশ ছেলেটির নামে মামলা করার হুকুম দেয়। একদিকে দেশি গরম কাপড় কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বদেশি প্রচারকেরা বিপদে পড়েছে। কারণ তৎকালীন সময়ে সস্তা দামের দেশি গরম কাপড় বাজারে ছিল না। উপরন্তু বিলিতি কাপড় পোড়ানোর পর স্বদেশি কাপড় কিনে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ স্বদেশি প্রচারকদের ছিল না। সেই সঙ্গে যদি বিলিতি কাপড় পোড়ানোর দায়ে মামলা চলে তবে তো বিপদের শেষ নেই। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য স্বদেশি প্রচারকের সদস্য

অমূল্য দলনেতা সন্দীপের কাছে উপস্থিত হয়। অমূল্যের কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে সন্দীপ নিজের মতামত প্রকাশ করে। তার মন্তব্যে নীতিবোধ ও মানবিক বিচার-বিবেচনা বর্জিত বল প্রয়োগের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাবে চিহ্নিত হয়েছে। তার কাছে স্বদেশের মানুষের মঙ্গলের থেকে স্বদেশি আবেগ বড়ো হয়ে উঠেছে। সে অমূল্যকে বলেছে "যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বকশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের গোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না।... আর বিলিতি গরম কাপড়? যত অসুবিধেই হোক, ও অসুবিধা কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারবে না। বিলিতি রঙিন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষির ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনো তাই করবে।"[৭] গরিব চাষিদের সস্তা বিদেশি গরম চাদরে শীত নিবারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে সন্দীপ বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনেক সময় ন্যূনতম মানবিক বিচার-বিবেচনা যে বর্জন করা হয়েছিল, এটি তার উদাহরণ।

শুধু তাই নয়, মুসলমানদের বশে আনতে সন্দীপ হীন কৌশল অবলম্বন করেছে। হাটে যারা নৌকা আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলেবলে বাধ্য করার পথে কতকটা আনা গেলেও তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড়সেই মিরজানকে বশে আনা যায়নি। সন্দীপ তখন নিখিলেশের নায়েব কুলোদার সঙ্গে চক্রান্ত করে তার দু-হাজার টাকা দামের নৌকা ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। হাট হয়ে যাবার পর মিরজানের খালি নৌকা ঘাটে বাঁধাছিল, মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশলে একটা যাত্রার আসরে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকাটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ফুটো করে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে মিরজান অমূল্যর কাছে নত হয়। তবে অমূল্য সন্দীপকে জানিয়েছে মিরজানের নৌকার দাম দুই হাজার টাকা দিতে পারলে তাকে কিনে রাখা যাবে। সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচার এবং পরে টাকা দিয়ে তাদেরকে দলে আনার রাজনৈতিক কৌশল এই ঘটনায় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর পরিস্থিতি আরও জটিলতার দিকে পৌঁছায়। নায়েব সন্দীপকে খবর দেয়, যে লোকের দ্বারা মিরজানের নৌকা ডোবানো হয়েছিল, তাকে পুলিশ সন্দেহ করেছে। নায়েব এই ভয় দেখিয়ে সন্দীপের কাছে টাকা নেওয়ার ধান্দা করে। সন্দীপের আত্মকথায় আছে, "...পুলিশকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তাহলে যে লোকটার নৌকো ডুবানো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনাফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে মুখে আমিও বলছি বন্দেমাতরং আর সেও

বলছে বন্দেমাতরং।"[৮]দেশের নামে সংগৃহীত অর্থ কীভাবে অপপ্রয়োগ করা হয় তারই একটা বাস্তব চিত্র রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের জবানিতে তুলে ধরেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হয়তো দেশের কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থ দেশের উন্নতির কাজের তুলনায় দেশের উৎশৃঙ্খলতার প্রতি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তী ঘটনায় সন্দীপের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর প্রবণতা দেখা যায়। সন্দীপ তার জবানিতে বলেছে "এদিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদার বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে, নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বেরকরে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক নাচ নাচাব।"[৯] সন্দীপের মত রাজনৈতিক নেতারা এই ভাবেই বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে দমাতে গিয়ে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করেছিল।

উপন্যাসের শেষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। বিমলার জবানিতে দেখা যায়, নিখিলেশ দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্দীপকে সাবধান করেছে। ঢাকা থেকে মৌলবিরা এসে নিখিলেশদের অঞ্চলের মুসলমানদের খেপিয়ে তোলার উদ্যোগ চালাচ্ছে। তারা সন্দীপের ওপর অত্যন্ত ক্ষেপে আছে, যেকোনো সময় একটা গণ্ডগোল বাঁধতে পারে। সেই কারণে নিখিলেশ সন্দীপকে তার এলাকা ছাড়তে বলে। এই একই প্রসঙ্গ নিখিলেশ তার নিজের আত্মকথাতেও প্রকাশ করেছে, "বিমলার সামনেই সন্দীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে।... ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।"[১০] সন্দীপের স্বদেশি প্রচার বা বিদেশি দ্রব্য বয়কটের প্রচারের পথ যে দেশের মধ্যে এমন সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল তৈরি করেছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপন্যাসের শেষের দৃশ্যে দেখা যায় ক্ষিপ্ত মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সন্দীপ রাতের অন্ধকারে গাঁ ঢাকা দিয়ে পালিয়েছে। আর তার তৈরি স্বদেশি প্রচারের দলের আদর্শবান সদস্য অমূল্য হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। নিখিলেশও এই দাঙ্গার শিকার হয়ে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। উপন্যাসের শেষে বিমলার আত্মকথায় সন্দীপ নিখিলেশকে জানিয়েছে, "খবর পেয়েছি মুসলমানের দল

আমাকে মহামূল্য রত্নের মত লুট করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে। অতএব এখনকার মত চললুম।"[১১] বলা বাহুল্য বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সূচনা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের মধ্যে স্বদেশি দ্রব্য প্রচার এবং বিদেশি দ্রব্য বয়কট দিয়ে। আর উপন্যাসটি শেষ হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দিয়ে। সেই দাঙ্গায় নিখিলেশ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে এবং অমূল্যর মৃত্যু হয়েছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার ভেঙে ফেলা বাংলাকে জুড়ে দিলেও সাম্প্রদায়িক বিরোধের বীজ বপন করে গেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বীন্দ্রনাথ সেই রূপরেখাটি অঙ্কন করেছেন। বলাবাহুল্য, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের ভাঙন রেখাটি চিরস্থায়ী করেছে।

**তথ্যসূত্র :**


১. দাস, সজনীকান্ত। 'কর্মী রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃষ্ঠা- ৩৭-৩৮।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'ঘরে-বাইরে', রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, সুলভসংস্করণ), বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৪৯১।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫১৭।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'দেশনায়ক', 'পরিশিষ্ট', 'সমূহ', গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ), বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৮২৪।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'ঘরে-বাইরে', রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, সুলভসংস্করণ), বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৪৮০-৪৮১।
৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৩৩।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'ঘরে-বাইরে', রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, সুলভসংস্করণ), বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৫৪০।
৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৪৩।
৯. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৪৪।
১০. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৬৮।
১১. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৯২।

মৌসুমী সিংহ

## নরেন্দ্রনাথ মিত্র : শিকড়হীন মানুষের অধিকার হারানোর গল্প

দুই বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজ-দেশের বাইরে ও অন্দরের চিত্র পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মহাযুদ্ধের অভিঘাতে মানুষের নীতি ও আদর্শগত মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবন এক অদ্ভুত সংকট ও সংশয়ের দ্বারা পীড়িত হয়ে পড়ে। যুদ্ধভীতি বাঙালি জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পরে। বাঙালি জাতির দেশভাগ জনিত হত্যা, লুণ্ঠন, বাস্তুচ্যুত এবং দাঙ্গাকে গল্পকাররা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন এবং দেশভাগের বিষয় বস্তুকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। দেশভাগের মতো গভীর ক্ষত মানব মনে নানা রকম অসুখের সৃষ্টি করেছিলো এবং সেই সময়ের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিতেও নানা রকম ব্যাধির লক্ষ করা যায়---"চল্লিশের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গেও বাংলা ছোটোগল্পের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছিল দুর্ভিক্ষের হাহাকার। ৪৭"-এর দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদির পাশাপাশি তৎকালীন রাষ্ট্রের, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের বহুমুখী বিপর্যয়ের কাহিনী। বিশাল সংখ্যকক্ষুধার্ত, গৃহহীন, সহায়-সম্বল, নিরাশ্রয় মানব গোষ্ঠীর চাপে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক পরিস্থিতি তখন অবর্ণনীয়। আর তার চেয়েও বেশি মর্মান্তিক ছিলো উৎখাত হওয়া মানুষগুলির অবস্থা। ক্রমশ এক মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছিল তারা অন্ন-বস্ত্র বা স্থানের সংকটের পাশাপাশি আত্মমর্যাদার সংকট, ধর্মীয় আচার-আচরণের ভিন্নতাজনিত সংকট, সংস্কৃতি বোধের সংকট তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল।"[১] তার ফলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নতুন রূপে নতুন ভাবে ছোটোগল্পের বিনির্মাণ ঘটে। এই ধারায় অন্যতম একজন মধ্যবিত্ত সমাজের রূপকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর ছোটোগল্পে নতুন ভাব, নতুন রীতি সংযোজিত হয়। এই সময় অন্যান্য লেখকেরা তাঁদের রচনায় মানবমনের আঁতের কথা বলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র ভিন্নধর্মী রচনা শৈলী নিয়ে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলেন। তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের রূপকার। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে তাঁর গল্পে নতুন ভাবে উপস্থাপন করলেন গল্পকার। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন---"নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মধ্যে মমত্ববোধ সম্পন্ন শুভ বিশ্বাসী শিল্পী থাকলেও তিনি নিষ্ঠুর স্ট্রোইক শিল্পী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মিল এইখানে যে, দুজনেই মনোলোকের জটিলতার বিশ্লেষণে আগ্রহী। সমাজনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তমান মূল্যবোধের পটভূমে মানিক মানুষকে দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেদিকে না গিয়ে মানুষকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন। তাঁর এই দেখা ক্লান্তিহীন। গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নানা বিত্তির মানুষকে, তাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে, পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তসংঘাত নরেন্দ্রনাথ গল্পে ধরেছেন। কেবল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির

সংঘাত নয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের জটিলতা নরেন্দ্রনাথ সূচীমুখ বিশ্লেষণে ধরা পরেছে।"[২]

মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে যেমন নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পে এক নতুন দিকের উন্মোচন করেছিলেন ঠিক তেমনি মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে নতুনত্বের ছোঁয়া এনেছিলেন। দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত "পালঙ্ক" গল্পটিতে পালঙ্ক শুধু কাঠের তৈরি আসবাবপত্র নয়, পালঙ্কে তিনি দেখিয়েছেন স্বদেশ ভূমির প্রতিরূপ হিসেবে। যে স্বদেশের মানুষ দেশভাগের আগে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে একান্নবর্তী পরিবারে থাকতো। সেখানে মানুষে মানুষে কোনো ধর্মের ভেদাভেদ ছিলো না---"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" এই বাণী সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত হতো। উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মানুষকে গৃহত্যাগ করতে পারে, কিন্তু গৃহহারা মানুষ যন্ত্রণা সর্বত্রই এক। কিছু মানুষ তার অস্তিত্ব বলতে শুধু নিজের পরিচয়টুকু নয় তার বাড়ি, ঘর, জমি, সেখানকার মাটি, আলো, বাতাস, চারপাশের লোকজন সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করেই চান। এর বাইরের কিছুই তাঁর নিজস্ব পৃথিবীর মধ্যে পড়ে না। তার সেই পৃথিবীতে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান পড়ে না। দেশভাগের নগ্ন, সর্বহারা, করালগ্রাস এদের প্রভাব ফেলতে পারে না। আসলে এই দেশভাগ প্রথমে মানব সমাজ হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে মেনে নিতে পারে নি। এই কারণেই প্রথম প্রথম মানুষের দেশভাগ যে তাদের জীবন-সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কতোটা প্রভাব এনেছিলো তা বুঝতে পারে নি। গল্পে আমরা দেখি রাজমোহন প্রথম অবস্থায় দেশভাগের মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রভাব বুঝতে পারে নি।কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় এই বিরাটাকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আঁচে হাটে তার বিরাট সংসারও ঝলসে যায়। দেশভাগ অবস্থাপন্ন মানুষকে যে নগ্নতা ও বাস্তবতার সন্মুখীন করেছিল তা এই গল্পে দেখা যায়। রাজমোহনকে তার পুত্র সুরেন ও পুত্রবধূ আসীমার চিঠিতে -—"কিন্তু আজ একটা অনুরোধ করার জন্যে আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। বেলেঘাটায় যে ঘর আমরা ভাড়া নিয়েছি, তা আপনি দেখে গেছেন। তার দেয়াল আর মেঝে থেকে যেন দিনরাত জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে। সেই স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে কেনু, টেনু, রীতা, মীনা— আপনার অত আদরের নাতি-নাতনীদের কারো কারো অসুখ বিসুখই আর সারছে না। প্রত্যেক মাসে জ্বর-জ্বারি আর আর ডাক্তার খরচ লেগেই আছে।"[৩] দেশভাগে মানুষে শুধু স্থানটুকু তো বদল হয় নি, ---বদল হয়ে গেছে পরিচয়, বদল হয়ে গেছেসন্তান, হারিয়ে গেছে বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, নিরুদ্দেশ ভাই-বোন; পেছনে থেকে গেছে ছেলেবেলার সঙ্গী, খেলার মাঠ, ছোট্ট স্কুল ঘর, চেনা মুখ, জানা পারিপার্শকি —আরো কতো কি! দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তানের অসংখ্য সহজ সাধারণ উদ্বাস্তু মানুষগুলি সেদিন

কাটা দেশের যন্ত্রণায় কাতর হলেও দেশভাগের জটিল রাজনীতিটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন নি। ঠিক যেমন বুঝে উঠতে পারে না অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মানিক লালের জীবনচরিত" গল্পের শোভা বা "তায়েব কাকার নসিব" গল্পের তায়েব চরিত্রটি, কিংবা, হাসান আজিজুল হকের "আগুন পাখি" উপন্যাসের নামহীন, সর্বহারা সেই নারী। তাদের মনে হয় "দেশ আবার ভাগ হয় কেমন করে?"[৪] এই গল্পেও দেখা যায় বিভাজন শুধু একটি দেশের হয় নি, হয়েছে অন্তরের সাথে অন্তরের। এই দেশভাগের আগেই চাকরী সূত্রে রাজমোহনের সন্তান ভিটে ছেড়ে কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলো। দেশভাগের পর পাকিস্তানে থাকা পিতাকে নিজেদের প্রয়োজনে লেখা চিঠিতে একবারও পিতার কুশল জানতে চায় নি। উপরন্তু রাজমোহন নিজের জন্মভিটা তথা পাকিস্তান ছাড়তে না চাইলে তারা তাঁকে অবিবেচক মনে করেছেন। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ মানুষের মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়েছে। মানুষ যেন নিজেদের টুকুর বাইরে এক পাও ভাবতে এবং হাঁটতে নারাজ। গল্পের মূল বিষয় পালঙ্ক নিয়ে, সেই পালঙ্ক নিয়েই দু'জন ব্যক্তির দু'রকম অভিব্যক্তি। রাজমোহনের পুত্রবধূ পালঙ্ক বিক্রি নিয়ে শ্বশুরকে চিঠি লেখেন—"এখন পাটের সময়। মুসলমানদের হাটে টাকা-পয়সা আছে। আপনি আমার নাম করেই বিক্রি করবেন। তাছাড়া ও পালঙ্ক রেখেই বা কি হবে ? কারো তো আর ভোগে আসবে না। মিছামিছি উইয়ে কেঁটে নষ্ট করে দেবে। তার চেয়ে আপনি ওটা বিক্রি করে দিন। টাকাটা কানু-টেনুর প্রয়োজনে লাগুক। আপনার ছেলেরও তাই মত।"[৫] অপরপক্ষে রাজমোহনের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কারণ ঐ পালঙ্কের সাথে তার সন্তান-সন্ততির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যাকে আঁকড়ে ধরেই তিনি বেঁচে আছেন—"এই ঘরে থাকত সুরেন ও তার স্ত্রী অসীমা। এক বছর আগেও সুরেন ছুটিতে এসে সপরিবারে এ ঘরে বাস ক'রে গেছে। পালঙ্কখানা দক্ষিণের দুটি বড় বড় জানালা ঘেঁষে এখনো পাতা রয়েছে। গদিটাকে পুরু চট দিয়ে ভালো ক'রে ঢেকে রেখেছেন রাজমোহন। রোজ একবার ক'রে কাঁধের গামছা দিয়ে পালঙ্কের ধূলো মোছেন।"[৬] এখানেই যেনো ফুটে ওঠে দুই ভিন্ন চিন্তাভাবনা, ভিন্ন প্রান্তের, ও ভিন্ন প্রজন্মের মানুষের চিত্র অথচ তারা সম্পর্কে পিতা-পুত্র। রাজমোহন পুত্রবধূ অসীমার চিঠিতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। শুধু ক্ষুব্ধ নয়, অভিমানেও তিনি পালঙ্ক মাত্র পঞ্চাশ টাকায় দিনমজুর মকবুলের কাছে বিক্রি করে। অভিমান কমলে রাজমোহন নিজের ভুল বুঝতে পারেন। স্বীয়কৃত কর্মের জন্যে তার অনুতাপের অন্ত্য থাকে না। মকবুলের কাছ থেকে তিনি নানা রকম ফন্দি ফিকির ও আছিলায় পালঙ্ক ফিরিয়ে নিতে চায়। এমনকি মকবুলের প্রদেয় অর্থ থেকেও বেশি অর্থ দিতে চান। বিত্তহীন যে মানুষ সে কোনো দিনই স্বচ্ছলতা, সুখ ও সৌখিনতার স্বাদ পায়নি। পালঙ্ক কিনে আজ তা মুষ্টিবদ্ধ। তাইতো সে স্ত্রী নিষেধ, গ্রামের মুরুব্বিদের ধমকানো, চমকানো কোণোটাই তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। শত প্রতিকুলতার মধ্যেও মকবুল নিজের সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতারনিকা' গল্পটি ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে "আনন্দ বাজার" পত্রিকায়

প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক সংকট, এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বেঁচে থাকার লড়াই, মূল্যবোধের সংঘর্ষ, মানবিক সম্পর্কের ভাঙন এবং চাকরিজীবি গৃহবধূর তীব্র মানসিক সংকট ও কর্মজীবি নারীর ভিন্নধর্মী দাম্পত্য এ গল্পের বিষয়বস্তু। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে এসে নতুন ভাবে স্থায়ী বাসস্থান করতে কিভাবে অর্থনৈতিক চাপে পরতে হয়েছিল তা এই গল্পে গল্পকার সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।গল্পের মূল চরিত্র সুব্রত ও আরতি। গল্পকার একদিকে দেশভাগের ফলে অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র যেমন দেখিয়েছেন তেমনি চল্লিশের দশকেও নারীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও পরিবারে তার কিরকম প্রভাব পড়েছিল তা দেখিয়েছেন। সংসারের প্রয়োজনেই আরতিকে অর্থ উপার্জনের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছে। পরিবারের মধ্যে আরতি সম্বন্ধে এক ধরনের দ্বিচারিতা কাজ করে। এই দ্বিচারিতা সুব্রতর আচরণেও বর্তমান ছিল।তাই স্বাবলম্বী হবার প্রশ্নে আরতিকে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হয়েছে মধ্যবিত্তের সনাতন সামাজিক সংসার ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে। গল্পে দেখা যায় পূর্ববঙ্গের মুন্সীগঞ্জ সাব ডিভিশনের প্রিয়গোপাল বাবু অর্থাৎ গল্পের নায়িকা আরতির শ্বশুরবাড়ি ছিল। বর্তমানে তারা উল্টোডাঙ্গার সরু গলির মধ্যে পঁয়তাল্লিশ টাকার ছোটো ছোটো দুখানা একতলার ঘর তাদের বাসস্থান। স্বপরিবারে তারা সেখানে থাকে। অর্থাভাবে সুব্রত বাধ্য হয়ে স্ত্রী আরতিকে চাকরী করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। স্ত্রীকে সে বলে-- "পুরুষ হোক,মেয়ে হোকা আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো?চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।"[৮] অথচ গল্পের সূচনায় দেখা যায় এই চাকরী করাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র দেখিয়েছেন যে স্বামী সংসারের অর্থের প্রয়োজনে স্ত্রীকে নিজে চাকরী করতে পাঠান। পরবর্তীতে স্ত্রীর স্বাধীন মনোভাব, স্বাধীনভাবে চলাফেরা মেনে নিতে পারে নি। সুব্রত এখানে সংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ — "তোমার হয় চাকরী ছাড়তে হবে,নয় আমাকে। চাকরী যদি করতে হয় অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা কর।"[৯] একজন নারীকে পরিবার,সমাজের বিধি নিষেধের বেড়া জালে কিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেরি পরিয়ে আটকে রাখা হত তা এই গল্পে দেখানো হয়েছে। সঠিক সুযোগ পেলে নারীরা সংসারে তাদের নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের সাথে সাথে যে প্রাত্যাহিক জীবনের সম্যাসাগুলো ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রতায় অতি সন্তর্পণে সমাধানের উপায় বার করতে পারে তাও এই গল্পে পরিস্ফুট। তার ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতা, সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক, কর্মক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা, পেশাদারী দক্ষতা আত্মমর্যাদা বোধ বাইরের জগতেও তাকে এনে দেয় স্বাতন্ত্রময় সফলতা। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত নারীর মূল্যবোধে আঘাত হানে অফিসের হিমাংশু মুখার্জী। তাই সে এত

কষ্টের,এই লড়াইয়ের চাকরী ছাড়তে বিন্দু মাত্র ভাবে না। যদিও তার এই চাকরী ছাড়াকে বাড়ির লোক কিছুতেই সমর্থন করে না। টাকার চাইতেও বড় তার কাছে প্রেস্টিজ, মূল্যবোধ, আত্মসম্মান। এখানে আরতি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল। মৃণাল, আরতি দুজনেই নিজেস্ব ব্যক্তিত্বে অনড়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দেশভাগের পটভূমিকায় অসাধারণ এক বিষয়কে নির্বাচন করে মধ্যবিত্ত তথা নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রেক্ষিতে গল্পের বিষয় বর্ণনা করেছেন। গল্পের নায়িকার চলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছু সংস্কার। পরিস্থিতির চাপে সেই সংস্কারগুলি কিভাবে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ শিথিল করে দেয় এবং নিজেদের চিন্তাভাবনার দ্বারা পরিচালিত করে তার সুন্দর চিত্র এখানে পরিস্ফুট।

১৯৪৭ এর দেশভাগের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও ভারতের মধ্যকার ভৌগলিক বিভাজন কিভাবে পরিবার গুলোকে খন্ড খন্ড করে দেয় তা এই গল্পে দেখানো হয়েছে। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে প্রেম, বর্ণভেদকে বিষয়বস্তু করে এক নতুন উপস্থাপন হলো নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "বিকল্প" গল্পটি। কেরানী হরগোবিন্দের সন্তান মেয়ে সুধা ও ছেলে হাবুল।এই ছেলের ভালো শিক্ষালাভের জন্যে প্রাইভেট টিউটর ইন্দ্রভূষণের গল্পে আবির্ভাব। একদিকে বিবাহযোগ্যা কন্যা সুধার জন্য পাত্রের সন্ধান। গল্পে ইন্দুভূষণ চরিত্রটি যেন গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বয়ং কারণ ইন্দুভূষণের মতো তিনি নিজেও দেশভাগের পর ফরিদপুর থেকে কলকাতায় চলে এসে গৃহ শিক্ষকতা চালাতেন। তিনিও উত্তর কলকাতার এক মেস বাড়িতে চারজনের সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন। * এই টিউশনকে কেন্দ্র করেই গল্পে সুধা ও ইন্দুভূষণের সাক্ষাৎ, ভালোলাগা ও ভালবাসা। কিন্তু তাদের এই সম্পর্ক পরিবার, সমাজ কেউ মেনে নেয়নি। বাঁধা হয়ে  দাঁড়িয়েছে বর্ণভেদ প্রথা,অর্থাৎ চিরাচরিত সংস্কার। তাইতো গল্পে দেখা যায় ব্রাহ্মণ পিতা হরগোবিন্দ কন্যার শূদ্র ছেলের সাথে প্রেমের এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি। হরগোবিন্দ পাড়ার ছেলেপিলেকে নিয়ে  ইন্দুভূষণকে শাসানো এমনকি গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে। এই লাঞ্ছনা,অপমানে ইন্দুভূষনের মৃত্যু হয়। দেশভাগ মানুষকে যেমন রূঢ় করে তুলেছে তেমনি একজন সহজ সরল মেয়েকে কিভাবে কঠিন কঠোর করে তোলে তা দেখা গিয়েছে। ইন্দুভূষণের মৃত্যু সুধাকে দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছে। বিবাহ না হলেও সে বৈধব্য ধর্ম পালন করে।জীবনের সমস্ত জৌলুস থেকে নিজেকে দূরে  সরিয়ে নেয়- যা তার একেবারে নিজেস্ব সিদ্ধান্ত। সদ্য যুবতী মেয়ের এই নীরব প্রতিবাদ তার বাবাকে বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের মত বলতে চেয়েছেন—

'আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি<br>
মন বান্ধিবি কেমনে এ এ<br>
আমার চোখ বান্ধবি মুখ বান্ধবি<br>
পরাণ কেমনে বান্ধবি'

এই প্রতিবাদ কেরানী পিতার বুঝতে বাকি থাকে না। তার নিজের কৃতকর্মের জন্য কন্যার এই পরিবর্তন। এই সম্পর্কে সুধার সাথে কথা বললে,তার নির্লিপ্ত উত্তর - 'সেসব যারা করতে পারতো তেমন আত্মীয়-স্বজন তাঁর কেউ নেই। থাকার মধ্যে আমি। আছি কিন্তু আমি যে তোমার মেয়ে। তুমি খুন ক'রে এলে তোমার সেই হাত আমি আচল দিয়ে মুছিয়ে দেব। সে হাতে শিকল পরাবো কেন? আমি যে তোমার মেয়ে।'[১০] "বিকল্প" গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন মেয়ের এই অচলাবস্থা কাটাতেই হরগোবিন্দ হিন্দু ভূষণের মতন বিকল্প প্রাইভেট টিউটর খুঁজেছেন। কিন্তু ভালবাসার মানুষের কোন বিকল্প হয় না। দেশভাগের পটভূমিকায় প্রেমের গল্পকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্রনাথ মিত্র এভাবেই এই গল্পে এক অন্য মাত্রা দান করেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার নরেন্দ্র নাথ মিত্র ছিন্নমূল মানুষের জীবন চিত্র তাঁর বেশ কিছু গল্পে এইভাবে পাঠককে সন্মুখে তুলে ধরেছিলেন।

**তথ্য সূত্র :**

১. উজানগর,পার্টিশন-মানবাধিকার-গণতন্ত্র সংখ্যা, সম্পাদক, উত্তম পুরকাইত, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৩, উজাগর প্রকাশন,পৃষ্ঠা - ৮৪।
২. কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশো: ১৮৯১ - ১৯৯০, অরুন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৮৯, পৃষ্ঠা - ৩৮৬।
৩. গল্পমালা -১, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৩,আনন্দ পাবলিশারস, পৃষ্ঠা - ২৪২।
৪. উজানগর, পার্টিশন-মানবাধিকার-গণতন্ত্র সংখ্যা, সম্পাদক, উত্তম পুরকাইত, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৩,উজাগর প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৭৩।
৫. গল্পমালা -১, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ২৪২।
৬. তদেব,পৃষ্ঠা - ২৪৩।
৭. তদেব,পৃষ্ঠা - ২৫৩।
৮. তদেব,পৃষ্ঠা - ১২৫।
৯. তদেব,পৃষ্ঠা - ১৩৭।
১০.তদেব,পৃষ্ঠা — ৩৭২।

**মৌসুমী রক্ষিত**

## দেবেশ রায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ রাজনৈতিক বাতাবরণ

স্বাধীনতার উত্তরপর্বে যেসব গল্পকাররা ছোট গল্পের জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন দেবেশ রায় তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে তার জন্ম। পিতা ক্ষিতীশ চন্দ্র এবং মাতা অপর্না রায়ের তৃতীয় সন্তান তিনি। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগের অতি সক্রিয়তায় বাংলাদেশে হিন্দুদের জীবনে কালো দিন নেমে আসে। দেশভাগের উত্তাল মুহূর্তে দেবেশ রায় ও তাঁর পরিবার পাবনা থেকে জলপাইগুড়ি শহরে চলে এসেছিলেন। সেখানকার স্কুল কলেজেই তার পড়াশোনা। ১৯৫৮ সালে পাশ করার পর জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন।

দেবেশ রায়ের জন্ম ১৯৩৬ সালে আর আমাদের দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭। অর্থাৎ দেবেশ রায় তখন ১০-১১ বছরের বালক। রাজনীতির, দেশভাগের উত্তাল সময় তাঁর বোঝার কথা নয়। কিন্তু ছাত্রাবস্থাতেই সমবয়সী কিশোর বন্ধুদের থেকে এই রাজনৈতিক চেতনার কারণে দেবেশ রায় কেমন যেন আলাদা হয়ে যান - এ কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন তার ছোটগল্প সংকলনের দ্বিতীয় খন্ডের ভূমিকায়। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী দেবেশ রায় একজন প্রভাব বিস্তারী নেতা হয়ে ওঠেন যৌবনে। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া, পুলিশি ধরপাকড় ইত্যাদির কারণে তাঁর জীবনও ছিল উথাল-পাতাল। পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আইনি ঘোষিত হয়। বাড়তে থাকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সংখ্যা। দেবেশ রায়ের দৈনন্দিন জীবনও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে যায় রাজনীতির গন্ধে। তাছাড়াও রাজ্যে বর্গাদার আইন, কৃষকদের সাথে প্রচলিত প্রবর্তিত আইনের ফাঁকফোকরে সাধারণ ভূমিহীন কৃষকের যথাপূর্ব অবস্থা রাজনীতির ধর্মীয় গোড়ামির যাঁতাকলে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল দেবেশ এর চোখের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে। তাই তার লেখাতে এই রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক ছবি যে ছায়া ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। লেখক এর কাজ যা সে তাঁর জীবন, অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছে তাকেই তার লেখনীতে ফুটিয়ে তোলা, তাকে সাহিত্যে জীবন্ত করে তোলা। আগাগোড়া রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দেবেশ রায়ের অনেক গল্পে রাজনীতির ছোঁয়া খুঁজে পাওয়া যায়। দেবেশ রায়ের অনেক গল্পে রাজনীতি কখনো চরিত্র হয়ে উঠেছে আবার কখনো নিজেই চরিত্রের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই রাজনীতি তাঁর লেখার পরতে পরতে মিশে আছে।

'ক্ষয় ও তার প্রতিকার' গল্পটির চরম বিন্দু মিলে গেছে তাই রাজনৈতিক স্রোতের

মাঝখানে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে আলোকে নিয়ে মূলত গল্পটির সূচনা যক্ষ্মার মতো মারণ রোগ তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ধরাতে তাকে দূরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেখানে ছাত্রাবাসের মতো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় চিকিৎসা করানোর কারণে। কিছুদিন পর যখন সে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফেরে তখন থেকেই গল্পের শুরু। বহুদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে আলো নিজের বাড়িতে ফিরে বুঝতে চাইছিল তার পুরানো পরিবেশ। কিন্তু স্বাভাবিক জীবন থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে যখন গুটিয়ে যায় তখন তপন তাকে রুটি তৈরি করতে বলে একদল সংগ্রামী কৃষকের ক্ষুধাতুর জ্বালা নিবারণের জন্য। জোতদাররা সেই সব কৃষকদের জমি ছিনিয়ে নেয় আর তারই বিরুদ্ধে সেই কৃষকরা লড়াইয়ে নেমেছে। এখানে বলে রাখা ভালো মার্কসীয় তত্ত্বে ‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ’ একটা বিশাল অংশ জুড়ে ছিল। যুগে যুগে এই অসম দ্বন্দ্ব চলে এসেছে।এই গল্পেও দেখা যাচ্ছে কৃষকদের দ্বন্দ্ব জোতদারের সাথে। তপন এই সমস্ত সংগ্রামী মেহনতি মানুষের শরীক হয়ে তাদের সাহায্য করতে উদগ্রীব। আসলে এই গল্পে লেখক দিয়েছেন জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এগিয়ে চলার বার্তা, যার শেষ পরিণতি জেনেও তা জাগরুক থাকে প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের মধ্যে।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্রের দ্বিতীয় খন্ডের একটি গল্প ‘উদ্বাস্তু’। এই গল্পে থিতু হওয়া শান্ত নিরুত্তাপ সংসারে রাষ্ট্রীয় নীতি কেমন করে পরিবারটিকে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস তথা নিজেরই প্রতি অবিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছে, তারই গল্প। এই গল্পের শুরুতেই গল্পকার মধ্যবিত্ত জীবনের চাওয়া-পাওয়া এবং না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাসকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে অল্পেতে আপাত খুশি এক টিকে থাকা জীবনের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। যেখানে জীবনের মূল্যের থেকে তার ঘর গোছানোর মূল্য অনেক। এই গল্পে লেখক সত্যব্রতের সুখী, অটুট বন্ধন, স্ত্রী-কন্যা সমেত এক ছোট্ট গৃহকোণের ছবি তুলে ধরেছেন। তারপরেই ঘটে ইন্দ্রপতন। গল্পকার এই গল্পে মাত্র দু-তিনটি চরিত্রের স্বল্প ঘটনা প্রবাহের মধ্যে, যুদ্ধ দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে একেবারে মাটি পরিবার সমস্ত কিছু থেকে উৎখাত করে একটা সাগরে নিক্ষেপ করে।

১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসিদ্ধ হওয়াতে পরবর্তীকালে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং উন্মাদনা গোটা বাংলাকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে থাকে। আপাদমস্ত কমিউনিস্ট দেবেশ রায়ের চোখে সেই স্বপ্ন নানা রূপে অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। তারই এক সুন্দর রূপ পেয়েছে ‘মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট’ নামক ছোটগল্পে।

অতীতে বার্নেশ ঘাট কে বার্নেশ জংশনও বলা হত। মালবাজার থেকে বার্নেশ পর্যন্ত একটা রেলপথ এসে কোচবিহার জেলার দিকে চলে গিয়েছিল সেই কারণে জংশন। আর তিস্তা পার হয়ে ওপারে সদর জলপাইগুড়িতে যেতে হতো, সেই কারণে ঘাট এখন আর বার্নেশে ট্রেন আসে না, বার্নেশ মৃত জংশন। কিন্তু জনসাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক যোগাযোগের

কারনে বার্নেশ আজও মুখরিত। ধুপগুড়ি, লাটাগুড়ি, চ্যাংড়াবান্ধা, মেখলিগঞ্জ, আলিপুরদুয়ারের পর্যন্ত মানুষ বার্নেশ ঘাটে আসে তিস্তা পেরিয়ে জেলা শহর জলপাইগুড়িতে পৌঁছবার জন্য। প্রচুর বাস আসছে যাত্রীদের নিয়ে বার্নেশ ঘাট পর্যন্ত। এই গল্পের চরিত্র ভাদুই। দশ বারো বছরের এক ছেলে যে এই বার্নেশ ঘাটে তার কাকার দোকানে কাজ করতে এসেছিল। সে এই দোকানে ও দোকানে কাজ করে বেড়ায়। যখন দোকান বন্ধ হয়ে যায় তখন সে নৌকার যাত্রী ধরার কাজ করে এটা তার উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। এই বার্নেশ ঘাটে জীবন সংগ্রামের গতিধারা সবার সমান তাই এখানে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার প্রয়াস সবার। আসলে লেখক ভাদুই এর চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছেন আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কে। কমিউনিস্ট আদর্শে গড়া বাংলা তথা ভারতবর্ষকে।

এর পরের গল্প 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার'। গল্পটিতে আকালু নামক গ্রামের এক চাষীর ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হওয়া এবং সেই মৃত্যুর নানাবিধ কারণের বর্ণনার ফাকে ফাকে রাজনীতির এক গভীর আবর্ত তৈরি হয়েছে। সে সময় বিশ্ব রাজনীতি, যুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনকেও আন্দোলিত করে তুলেছিল। তা আকালু নামক গরিব চাষীর জীবনে ঘটে যাওয়া রেল দুর্ঘটনা এবং এই দুর্ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

একই রকম ভাবে 'বটা সান্যালের অন্তর্দন্দ্ব' গল্পটিও রাজনীতির আবহে মোড়া। পঞ্চাশ ষাটের দশকে ভারতের শাসন ব্যবস্থার যখন টালমাটাল অবস্থা, ১৯৬২ তে চীন-ভারত যুদ্ধ, পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের শাসন, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের বিস্তার, রাজনৈতিক পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র সমস্ত কিছুই এই গল্পের কাহিনীকে গড়ে তুলেছে। গল্পটিতে চা বাগানের শ্রমিকদের আন্দোলন বিভিন্ন চরিত্রগুলির রাজনৈতিক কার্যকলাপ কাহিনীর মধ্যে আদ্যোপান্ত রাষ্ট্রীয় অস্থিরতা, রাজনীতি, সমাজনীতিকে এক অনন্য মাত্রা দান করেছে।

'জয়যাত্রায় যাও হে' গল্পটির রচনাকাল ১৯৭০ সাল। বাংলার রাজনীতিতে সে সময় সিপিআই ও বাংলা কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার চলছে। নাম দেওয়া হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। কোয়ালিশন সরকার থাকলে মতপার্থক্যগত, মর্যাদাগত এবং উন্নয়নগত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে একটা টালমাটাল অবস্থা এবং চাপ সবসময় থাকে। সেই সময় পশ্চিমবাংলা সরকারের ক্ষেত্রেও এই পরিণতি ক্রিয়াশীল ছিল। এই গল্পের দুটি মাত্র চরিত্র আকালুদ্দিন এবং নারাণ মল্লিক। কাজের তাগিদে বাড়ি ফেরার পথে রাত হয়ে যাওয়ায় আকালুদ্দিন চির পরিচিত রাস্তায় বাড়ি ফিরতে পারেনা কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়ার কারণে নারাণ মল্লিক আর আকালুদ্দিন আজ চরম শত্রু। রাজনীতির জটিল ষড়যন্ত্র, মতাদর্শ এই মানুষগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। চিরকাল ধরে রাজনীতির বীজ তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।পরস্পর পরস্পরের সমব্যথী, এক হওয়া সত্ত্বেও তারা একসাথে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না।

পরিশেষে বলা যায় দেবেশ রায় তাঁর চোখের সামনে দেখেছিলেন বহু রাজনৈতিক টানাপোড়েন, পঞ্চাশের দশকের ধর্মীয় সন্ত্রাস, তৎকালীন শাসকের রক্তচক্ষু যার চক্রে পড়ে বহু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে নারকীয় অনাচার যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। সেই মানুষগুলির বেদনা সহচর হয়েই তাঁর এই ধরনের গল্পগুলো ডানা মেলেছে। অন্যদিকে শরীর এবং অন্তরাত্মায় একজন কমিউনিস্ট কর্মী হওয়াতে তাঁর প্রত্যেকটি মুহূর্ত কেটে গেছিল রাজনৈতিক আদর্শ, চেতনা, তাকে রক্ষা করার বিস্তার করার অদম্য সাহস এবং পরিশ্রমে। সেই আদর্শ স্বপ্ন সঞ্চারি রূপে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে গেছিল সেইদিন।

**তথ্যসূত্র :**


১। সৌরভ অনিন্দ্য, শিল্প সাহিত্য, দেবেশ রায় সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা ১৪৪

২। রায় দেবেশ, গল্পসমগ্র ৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৩

৩। রায় দেবেশ, গল্পসমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩

৪। রায় দেবেশ, গল্প সমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা ৯৫

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৫

৬। দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, দ্বিতীয় খন্ড, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, পৃষ্ঠা ৬১১

৭। রায় দেবেশ, গল্পসমগ্র ৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬২

৮। দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, দ্বিতীয় খন্ড, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, পৃষ্ঠা ৬১৩

৯। চক্রবর্তী অনিশ্চয়, গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ন০৯, পৃষ্ঠা ৫৪।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫

১১। দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, দ্বিতীয় খন্ড, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, পৃষ্ঠা ৫৯০।

বিশ্বরূপ দে

## ‘দেখি নাই ফিরে’ উপন্যাসে বিশ্বপথিক রামকিঙ্কর বেইজ

রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে লেখা সমরেশ বসুর “দেখি নাই ফিরে” উপন্যাসটি রামকিঙ্করের একটি জীবনালেখ্য। লেখক তার এই উপন্যাসে রামকিঙ্কর বেইজ কে সর্বাঙ্গীন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পীর জীবনের গতিপথের শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত কলমের আঁচড়ে জীবন্ত করার পরিকল্পনা ছিল সমরেশ বসুর। তার জন্য তিনি জীবনপাত পরিশ্রম করেছেন। সমরেশ বসু শিল্পীকে জানার জন্য, তার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও পূর্ণতাকে উপন্যাসে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। যদিও প্রথমে ১৯৮০ সালের ২রা আগষ্ট শিল্পী রামকিঙ্করের মৃত্যু হয় আর ১৯৮৭ সালের ৩ রা জানুয়ারি থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে শুরু করে “দেখি নাই ফিরে” উপন্যাসটি। কিন্তু নিয়তির অমোঘ পরিহাসে মাত্র প্রায় এক বছরের মাথায় অপারলোকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রস্থান করলেন শিল্পীর জীবনকথক সমরেশ বসু। অসম্পূর্ণ রয়ে গেল তার মহান শিল্পকর্ম, যদিও এই অপূর্ণতাই বাংলা সাহিত্যের জগতে যুগান্তকারী নিদর্শন হয়ে রইল।

বাংলা চিত্র, ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলার জগতে রামকিঙ্কর বেইজ এক অনবদ্য শিল্পী। বাঁকড়ার নিম্নবিত্ত ক্ষৌরকার পরিবারের ঘরে জন্ম নেওয়া রামকিঙ্কর বেইজ আপন প্রতিভাবলে চিত্র ও ভাস্কর্য্যর জগতে চিরস্মরণীয় স্থান অর্জন করেছেন। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না, যে ঘরে ক্ষৌরকর্মই জীবনধারণের মূল পেশা, সেখানে বড় হওয়া তো দূর, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখাই দুঃসাধ্য সেখানে নরসুন্দর রামকিঙ্কর সৌন্দর্যের হাতছানিতে সুন্দরকে অনুসরণ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র জীবনের গন্ডিকে অতিক্রম করেছিলেন শিল্প ও মানসিকতায়। জীবনের রাস্তায় তিনি সাধারণ পথচলতি পথিক হতে চাননি বলেই জীবনের চেনা ছকে গা না ভাসিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন অসীমের দিকে। যেখানে নিশ্চিত নিরাপত্তা ছিল না, ছিল না সুখী গৃহকোনের অলস অবসর। অনিশ্চয়তার নৌকায় সওয়ারি হয়েই তিনি খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছেন জীবনের মূল সুরকে।

পাঁচটি অধ্যায়ে বা পর্বে উপন্যাসকে বিভক্ত করে শিল্পীর জীবনের পঞ্চ প্রবাহকে লেখক সমরেশ বসু আঁকতে চেয়েছিলেন। অন্তত লেখকের সেটাই উদ্দেশ্য ছিল যা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি তার মনের ভাবকে ব্যক্ত করেছেন—

‘তোমাকে, বলা হয়নি, রামকিঙ্করের “দেখি নাই ফিরে” পাঁচটি পর্বের নামকরণ করেছি, “আরক্ত ভোর”, “সকালের ডাক”, “রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘবেলা’, ছায়া দীর্ঘতর ‘অন্ধকারের আলো’।’[১]

লেখক এই পাঁচটি পর্বের মধ্যে দিয়ে রামকিঙ্করের জীবনের পাঁচ অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ‘আরক্ত ভোরের’ মধ্যে শিল্পীর শৈশব, “সকালের ডাক” পর্বে শিল্পীর শিল্পজীবনে নতুন অধ্যায়ের সুচনা, “রৌদ্রদগ্ধ দীঘবেলা” পর্যায়ে তিনি রামকিঙ্করের শিল্পের

পূর্ণ প্রকাশ, "ছায়া দীর্ঘতর" পর্বে তার শিল্পী জীবনের ক্রম অপসৃয়মান অবস্থাকে আর "অন্ধকারের আলো" অধ্যায়ে শেষ জীবন ও অন্যান্য অপ্রাপ্তির মধ্যেও এর পূর্ণতার অনুসন্ধানকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। চিঠিতে তার এই ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। অথচ লেখার সময় তিনি পঞ্চম পর্ব হাত দেবার সুযোগই পেলেন না এবং চতুর্থ অধ্যায়ও অপূর্ণ রয়ে যায়। উপন্যাসে তিনি তাঁর পূর্ব ভাবনানুযায়ী পাঁচটি পর্বের ধারাবাহিকতাকে বজায় না রেখে শুরু করলেন 'রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলার এক দিন' দিয়ে, তারপর এল "আরক্ত ভোর" তৃতীয় পর্বে এল "সকালের ডাক- বিশ্ব অঙ্গনে" আর চতুর্থ ধাপে লিখলেন 'রৌদ্র দগ্ধ দীর্ঘবেলা'। সম্পূর্ণ করতে না পারায় অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই উপন্যাস পাঠকের কাছে এক অমৃতকুম্ভসম।

"রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলার এক দিন" পর্বে লেখক শুরু করলেন অজানা আতঙ্ক ও আশীর্বাদ এর রেশ ধরে। সেই আতঙ্ক ও আশীর্বাদ শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না। বিশ্বপ্রাঙ্গনের এই ডাক শিল্পীকে কখনো স্থির হতে দেয়নি। এগিয়ে নিয়ে গেছে আলোর সন্ধানে। শিল্পী রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে তৈরী করেছেন এক অদ্ভুত ভাস্কর্য্য যা নিয়ে আশ্রমিকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মতবিরোধ। কেননা তার স্পষ্ট স্বরূপ কেউই বুঝতে পারছে না, এমতাবস্থায় শান্তিনিকেতনের সর্বেসর্বা রবীন্দ্রনাথ ঘুরতে বেরিয়ে সেই ভাস্কর্য্য দেখে রামকিঙ্করকে ডেকে পাঠান। গুরুদেবের এই সমন রামকিঙ্করকে শান্তিনিকেতনে তার অস্তিত্বের শঙ্কায় বিচলিত করে তোলে, সে কথা শিল্পীর মুখেই শুনতে পাই—'হ্যাঁ, উনি মহাপুরুষ, তাই ভয় পাই। উনি তো আর তোমার মতো নন, উনি তো তোমার মতো মনে করেন না, আমি ঈশ্বরের মতো আঁকতে গড়তে পারি। তিনি যখন মনে করেছেন, 'আমি শিব গড়তে বাঁদর গড়েছি, "কেন ক্ষমা করবেন?"[২]

রামকিঙ্করের নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকলেও মনে সংশয় ছিল, সংশয় এটাই যে সবাই তার শিল্পের মর্মার্থ অনুধাবন নাও করতে পারে। আশ্রমিকদের কথায় আমরা এই সংশয়ের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারি। শেষ পর্যন্ত দুরু দুরু বুকে ভবিষ্যতের আশঙ্কাকে মাথায় নিয়ে কিঙ্কর রওনা দেয় গুরুদেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে।। কেননা তাঁর ডাককে লঙ্ঘন করার ক্ষমতা কারোর নেই, সংকোচের সাথে মুখোমুখি হন গুরুদেবের। দীর্ঘ কথোপকথনে গুরুদেব তার তৈরী করা মূর্তির বিষয়ে জানতে চান স্রষ্টার কাছে। স্রষ্টা সৃষ্টি করলেও তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সে দিতে পারেনা। কেননা শিল্পীর কাছে শিল্প আসে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন রূপে, ভাষায় তা অব্যক্ত, অসম্পূর্ণ। শিল্পী স্বপ্নে ধরা দেওয়া মূর্তিকে স্মৃতির মাধ্যমে শিল্পে ধরে রাখতে চেয়েছে, তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার নিজস্ব রূপ। বহুজনের কাছে তা সমান তো নয়ই, বরং তা ভিন্ন। তাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু প্রশ্নের শেষে প্রশ্নবাণে জর্জরিত কিঙ্কর বলে—'আমি জানি নে।' সে মুখ না তুলে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'সে এসেছিল আমার কাছে প্রেমের রূপ ধরে।

ভালবাসা আর ব্যাথায় তারা আকাশের নিচে মানুষের কাছে ধরা দিতে এসেছে। তারা কেউ পুরো নয়, আবার অর্ধেকও নয়।'[৩]

সবাই শিল্পীর কাজকে বুঝতে না পারলেও শিল্পরসিক রবীন্দ্রনাথ তা যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন। আর তাই রবীন্দ্রনাথ তাকে শুনিয়েছিলেন সেই অভয়বাণী— 'তুই তোর মুর্তি দিয়ে, ভাস্কর্য দিয়ে, আমাদের সবখানে ভরিয়ে দে। তোর মূর্তিরা যেমন রূপেই এসে তোর কাছে ধরা দিক, তাদের তুই এখানে সর্বত্র ছড়িয়ে দে।..... "আর শোন, যা ধরবি তা গোড়া থেকে শক্ত হাতে ধরবি, আর শেষ করবি। কিন্তু আর পেছন ফিরে তাকাবিনে।" একটা শেষ করবি, আর সামনে এগিয়ে যাবি—সামনে। কখনো পেছন ফিরে দেখবি নে।"[৪]

এই মহামন্ত্র 'একটা শেষ করবি, আর সামনে এগিয়ে যাবি- সামনে।' জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার মূল বাণী হয়ে রয়ে গিয়েছিল।

রামকিঙ্করের জীবনকে দেখলেও যেন আমরা এই কথারই অনুরনন শুনতে পাই। তা না হলে সামান্য নিম্ন বিত্ত ক্ষৌরকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করা যেখানে বড় হওয়া তো দূর অস্ত বড় স্বপ্ন দেখার পরিসর ছিল না। সেই অবস্থায় চরম দারিদ্রকে সঙ্গী করেই রামকিঙ্করের পথ চলা। বাঁকুড়ার মতো মফঃস্বলে নিত্য অভাবকে সঙ্গী করেও বালক রামকিঙ্কর হাতে খড়ির সময় বর্ণ পরিচয়ের বর্ণের সাথে সাথে ছবিরও পরিচয় ঘটে। শিশু রামকিঙ্করকে বইয়ের থেকেও ঘরে থাকা ক্যালেন্ডারের ছবি আকর্ষণ করত বেশি। লেখক সমরেশ বসু "আরক্ত ভোর" পর্বে রামকিঙ্করের শৈশব থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তের ঘটনা প্রবাহকে বর্ণনা করেছেন। বালক কিঙ্করকে রঙ যেন সবসময়ই ডাকে। সরকিছুর মধ্যেই সে রঙকে দেখতে পায়, বা বলা ভালো সবকিছুতেই সে রঙ খুঁজে বেড়ায়। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সকালে সূর্যের মধ্যে রঙের অনুসন্ধানে বা গন্ধেশ্বরীর বুক ধরে পার হওয়া কাড়ার (মহিষ) মধ্যে। রঙ পাগল রামকিঙ্কর কাড়ার কালো রঙের মধ্যেও সে কালো রঙের ভিন্নতা খুঁজে পায়। রঙ যেন রামকিঙ্করকে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়—"রঙ ছাড়া কী আছে? দ্যাখ ক্যানে, ই লদী, জল, মানুষ, গরু, কাঁড়া, জঙ্গল। সব আলাদা আলাদা রঙ। তু দেখথে পায় নাই? সব ত রঙ।" বালকের চোখে ফোটে এক মগ্ন বিস্ময়ের ঘোর। পুবের দূরে ওর চোখ। বললো, "কত রঙ। খালি রঙ। দ্যাখ ক্যানে, রঙ ছাড়া কিছু নাই। রঙ দেখ্যে দেখ্যে আমি ভেবাচেকা খাই।"[৫]

জীবনের শুরু থেকে যে রঙ তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায় সেই রঙই তাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। অথচ এই অভাবের সংসারে রঙ তার মোটেই সহজলভ্য ছিল না। বালক এই প্রতিবন্ধকতায় আটকে না গিয়ে বরং এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই তার সুরাহা খুঁজে নিয়েছিল তাই ঘরের মুড়ি ভাজার খলার নিচের কালি, ঘরের মেয়েদের ব্যবহৃত আলতাপাতা, সিঁদুর, হলুদ বাটা, কল্লাচ পাথর, বিভিন্ন পাতাকে ছেঁচে তার রস আদায় করার মতো বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে তার রঙের অভাবকে সে পূরণ করেছিল নিজের মতো করে। তবে কেবল

ছবি আঁকাতেই নয় মাটিও তাকে টানত চরমভাবে। তাই পরবর্তীতে রামকিঙ্করের কাছে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বা সবচেয়ে দামি জিনিস কী জানতে চাইলে উত্তর আসে মাটি, কেননা তিনি বলেছেন জীবন তো কাটল ওই নিয়েই। মাটির প্রতি এই টান জন্ম নেয় বাঁকুড়াতেই। ছোটবেলায় মাটি দিয়ে তৈরী করত তার ছোট বোনের খেলার জন্য বিভিন্ন পুতুল। এই টান আরও বৃদ্ধি হয় অনন্ত ছুতারের সান্নিধ্যে। রামকিঙ্করের বাড়ির কাছেই ছিল অনন্ত জ্যাঠার ঠাকুর তৈরীর স্থান। অনন্ত জ্যাঠার সস্নেহ সান্নিধ্য কিঙ্করকে মাটির আরও কাছে নিয়ে এসেছিল। ফলে একদিকে রঙ আর অন্যদিকে মাটি এই দুয়ের নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বাঁকুড়ায় থাকাকালিন প্রাথমিক স্কুল শেষ করে হাইস্কুলের আঙিনায় পা রেখেছিলেন তিনি। সাথে সাথে নিজের ইচ্ছামতো ছবি আঁকার সাথে বিভিন্ন ফরমায়েশি কাজ তিনি করেছেন কেবল রঙের প্রতি ভালোবাসায়। যেমন মাচানতলায় রজব আলির ঘোড়ার গাড়িতে ছবি আঁকা, মাড়োয়ারি দোকানের সাইনবোর্ড লেখা, বিভিন্ন নাটকের সিন আঁকা, কারো ছবিকে এঁকে দেওয়া, পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গী হয়ে অনিলবরণ বাবুর সান্নিধ্যে আসা এবং বিভিন্ন ছবি ও পোস্টার লেখা। এ সবই ক্রমাগত তাকে পরিণত করছিল। পরিণত যেমন করছিল তেমনই তার পরিচয়ের ও সুনামের পরিসরও ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছিল। রামকৃষ্ণ মঠের আশু মহারাজের হাতে সারদা মায়ের আঁকা ছবি তুলে দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে রামকিঙ্করের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা পরিণতি পায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে। বহু পূর্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রামকিঙ্করের কাজ দেখেছিলেন এবং তার পর থেকেই বাঁকুড়ায় এলেই তিনি বালক রামকিঙ্করের খবর পেতেন। যে রামকিঙ্কর প্রথম বৃহৎ রঙয়ের সম্ভার দেখেছিল যামিনী বাবুর সাথে কোলকাতায় গিয়ে, প্রকৃতির বুকে থাকা অকৃত্রিম রঙের ভান্ডারের আগল খুলে গিয়েছিল অনন্ত জ্যাঠার পথপ্রদর্শনায়, যে রামকিঙ্কর বালক কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনের উপান্তে পৌঁছে গিয়েছিল ধারাবতী পটুয়ার সান্নিধ্যে, সেই রামকিঙ্কর কে বাঁকুড়ার ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহৎ প্রান্তরে প্রবেশের দরজার কাছে পৌঁছে দিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তার মানসিকতার নেতি থেকে ইতিতে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল এই বাঁকুড়াতেই। বালক কিঙ্কর প্রথম থেকেই যে মূর্তিটিকে বেশি এঁকেছিল তা হল মা সারদা; কেননা এর সাথে বালক নিজের মায়ের মিল খুঁজে পেয়েছিল। সধবা সারদা মায়ের সেই মূর্তির যে স্বরূপ তার মন কে জুড়ে ছিল, তা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত মায়ের বৈধব্য রূপ দেখে মনে শুরু হয় সংশয়ের টানাপোড়েন। সেই সময় তিনি ছুটে যান বিভূতি বাবুর কাছে মনের সন্দেহ নিরশনের উদ্দেশ্যে। বিভূতিবাবুর উপদেশ তাকে প্রথম তার মধ্যে থাকা সংশয়ের বেড়া ভাঙতে সাহায্য করে। শুধু চোখে দেখা সবকিছু নয় বরং শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি শিল্পীকে বৃহৎ জগতের পরিসরে উন্মুক্ত করে দেয়, সত্যকে তিনি খুঁজে পান বিভূতিবাবুর কথায়—'মায়ের যে ছবি তুমার ভাল লাগে, উটিই আসল জানবে। উটিই আতের ভিতরি রাখা করবে। উয়ার যে

ছবি দেখ্যে তুমার মনে কষ্ট হব্যাক, উটি দেখ্য নাই। দরকার নাই।' তিনি ওর বুকে হাত রেখেছিলেন। ওর চোখে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন, 'ইখানে তিনি যিমনটি রঁইচেন, সিটিই সত্য। তুমি যে বস্তু, যে মানুষকে যিমনটি দেখবে, সিটিই সত্য।'[৬]

এই ভাবনা তাকে পরিপুষ্ট করেছিল। সাহায্য করেছিল চেনা বৃত্তের বাইরের সত্যকে দেখার, বৃহৎ সুন্দরকে অনুভব করার। এই ভাবনা থেকেই র‍্যাফেলের আঁকা "মাদার অ্যান্ড চাইল্ড" এর ছবিটিকে শরৎ চাটুজ্যে যখন রামকিঙ্করকে আঁকতে দেয় তখন কিঙ্কর র‍্যাফেলের ছবিটিকে কপি করার পরিবর্তে তার মনে ভেসে ওঠে বাঙালী দুঃখী মা ও তার সন্তানের কথা আর এই ভাবনাতেই তার তুলিতে ফুটিয়ে তোলে বনবাসী সীতা আর লব কুশকে। শুধু চোখে দেখার সীমাতে আবদ্ধ না থেকে তাকে অতিক্রম করার আকুতি, মনের দৃষ্টিতে ধরার ব্যাকুলতার বাসনার মধ্যে দিয়ে রামকিঙ্কর বিশ্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হয়। দেখার, অনুভব করার যে দৃষ্টি রামকিঙ্করের প্রসারিত হয়েছিল তা এই বাঁকুড়ার মাটিতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই অর্ন্তদৃষ্টিতেই তিনি তখন সবকিছুকে জরিপ করে রূপ দিচ্ছিলেন ছবিতে। অসহযোগ আন্দোলন পর্বে অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে বাঁকড়া থেকে পদযাত্রায় শুশুনিয়া পর্যন্ত যে প্রচারে কিঙ্কর অংশগ্রহণ করেছিল তা রাস্তার পরিচয়কে তার কাছে আরও স্পষ্ট করে তোলে।—"দেখেছে। কিন্তু আজকের মত এমন করে চোখে পড়ে নি। ও কি আম গাছের বোল দেখেনি? দেখেছে। এমন আকাশমুখো গাছ ভরা সোনার বরন যেন দেখেনি। রামকিঙ্করের কাঁধের ঝোলায়, রঙ-তুলি, কাগজ, সবই আছে। কিন্তু চলতে চলতে ছবি আঁকা যায় না, গান করা যায়। অথচ শহর ছাড়িয়ে এসে, এই রঙের সমারোহ ওকে অস্থির করে তুলছে। এই বর্ণবাহার, প্রকৃতি এখন আর ওর চোখে নেই। মস্তিষ্কে ঢুকেছে। প্রকৃতির এই উল্লাসকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ও রঙে ধরতে পারছে, ততক্ষণ শান্তি নেই।"[৭]

এতদিনের দেখা আর মুক্ত মনে দেখা দুইয়ের যে কত ফারাক তা সেদিন বুঝেছিল কিশোর রামকিঙ্কর। তার আগে-থেকেই আর একটি বিষয় কিঙ্করকে টানত তা হল তেলরঙ যা তাকে উৎসাহিত করেছে বিশ্ববন্দিত সব শিল্পীদের আঁকা- ছবি দেখে। বাইরের টান ক্রমাগত তার শিরা-উপশিয়ায় স্পন্দিত হতে শুরু করল। সাথে বয়ঃবৃদ্ধির ফলে রোজগারের কথাও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলত। ক্ষৌরকার পরিবারে এত-বয়স পর্যন্ত পিতার অন্নে জীবনযাপনের ধারা ছিল না। এই চিন্তা ধীরে ধীরে রামকিঙ্করকে গ্রাস করছিল। জীবন এবং এখনও জীবনের সঠিক দিশার খোঁজ না পাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ছিল।—"রামকিঙ্করকে যেন কেউ, ওর অলক্ষ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আর ওর মনে হচ্ছিল, যে দিকেই যায়, পথ শেষ হয়ে আসে। কোনো কিছুতেই মন স্থির হয়ে বসছিল না। সব কাজে কেবলই অতৃপ্তি। বিশ্বনাথ আর অতুলের বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। ওদের দুজনের হাসি গিয়েছে বদলে। আর দুজনেই রামকিঙ্করকে ডেকে, আড়াল থেকে, চুপিচুপি বউদের দেখায়। রামকিঙ্কর দ্যাখে। ভালো লাগে। খুশি হয়। আড়াল থেকে চুপিচুপি বউ দেখানোটা

যেন বন্ধুদের একটা খুশির খেলা। রামকিঙ্করকে তো সবই দেখাতে হবে। রামকিঙ্কর দ্যাখে। হাসে। হাসতে গিয়ে নিঃশ্বাস আটকে যায়। ওর চোখে যেন সব সময়েই সন্ধ্যার পাখির দৃষ্টি। যে পাখির চোখে আসন্ন রাত্রির বিষণ্ন অস্থিরতা।"[৮]

এর মাঝে টুকটাক ছবি ও দুর্গাপ্রতিমা গড়ায় অনন্ত জ্যাঠার শাকরেদি এই অন্ধকার অমানিশায় তার বাঁচার অবলম্বন হয়েছিল। সাথে ছিল অনন্ত জ্যাঠার অকৃত্রিম প্রশংসা। এরই মাঝে ঈশ্বরের দূতের মতো গ্রীষ্মের দাবদাহের শেষে আষাঢ়ের স্নিগ্ধ বর্ষণের ধারার স্নিগ্ধতার মতোই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রেরিত চিঠি বহন করে নিয়ে এল বিশ্ব অঙ্গনের ডাক—"শ্রীচণ্ডীচরণ বেজ, পূর্ব কথামত, এই চিঠি পাঠাইলাম। চিঠি পাইয়া, শ্রীমান রামকিঙ্করকে, শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়া দিবে। রামকিঙ্কর বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিয়া, শ্রীনিকেতনে, আমাদের বাঁকুড়ার শ্রীসন্তোষ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইবে। সন্তোষবাবু শ্রীমানকে আমার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন। সন্তোষবাবুকে আমার সমস্ত কথা বলা আছে। পুত্রকে পাঠাইতে বিলম্ব করিবে না। তাহাকে বলিবে, যতগুলি ছবি আঁকা আছে, সব যেন সঙ্গে লইয়া আসে। তেল রঙে আঁকা ছবি আনিবার প্রয়োজন নাই। খাইবার থালাবাসন সঙ্গে দিবে। জামাকাপড় বিছানাও যেন লইয়া আসে। এখানে পুত্রের যাহা ব্যবস্থা হইবে, যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা পরে তোমাকে পত্রে জানান হইবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা জানিবে-ইতি'।[৯]

উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব "সকালের ডাক- বিশ্ব অঙ্গনে" যথার্থই রামকিঙ্করকে নিয়ে এল বিশ্বের আঙিনা বিশ্বভারতীতে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী। যথাযথ অর্থেই বিশ্বের ভারতী। 'একমেবাদ্বিতীয়ম' এই প্রতিষ্ঠানে রামকিঙ্কর খুঁজে পেল তার অন্তরের ব্যাকুলতার উত্তর গুলি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য নন্দলাল বসুর কাছে কিঙ্করকে নিয়ে গেলে তার আঁকা ছবিগুলি দেখে নন্দলাল খুশি হয়েছিলেন, সাথে বলেছিলেন—"চমৎকার। তোমার হাত তো দেখছি একেবারে পাকা শিল্পীর হাত। নির্ভুল সুন্দর কাজ। এখানে তুমি নতুন কী আর শিখবে?" তিনি মাথা নেড়ে ছবিগুলো রামকিঙ্করের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'এখানে আর নতুন করে তোমার কিছু শেখবার নেই।'[১০]

নন্দলাল বসুর এই কথা রামকিঙ্করকে মুষড়ে দিয়েছিল। প্রত্যাখ্যানের, হতাশার, বিসর্জনের সুর বেজে উঠেছিল তার বুকে। সেই মুহূর্তেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ - "নন্দলালবাবু, তবু আপনি যদি ওকে এখানে কিছুকাল রাখেন, আপনাদের ছাত্র করে নেন, কিছু নতুন সুযোগ ও নিশ্চয়ই পাবে।"[১১] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এই অনুরোধ নন্দলাল ফেরাতে পারেনি। মহাকালের বুকে যেন একফালি বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে উঠল। এই পদার্পন রামকিঙ্করের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী রূপে রয়ে গেল। বদ্ধ জলাশয় থেকে যাত্রা দীর্ঘায়িত হল মহাসমুদ্রের দিকে। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ পরিপুষ্ট করল অযত্নে, নিজের খেয়ালে বেড়ে ওঠা চারাগাছকে। তার যথাযথ পরিচর্যার পরিসরে সুযোগ দিল মহীরুহে পরিণত

হবার। আর রামকিঙ্কর তার সুউপযোগ করে নিজেকে দৃষ্টান্ত রূপে স্থাপন করল স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জগতে।

শান্তিনিকেতনের প্রশস্ত পরিসরে, বহু ছাত্র ও শিক্ষকের সান্নিধ্যে, শিক্ষার বহু আধারের সংস্পর্শে ও সর্বোপরি গুরু নন্দলাল বসু ও রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় রামকিঙ্করের মানসিকতা, দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনকে অনুভব করার স্বতন্ত্রতা ও শিল্পকে বোঝার বৃহৎ পরিসরে, বিশ্বের সাথে যোগসূত্রে তার এতদিনের বহু প্রশ্ন, জীবনের বহু ধাঁধার সমাধান ক্রমশ সহজ হয়ে উঠল। জীবনের প্রতি ক্ষণে নতুন থেকে নতুনতরের সাক্ষাৎ তার শিল্পদৃষ্টিকে ক্রমাগত প্রসারিত করতে শুরু করল। খোয়াইয়ের বিস্তৃত দিগন্ত, লাইব্রেরীর অফুরান বইয়ের সমাহার, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাঙ্গন ও মুক্ত পরিবেশের প্রতিটি বিন্দুকে রামকিঙ্কর তৃষিতের মতো গ্রহণ করতে লাগল। ভেতরে থাকা বাঁকুড়া আর নতুন অধ্যায় শান্তিনিকেতন মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। শান্তিনিকেতনের ঘন্টাতলার শব্দ তার রক্তে উন্মাদনার লহর জাগিয়ে তুলল। রবীন্দ্র গান, নাটক তাকে বাঁচার নতুন রসদ দিল। সুরের সুধা চুঁইয়ে রক্তে প্রবেশ করল। মাষ্টারমশাই নন্দলালের কথা তার জীবনবাণীকে নব রূপে রূপায়িত করল—'আমি কি শুধু খেয়ে বাঁচি? আমি শুধুই খেয়ে বাঁচি না। কী করেই বা তা হতে পারে। আমি তো একটি জীব মাত্র নই। আমি মানুষ। একে তো মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম, তার ওপরে আমি শিল্পী। এ কথা আমি কখনো ভুলি না। তা কারিগরি বিদ্যা বা ক্রাফটসম্যান বললেও কিছু যায় আসে না। আমি শিল্পীই। আমি যে এঁকেও বাঁচি। আঁকার আনন্দের মধ্যে বাঁচি। সেই আনন্দের মধ্যেই আছে আমার আদর্শ আর সাধনা।'[১২]

শান্তিনিকেতনের পরিবেশ রামকিঙ্করকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে শুরু করল। আর এই দুর্নিবার আকর্ষণের টানে বাঁকুড়ার সাথে তার সংযোগকে ধীরে ধীরে ফিকে করতে শুরু করল। যেমন করে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হবার পর ছেদ হয়ে যায় সন্তানের সাথে মায়ের নাড়ির সংযোগ। কিন্তু শরীরবৃত্তীয় এই সংযোগ মনের ভেতরের রসায়ণকে বিলুপ্ত করতে পারে না। ঠিক তেমনই বিশ্বের ডাকে রামকিঙ্করের সাথে বাঁকুড়ার সংযোগ কম হলেও চিরদিন বাঁকুড়ার টান তার অন্তরে স্থায়ী হয়েছিল। নিত্যদিন নতুনের হাতছানি রামকিঙ্করকে বিবশ করে তুলছিল। নতুন জ্ঞান, নতুন শিক্ষাকে সে গোগ্রাসে আত্মস্থ করতে লাগল। অষ্ট্রিয়ান মিস ফন পট, আর্থার গোডিস, সিন্নেন্নো সিন্নেন্নি নামের ইটালীর লেখকের বই, হাঙ্গেরির স্টেলা ক্রামরিশ, বেলজিয়ান ভাস্কর মঁসিয়ে বুর্দেলের ছাত্রী মিসেস মিলোয়ার্ড (মঁসিয়ে বুর্দেল ছিলেন ফরাসী ভাস্কর রদ্যাঁর ছাত্র এবং সহকারী), জয়পুরের নরসিংহলাল, দেশ-বিদেশের বহু গুনী মানুষের সান্নিধ্য রামকিঙ্করের ভাবনার পরিসরকে বৃদ্ধি করেছিল। শিল্প, সাহিত্য, সমালোচনা, মাস্টার মশাইয়ের কথা আর বহিঃবিশ্বের সাথে যোগসূত্র রামকিঙ্করের শিল্পকে যেমন আর্ন্তজাতিক পরিসরে পরিপুষ্টি সাধন করেছিল তেমনই মানসিক ও জীবনের ভাবেও করে তুলছিল নির্মোহ, নিরাসক্ত। বাঁধনের থেকে বাঁধন ছেঁড়ার যে

আনন্দ সেই আনন্দ কিঙ্করকে মাতিয়ে দিয়েছিল। সত্য ও সুন্দর তার কাছে নিত্য নতুন রূপে সংজ্ঞায়িত হতে থাকল তা কেবল বাইরের নয় অন্তরের—"আমরা যা দেখলাম প্রকৃতির মধ্যে সুখে দুঃখে সৌন্দর্যে অনুভূতিতে, তা-ই একটা অন্য মাধ্যমে প্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা এবং ব্যাকুল ক্রন্দন। কিছু করতেই হবে, উপায় নেই। যেমন একটা শিশু কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে, তার পর স্বপ্ন দেখে। আমাদের কাজ হল, সেই স্বপ্নের অভিব্যক্তি। সেখানে তখন সেই ব্যাকুল ক্রন্দনের চোখের জল আর থাকে না। শিল্পী-শিশু কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ভিতর সুন্দরের আবির্ভাব হয়। আনন্দাশ্রু বইতে থাকে।"[১৩]

আর সারা জীবন শিল্পের সাধনা নিয়ে থাকা শিল্পী অক্লেশে ত্যাগ করেছিলেন অর্থ, খ্যাতির লোভকে। নির্দিধায় পতঙ্গকে দূরে সরানোর মতো এই সব হাতছানিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন কেবল নিশ্চিদ্র শিল্প চর্চার তাগিদে, বিশ্বপথিকের সেই অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তার নিজের ভাষ্যে—"পথ-ভালোবাসার তত্ত্ব আমার ওদের কাছে পাওয়া। আমি আগেও যেমন চলেছি, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই সহজ পথে থাকতে চাই। একটা কথা পথ চলতে-চলতে বুঝেছি, পথে বড় কাঁকর। ঝোপঝাপড়া, কাঁটা আর নানা অজানা ভয়। একবার নির্ভয় হতে পারলে এমন চলার আনন্দ আর কিছুতে নেই, সম্পূর্ণ অন্য এক পৃথিবীকে যেন কত কাছে পাওয়া। স্বাধীন মন থাকলে তা থেকে বিচিত্র সহজ রূপ, রস আস্বাদন করা যায়।"[১৪]

**তথ্যসুত্র :**


১) রায়চৌধুরী ড. ঝুমা, নিজেকে জানার জন্যে, পূর্বাশা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ-৩৪৯।

২) বসু সমরেশ, দেখি নাই ফিরে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ- ৯

৩) তদেব ১১

৪) তদেব ১২

৫) তদেব ২০

৬) তদেব ২২৮

৭) তদেব ১৯৮

৮) তদেব ২৪০

৯) তদেব ২৫১

১০) তদেব ২৬৯

১১) তদেব ২৮৯

১২) তদেব ৩৩২

১৩) ভট্টাচার্য সন্দীপন, রামকিঙ্কর বেইজ আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র, বইপত্তর, কলকাতা, নতুন মুদ্রণঃ মে ২০২৪, পৃ-১০১

১৪) তদেব, পৃ- ১০৪

তনুশ্রী মণ্ডল

## মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' গল্পে নিম্নবর্গের জীবন : লোকবিশ্বাস, যুক্তি ও চেতনার সহাবস্থান।

বেহুলা- মনসামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত চরিত্র। যদিও প্রচলিত কাব্যকাহিনি এই গল্পে অনুসৃত হয়নি। বেহুলা এখানে নদী হিসেবে প্রবাহিতা। সেই নদীকে কেন্দ্র করে একদিকে সর্পসঙ্কুল একটি অঞ্চলের মানুষের সর্পকেন্দ্রিক বিশ্বাস, সংস্কার, অন্যদিকে বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রূপ গল্পে উন্মোচিত। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে আছে ভেদ। এই ভেদ তৈরি হয়েছে কখনো বর্ণ, কখনো শিক্ষা, কখনো অর্থ অনুযায়ী। এই ভেদভাব থেকেই এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষের অধীন হয়েছে। এই অধীনতা থেকেই এসেছে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ধারণা। উচ্চবর্গের অধীন হয়েছে নিম্নবর্গ। প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গের মানুষ শোষিত হয়েছে উচ্চবর্গ ও তার সহায়ক শ্রেণীর মানুষের দ্বারা। এই নিম্ন বর্গের মানুষের জীবন, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার ও চেতনার বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যের মিথ। অঞ্চল অনুযায়ী পালা গায়কদের জবানিতে এই লোককাহিনিতে স্বাতন্ত্র্য আসে। সাপের প্রতি ভীতি থেকেই তৈরি হয়েছে সর্পদেবী ও সর্পকেন্দ্রিক মিথ ও লোকবিশ্বাস। এমনই এক সর্পসঙ্কুল অঞ্চলকে মহাশ্বেতা দেবী তার 'বেহুলা' গল্পের পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। 'বেহুলা' গল্প প্রকাশিত প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে 'প্রমা' পত্রিকায়। মহাশ্বেতা দেবীর লিখিত সাহিত্যে নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর ভাষা খুঁজে পায়। 'বেহুলা' গল্পও কেন্দ্রীভূত হয়েছে তথাকথিত নিম্নবর্গের একজন মানুষ শ্রীপদ মাল-কে কেন্দ্র করে। মাল অর্থাৎ ওঝা। শ্রীপদ মাল- সাপের ওঝা। বংশ পরম্পরায় সে এই কাজ করে আসছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই কাজ সে করে বিশেষ নিষ্ঠায়। পিতার শিক্ষা ও নিজের বুদ্ধিবলে সে দক্ষতা অর্জন করেছে এই কাজে। চিকিৎসা সে করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই। মানুষের প্রাণ বাঁচায়। ঐ অঞ্চলের মানুষ তাকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। অথচ উচ্চবর্গের কাছে সে তথাকথিত ছোটলোক। ওঝাবৃত্তি- শ্রীপদ মালের পেশা নয়। শ্রীপদ কাজ করে গ্রামের জোতদারের অধীনে। সাপকে সে দেবতা বলে মনে করে। পূজা করে বিষহরির। তার মনের মধ্যে একত্রে বাসা করে আছে বিশ্বাস ও সংস্কার ও যুক্তি।

শ্রীপদ পেশায় কৃষক। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার সূত্রে ওঝা। এমন পেশার মানুষজন আমাদের সামাজিক কাঠামোয় নিম্নবর্গ। এই মানুষগুলি অবহেলিত, শোষিত হলেও সেই শোষণ সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। সচেতন নয় বলেই প্রতিবাদীও নয়। সমগ্র বেহুলা গ্রাম পঞ্চায়েতে একমাত্র শ্রীপদ বোঝে রাষ্ট্রযন্ত্রের বা তার সহায়ক বর্গের শোষণের স্বরূপ। তার

কারণ শ্রীপদর শিক্ষা ও গ্রামের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ। শ্রীপদ প্রাইমারি স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়, তাছাড়া বাবার সঙ্গে হাসপাতালে বেশ কয়েকবার তার যাতায়াত। তাই সে পরিচিত নাগরিক জীবনবৃত্তের সঙ্গে। এই পরিচিতিই তাকে অবহিত করেছে মানুষের অধিকার সম্পর্কে।

বেহুলা গ্রামে নিম্নবর্গের মানুষের সহাবস্থান। সেই মানুষের মধ্যে আছে নিজস্ব বিশ্বাস। মনসা মঙ্গলকাব্যের 'বেহুলা' এখানে নদী রূপে প্রবাহিতা। পরিবর্তিত সময়েও মিথ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আসলে— "আপাতদৃষ্টিতে বহমান যে কাল, তার গভীরে একটি অন্য সময়ের স্রোত বয়ে চলে। বর্তমানের উদ্বেগ পীড়িত ব্যক্তি মানুষ সেই স্রোতকে অন্যভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন।"[১] মহাশ্বেতা দেবী জানান— "লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোন লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্যে।"[২] আসলে কাব্যকাহিনিতে স্বামী লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার তাগিদে দেবসভায় গিয়ে নাচ দেখায় বেহুলা। নারীর লাস্যে মুগ্ধ হয় দেবসমাজ। বেহুলা গ্রামে প্রচলিত আঞ্চলিক কাহিনিতে স্বামীর প্রাণ সে ফিরে পায় ঠিকই, কিন্তু তাকে দেবতাদের অভিশাপগ্রস্ত হতে হয় লাস্য দেখিয়ে নাচ করার জন্যে। সাপের কামড়ে মৃত মানুষকে বেহুলার জলে ভাসালে সে সদ্গতি পাবে, কিন্তু বেহুলা কবে মুক্তি পাবে সে প্রশ্নের উত্তর মেলে না। তবে থেকে বেহুলা নদী হয়ে বইছে। তাই এই অঞ্চলে সর্পদষ্ট মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয় নদীর জলে। পুরুষশাসিত এই সমাজব্যবস্থায় নারীও নিম্নবর্গ। তার স্বরও উপেক্ষিত। দেবসমাজ তারই নৃত্য প্রদর্শন করে মুগ্ধ হয় আবার তাকেই নিজ ক্ষমতাবলে শাপগ্রস্ত করে। এমনকি বেহুলার মুক্তির উপায়ও মেলেনি। আজীবন তাকে বহন করতে হয় ক্ষমতাসীনের অভিশাপ।

লোকায়ত বিশ্বাস থেকেই যেন সর্পদষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়াকে মানুষ ভেবে নিয়েছে নিয়তি। কপালের লিখন। সাপের উপদ্রব হ্রাস করার জন্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সচেতন নন কেউ। এই সর্পসঙ্কুল স্থানে গ্রামপ্রধান হৃদয় নস্কর তথা হেদো নস্করের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজা কালাচের প্রিয় বাসস্থান হওয়াতে গ্রামে সাপের উপদ্রব আরও বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিমান হেদো নস্কর শহর থেকে কার্বলিক অ্যাসিড নিয়ে এসে নিজের বাড়ী সুরক্ষিত করেন, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের লালিত লোকবিশ্বাস থেকে ভীতির কারণে তিনি মনসা পূজার সমারোহ বৃদ্ধি করেন। সাপ, সাপের পূজা, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা নিয়ে মানুষের মধ্যে আদিম বিশ্বাস দানা বেঁধে আছে প্রবলভাবে।

শ্রীপদ মাল ওঝা। বেহুলা গ্রামের সর্পদষ্ট মানুষের বাঁচার একমাত্র আশ্রয় তার চিকিৎসা ও তার নির্মিত ঔষধ। এই গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই কোনো সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। সর্পদষ্ট হয়ে

প্রতিবছর বহু মানুষ মারা গেলেও স্বাস্থ্যভবন থেকে আসে না কোন অ্যান্টিভেনম। স্বাস্থ্যভবনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে নিম্নবর্গের মানুষ কেবল সংখ্যা। ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে থাকে তাদের প্রয়োজনের পরিসংখ্যান। স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের শাসক বদলালেও, বদলায়নি শাসকের মানসিকতা। আধিপত্য, শোষণ আব্যাহত থাকে। এই আধিপত্য চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকেই। যার মূল নিহিত বর্ণভেদে বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায়। বর্ণ, শিক্ষা, অর্থের আধিপত্য এক শ্রেণীর মানুষকে নিম্নবর্গে পরিণত করেছে। যে নিম্নবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চবর্গ তথা উচ্চবর্গের সহায়ক শ্রেণী। তাই বেহুলা গ্রামের জোতদার হৃদয় নস্করই বর্তমানে সে অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান। একমাত্র বাড়তি ঘর বা পাকাবাড়ী তারই আছে এই অঞ্চলে। বসবাসের উপযোগী গৃহ একমাত্র তার বাড়িতেই বিদ্যমান। হৃদয় নস্কর এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক। শাসকের সহায়ক। তাই সরকারি পরিষেবা যা জনসাধারণের জন্যে তা এসে পৌঁছায় তারই ঘরে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে যে ছিল জোতদার সেই হয়েছে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। সরকারি ব্যবস্থাপনার কিছুই তাই এসে পৌঁছায় না গ্রামবাসীদের কাছে। এই নিয়ে খুব বেশি সচেতন নয়ও সাধারণ মানুষ। শ্রীপদ ব্যতিক্রম। গ্রামের জোতদার তথা পঞ্চায়েত প্রধান হেদো নস্করের কৃষিজমিতে কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাকে। সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসা সে করে থাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই। যদিও তার মনেও আছে বিষহরির প্রতি অগাধ বিশ্বাস। নিজস্ব সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা। লোকজ বিশ্বাস অথচ যুক্তির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন আছে তার মধ্যে। আছে আলো ও অন্ধকারের সহাবস্থান। সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসা করাকে শ্রীপদ নিজ দায়িত্ব বলে মনে করে। পিতার থেকে শিখেছে সে এই বিদ্যা। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে চিকিৎসা করেও সে ভজনা করে মা বিষহরির। বিষহরি তার আরাধ্য দেবী। সর্পদষ্ট রোগীকে বাঁচাতে সক্ষম হলে সে তাই মনসার পালাগানের আয়োজন করতে বলে। সেই পালাগানে সে নিজেই গায়েন। মনসার আরাধনা করে আঞ্চলিক কাহিনি অনুসারে সে মনসার পালাগান গায়। বিশ্বাস করে এই অঞ্চলেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল—"শ্রীপদ গভীর বিশ্বাসে বলে—এখানেই হইছিল সব। চম্পাই নগর এখন বেউলোর গবভে। বেউলো যেখানে দাঁইড়ে দাঁইড়ে নদী হয়, সেখানে এক আশচাজ্জ কদম গাচ আছে। বৈশেখে কদম ফুল ফোটে।"[৩] শ্রীপদ বিশ্বাসী। সে কেবল মানুষের প্রাণ বাঁচায়। সাপ নিয়ে লাভজনক কোন কারবার সে করে না— "সাপ এখন ভালো ব্যবসা। খপাখপ দাঁড়াস ধরে। চামড়ার দাম কলকাতায় বিস্তর। জিয়ন্ত গোখরো ধরলে কবরেজি দোকানে ওষুধ কত্তে বিষ নেয়।

আপনি সে কাজ করেন না?

না। বাবার নিষেধ। কত্তে নি।

চলে কি করে?

চলে নে। চ্যায়রা দেকে বুজচেন না? নস্করের জমি ভসসা। যারে বলে নির্ভসসা।"[৪]

শ্রীপদ বুদ্ধিমান মানুষ। সর্পদষ্ট মানুষের অবান্তর চিকিৎসা সে করে না। বিষধর সাপে কামড়ে বেশি পরিমাণ বিষ ঢাললে তার ওষুধে যে বিন্দুমাত্র কাজ দেবে না সে শ্রীপদ জানে। সেক্ষেত্রে সে হাসপাতালে পাঠায় ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্যে। অল্প বিষ ঢাললে বা নির্বিষ সাপ কামড়ালে তখন শ্রীপদ চিকিৎসা করে নিয়মমাফিক। বিষহরির নামে মন্ত্র আওড়ায়। এমনি করে হাতযশ অর্জন করে সে।

এমনই এক গ্রামে সাপের বিষ নিয়ে গবেষণার কাজে আসে বসন্ত। বসন্ত বহিরাগত। গ্রামজীবন ও গ্রামীণ মানুষ সম্পর্কে তার ধারণা স্বল্প। শ্রীপদর বুদ্ধিমত্তায় সে চমৎকৃত হয়। সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীপদকে আরও বেশি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানোর। শহর থেকে নিয়ে আসা অ্যান্টিভেনম দেওয়ার পদ্ধতি সে শেখাতে চায় শ্রীপদকে। শ্রীপদর মধ্যে থাকা লোক বিশ্বাসে আঘাত পড়ে। শ্রীপদর কাছে মানুষ ও মানুষের প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। মানুষ বাঁচবে তার ইঞ্জেকশনে, এই আশ্বাসে তার বিশ্বাস স্থিত হয়, তাই সে বলে- "পিত্তি পুরুষ গোঁসা হবে। হ'ক। আমারে ভগবান সবে ঝেনে আসে। কিচ্চু করতে পারি নে গো। তেনারা ঝে বিদ্যে চাইপ্যে দে গেছে, সে একন এক জগদ্দল বোঝা। নয় মন্দ হলাম, বেপতে গেলাম, মানুষ তো বাঁচবে আপনি মোরে ঝা শেকাচ্চ তাতে মানুষ বাঁচে। মানুষ বাঁচলি বিষহরির কোপ নি।"[৫] সর্পদষ্ট মানুষকে বাঁচানোর কাজে শ্রীপদ যেন যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে। বেহুলা গ্রামের রক্ষক সে। তারই ভরসায় বাঁচে বেহুলা গ্রামবাসীরা তাই শ্রীপদ গ্রামের বাইরে থাকলে নির্বিষ সাপের কামড়েও ভীতির কারণে মারা যায় মানুষ। প্রবল আগ্রহে ইঞ্জেকশন দেওয়া শিখে ফেলে শ্রীপদ। ইতিমধ্যে হেদো নস্করের বাড়িতে কাজ করা শশীকে ইটের পাঁজা থেকে সাপে কামড়ায়। শশীর উপর প্রথম ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে শ্রীপদ বসন্তর তত্ত্বাবধানে। দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস থেকে শ্রীপদ মনসার বন্দনা করে তবে অ্যান্টিভেনমের প্রয়োগ করে—

"মা মনসা দয়া করে বিষয়ে পেরি ধরি।
ভুজঙ্গ জননী ভুজঙ্গের বিষ নিলেন হরি।।
বিষ গেলেন সপ্ত স্বর্গের উওর দিকে।
মা মনসা দোহাই দিলেন শঙ্কর পিতার।।
বিষ গিয়ে শঙ্করের হল কণ্ঠহার।
জয় জয় শুভঙ্কর শঙ্করের দোহাই।।"[৬]

অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস থেকেই শ্রীপদ মায়ের আজ্ঞা কামনা করে ও স্বপ্ন দেখে যে মাতা বিষহরি বসন্তকে পাঠিয়েছেন তাকে শেখানোর জন্যে। এইভাবে বিশ্বাস ও যুক্তির সহাবস্থান চলে শ্রীপদর মধ্যে। নিজে রুগি বাঁচালেও তাকে সে মায়ের সেবক বলে মনে করে। গ্রামবাসীদেরও বিশ্বাস শ্রীপদর উপর। বিষহরির সেবক সে। মায়ের আজ্ঞা নিয়েই সে

কাজ করে। সর্পদষ্ট রুগি বাঁচলে মনসার পালাগান দিতে আদেশ করে। সে পালাগানের সেই গায়েন। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে মনসার ধ্বজা পুতে সে নিজেই গান করে। একটা মানুষের এমন বিভিন্ন দিক আবিষ্কার করে বসন্ত অভিভূত হয়। বন্ধু হয়ে ওঠে সে শ্রীপদ মালের। স্থাপিত হয় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের যোগসূত্র। নিতান্ত একাডেমিক আগ্রহ থেকে মানুষগুলির প্রতি একটা সহানুভূতির একটা স্থান তৈরি হয় বসন্তর। গ্রামজীবনের মানুষগুলির প্রতি একটা সংযোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাই বসন্তর মনেও এই গ্রামে চলা বিভিন্ন অব্যবস্থার প্রতি প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। এই প্রশ্ন আসলে লেখিকার। উচ্চবর্গের মানুষ যে ক্রমাগত শোষণ করে চলে নিম্নবর্গের মানুষগুলিকে, তা তিনি সোচ্চারে জানান- "মহানগরীর এত কাছে একটি গ্রামে এত অন্ধকার কেন? লাভে পোষাবে না বলে নস্কর ইট বেচবে না। পরিণামে কালাজের বংশবৃদ্ধি ও মানুষের মৃত্যু। মানুষগুলি অনাহারে শীর্ণ কেন? নস্কর এই ক্রনিক অনাহারে কোন ভূমিকায় আছে? কেন হেলথ সেন্টারে অ্যান্টিসিরাম থাকে না? হেলথ সেন্টারের ছোকরা ডাক্তার মাথা নাড়েন। না, তিনি জানেন না কোন 'কেন'র উত্তর। কলকাতায় স্বাস্থ্যদপ্তর মানেই মন্ত্রী, আমলা, ফাইল। মানুষ ও মানুষের সমস্যা সেখানে ফাইলে লিখিত সংখ্যা মাত্র।"[৭] এই ফাইলে লিখিত সংখ্যা থেকে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে সক্ষম হয় বসন্ত। সাপকে দেবজ্ঞানে পূজা করে শ্রীপদ। মৃত কালাজের চামড়া দিয়ে দেবী বিষহরির গয়না বানায়। সাপ, সর্পদেবী ও মানুষের এক ত্রিকৌণিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই ঐ গয়না পরিহিতা দেবী যেন সস্নেহে তাকিয়ে থাকেন শ্রীপদর দিকে।

সর্পদষ্ট মৃতদেহ বেহুলার জলে ভাসালে সদ্গতি পায়, এটি এই অঞ্চলের প্রচলিত মিথ। সেই অনুযায়ী কালাজের দংশনে মৃত শ্রীপদর দেহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় বেহুলার জলে। শ্রীপদকে সম্মান জানাতে হাজির হয় ঐ অঞ্চলের সমস্ত মানুষ। বাঁওরে ভেলা পাক খায় সাতবার। এমনই চলে আসছে বরাবর। এটাই রীতি। কেবল শ্রীপদর ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যতিক্রম। ভেলা পাক খেয়েই যেতে থাকে ক্রমাগত। হাওয়ায় তার মুখের চাদর উড়ে গেলে বসন্ত দেখে সে মুখে আছে তার প্রতি অভিযোগ। শহর থেকে নিজের কাজে আসা সচেতন মধ্যবিত্ত বসন্তর প্রতি তার যেন থাকে অনন্ত অভিযোগ। শহুরে উচ্চবর্গের মানুষের কাছে নিম্নবর্গের সমস্যা তেমন গুরুত্ব পায়নি কখনোই। বসন্তও এসেছিল কেবল নিজের একাডেমিক কাজের তাগিদে। সমস্ত অভিযোগ, হতাশা বুকে নিয়ে বেহুলায় ভেসে চলে শ্রীপদ। নদীই তার আপন জন। একদিকে বেহুলা নদী মৃত মানুষের সদগতি করে চলে আর অন্যদিক শ্রীপদ জীবন্ত মানুষের একমাত্র ভরসা। মানুষকে সর্পদষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে চলাই তার জীবনধর্ম। এই ধর্ম সে আজীবন পালন করে চলেছে। অসহায় মানুষগুলির দুঃখ তাকে হতাশ করে। তার কোন উত্তরসূরি রইল না, যে তার এই বিদ্যা গ্রহণ করে পরবর্তীতে মানুষগুলিকে বাঁচাবে। এই হতাশা বুকে নিয়ে বেহুলার বুকে ভেসে চলে শ্রীপদ।

তার এই হতাশাই জাগিয়ে দিয়ে যায় বসন্তকে ও তার চেতনায় দীক্ষিত হয়ে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য মানুষগুলিকে।

নিম্নবর্গের মানুষগুলি প্রান্তিকায়িত। প্রশ্নহীন আনুগত্যপূর্ণ এক জীবন বাঁচতে অভ্যস্ত তারা- "অধিকাংশ সময় নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসক গোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে"[৮] এই প্রশ্নহীন আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে চলে শাসক। শহর কলকাতা থেকে অত্যন্ত দূরবর্তী স্থান না হয়েও এই স্থান কেন এত অনুন্নত, কেন একেবারে সাধারণ পরিষেবা এসে পৌঁছায় না সেই প্রশ্নও তারা কখনো উত্থাপন করেননি। সর্পসঙ্কুল স্থান হওয়া সত্ত্বেও অ্যান্টিভেনম এসে পৌঁছায় না। কেবল সিরাম বা অ্যান্টিভেনম নয় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা সেখানে মেলে না। প্রতিবছর সর্পদষ্ট হয়ে মানুষের মৃত্যু হয় অথচ অ্যান্টিভেনম নেই বলে মানুষের মধ্যে কোন ক্ষোভের সঞ্চার নেই। সর্পদষ্ট হওয়াকে তারা নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষের নিজস্ব কোন স্বর নেই। এমনই একটি অঞ্চলে শ্রীপদ মাল যেন ব্যতিক্রম। সে বারবার অনুরোধ করে পঞ্চায়েত প্রধানকে সর্পদষ্ট মানুষের জন্যে প্রাণদায়ী অ্যান্টিভেনম আনানোর। তার যুক্তিবোধ অবাক করে দেয় শহর থেকে আগত বসন্তকে। বিশ্বাস ও যুক্তির এক অদ্ভুত সহাবস্থান তার মধ্যে বয়ে চলে। এমন যুক্তিবাদী মন নিয়ে বেহুলা নদীর জলে সর্পদষ্ট মৃতদেহ ভাসানোর পক্ষপাতি নয় সে কারণ বর্তমানে বেহুলা স্রোতহীন। নদীর আর মৃতদেহ বইবার সামর্থ্য নেই। অথচ সে নিজেই গভীর বিশ্বাসে বলে এখানেই হয়েছিল সব। বর্তমানে বেহুলা। সর্পদষ্ট মৃতদেহ না পুড়িয়ে কেন জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, সে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপদ বলে- "বলে দেন গে, মাত্তে আসবে। নদীর বওতা থাকে, লাশ টেনে তামলীতে ফেলল, লাশ ঝেয়ে সাগরে শামিল হলেন! বেউলো তো মত্তে বসেছে। ই কি আবাদ? ঝে ঋত খাল নদী সব ঝেয়ে সাগরে পড়তেছে ঝপাঝপ। পুঁইড়ে দে, লাশের কাপড়টা ভাইসে দে, বলার জো আছে?"[৯] সাপের বিষয়ে শ্রীপদ অভিজ্ঞ মানুষ। কোনো সাপ কামড়ালে তার কী লক্ষণ, সবই তার নখদর্পণে। তার হাতে কলমে শিক্ষা। এক দিকে হাতে কলমে শিক্ষা অন্যদিকে বাস্তববুদ্ধি, সামান্য লেখাপড়া শ্রীপদকে এমন অভিজ্ঞ করে তুলেছে। শ্রীপদ জানায় : "হাসপাতাল ভাল বাবু, ডাক্তারি ভাল, আগে হলি টাইফয়েটে, কলেরায় মরতু সবাই। একন ঝদি সময় থাকতে ডায়মনহারবারে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি, বেঁচে ওটে। সেথা নিলে বা ইরফানপুরে নিলে বিয়োতে গিয়ে মাগিগুলো মরে নে।"[১০]

শিক্ষা আনে চেতনা। তাই রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়ক মানুষ সকলেই চায় নিম্নবর্গ যাতে শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করে- "রাষ্ট্রক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাধিকার অধিকার

এবং চাহিদা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে চায়না। বরং বাজার সংক্রান্ত নীতিগুলোকে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে চায়।"[১১] তাই তামলী স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করলেও অর্থের অভাবে তার আর পরবর্তীতে পড়া হয় না। এই অঞ্চলে একমাত্র যার আর্থিক সঙ্গতি আছে সে হেদো নস্করের বাবা। সেও চায়নি কোন মালের সন্তান লেখাপড়া শিখুক। শ্রীপদ জানায়- "তকন, কোতা স্কুল নি। মাসে দুটো টাকা হলে ইরফানপুর স্কুলে পড়া হতু। হেদোর বাপের ঠেঙে আমার বাপ কত ব্যাগ্যতা করিছিল।

-দিল না ?

-না। বলল, আজ মালের পো পড়বে, কাল জেলের পো পড়বে, পরশু তোরা মাতায় পা রেকে চলবি, তাতেই হয় নে।"[১২]

পূর্বেকার জোতদার বর্তমানে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। তিনিও বজায় রেখেছেন শোষণের ধারা। এমনই হেদো নস্করের জন্যে বেহুলা পঞ্চায়েতে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই পরিত্যক্ত ইটের পাঁজা আজকে কালাচের পুরী হয়ে উঠেছে। মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে অনেকখানি। তবুও লাভ না ওঠায় হেদো নস্কর ইটের পাঁজা বিক্রি করেনি। এই নিয়ে গ্রামের কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি একমাত্র শ্রীপদ ছাড়া। পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে আসা কেরোসিন পৌঁছায় হেদো নস্করের ঘরে, তবুও সেই কেরোসিন সাধারণের কাজে ব্যবহার হয় না। তাই নস্করের বাড়িতে কাজ করা শশিকে সাপে কামড়ালে শ্রীপদ সকলকে একত্রিত করে বলে সাপের বাসা নষ্ট করার জন্যে- "হেদো নস্কর সরকারের কেরাচিনি নে ঘরে ডিম ফোটাচ্ছে। অর পাঁজা হতে সব্বনাশ, তা ও দেবে নে! এবার অগঘানে ধান তুলে দে আমরা সবাই চাঁদা তুলে কেরাচিনি কিনব।

—কিনে?

—পাঁজায় আগুন দে শিয়রচাঁদার বংশ নিবংশ করব। নইলে বাঁচবুনি।

—তাই হবে। তাই হবে।

বেরিয়ে এসে শ্রীপদ বলে এখন নাচতেছে সব! তকন দেখবেন সবাই পাশ কাটাবে। নিঝের ভালো নিঝে বোঝে নে এরা।"[১৩]

ওঝা হয়েও বসন্তর কাছে ইঞ্জেকশন দিতে শেখে শ্রীপদ। এতে গ্রামজীবন স্পন্দিত হয়। সাধারণ মানুষের ইঞ্জেকশন এর ব্যাপারে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিষধর সাপ কাউকে কামড়ালে বেহুলা গ্রামের বাইরেও শ্রীপদর ডাক পড়ে ইঞ্জেকশান দিতে। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার দিকে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই অঞ্চলের সর্পদষ্ট মানুষের বাঁচার একমাত্র ভরসা শ্রীপদ সর্পদষ্ট হয়ে মারা গেলে, তার মৃত্যু বসন্তের মধ্যবিত্ত চেতনায় আঘাত করে। নিম্নবর্গের মানুষগুলির সংকট, অসহায়তা তাকে প্রতিবাদী করে। সে সঙ্কল্প করে সাপের পাঁজা ধ্বংস করার। হেদো নস্করের সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রতিবাদ করে। আদায় করে নিম্নবর্গের অধিকার।

একত্রিত করে গ্রামবাসিদের। তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে চেতনা। কর্মের উদ্যোগ। যে চেতনায় দীপ্ত হয়ে সকলে উৎসাহে পূর্ণ হয়ে ইটের পাঁজায় আগুন জ্বালায়। দীর্ঘদিন ধরে অন্তরে জমিয়ে রাখা ক্ষোভ আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। সেই আগুন যেন মানুষগুলিকে আত্মসচেতন করে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে নতুন করে বাঁচতে শেখায়।

**তথ্যসূত্র :**

১। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩৭।
২। মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, পয়লা বৈশাখ ১৩৫১, পৃষ্ঠা- ৬
৩। মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৩,পৃষ্ঠা- ১০২
৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০২।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৯।
৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১০।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৫।
৮। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস,সম্পা: গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স,অষ্টম মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৮।
৯। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৩ পৃষ্ঠা- ৯৯।
১০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৪।
১১। জহর সেন মজুমদার, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৭, পৃষ্ঠা- ২১।
১২। মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,১৯৯৩, ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা- ১০৩।
১৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১১।

**প্রাবন্ধিক পরিচিতি :** তনুশ্রী মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কুশমণ্ডি।

সায়নী কুণ্ডু

## সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সেকালের আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীর ও একালের বাণী বসুর 'খনামিহিরের ঢিপি'র নারীগণের জীবনদলিলে পার্থক্য অনুসন্ধান

মানুষের মনোভূমিতে বদলের হাওয়া প্রবাহিত হবার পশ্চাতে অনেকগুলি বিষয় দায়ী থাকে সামাজিক পালাবদল তো বটেই এমনকি অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় পালাবদলও নিঃশব্দে কাজ করে যায়, তাই মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নারীগণকে পুরুষ অভিভাবকগণের অধীনস্থ থেকে যে অসহায় অবস্থায় দেখি উনিশ শতকে নবজাগরণের নবকিরণে তা থেকে অবশ্যই কিছুটা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে দেখি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার ক্রমোন্নতির চিত্র অবশ্যই দৃশ্যমান হয় অর্থাৎ পূর্বে নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরের যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল তার পরিবর্তন হচ্ছিল। বিংশ শতাব্দীতে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতীর জীবন যতটা কঠিন ছিল অবশ্যই একবিংশ শতকের বাণী বসুর লিখিত 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসের চরিত্র বেদবতী বা রঞ্জাবতীর জীবনের প্রসারতা বেশি ছিল আশা করা যায় কিন্তু উপন্যাসের পাতায় আমাদের জন্য চমক অপেক্ষা করে, যা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মিলে যায়। প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সমাজে বেশ কিছু প্রথা ও সংস্কার প্রচলিত আছে যা মানুষ যুগ ও বংশপরম্পরায় বহন করে নিয়ে চলে। শিক্ষা, অর্থ বা আভিজাত্যর উপর এই বিষয়গুলির মান্যতা নির্ভর করে না। বিশেষ করে এখনো নারীর জীবনকে নানা নিয়মের নিগড়ে বেঁধে রাখতেই সমাজ ভালবাসে।

সত্যবতীর সময়কার মেয়েদের জীবনে যেমন তালপাতায় হাত ছোঁয়ানোটাই পাপ বলে পরিগণিত হত রঞ্জাবতীর সময়ে তা নিশ্চয়ই নয় এবং স্বউপার্জনের পথও প্রশস্ত হয়েছিল কিন্তু সংসার, সন্তানের দায়িত্ব পালন ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে তারা হিমশিম খায়, আবার সেই প্রাচীনকালের মনুসংহিতার ব্যাখ্যা যে স্বামীর কোন দোষ না দেখে স্ত্রী প্রতি সেবায় রত থাকবে তেমনই একালের স্ত্রীগণও খুব সহজে সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না, বলা বাহুল্য সমাজও তা মেনে নেয় না।

আমার আলোচ্য দুটি উপন্যাসের প্রথমটি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এবং দ্বিতীয়টি বাণী বসুর 'খনামিহিরের ঢিপি' যেটি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সময়কাল লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয় যে একটি উপন্যাস তার কলেবরে বিংশ শতাব্দীর নিয়ম সংস্কারের আঁধারে সেকালের মানুষের জীবন চিত্র তুলে ধরেছে এবং অপরটি অবশ্যই একবিংশ শতকের মানুষের জীবনের টুকরো টুকরো কোলাজ তুলে ধরেছে। তবে একথা উল্লেখ্য যে

একই উপন্যাসে পূর্ব প্রজন্মের নারীগণের প্রতি সমাজবিধান কি ছিল এবং পুরুষতন্ত্রে নারী নিজেই কিভাবে তার আপন অমর্যাদার প্রতি উদাসীন ছিল তাও দৃশ্যমান।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করলে গ্রাম শহর নির্বিশেষে তৎকালীন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জীবন যাপন, নিয়ম, আচার, সংস্কার বোধের স্পষ্ট চিত্র তৈরি হয়। তৎকালীন সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ভীতি তৈরি করার জন্য সামাজিক চাপ, বাল্যবিবাহের অযৌক্তিক নিয়ম, পণদানের নির্লজ্জ উদাহরণ, বহুবিবাহ জনিত কারণে সতীন সমস্যায় জর্জরিত নারী জীবনের বেদনাদায়ক দ্বন্দ্ব এবং বৈধব্যের সুকঠিন নিগড়ে বন্দি মানুষগুলির বোবা যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। বাল্যকাল থেকেই মেয়ে সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলা হতো বিবাহের পরবর্তীতে স্বামী সন্তানকে ও শ্বশুরবাড়ির সকলকে তুষ্ট রেখে পতিসেবা, সন্তান পালন ও গৃহকর্মের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার জন্য, সেই কারণেই তাদের স্বাভাবিক কৈশোর চাঞ্চল্যকে 'ধিঙ্গিপনা'র তকমা দিয়ে তিরস্কার করা হতো। পরবর্তীতে পরের ঘরে গিয়ে 'শাশুড়ির ঠোনা' খাওয়ার ভয় দেখানো হতো। উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র সত্যবতী অবশ্য যুগের তুলনায় ব্যতিক্রমী বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী ছিল, তার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা একটি বাক্য থেকে সেকালের সমাজমানষ স্পষ্ট হয়,

"মেয়ে সন্তানের বোধ করি এত বেশি তলিয়ে ভাবতে শেখাও ভালো নয়।"[১]

যে সময়ে উপন্যাসটি লিখিত এবং প্রকাশিত হয় সেই সময় অবশ্যই নারী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছিল কিন্তু শহরে এবং বিশেষত কিছু পরিবারের বিশেষ উদ্যোগ ছিল এগুলি। সার্বিকভাবে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে নারী শিক্ষার প্রচলন প্রকৃতভাবে সূচিত হবার জন্য আমাদের আরও অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়। সত্যবতী ও তার বাল্যকালে খেলার সঙ্গীদের বক্তব্যে প্রকৃত অবস্থা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারই খেলার সঙ্গী এক কিশোরের বক্তব্য—

"মেয়েমানুষের তালপাতায় হাত ঠেকলে কি হয় জানিস না?"[২]

"ভগবান বলে দিয়েছে ভাল কাজগুলো বেটাছেলেরা করবে, খারাপ কাজগুলো মেয়েমানুষরা করবে বুঝলি?"[৩]

আসলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী-

"লেখাপড়া শিখে লাভ কি? তারা কি নায়েব গোমস্তা হবে?"[৪]

উপন্যাসে সত্যবতীর পিতা রামকালীর মত শিক্ষিত ও কবিরাজী করা মানুষও মনে করেন—

"মেয়ে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোন্দল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসে না রামকালীর।"[৫]

সেকালের সমাজের রীতি মেনেই

"মেয়েকে রামকালী গৌরীদান করেছেন।"[৬]

আসলে কুলীন ব্রাহ্মণের গৌরীদান ভিন্ন সমাজচ্যুতির ভয় ছিল, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত ভেদে এই নিয়মের কোন ভিন্নতা ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষ একনায়কতন্ত্রের জয় গান গাইতে গিয়ে মানুষগুলিকে বঞ্চিত করতে করতে একেবারে ইতর শ্রেণীর প্রাণীর স্তরে নামিয়ে আনে। নারী ভিন্ন বংশ রক্ষা সম্ভব নয় তাই 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই শাস্ত্রবচন সমাজ মেনে চলে, যে নারীকে পুত্র জন্মদান ও পালন এবং গার্হস্থ কর্ম সারা জীবন ধরে করতে হবে তাকে লেখাপড়া শেখানো সময় ও অর্থের অপচয় বলেই সমাজপতিদের মনে হয়। তাই ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে একটি লিঙ্গের মানুষ স্বাধীনতা, শিক্ষা, সম্মান হারিয়ে মানসিকভাবে প্রায় পঙ্গু হয়ে যেতে থাকে। এর পশ্চাতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সুবিধাবাদী রীতি নীতি গুলি তৈরি হতে থাকে। গৌরী দানের সুযোগ নিয়ে বৃদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণরা সহস্র বিবাহের যে নজির রেখে গেছেন তা ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিতই করেছে। এই সূত্র ধরেই আসে সতীন সমস্যা যা একটি বিবাহিত নারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে কণ্টকাকীর্ণ করে তুলত। আশাপূর্ণা দেবীও তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন,

"সতীন কাঁটার জ্বালা"[৭]

কেমন সমাজে উপস্থিত ছিল ইতিহাসের কাহিনির সত্য রূপ যেন সাহিত্য তার কলেবরের স্থান দেয়। সে যুগে সমাজে, "সংসারে যেমন ভাই, বোন, ননদ, দেওর, জা, ভাসুর সব থাকে, তেমনি সতীনও থাকে"[৮]

শিক্ষিত বা বিচক্ষণ মানুষ বলে পরিগণিত ব্যক্তিগণও নারীর এই জীবন যন্ত্রণাকে বহুদিন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেননি বদলে এটি যে স্বাভাবিক ঘটনা তা মনে করে নিজের ও অপর পুরুষের একাধিক বিবাহে উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ করেছেন তাই সত্যবতীর পিতা তার ভাতুস্পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ ধুমধাম করে দিয়েছেন তার প্রথমা স্ত্রীর উপস্থিতিতেই। সত্যবতী ও তার পিতার কথোপকথনে স্পষ্ট হয় সতীন কাঁটা জ্বালা সহ্য করার ভয়ে মেয়েদের শৈশব থেকে ব্রত পালন করতে হত, ব্রতর ছড়া হিসাবে পাই,

"হাতা, হাতা, হাতা,
খা সতীনের মাথা।"[৯]
"অশ্বথ কেটে বসত করি,
সতীন কেটে আলতা পরি।
ময়না, ময়না, ময়না
সতীন যেন হয় না।"[১০]

এমন ভয়ও দেখানো হতো যে,

"ব্রেতোপতিত হলে তো জলজ্যান্তে নরক।"[১১]

তবে রামকালীর ভাতুষ্পুত্রের প্রথমা স্ত্রী সারদার একটি উক্তি আমাদের সে যুগের সমাজের নারীগণের সব থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত জীবন ধারণের চিত্র তুলে ধরে,

"বরং একশটা সতীন নিয়ে ঘর করবে সারদা।
বিধবা হওয়ার মত অভিশাপ কি আর আছে?"[১২]

এতে উচ্চ-নিম্ন বিত্ত, বয়সে ছোট-বড় হিসাবে কোনো শিথিলতা বরদাস্ত করা হতো না আবার একথা জানলেও আশ্চর্য হতে হয় সেই নিয়মের যথাযথ পালনের পাহারাদার ছিল কোন এক নারী। সত্যবতীর পিসির ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে শুদ্ধ থাকার চেষ্টা আর নিজের ও বাড়ির অন্যান্য বিধবাগণের খাদ্য গ্রহণ ও নিয়ম পালন সম্পর্কে রক্তচক্ষু পর্যবেক্ষণ আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আভাস পেতে সাহায্য করে। উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক সেকালের সমাজের প্রচলিত নানা সংস্কার ও প্রথার উদাহরণ চরিত্রগুলির জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাহিত্য হয়তো সাহিত্যিকের কল্পনার লিখিত রূপ কিন্তু 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' কাল্পনিক নামের আধারে সেকালের সমাজের সত্য ঘটনা, সংস্কার, নারী জীবনের যন্ত্রণার বাস্তব উপাখ্যান হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি এই একবিংশ শতকে প্রকাশিত বাণী বসু লিখিত 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসেও দেখি তার প্রতিধ্বনি। এক শতাব্দী পরের উপন্যাসে অন্যতম নারী চরিত্র কেন তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খনার জীবনের ঘটনার সঙ্গে নিজ জীবনের ঘটনার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে, প্রশ্ন জাগে তবে কি বদল হয়নি অনেক কিছুই! উপন্যাসটিতে একবিংশ শতকের কথা যেমন পাই তেমনি পাই মাতৃতন্ত্রের সমাপ্তি কাল ও পিতৃতন্ত্রের একেবারে সূচনাকালের কথা মাতৃতন্ত্রে কন্যার জন্ম কালে,

"কন্যা এসেছে কন্যা এসেছে।"[১৩]

এই হর্ষ ধ্বনি পরবর্তীকালে ক্রমশ আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে কারণ পুরুষ বাহুবলে তখন নারীকে যৌনসঙ্গীরূপে ও গৃহকর্মে আবদ্ধ করতে চেয়েছে, বিবাহ পদ্ধতির এই সূচনাকালেই বোধহয় নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায় এবং পুরুষের গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি করার কামনায় সন্তান উৎপাদনার্থে বহুবিবাহের সূচনা হয়।

"এক পুরুষের একাধিক নারী থাকছে, নারীর একাধিক পুরুষ থাকছে না
এক নির্দিষ্ট পুরুষ ছাড়া অন্য কারোর সন্তান গর্ভে ধারণ করা অনাচার"[১৪]

এই প্রাচীনকালের গল্পের পাশাপাশি চলতে থাকে বিশ ও একুশ শতকের কয়েকজন নারীর জীবনের কাহিনী, সর্বমঙ্গলা নামে যে চরিত্রটির কথা আমরা পাই তার জীবনের সূচনা হয়তো বিশ শতকেই, তাই প্রাচীন সামাজিক নিয়মের শিকলে বদ্ধ মনটি তিনি কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করতে পারেননি। পুরুষতন্ত্রের পাঠে শিক্ষিত নারী হিসেবে তার পরিচিতি,

"কেননা রোজগেড়ে পুরুষমানুষের অন্নপানের রাজকীয় ব্যবস্থা নিজেকে
এবং বৌমাদের বঞ্চিত করে তুমিই করতে।[১৫]

সম্পন্ন সংসারে অসীম কর্তৃত্বময়ী গৃহকর্ত্রী হিসাবে পরিচিত হলেও,

"ভাত কাপড় ছাড়া আর কিছু তোমাকে দেওয়ার কথা কারো মনে হয়নি। নাপিত-বউকে পুজোয় একটা শাড়ি, ছোট নাতির একটা খেলনা, প্রতিবেশী গিন্নীকে অর্থাৎ সখিকে একখানা ছাটা ফুলের আসন বুনে দিতে ইচ্ছে করলে টাকাটুকুর জন্য শরণার্থী হতে হতো। অসীম কর্তৃত্বময়ী তোমার নিজের বলতে কিছু ছিল না। গহনাগুলি বউমারা মেয়েরা নাতনিরা দফায় দফায় পেয়েছে। সাচ্চা জড়ির বেনারসি দিয়ে বাসন কিনেছ। আর কি থাকতে পারে এক গৃহকত্রীর। যোগ-বিয়োগ করে হাতে সেই একটা ক্ষয়া পেন্সিল।"[১৬]

তবু কখনো তিনি বোধ করেননি যে তার আত্মমর্যাদাটুকু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আসলে আকৈশোর এমনই শিক্ষায় শিক্ষিত করে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হতো যেখানে অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন মেয়েটি পিতৃতন্ত্রের নিয়মগুলিকে সজাগ পাহারায় বজায় রাখত, বলতে পারত,

"মেয়েরা সবশেষে হাঁড়ি-কড়া-পোঁছা খাবে। মাছ জুটবে না, ছাল কাঁটা দিয়ে সধবা ধর্ম রক্ষা করতে হবে, দুধ বাচ্চারা বুড়োরা আর ব্যাটাছেলেরা খাবে- এইরকমই তো নিয়ম তখন সব বাড়িতে। ভালো জিনিসটি আগে ব্যাটা ছেলেদের পাতে পড়বে- এই।"[১৭]

স্বামীর অক্ষয় পরমায়ু রক্ষার দায়ভার গ্রহণে বাধ্য সতী স্ত্রী একাদশীর নিয়ম রক্ষার দিনও

"সর্বমঙ্গলা নাকি জীবনে কখনো একটা গোটা মাছের টুকরো খাননি। এত লোক লোকের পর লোক যখন খেতে বসলেন তখন হয়তো আর একজন অসময়ে এসে গেছে। একাদশী সধবাকে সেদিন অন্তত মাছ খেতেই হয়। তাই আধখানা অতিথির পাতে গেল।"[১৮]

সর্বমঙ্গলার কন্যা বেদবতীও সেই ধরা বাধা নিয়ম সংস্কার মেনেই সংসারে চলেছে। স্বামীর অসংযম, খামখেয়াল সবই সংসারের নিয়ম বলেই মেনে নিয়েছে। তবে তার কন্যা রঞ্জাবতী যাকে আমাদের উপন্যাসের প্রধান মুখ বলে মনে হয়, যে নিজে একজন গবেষিকা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, বিবাহ করেছেন স্ব-নির্বাচনে একজন অধ্যাপককে, কিন্তু তার দাম্পত্য ও সংসার জীবন অভিজ্ঞতাও খুব একটা আলাদা চিত্র বহন করে আনে না, স্বামীর দায়িত্বহীনতা পর নারীতে আসক্তি জেনেও সংসারে থাকতে বাধ্য হওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে কুৎসিত নজরদারীর কারণে হেনস্থা হওয়া একবিংশ শতকের আধুনিকতার ফল মোটেই নয়। তার অনুভবেই বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে,

"গড়পরতা পুরুষের নাকি এক নারীতে ক্লান্তি আসে। মেয়েদেরই কি আসে না? সমাজ বহুযুগ ধরে পুরুষকে ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে। সেইভাবেই শিক্ষিত করেছে। রাজ-রাজরা থেকে বস্তিবাসী পর্যন্ত। মেয়েদের সংসার ধরে রাখতে হবে। শিশু

পালন করতে হবে। তাদের সংস্কার যাতে একমনস্ক হয় তার জন্য সমাজ কম শাস্তর লেখেনি। নিন্দা-মন্দ, কুৎসিত অপবাদ, চারদিকে গণ্ডিটানা, বিধিনিষেধ, এবং সতীত্বের মহিমা কীর্তন, সতীদাহ, সতী পূজা, সতীমায়ের মেলা এবং সর্বশেষ চালাকি দেবীপূজা। তুমি দেবীর অংশ তোমাকে মর্ত্য মানুষের দুর্বলতা মানায় না।"[১৯]

রঞ্জাবতীর কন্যা ঈশা ততটা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে ইচ্ছুক নয় বরং গার্হস্থকর্মে সুখী হতে চায় সে, বিবাহ সূত্রে একটি শিক্ষিত ও আধুনিক পরিবারের অংশ হওয়া সত্বেও সে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাতে একথা স্পষ্ট হয় যুগের অগ্রগতি হলেও মানুষের মানসিক অগ্রগতি বোধহয় ততটা দ্রুত নয়,

"এখনো কোনও কোনও ফ্যামিলি উনিশ শতকের প্রথম অংশে বাস করছে, বিশ শতকের শেষ দিকে মাথা, মগজ, কিন্তু উনিশে পা। তার ফলে এইসব মানুষকে বোঝা যায় না। একদিকে যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, গুলে খেয়েছে। কাঁটা চামচে খায়, বাড়ি পশ্চিমে কায়দায় সুসজ্জিত, কুঁচিয়ে পরিপাটি শাড়ি পরা মহিলা, প্যান্ট শার্ট পরা বয়স্ক পুরুষ পায়ের উপর পা তুলে চশমা পরা বুদ্ধিমান বসে আছেন, লোকের হাত দিয়ে ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এল, মহিলা চা তৈরি করে দিলেন। সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু সেই সব মানুষই বউয়ের খাবার দিকে শ্যেন দৃষ্টি ফেলে রাখেন! ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হলে কথা বন্ধ করে দেন! বরের সঙ্গে বেরিয়ে খেয়ে এলে বা দেরি করলে খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাজার কথা শুনিয়ে দেন, ছেলেকে নয়, বউকে। এ কবেকার মনোবৃত্তি!"[২০]

এখনো কোন পুরুষ তার উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল স্ত্রীকে অবলীলায় বলতে পারে,

"আই'ল থ্রু ইউ আউট অফ দিস হাউস"[২১]

আসলে উপন্যাসে প্রাচীনকালের নারীর রঙ্কা, খনা থেকে একালের সর্বমঙ্গলা, বেদবতী, রঞ্জাবতী, ঈশা প্রত্যেকেই সংস্কার প্রথা নিয়মের জালে জর্জরিত, অসুস্থ রঞ্জাবতী আবহমান কালের নারীর দুর্গতির কথাই অবচেতনে বলে যায়—

"সবার উপরে তিনি সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, দাদা, যার বিদ্যাও অবিদ্যা, গুণও অগুন। তরুণী বধূ গুনে দেখিয়ে দিলেন শ্বশুরের গননায় কোথায় ভুল ছিল, কেন মিহিরের মৃত্যু হলো না। সেই থেকে শুরু। অগ্নিশর্মা স্বামী ঘরে ফিরেছেন, কোথায় খনা? এত বড় স্পর্ধা!......... মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মিহির স্ত্রীকে শপথ করালেন আর জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষচর্চা করবেন না। কণ্ঠে গান নিয়ে জন্মেছে তাকে বলছে গাইবে না, পায়ের চলায় নাচের ছন্দ, তাকে বলছে নৃত্য তো বাইজির পেশা। গুণবতী কি তা ছাড়তে পারেন? পারেন না! মৃত্যুর চেয়েও কঠিন তা। জিব কেটে ফেলেছেন খনা, স্বামীর হাতে সেটি ধরিয়ে দিয়ে রক্তমুখী বধূ

বেরিয়ে যাচ্ছেন- এই নাও আমার গৌরব, আর তোমার গ্লানি। মাথা উঁচু। স্পিরিট নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু এই নীরবতা আর এই ভয় আপামর মেয়ের সাইকিতে একটা পরিবর্তন আনলো। চুপিসারে। ওরে বাবা, বেঁচে-বর্তে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো। শিখবে বই কী! শুক্তো, ছ্যাঁচড়া, ধোপার খাতা, ছেলেকে অ-আ-ক-খ। ইচ্ছা অনিচ্ছা তোরঙ্গে তুলে রাখো। সতী- উমা- করুণা- মলিনারা এইভাবে বুক ভরা মধু বাংলার বধূ হয়ে জন্মালো মরল। খুব নাম হল। কিন্তু দাদা এ তো শেষ নয়, মিহির একশো আশি ডিগ্রী ঘুরে গেছে হঠাৎ। বলছে পাল্টাও, ঘরের বাইরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, নাচ, গান, বিদ্যা সব আয়ত্ত করো, কিন্তু অবশ্যই স্বামী যতটুকু চাইবে, ততটুকু রামচন্দ্রের গণ্ডি এবার। রূপ-গুন-চরিত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে এমন হও যাতে তোমাকে নিয়ে গর্ব করা চলে। খালি আমার থেকে এক বিঘত খাটো থেকো।”[২২]

সেকালে খনার জিভ কেটে ফেলেছিল বা তার জিভ কাটা হয়েছিল একালেও নারীর ইচ্ছার বা স্বপ্নের ডানা ছেঁটে ফেলতে পুরুষতন্ত্র যথেষ্ট খড়গহস্ত আসলে পুরুষতন্ত্রের নিয়মে রাজি না হলেই সমাজের রক্তচক্ষু। সামাজিক ছাঁচকে অস্বীকার করে ব্যতিক্রমী হতে গেলেই প্রতিকূলতায় জীবন ভরে ওঠে এই কারণেই আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী শ্বশুরবাড়ির প্রিয় হতে পারেনি। কারণ যুগের সঙ্গে তার চিন্তাধারা খাপ খায়নি। প্রতিভাময়ী সত্যবতীর যুক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে প্রতি পদে পদে অযৌক্তিক কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সংস্কারের সংঘাত তৈরি হয়েছে। একালের রঞ্জাবতী একযুগ পরেও সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন। যদিও সে অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন নয় তবুও সংসারের ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষার দায় কেবল তারই সেখানে এতটুকু ত্রুটিতে ছুটে আসে তীক্ষ্ণ সমালোচনা আসলে সমাজমানসে আবহমান কাল থেকে দৃঢ়ভাবে যে সংস্কার ও প্রথাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি সহজে উৎপাটন করা সম্ভব নয়, তাই সত্যবতী ও রঞ্জাবতীর মধ্যে যুগ শিক্ষা ও পরিস্থিতির পার্থক্য থাকলেও স্বাধীনতা ও সম্মানের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য তৈরি হয়নি। এক্ষেত্রে উপন্যাসিক বাণী বসুর একটি সাক্ষাৎকারের মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য,

‘প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে আধুনিক ভারতবর্ষ নারীদের সামাজিক অবস্থানের কোনো দিশা ফুটে উঠেছে?’... তার উত্তর ছিল ‘নারীদের ব্যাপারে প্রাচীন থেকে আধুনিক ভারতে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। আগে মেয়েরা বড় ঘরের মেয়েরা অবশ্যই শিক্ষিত হতেন। সত্যবতীর শিক্ষার উল্লেখ আমরা পাই। তারপরে আধুনিকতর যুগে বৈষ্ণবীরা এদের শেখাতেন, তারপরে আসতেন মেম শিক্ষিকা। ঘরে বাইরে-তে যেমন হাতের কাজ, অক্ষর পরিচয়, কিছু ফ্যাশন, ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতি, একটু আধটু গান বাজনা শেখানো হতো তাঁদের। সাধারণ ঘরের মেয়েরা

এসবের নাগাল পেতেন না। এখন শিক্ষার ক্ষেত্রেও আরও উদারতা সুযোগ, সেগুলো অর্থকরী কাজে লাগাবার সুযোগ এগুলো এসেছে বটে। কিন্তু সম্মানটা আপেক্ষিক আর নিরাপত্তার প্রশ্নে দ্রৌপদী যেখানে ছিলেন আজকালকার মেয়েরাও সেখানেই। খুব দুঃখের কথা, কিন্তু এটাই সত্য।"হ[২৩]

**তথ্যসূচি :**


১। দেবী, আশাপূর্ণা। প্রথম প্রতিশ্রুতি। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪৩০, পৃ. ২৭

২। তদেব, পৃ. ১২৪

৩। তদেব, পৃ. ১২৪

৪। তদেব, পৃ. ১৩০

৫। তদেব, পৃ. ৭৭

৬। তদেব, পৃ. ১৭০

৭। তদেব, পৃ. ৬৮

৮। তদেব, পৃ. ৬৯

৯। তদেব, পৃ. ৭০

১০। তদেব,পৃ. ৭১

১১। তদেব, পৃ. ৭২

১২। তদেব, পৃ. ১০২

১৩। বসু, বাণী। খনামিহিরের ঢিপি। আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৬০

১৪। তদেব, পৃ. ১৮৬

১৫। তদেব, পৃ. ৫২

১৬। তদেব, পৃ. ৫২

১৭। তদেব, পৃ. ৪৬

১৮। তদেব, পৃ. ১২০

১৯। তদেব, পৃ. ১২০

২০। তদেব, পৃ. ১৪১

২১। তদেব, পৃ. ২০৯

২২। তদেব, পৃ. ২৩০

২৩। গোস্বামী, উজ্জ্বল (সম্পাদিত)। লেখা দিয়ে রেখাপাত (বাণী বসু সম্মাননা সংখ্যা)। নৈহাটি, সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ২৮

মোঃ আফরুক সেখ

## তাপস রায়ের ‘শুধু পটে লেখা’ : ইতিহাস, লোকশিল্প ও সামাজ বাস্তবতার আলোকে

তাপস রায়ের ২০২২ সালে প্রকাশিত ‘শুধু পটে লেখা’ উপন্যাসটি ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের এক অনন্য উদাহরণ। ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে লুকিয়ে আছে ইংরেজ শাসনকালের রাজনৈতিক পটভূমি ও বাংলার একান্ত লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপটচিত্রের ইতিহাস। উপন্যাসের কাহিনি বর্তমানের ঘটনা দিয়ে শুরু হলেও সমগ্র উপন্যাসটি সুহান ওরফে সায়ন্তনের বয়ানে ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত হয়েছে। সায়ন্তন মেদিনীপুরের নামকরা পটশিল্পী রজনী চিত্রকরের বর্তমান একমাত্র বংশধর। সকালে বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁত মাজার সময় একজন মাঝবয়সী মহিলার চিৎকার শুনে এগিয়ে গিয়ে সে জানতে পারে তাঁর ছেলে রঙ্গীত বসুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মহিলাটি সুদূর শিলিগুড়ি থেকে এসেছেন বাচ্চাকে গান শেখাতে। কিন্তু গুরুজি প্রকৃত গানের ভক্ত, তিনি গানকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে দেখেন, টাকা কামানোর যন্ত্র হিসেবে নয়। বিচারক হিসেবে মঞ্চে প্রকৃত বিচার করলেও অন্যান্য বিচারক সেটা না মানায় তিনি সিদ্ধান্ত নেন আর গান শেখাবেন না। শেষমেশ সায়ন্তন ও গুরুজি মিলে ঠিক করেন সেদিনের গানের অনুষ্ঠানে প্রতারিত হওয়া মিঠুন নামক ছেলেটিকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারা যায় মিঠুনের বাবার পটচিত্রে অসামান্য প্রতিভার কথা। সেখান থেকেই শুরু হয় উপন্যাসের কাহিনি বিস্তার; যার মধ্য দিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকের ইংরেজ শাসন ও জমিদার নরেন্দ্রলাল রায়ের প্রচেষ্টায় পটশিল্পীদের জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাস ফুটে ওঠে।

ঠেকুয়াচকের সুহানের বাবা রজনী চিত্রকর, দাদু ভোলানাথ পটো এবং দিদি জামিলাকে নিয়ে উপন্যাসের যাত্রা শুরু। গল্পের এই ঐতিহাসিক কাঠামোর ওপর লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে সৃজনশীলতার এক মায়াবী প্রলেপ দিয়েছেন। এখানে রাজা নরেন্দ্রলাল খান বা ক্ষুদিরাম বসুর মতো চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে নেওয়া হলেও রজনী চিত্রকর এবং তাঁর পুরো পরিবার অর্থাৎ সুহান, জামিলা ও ভোলানাথ পটো চরিত্রগুলি মূলত লেখকের উদ্ভাবনী শক্তির ফসল। মূলত ইতিহাসকে রক্ত-মাংসের মানুষের সংলাপে জীবন্ত করে তুলতেই লেখক এই কাল্পনিক চরিত্রগুলির অবতারণা করেছেন। তাঁরা পটের গান শোনাতে বেরিয়ে যান নাড়াজোলের মেলায়। সেখানে যাওয়ার পথে একটি গ্রামে আশ্রয় নিলে যমুনা নামের একটি মেয়ের প্রতি সুহান আকৃষ্ট হয়। কিশোরীর সাথে সুহানের যে হৃদয়ের টান তৈরি হয়, তা পটুয়াদের যাযাবর জীবনের এক কোমল দিক। যমুনার মতো চরিত্রগুলি মূলত পটুয়া সমাজের অভ্যন্তরীণ আবেগ ও জীবনতৃষ্ণা প্রকাশের প্রয়োজনে লেখকের ললিত মানস

থেকে জন্ম নিয়েছে। সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে সপরিবার জমিদার নরেন্দ্রলাল খানের গ্রামে যান পট দেখাতে। জমিদার নিজেও শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী। তিনি মাঝে মাঝে তুলট কাগজে মনসার চিত্র আঁকার চেষ্টা করেন; কিন্তু মনের মতো ছবি হয়ে ওঠে না বলে তিনি রজনী চিত্রকরের কাছে চিত্রাঙ্কন শেখেন। নরেন্দ্রলালের দাদু মোহনলাল খান হুগলি জেলার শিল্পী শ্যামসুন্দর পটিকারকে নাড়াজোলে বসত দিয়েছিলেন। ফলে তাঁরও বাসনা ছিল পটুয়া সমাজের সুনাম বাড়াতে রজনী চিত্রকরকে স্থান দেওয়া। রজনী চিত্রকর ঘরে ফেরার পথে সুহানের পছন্দের পাত্রী যমুনার দাদুর বাড়িতে যান। সেখানে যমুনাকে গান শেখানোর ভার রজনীর ওপর পড়লে সে বড়ো অসহায়ত্ববোধ করে। তাঁর ভাবনার মধ্য দিয়ে গোটা পটুয়া সমাজের অন্তর্জালা প্রকাশিত হয় **"গান শেখাবে সে কী করে। চিত্রকরদের শিক্ষা, চিত্রকরদের পরিবারের, জাতের ভেতর করতে হয়। বাবা-মা-র কাছ থেকেই গান কণ্ঠে ওঠে। সমাজের চলাচলের ভেতরে অধ্যাত্মিক জীবনের ধ্যান মনের ভেতর প্রতিমা বানায় ছন্দে- সুরে। বাইরে থেকে কীভাবে পটুয়ার গান শিক্ষা দেয়া যাবে। তাছাড়া অন্য জাতির হাতে নিজেদের শিক্ষা তুলে দেয়াটাও গর্হিত আর পাপ কাজ। রজনী তো জানে বিশ্বকর্মার পুত্র তারা শুধুমাত্র অভিশাপ বুকে করে- না ঘরকা না ঘটিকা হয়ে যুগ যুগ ধরে হিন্দু ও মুসলমানের মাঝখানটিতে কীরকম এক অস্পৃশ্য ঘেরাটোপে জীবন কাটাচ্ছে। আবার যদি কোন অভিশাপের কবলে পড়ে। কিন্তু এই মেয়েটির ভেতর জান আছে। রজনী জানে পটুয়ার ছবিতে জান না থাকলে সে পটের কোনো মূল্য নেই। পট খুললেই ছবি নিজে নিজে দর্শককে টেনে নেবে, তবেই না নাম, কাম। রজনীর অভিজ্ঞ চোখ দেখল এই ছবিতে যেন বড় মানুষের মতো তুলির টান, কল্পনার পাখা মেলে দেবার আকৃতি।"**[১] রজনীর এই ভাবনা যেন সমস্ত চিরন্তন শিল্পীর ভাবনা, যা আজও বহমান।

নাড়াজোলের জমিদার নরেন্দ্রলাল খান বিলাসিতায় মত্ত থাকার পাত্র ছিলেন না। তিনি প্রজাদের সাথে ও ব্রিটিশদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে চান। কারণ তিনি জানতেন, প্রজার বলই রাজার বল। তবে কোনো কোনো জমিদার তাঁদেরকে সমিহ করতেন না। মহিষাদলের জমিদার জ্যোতিপ্রসাদ বলেই ফেলেন **"চামচিকের পাখি হবার সখ। যাবে যাবে, দেবতার কোপে পড়লে বুঝতে পারবে তাঁতি এঁড়ে গরু কিনে ফ্যাসাদ ডেকে এনেছে।"**[২] একথা শুনে নরেন্দ্রলাল সিদ্ধান্ত নেন এমন কিছু করবেন যাতে সমাজের মানুষের ও তাঁদের খ্যাতি আকাশছোঁয়া হয়। নরেন্দ্রলালের জীবনের এক নতুন মোড় ঘোরে বন্ধু বীরেনের বোন চম্পাকলিকে নিয়ে। চম্পা নিজেও একজন ভালো পটশিল্পী। বিশেষ করে চম্পাকলি চরিত্রটি লেখকের এক শৈল্পিক আবিষ্কার, যাঁর প্রেম, অভিমান ও প্রতিহিংসার মধ্য দিয়ে নারী হৃদয়ের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বুনন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সে রাজাবাবুকে পটের গান শোনাত। নিজের জীবনের সবটুকু নরেন্দ্রলাল রায়ের জন্য উৎসর্গ করে দেয়

চম্পা। পটের চিত্রে সীতার চরিত্রে নিজেকে মিলিয়ে আঁকে সে। কিন্তু রাজাবাবুর মন শেষ পর্যন্ত জামিলার পটের ফ্রেমে আটকে যায়, যেখান থেকেই চম্পা ও নরেন্দ্রলালের সম্পর্কের ইতি ঘটে।

চম্পার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর রাজাবাবু জামিলাদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পটের পালাগান দেখেন ও মোহিত হন। তিনি তাদের নিজের জমিদারিতে স্থাবাসস্থান দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। রাজার চলে যাওয়ার পর থেকে জমিলার মনে নতুন রঙের ছোঁয়া লাগে, সে ছবির মধ্যে বেহুলার পটে নিজের কামনীয় দেহকে মিলিয়ে আঁকতে থাকে। যা তাঁদের পটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই ছবি দেখে সুরেশ তাঁকে কলকাতায় গিয়ে ছবি বিক্রির পরামর্শ দিলে জামেলা রাগে ফুঁসে উঠে বলে "**মুঞি জামুনি। বিকবো? এই পট মোদের পরাণ। মোদের খেতি দেয়। একবার বিকলে কতো ট্যাকা, অ্যাঁ। আর বিশ্বকর্মার হাতের জিনিস লিয়ে দোকানদারি কইরলে দেবতা খিপে যাব্যে লমনে লাই একবার কী গোল বাঁধল, দেবতা খিপে আমাদের নবশাখ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। এখন আমরা না ঘরকা, না ঘাটকা। না মুসলিম, না হিন্দু। আমরা শুধুই চিত্রকর।**"[৩]

পরবর্তীতে চম্পা মানসিক ও শারীরিক দু'ভাবেই ভেঙে পড়ে। রাজার স্মৃতি মন থেকে দূর করতে বীরেন সিদ্ধান্ত নেয় কৈলাস চিত্রকরের সাথে চম্পার বিবাহ দেওয়ার। বিবাহের পর কৈলাসের বাড়িতে চম্পার পটের আসর বসলে সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়। সুরেশ বা কৈলাসের মতো চরিত্রগুলি এখানে পটুয়াদের পেশাগত ও মানসিক সংকটের আখ্যান নির্মাণে লেখকের মননজাত সৃজন হিসেবে কাজ করেছে। এদিকে নরেন্দ্রলাল ব্রিটিশদের দমনে বিপ্লবী কাজকর্ম ও আগ্নেয়াস্ত্রের যোগাড় করতে থাকেন। এই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এক উত্তপ্ত আঁচ উপন্যাসে ধরা দেয়। জমিদারবাবু জাতীয়তাবাদী গান লেখায় নিযুক্ত হন। পাশাপাশি তাঁর ভাবনায় লেখক বলেছেন "**কলকাতয় রবীন্দ্রনাথ নামে এক জমিদার বাংলা-ভাগের বিরুদ্ধে গান লিখে খুব নাম করেছেন। সভ-সমিতিতে নাকি সেই গান গাওয়া হচ্ছে। নরেন্দ্রলালের ইচ্ছে, তাঁর গানও যেন সভায় গাওয়া হয়। কলকাতা না গাইতে পারে, কিন্তু মেদিনীপুরের সভা সমিতিতে তো সেটা সম্ভব!**"[৪]

জমিদার নরেন্দ্রলাল তাঁর প্রাসাদে বীরেন ও কৈলাসকে অস্ত্র চালনা শেখাতে চান। তাই তিনি সেখানে একটি গানের আসর বসান যেখানে চম্পা ও কৈলাসনাথ পটগান করবে। কিন্তু চম্পাকে রাজি করানো সম্ভব না হওয়ায় বীরেন লক্ষ্মীমণিকে নিয়ে অনুষ্ঠানে যায়। রাজাবাবু সেখানে কৈলাসকে একশ টাকা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি একটি নতুন দায়িত্ব দিয়ে চম্পার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন। চম্পাকে টেক্কা দিতে তিনি কৈলাসকে বলেন "**দেখো, দেব-দেবীদের ছবি আর গানে তুমি চম্পার সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু নিজের গুণকে তুমি তো আর নষ্ট করতে পারো না। আমি বলি কি, তুমি নতুন ছবি আঁকো। যে ছবি**

**নাড়াজোলে আর কারোর কাছে নেই, কেউ আঁকার চেষ্টাও করেনি।"**[৫]। যার ফলে কৈলাসের মনে আনন্দের দোলা লাগে এবং চম্পাও তাঁর পরিবর্তন টের পায়। নরেন্দ্রলাল এই সুযোগে পটুয়াদের দিয়ে ইংরেজদের অনাচারের কাহিনি ও চুয়াড় বিদ্রোহের গল্প প্রচার করার চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চান কীভাবে সাহেবরা অন্যায়ভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল বিপ্লবীদের। একারণেই বলা যায় **"বস্তুত পটচিত্র এবং পটুয়াদের ভূমিকা অনেকটা চারণকবিদের মতো যারা তাঁদের চিত্র, সঙ্গীত, রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে পটচিত্রকে একটি সর্বাঙ্গীণ লোকশিল্পের স্তরে উন্নীত করেছেন। কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শিল্পকর্মই নয়, পটচিত্রের ব্যাপ্তি সামাজিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেও। পটচিত্র এমন এক আদর্শের কথা শোনায় যা কেবলমাত্র কৃষক বা শ্রমিকের নয়, সমস্ত সম্প্রদায়ের।"**[৬]

নরেন্দ্রলালের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চম্পা এখন দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, অন্যদিকে স্বামী কৈলাসকে নিজের করে ফিরিয়ে আনা। সে ঠিক করে রামনবমীর পট প্রতিযোগিতায় সে যাবে এবং জামিলাকে পরাজিত করবে। পাশাপাশি সে রাজার জন্য আঁকা সমস্ত পট ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এদিকে রাজাবাবু কৈলাসকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ করে তোলেন। রাজা নরেন্দ্রলালের সান্নিধ্যে উঠে আসে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, সত্যেনবাবুর মতো বিপ্লবীদের কথা। রথের মেলায় পট প্রতিযোগিতার দিন ঘনিয়ে এলে চম্পা প্রথমে রাজি না হলেও পরে নিজের শিল্পীসত্তার প্রতিশোধ নিতে অংশগ্রহণ করে। বিচারকরা জামিলার কৃষ্ণলীলার পট দেখে অভিভূত হন। পুরস্কার ঘোষণার সময় জামিলাকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে নাড়াজোলে জমিদানের কথা বললে চম্পা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং পটুয়াদের খেপিয়ে তোলে। সে বলে **"এটা করতে লারবে। মুদের মেরে ফেলার চক্কান্ত কইরছে রাজা। মোরা আর মাঙন মাইঙতে পারবনি। মোদের পট দেখবে না কেউ। সব ওই ডাকাতে মাগির খপ্পরে পইড়বে।"**[৭] পরিস্থিতি সামাল দিতে তমলুকের জমিদার জানান জামিলাকে তাঁর জমিদারিতে নতুন পটুয়া পাড়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে।

এরপর চম্পা ইংরেজ সাহেবের সাথে হাত মিলিয়ে নরেন্দ্রলাল রায়ের গোপন তথ্য জানাতে থাকে এবং পটুয়াদের ক্ষ্যাপানোর জন্য অপপ্রচার চালায়। চম্পা রস সাহেবের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু স্ত্রীর এই অনাচারের খবর পেয়ে কৈলাস রস সাহেবকে হত্যা করে লাশ গুম করে দেয়। রাজা নরেন্দ্রলাল পটুয়াদের জন্য নতুন গ্রাম উদ্বোধন করেন, যার নাম দেন 'পটুয়ার চর'। চম্পা এরপর কলকাতায় খবর পাঠিয়ে রাজার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। ক্ষুদিরাম অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয়। চম্পার ক্ষোভ ছিল **"একবার নাড়াজোলের রাজাকে জেলের ভাত খাওয়াতে পারলে, তারপর ওই মাগিটা যেখানে থাকবে, সেখান থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসবে।"**[৮] নরেন্দ্রলাল পুলিশের হাতে ধরা দিলে প্রজারা

তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেও চম্পার মনে তখন প্রতিহিংসার জয়। কিন্তু এই জয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কৈলাস চম্পার বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে না পেরে তাকে হত্যা করে।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে এক মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে। সায়ন্তন জানতে পারে জামিলা আজ উন্মাদ এবং রজনী চিত্রকর অপমানে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর জবানিতে ফুটে ওঠে পটুয়া জীবনের চরম ট্র্যাজেডি **"বাবু বিশ্বকর্মার শাপ কীভাবে খণ্ডাব কন! আমাদের চিত্রকরদের যে নিজের জাতের ভেতর বিয়ে-শাদির কথা। তা আমার বাপ আমারে বে দেল তাঁতির ঘরে। সাপ হবে না! দিদি জামেলা। তা দিদির ঘর আর কোথায়! ওই তো চাষির ছেলে সুরেশ চাঁপড়ি। তার সঙ্গে বে দেলো জামেলাদি-র এই নতুন পট গাঁয়েই। আর কী কব, বিয়ের মাস তিনেক পরেই রাজা নরেন্দ্রলালের জেলে যাবার কথা শুনে দিদি জামেলা পাগল হয়ে গেল। জামেলাদিদির বর সুরেশ তারপর সেই যে কলকাতায় গেল আর ফিরল না। রজনী চিত্রকরের পরিবারের সেরা পোটো, পট-গাঁয়ের সেরা সুন্দরী ছেঁড়া কাপড়ে রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবা রজনী চিত্রকরের সহ্য হয়। হয়নি তা। গলায় দড়ি দিলো নিজের বাড়িতে, ঠেকুয়াচকে ফিরে। বাবা মরে যাওয়ার পর মা-ও বাঁচেনি। শুধু আমি এত পাপ বয়ে কীভাবে যে আজও বেঁচে আছি! বিশ্বকর্মা সবাইকে শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু এই আমি- আজও!"**[৯] লেখক এখানে সফলভাবে দেখিয়েছেন যে, পটুয়ারা কোনো বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকেও এক অস্পৃশ্য বলয়ে থেকে জীবন কাটান। আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এই পটশিল্প আজ আধুনিকতার চাপে মৃতপ্রায়। উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সৃজনশীল আখ্যান ও আবেগের এই অসামান্য মেলবন্ধন ইতিহাসকে শুষ্ক তথ্য থেকে বের করে এনে এক জীবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ করেছে।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র ও পটুয়াদের সামাজিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. সুমনা দত্তের পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। তিনি পটুয়াদের কেবল চিত্রশিল্পী হিসেবে নয়, বরং ইতিহাসের বার্তাবাহক ও লোকশিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায়:

**"গানের সুরে পুরান প্রশ্নতি**
**ইতিহাসের বানী:**
**দেশের নরনারীর ঘরে**
**এরাই দিত আনি।"**[১০]

এই কাব্যিক উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকাল থেকেই পটুয়ারা তাঁদের পটের আধারে পৌরাণিক আখ্যানের পাশাপাশি সমকালীন ইতিহাসের সত্যকেও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাপস রায়ের উপন্যাসেও আমরা দেখি, পটুয়ারা কেবল

পৌরাণিক পটে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের চারণকবি হিসেবে ইতিহাসের এক অমোঘ বাণী প্রচার করেছেন। ড. দত্তের এই অভিমতটি পটুয়াদের সেই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতাকেই সমর্থন করে

প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে পটচিত্র। নানা সময়ে তা ব্যবহার হয়েছে শৈল্পিক স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ, শিক্ষার উপকরণ কিংবা ধর্মীয় আচরণবিধির অঙ্গ হিসেবে। প্রাচীনকাল থেকে শিল্পের এই বিশেষ ধারা বাংলা ও বাঙালির চিরাচরিত ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজেও পটচিত্র একইভাবে প্রাসঙ্গিক। আসলে পটচিত্র কখনোই গতানুগতিক নয় বরং অত্যন্ত চলমান। কারণ সময়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে নিত্য প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করে সমসাময়িক সমাজকে প্রতিবিম্বিত করে। একইভাবে নিভৃত পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতা শহরের কালীঘাটের পটে প্রতিবিম্বিত হয় সমকালীন সমাজদর্শন।

বিবর্তনের ধারায় এইভাবে প্রাথমিক স্তর থেকে লোক বা লৌকিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে লোকশিল্প। পটগান আমাদের দেশের প্রায় হারিয়ে যাওয়া একটা লোকসংস্কৃতি। বাংলার বহু প্রাচীন শিল্পের মতোই সমসাময়িক কালে পটশিল্প তার প্রাচীন গৌরবের অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৬০ সালের পরবর্তী সময়ে এই পটগান ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। লোকশিল্পের এই প্রাচীন ধারাটি আজ মৃতপ্রায়। কালীঘাটের পটশিল্পের ধারা কবেই বিলুপ্ত হয়েছে। ধুঁকতে ধুঁকতে কোনোমতে টিকে আছে দীর্ঘপটের ধারাটি। পটশিল্পের অনেক ঘরানাই আজ বিলুপ্ত। মুর্শিদাবাদ জেলার গণকর ঘরানা বিলুপ্ত। কোনোমতে টিকে আছে কান্দি-খড়গ্রাম ঘরানা। পটচিত্র অঙ্কন করা সময়সাপেক্ষ কাজ, তাছাড়া বর্তমান গতিময় জীবনে ধৈর্য্য ধরে পটগান শুনবার মতো অবকাশের বড্ড অভাব মানুষের জীবনে। ছাপাছবি আজ সর্বত্র সুলভ। লোকশিল্পের পৃষ্ঠপোষক সাধারণ মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়েছে অন্য আকর্ষণ। লোকরঞ্জনের জন্য তো নয়ই, লোকশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও পটুয়ারা আর অপরিহার্য নয়। অভাবে পটুয়ারা আজ বাপ-ঠাকুরদার পেশা ছেড়ে বেছে নিচ্ছে অন্য বৃত্তি। যারা তা পারছে না তারা পরম্পরাগত এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরেই জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা যায়, তাপস রায়ের এই সৃষ্টিলগ্নে ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। মেদিনীপুরের বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের উত্তাল ইতিহাসের সাথে বাংলার মৃতপ্রায় লোকশিল্প পটচিত্রের যে সমন্বয় লেখক করেছেন, তা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরল। পটুয়াদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংকটের আড়ালে লেখক আসলে এক শাশ্বত শিল্প-সংগ্রামের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, যা জাতি ও ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবতার জয়গান গায়। রাজা নরেন্দ্রলাল খানের দেশপ্রেম এবং চিত্রকরদের শিল্পের প্রতি অদম্য

আনুগত্য প্রমাণ করে যে, সংস্কৃতি ও শিকড়ের টানই হলো জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ভিত্তি। ব্যক্তিগত প্রেম, প্রতিহিংসা ও বীরত্বের আখ্যান ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে ইতিহাসের এক অমোঘ সত্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে পটের বিবর্তন এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চিত্রকরদের অবদান এই উপন্যাসটিকে একটি নিছক আখ্যান থেকে ঐতিহাসিক দলিলে উন্নীত করেছে। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চিত্রকরদের ‘চারণকবি’ হিসেবে চিত্রায়ন উপন্যাসটিকে একটি সার্থক সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিলে উন্নীত করেছে। বিবর্তনের ধারায় বিলুপ্ত হতে থাকা এই প্রাচীন শিল্পধারাকে লেখক তাঁর লেখনীর জাদুতে নতুন এক বৌদ্ধিক প্রাণদান করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, ‘শুধু পটে লেখা’ উপন্যাসটি কেবল এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট অতীত নয়, বরং এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় রক্ষার এক বলিষ্ঠ আর্তি হিসেবেই সার্থকতা লাভ করেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১) রায়, তাপস, ‘শুধু পটে লেখা’, মিসিসিপির মেঘ পাবলিশার্স, ২০২২২, পৃষ্ঠা ২১
২) তদেব, পৃষ্ঠা ২৩
৩) তদেব, পৃষ্ঠা ৪২
৪) তদেব, পৃষ্ঠা ৫৬
৫) তদেব, পৃষ্ঠা ৬৪
৬) দে, পূর্বালী, উশ্রী মুখোপাধ্যায় এবং মৌপিয়া রায়, ‘BKGC SCHOLARছ’, ‘প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পটচিত্র’, anuary June 2021– Vol. 2– Issue 1. PP. ৮৬
৭) রায়, তাপস, ‘শুধু পটে লেখা’, মিসিসিপির মেঘ পাবলিশার্স, ২০২২২, পৃষ্ঠা ১২০
৮) তদেব, পৃষ্ঠা ১৭০
৯) তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৪
১০) চট্টোপাধ্যায়, ড. সুমনা দত্ত, ‘ভারত বিচিত্র’ পত্রিকা, ‘বাংলার পটচিত্রের প্রাচীন কথা’, ৭-সংখ্যা, ৪২- বর্ষ, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ-৫

সুমনা পাত্র

## মধ্যবিত্তের লড়াই ও ক্লান্তি : মতি নন্দীর কলমে যাপনের আখ্যান

বাংলা সাহিত্যে মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০) এক স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী নাম। তাঁর সাহিত্য মূলত কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন, লড়াই এবং অবশ্যই ক্রীড়া জগতের এক অনন্য দলিল। তাঁর গদ্যে হতাশাক্লিষ্ট বঞ্চিত সাধারণ জীবনযাপনের কৃত্তিমতা স্বচ্ছ আয়নার মতো পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে। তাঁর গল্প উপন্যাসে অতিরঞ্জন বা রোমান্টিকতা খুব কম, বরং দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সত্য তিনি নির্মোহভাবে তুলে ধরেছেন। মতি নন্দীর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সাদা বা কালো নয়, বরং ধূসর। মানুষের লোভ, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং শেষপর্যন্ত টিকে থাকার লড়াইকে তিনি কোনরকম মেকি সহমর্মিতা ছাড়াই তুলে ধরেছেন, বলা ভালো শহুরে মানুষের ভাঙন ও একাকীত্ব মতি নন্দীর রচনার অন্যতম বিষয়। তাঁর "দ্বাদশব্যক্তি" প্রবন্ধে মতি নন্দী তারক সিংহ নামক এক আইএ পাস নগণ্য কেরানির চরিত্র সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমি তারক সিংহ নই। কিন্তু ওর ভাবনা চিন্তায় আমি আছি। ওকে বানিয়েছি সম্পূর্ণতই কল্পনা দ্বারা। আশেপাশে দেখা বা মেশা মানুষদের আদল থেকে ও তৈরি হয়েছে। অভিজ্ঞতার পাল্লার মধ্যে ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছি। আমার সব লেখার চরিত্রকেই তাই করি।... আমার কাছ থেকে ও আর যেটুকু পেয়েছে তা হল, আমার প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং উত্তর কলকাতার যে পাড়ায় বংশানুক্রমে প্রায় একশো বছর আছি সেই পরিবেশ।"[১]

এই মধ্যবিত্ত কেরানি গোত্রীয় বাঙালিরাই মতি নন্দীর বেশিরভাগ রচনায় ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে। 'ভিড়' অর্থাৎ এমন একটা পরিসর যেখানে মানুষ আর 'ইন্ডিভিজুয়াল' নয়, যেখানে তার ঘাড়ে দায়িত্ব- কর্তব্য- সংযম- মানবিকতার দায় নেই, যেখানে লোকে কী ভাববে কী বলবে ইত্যাদি ব্যক্তি ভাবনার ভার বহনের দায় নেই, সর্বোপরি যেখানে ইনহিবিশন কিংবা অবদমনের বাড়তি কোনও চাপ নেই।

ক্রীড়া সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে মতি নন্দীর হাতে। বাংলা সাহিত্যে ক্রীড়া সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁর। ক্রীড়াবিষয়ক উপন্যাসে জনতার ভিড় তার বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ, চেহারা, গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান সব নিয়ে হাজির। তবে ক্রীড়াভিত্তিক উপন্যাসগুলি কেবল খেলার বর্ণনা নয়, বরং জীবনের লড়াইয়ের দলিল। 'স্ট্রাইকার', 'কোনি', 'স্টপার' ইত্যাদি বহুল পঠিত উপন্যাসের কোনোটাই এর ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে মতি নন্দী নিজেই জানিয়েছেন, "খেলা আর মাঠ আমার কাছে জ্ঞান হওয়া থেকেই একটা ব্যাপার। এটাই অবশেষে আমার জীবিকা হয়েছে। খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় মানুষের দেহের গুরুত্ব, দেহ সঞ্চরণের সৌন্দর্য, পরিশ্রম দ্বারা অধিত গুণাবলীর প্রকাশ যা কখনো কখনো শিল্প আস্বাদনের স্তরে উত্তীর্ণ হয় এবং সমাজের

নিচুতলার মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের চেহারাটি কেমন, তা আমাকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়।.... 'স্ট্রাইকার' বা 'কোনি' এই যোগাযোগেরই একটা দিক। এই দিকে রয়েছে হতাশা, আত্মঅবমাননা, নেতিমূলক ভবিষ্যৎ। এখানে আঁকড়ে ধরার জন্য একমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে স্বপ্ন। তার মারফত কাঙ্ক্ষিত জগতে বিচরণ।"[২]

'স্টপার'-এর ভিড় যেন ধ্রুপদী বা গ্রিক নাটকের নিয়তির ভূমিকা নিয়েছে। জনতার ভিড়কে প্রেক্ষাপটে রেখেই এখানে রচিত হয়েছে খেলোয়াড়ের জীবনের পথ। এই মধ্যবিত্ত জনতার হাতে মানুষ যেন অনেকক্ষেত্রেই পেছনে দড়ি বাধা পুতুল। তার প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উপস্থিতিই হয়ে উঠেছে কাহিনির ভাইটাল ফোর্স, আধার না থাকলে যেমন আধেয়র কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে না তেমনই মাঠে বা মাঠের বাইরে, ঘরে-বাইরে, ঘুমে-জাগরণে এই জনতাই হয়ে উঠেছে চরিত্রদের ক্ষেত্রে একইসঙ্গে সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস-সাফল্য-ব্যর্থতা। এই মধ্যবিত্ত জনতাই 'স্ট্রাইকার' প্রসূন ভট্টাচার্যকে গালাগাল দিয়ে উচ্ছন্ন করেছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা দিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে মাটিতে। আবার এই একই জনতা জয়ের দিনে তাকে মাথায় তুলে নেচেছে, মাথায় পরিয়ে দিয়েছে নায়কের রাজমুকুট। যে জনতা একদিন প্রসূনের বাবা অনিল ভট্টাচার্যকে ঘুষ খেয়ে দলকে হারানোর অপবাদ দিয়ে কেরিয়ার শেষের কারণ হয়েছিল, পুত্রের ফাইনালে গোলের সঙ্গে সঙ্গে সেই জনতাই কারণ হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের সার্থকতম প্রাপ্তির। সব কেড়ে নিয়ে গ্রিক-মিথিক্যাল নেমেসিস এর মতো যে একদিন এসেছিল কালো রাত্রি হয়ে, আরও একদিনে সেই মধ্যবিত্ত জনতাই ঘুচিয়ে দিয়েছে দুরাশার কালো মেঘ, অবসান ঘটিয়েছে সব অন্যায় লজ্জা অপমান যন্ত্রণাময় দিনরাতের। 'কোনি' উপন্যাস মতি নন্দীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং কোচ ক্ষিতীশ সিংহের অদম্য জেদ কীভাবে অসাধ্য সাধন করেছে, তা উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। "ফাইট কোনি ফাইট" আজ এক কিংবদন্তী স্লোগান। কোচ-সাঁতারু ও ক্লাবের রাজনীতির আড়ালে থাকা মানুষের আত্মমর্যাদার লড়াই, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ধূসরতাকে তিনি এই উপন্যাসে শৈল্পিকভাবে তুলে ধরেছেন।

ক্রীড়া বিষয়ক উপন্যাসে মধ্যবিত্ত ভিড়ের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত সরল কিন্তু মতি নন্দীর কিছু গল্পে ভিড়, একদল মানুষের সম্মিলিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যেসব ছবি আমরা পাই তা অবশ্যই অনেক বেশি জটিল, বহুস্তরীয়, সমাজ মনস্তত্ত্ব জানা-বোঝার মোক্ষম সব উপাদান। 'রাস্তা', 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু', 'শবাগার', 'দু'ভাগে', 'ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন' ইত্যাদি অসংখ্য গল্পে সমাজজীবনের যে ছবি এঁকেছেন তাতে তুলি-কলম নয়, মর্গের টেবিলে ডোমের হাতের ছুরির মতো রূঢ়, নিষ্কম্প, নির্দয় হাতে মতি নন্দী ব্যবচ্ছেদ করেছেন বাঙালি মধ্যবিত্তের ভাবের ঘরে চুরি করা ছদ্মবেশী জীবন, তার স্ববিরোধ, ভণ্ডামি, আত্মপ্রবঞ্চনা,

গোপন সব অন্ধকার। "ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন" গল্পে লেখক দেখিয়েছেন মধ্যবিত্তের নিজেকে কোনোক্রমে টিকিয়ে রাখার নির্মম লড়াইয়ের কথা। ললিতের বুড়ো বাবার কথাতেই পাঠকের কাছে সেই সত্য উন্মোচিত হয়েছে-

"...জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না, টের পাই না। গলির একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম, স্বাদ পেলুম না। লংকা ঘষে আচার দিয়ে খেলুম, তবুও।...কাল পেচ্ছাপ করে ফেললুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম। বুঝলে, আমার শীত করল না।"[৩]

"দু'ভাগে" গল্পে লেখক দেখিয়েছেন সন্তানের অকালমৃত্যুর পর এক অসহায় পিতার যন্ত্রণার কথা। বিনোদ পুত্রের আত্মহত্যার প্রতিবাদে মানহানির মামলা করতে চায়। খবরের কাগজে খবর হয় পরীক্ষাহলে টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়ে অপমানিত হয়ে খোকা আত্মহত্যা করেছে। যে ছেলেকে ঘিরে বহু প্রত্যাশা বহু স্বপ্ন ছিল বিনোদের, এক ঝটকায় সব স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়েছে। ছেলের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বিনোদ দেখেছে তার চোখে মৃত্যুর অহংকার। যদিও উকিল ঘুনুর কথা তার ভালো লাগেনি। ঘুনু বলেছে, "...সে তো তেজ দেখিয়ে, তার নিজের অহংকার রক্ষা করল। কিন্তু এখন তুই? লোকে তো বলবে এর ছেলে পরীক্ষায় টুকেছিল।"[৪]

পুত্রস্নেহে অন্ধ বিনোদ নির্দ্বিধায় বলেছে, "আমার ছেলে আত্মহত্যা করেছে সেজন্য আমি গর্বিত।"[৫]

নিজের মধ্যবিত্ত মিথ্যা মর্যাদাবোধ, ইগোকে বড় করতে সন্তানের মৃত্যুতেও সে মাথা নত করেনি।

তবে অদৃশ্য, অলক্ষ, সব কিছুর আড়ালে ওত পেতে থাকা নিয়তিকে ভিড়ের মধ্যে দেখার যে অনন্য ভঙ্গি মতি নন্দী তাঁর নানা গল্পে দেখিয়েছেন তার একটি বিখ্যাত উদাহরণ "জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ" গল্পটি। এই গল্পে মধ্যবিত্তের ভয়াবহ অমানবিক, ইতর, অপরাধপ্রবণ আচরণ প্রত্যাশিত হলেও তাই যেন দৈনন্দিনের আপাত সুন্দর মুখের নিখুঁত ত্বকের তলায় কঙ্কালের কুৎসিত ভ্রূকুটির মতোই। গল্পে দেখি কলের জলের অপ্রতুলতার কারণে কীভাবে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। বস্তিতে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে চূড়ান্ত হেনস্তার শিকার হয়েছে পূর্ণিমা। তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে, আত্মমর্যাদার অবমাননায় তার জ্ঞানশূন্য অবস্থা পাঠককে বিচলিত করেছে। গল্পে দেখি—"...পূর্ণিমা পাথরের মতো বিছানায় বসে রইল। ঘরের বাইরের পৃথিবীটা প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তার নিজের জগৎ চুরমার হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ...পূর্ণিমার মনে হল তার অভ্যস্ত এই দৃশ্য থেকে সে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। এখন যেন সে ছেঁড়া ব্লাউজের উপর শার্ট আর শায়া পরে সারা মুখে মাটিলেপা অবস্থায় অনুভবহীন শূন্যতার মধ্যে। এইভাবেই কি তাকে দিনযাপন করতে হবে?"[৬]

আক্রোশ বা রাগকে ফুটে উঠতে দেখি মতি নন্দীর আরও অনেক গল্প উপন্যাসে। ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ট্রেনে যাদের নিত্য যাতায়াত করতে হয় না তাদের উপর রাগ, অপেক্ষাকৃত ভদ্রস্থ চেহারার লোকেদের প্রতি সমাজের কোনঠাসা কুৎসিত অকুলীন লোকেদের রাগের চিত্র তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক হচ্ছে মধ্যবিত্ত জনতার অন্যতর উপস্থিতি। ভিড় কী বলবে, কী হবে জনতার রায়- এই ভয় মধ্যবিত্ত জনতাকে কীভাবে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কেড়ে নেয় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়াকে তার উদাহরণ লেখকের রচনায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এরকম বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় গল্পে দৃশ্যত উপস্থিত না থেকেও জনতা নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে ব্যক্তি মানুষের। মতি নন্দীর ভাষা সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং অলংকার বর্জিত। ছোট ছোট বাক্যে গভীর অর্থ প্রকাশ, কোনরকম সামাজিক ভণিতা ছাড়াই তিনি মধ্যবিত্তের মানসিক সংকটকে উন্মোচিত করেছেন। তাঁর লেখায় জীবন ফুরোয়, খেলোয়াড়ের অবসর হয়, কিন্তু মধ্যবিত্ত দর্শকের ছুটি হয় না। তাদের জীবন যেন স্কোয়াশ খেলার সেই স্থির দেওয়ালটির মতো, যাতে ঘা খেয়ে ফিরে আসে লম্ফমান বল, যাকে আবারও ব্যাটের ঘায়ে দেওয়ালে আছাড় খাইয়ে ফিরিয়ে এনে চলতে থাকে খেলা, থুড়ি মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনযাপন। আর তাই মধ্যবিত্ত জনতার ভিড় আর ভাঙ্গে না, ভাঙতেই চায় না।

**তথ্যসূত্র :**

১. নন্দী মতি, 'দ্বাদশব্যক্তি' ভূমিকা অংশ, মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯, পৃ. vii
২. প্রাগুক্ত, পৃ. x-xi
৩. নন্দী মতি, 'ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন', মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯, পৃ. ৩৮১
৪. নন্দী মতি, 'দু'ভাগে', মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-০৬,প্রথম প্রকাশ ১৪১৯, পৃ.২৫২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
৬. নন্দী মতি, 'জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ', মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯, পৃ. ৪০৭

রেহানা খাতুন

## আফসার আমেদের 'জীবন জুড়ে প্রহর' উপন্যাসে মোবাইল আগ্রাসন ও দাম্পত্য সংকট

বর্তমান ডিজিটাল দুনিয়ায় মোবাইল ছাড়া যেন জীবন অচল। মোবাইল ছিনিয়ে নিচ্ছে মুখোমুখি আলাপ ও আড্ডার অবসর। কমছে মানুষে মানুষে আন্তরিকতার সম্পর্ক। মোবাইল মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরেও প্রভাব ফেলছে। মোবাইলকেন্দ্রিক হওয়ায় পরিবার, পরিজনদের মধ্যেও সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। মোবাইলের আসক্তির কারণে দাম্পত্য জীবন সমস্যা সংকুল, সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে। আর আমরা দোষারোপ করি আধুনিকতাকে। আধুনিকতার কি প্রয়োজন নেই আমাদের জীবনে? উত্তর একটাই- অবশ্যই আছে। আমরা যেখানে মোবাইলের নিয়ন্ত্রক সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধা কোথায়? সবকিছুর মূলে আছে মোহ বা আসক্তি। মোবাইলের নেতিবাচক দিককে বাদ দিয়ে ইতিবাচক ভূমিকাকে গ্রহণ করলেই জীবন সুন্দর। বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ (১৯৫৭-২০১৮) আধুনিক বিশ্বসময়ের এই যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন। সময়ের চাহিদা ও অভিঘাতকে নিয়ে লিখে ফেললেন 'জীবন জুড়ে প্রহর' (২০০৯) উপন্যাস।

বর্তমান সময়ের একটি জ্বলন্ত সমস্যা হলো দ্বন্দ্বমুখর জীবনে শান্তি খোঁজার তাগিদে মানুষ এমন কিছু করছে যা অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত। সমাজের অংশ হয়ে সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করতেও মানুষ পিছপা হয়না। আর এইক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে মোবাইল ফোন। 'জীবন জুড়ে প্রহর' উপন্যাসে এই আধুনিক চলমাধ্যমের ক্ষতিকর দিকই উঠে এসেছে। গোটা উপন্যাসে আনিস ও শাকিল এই দুই প্রধান চরিত্রের দ্বান্দ্বিক জীবন রূপায়িত। দুই পুরুষকেই কেন্দ্র করে দুই নারী আবর্তিত হয়েছে। শাকিল ও মনোয়ারার দাম্পত্য জীবনে উঁকি দিয়েছে কুলসুম। আর আনিস ও রিজিয়ার সাংসারিক জীবনকে জটিল করে তুলেছে নিবেদিতা। দুটি ধারায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

**প্রথম ধারা ঃ** গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় শাকিল, মনোয়ারা ও কুলসুমের ত্রিকোণ প্রেম।

**দ্বিতীয় ধারা ঃ** নাগরিক জীবনের পটভূমিতে আনিস, রিজিয়া ও নিবেদিতার জটিল প্রেম মনস্তত্ত্ব।

**প্রথম ধারা :**

সারেঙ্গার শাকিল সাঁকরাইলে বি. এল. আর. ও অফিসে খাতাপত্তর সামলানোর মতো পাতি কাজ করে। ঔপন্যাসিক সুচারুভাবে এই দপ্তরের কাজের বর্ণনা করেছেন। এই দপ্তরের কাজের সঙ্গে ঘুষ নেওয়ার মতো জঘন্য বিষয় যে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত তাও ঔপন্যাসিক

দেখিয়েছেন। "পাবলিক সময় ব্যয় ও সমস্যা দূর করতে টাকা দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপার, গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মানুষ টাকা দিতে রাজিও। অফিসের অনেকেই প্রতিদিন কত টাকা খিঁচে নিচ্ছে, শাকিলই পায়না। তা নিয়ে তার মনোকষ্ট।" শাকিলের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটে। অফিসে ঘুষ নিতে না পারার যন্ত্রণায় রাতারাতি বড়লোক হওয়ার নেশায় প্রতিদিন লটারির টিকিট কাটে। এর ফলে সংসারে টান পড়ে। মাসের শেষে ধার করে সংসার চালাতে হয়। প্রাত্যহিক জীবনের এই অভাবের তাড়না স্ত্রী মনোয়ারাকে নিষ্প্রাণ করে তোলে। স্বামী বাড়ি ফিরলে একপ্রকার উদাসীনতা দেখায় মনোয়ারা। রাতে খাওয়ার পরে নিজের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। শাকিলের মধ্যে আদিমসত্তা জাগলেও ঘুমন্ত বউকে জাগানোর সাহস তার হয়না। বেদনাতুর রাত কাটে তার। শাকিল দিশেহারা হয়ে যায়। কোথাও যেন নিজের অস্তিত্ব সংকটে ভোগে। সে সংকল্প করে লটারির টিকিট না কাটার। কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারেনা। "আরও টাকা তার চাই, আরও ভালো করে বাঁচতে চায়। দশ বিশ লাখ টাকা কি তার ভাগ্যে উঠবে না? উঠতেই পারে। ভেতরে ভেতরে বাসনায় ফুটতে থাকে শাকিল।"

স্বামী-স্ত্রীর এই দাম্পত্য সম্পর্কের শৈথিল্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে রাহাত ও কুলসুম। রাহাত মনোয়ারার পাড়া সম্পর্কে দেবর হয়। রাহাতের বৌদি কিসমতের সঙ্গে মনোয়ারার সখ্যতা। এই সখ্যতার সূত্র ধরেই মনোয়ারা ও রাহাত কাছাকাছি আসে। অবিবাহিত রাহাত শিলিগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ছুটিতে বাড়ি ফেরে। ছুটি শেষে শিলিগুড়ি ফেরার সময় মনোয়ারাকে একটি চিরকুট দেয়। চিরকুটে লেখা- 'এই হল আমার মোবাইল নম্বর।মন খারাপ করলে ফোন করবে।' কিন্তু মনোয়ারার কাছে বা তার পরিবারে কোনো ফোন নেই। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল মনোয়ারা। সুযোগও এলো। মুম্বাই চলে যাওয়ার জন্য মোতালেব নামের একটি ছেলে তার মোবাইল বিক্রি করতে চায়। শাকিলের কাছে আসে। আর মনোয়ারাও তার স্বামীকে প্রলোভন দেখিয়ে বলে- "তুমি মোবাইলটা নাও, তোমাকে খুশি করব। আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো।" এই প্রস্তাব শাকিলের কাছে মেঘ না চাইতে বৃষ্টির মতো হল। শাকিল মোবাইলটা কিনলো। শাকিল ভাবলো মনোয়ারা তাকে নিজের মতো করেই চায়। 'তোমার হাতে মোবাইলটা খুব মানাবে' — মনোয়ারার এই কথায় শাকিল তৃপ্ত হয়। মনোয়ারা এই ফোন নিয়ে রাহাতের সঙ্গে কথা বলে। স্বামীর সন্দেহ হলেও তা ক্ষণেকের মধ্যে দূর হয়। অন্যদিকে শাকিলও তার বন্ধু আরিফের বোন কুলসুমের রূপে আকৃষ্ট হয়। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অজুহাতে বন্ধুর বোনকে ফোন নম্বর দিয়ে আসে। শাকিল বাড়িতে থাকাকালীনই কুলসুম ফোন করে। তাদের কথোপকথন শুনে মনোয়ারা আহত হয়। মনোয়ারাকে আহত হতে দেখে শাকিল একপ্রকার খুশিই হয়। "আসলে মনোয়ারার সঙ্গে তার একটা শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক আছে, একথা এইসময় ভালো করে মনে পড়ে যায়

শাকিলের। দাম্পত্যের এই আলোছায়ার অনুভূতি থাকে শাকিলের। কেননা এর ভেতরই তো তার

মনোয়ারা ও শাকিলের সংসার জীবন বিপর্যস্ত হল। মনোয়ারার প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা এবং বেঁচে থাকা।" আত্মতৃপ্তির জন্য মাঝেমাঝেই শাকিল অফিস না গিয়ে আরিফের বাড়িতে যায়। তাদের পারিবারিক সমস্যার মোকাবিলার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কিসমতের বাড়ির ফোন থেকে শাকিলকে ফোন করে মনোয়ারা। শাকিল এই ফোনের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। আরিফদের বাড়িতে বসে মিথ্যা বলে যে সে অফিসে আছে। তারপর শাকিল এক অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। অন্যদিকে মাজু মাস্টারের কাছ থেকে মনোয়ারা আসল তথ্য জানতে পারে। "ভালোবাসাটা যেন মনোয়ারার ইচ্ছাধীন — সম্পর্কের কোনো চাহিদা বোঝে না। তবুও এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে হবে শাকিলকে। এ সম্পর্কের পরিচয় নিয়ে তার থাকা জুটবে। বাঁচা জুটবে কি?" আর বাঁচার জন্যই শাকিল কুলসুমের কাছে গিয়েছে। কিন্তু এই প্রেমের সম্পর্ক যে কারো কাছেই প্রকাশ করা যায় না — মনের অতলে লুকিয়ে ফেলতে হয়। এই বোধও তার আছে। তাই শাকিল দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কুলসুমের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে ফেলে।

এই মনঃকষ্টের কথা, উদ্বেগ উদ্বেলতার কথা বলার জন্য, মনের আরাম পাওয়ার জন্য শাকিল তার মামাতো দাদা আনিসের কাছে যায়। আধুনিকমনস্ক মানসিক রোগী আনিস শাকিলকে এই বলে প্রবোধ দেয় — "আসলে সামাজিকতার বস্তাপচা নৈতিকতার জন্য। সমাজকেও এগিয়ে যেতে হয়, একসময় তো পৃথিবীর সমাজে দাসপ্রথা ছিল। তার থেকে তো বেরিয়ে এসেছি আমরা। আজকের পৃথিবীতে নারী পুরুষই যৌনতার একমাত্র সন্ধি নয়, পুরুষে পুরুষে নারীতে নারীতে যৌনতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আনিসের কাছে এসে মনের ত্রাস কিছুটা কমে শাকিলের। একে অপরের মোবাইল নম্বর আদানপ্রদান করে। দাম্পত্য সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা নয় — ভালো না লাগলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই অভয়বাণী পেয়ে গেল শাকিল। এইভাবে কিছুদিন তাদের প্রেমলীলা চলতে থাকে। একটা সময় পর শাকিল ভেতরে ভেতরে মুষড়ে যেতে থাকে। কুলসুমকে বলে — 'প্লিজ, আমাকে রেহাই দাও।' শাকিল মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় সে আর কুলসুমদের বাড়িতে যাবেনা, কুলসুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। তাহলে মনোয়ারার প্রতি অবিচার করা হবে। 'বিবাহিত সম্পর্ক একটা বিষম জিনিস, যাকে ছিঁড়ে ফেলা সহজ নয়, অস্বীকার করাও কঠিন।' ইতিমধ্যে এক সমস্যা দেখা দেয়। সদু মধুদের সঙ্গে আরিফদের সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল শুরু হয়। সেখানে নিজের পৌরুষ দেখাতে গিয়ে শাকিল খুন করে বসে মধুকে। তারপর তার মনে হল থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর উপায় নেই।

গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় ঔপন্যাসিক এই দাম্পত্য সম্পর্ককে দেখিয়েছেন। শাকিল

ও মনোয়ারার দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়েন ছিল এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সেই টানাপোড়েনে ঘৃতাহুতি দিল মোবাইল ফোন। রাহাতের সঙ্গে মনোয়ারার যে সম্পর্ক তাতে মনোয়ারার একটা আলাদা ভালোলাগা ভালোবাসার অনুভূতি আছে। কিন্তু রাহাতের সঙ্গে তার প্রত্যেকদিন সাক্ষাৎ হয়না। অন্যদিকে কুলসুমের সঙ্গে শাকিলের যে প্রেম সম্পর্ক সেখানে শাকিল অফিস কামাই করে প্রত্যেকদিন কুলসুমের সঙ্গে দেখা করেনা। কিন্তু এই দুই বিপ্রতীপ সম্পর্ককে অঙ্কুর থেকে মহীরুহে পরিণত করেছে মোবাইল ফোন। প্রত্যক্ষ দেখা সাক্ষাৎ না হলেও ফোন তাদের প্রেমকে গাঢ় করে তুলেছে। আর নষ্ট হয়েছে একটা দাম্পত্য সম্পর্ক।

**দ্বিতীয় ধারা :**

উলুবেড়িয়া এস.ডি.ও. অফিসে চাকরি করে শাকিলের মামাতো দাদা আনিস। মেধাবী আনিস নিজের যোগ্যতায় চাকরি পায়। তারপর নাটক করা, নাটকের দল করা এইসব নিয়ে মেতে ওঠে। নাটক লিখেছে সে বেশকিছু। পশ্চিমবঙ্গের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে কোলকাতার নানা প্রতিষ্ঠান থেকে খাতির পায়। মধ্যচল্লিশ বয়সে অনেকগুলি সার্থক প্রযোজনা করেছে। অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্রসদন, গিরিশ, মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ করেছে। সরকারি কমিটির সদস্য। বর্তমানে সে নাটক করেনা। নাটকের দল ভেঙ্গে গিয়েছে। কারণ আনিস মানসিকভাবে অসুস্থ। সোশ্যাল অ্যাঙ্গাজাইটিসে ভোগে। আত্মপরিচয়ের সমস্যাতে ভোগে। আনিস তার সমস্যায় এতখানি নুয়ে আছে যে তার স্ত্রী রিজিয়ার সমস্যা সেখানে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পায়না। রিজিয়া ভাবে নাটক লিখবে, নাটকের দল গড়ে তুলবে, আনিস আবার পূর্বের মতো সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে। তাই রিজিয়া যে স্কুলে চাকরি করে সেই স্কুলের একসময়ের ছাত্রী ত্রিশ-বত্রিশের বিবাহিতা নিবেদিতাকে আনিসের সঙ্গে নাটক করার, নাটকের দল করার কথা বলে। ইতিমধ্যে নিবেদিতা একটি নাটকে অভিনয় করেছে এবং সেটা আনিসের মনে দাগ কেটেছে।

এই নিবেদিতা রিজিয়া ও তার মেয়ে দিয়া স্কুলে চলে যাওয়ার পরে আনিসের কাছে আসে। প্রথম দিকে আনিস বিরক্ত হলেও পরে নিবেদিতার এই রিজিয়ার অবর্তমানে আসাকে উপভোগ করে। কথার জাল বুনে নিবেদিতা আনিসের মনকে হরণ করে নেয়। নিবেদিতা বলে — "আমার তো আমার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। অনেককিছুর অভাব থেকে যায় জীবনে। অভাব নিয়ে ভাবনাটাই বোকামি।" এরপর ফোন নম্বর দেওয়া নেওয়া হয়। রিজিয়া ও আনিসের চোদ্দ বছরের দাম্পত্য জীবনে নিবেদিতার অনুপ্রবেশ ঘটে।

আনিসের সবথেকে কাছের বন্ধু রাকিব। নিবেদিতাকে আনিসের ভালো লাগে- এই বিষয়টা রাকিবকে জানায়। অন্যদিকে রিজিয়ার অনুপস্থিতিতে নিবেদিতার তার বাড়িতে আসা রিজিয়ার কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রিজিয়া এই বিষয়টি নিয়ে আনিসকে

বললে আনিস প্রত্যুত্তরে জানায় — "তুমি তো চেয়েছ আমি নাটক লিখি, নাটক করি। তোমারই তো ছাত্রী ছিল নিবেদিতা, তুমি আমার কাছে আসতে বলেছ।" রিজিয়া যেন নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে। আসলে রিজিয়া চেয়েছিল তার অসুস্থ স্বামী সুস্থ হয়ে উঠুক। আর আনিস এই অসুস্থতাকে হাতিয়ার করেই প্রতিনিয়ত নিবেদিতার আগমনের, ফোনের প্রত্যাশা করেছে। রাকিবকে সঙ্গে নিয়ে গৌর হোটেলে গিয়ে মদ খেয়েছে। রিজিয়া ধর্মকর্ম করে ও মানে। আনিস করেও না, মানেও না। এই বিরোধ, অপ্রতিসাম্য থাকা সত্ত্বেও রিজিয়া চায় সে ভালো থাক। সদা সতর্ক থাকে। স্বামীর প্রতি যত্নশীল হয়।

আনিসের এই অসুস্থতা থেকে সুস্থ জীবন দিতে রিজিয়া ডাক্তারের কাছে যেতে চায়। অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও আনিস ডাক্তারের কাছে যায়। ওষুধ খাওয়ার পর আনিস বিশ্বলোকের সংশ্রবের বাইরে চলে যায়। খায়, ঘুমায়। রিজিয়ার সঙ্গে আনিসের কোনো বিরোধ হচ্ছেনা, বিরোধিতার কষ্ট হচ্ছেনা। এর মধ্যেই নিবেদিতা ফোন করে। রিজিয়া ফোন ধরে। ঘুম থেকে উঠে জানতে পেরেই রিজিয়াকে আবার আহত করে এই বলে — "আমি নিবেদিতার সঙ্গে শুধু কথা বলার কথা বলিনি। তোমার ভাবনাতেই নোংরা লেগে আছে।" শুরু হয়ে যায় চূড়ান্ত অশান্তি। রিজিয়া ডিভোর্স চেয়ে বসে। প্রতি রাতেই না ঘুমিয়ে রিজিয়া অনেক অপ্রাপ্তির কথা ভাবে। এই দ্বন্দ্বময় জীবন সে না পেতে পারত। আরও ভালো বাড়ি, আরো ভালো বর সে পেতেই পারত।

কোনোকিছুতেই আনিসকে নিরস্ত করতে পারেনা। নিবেদিতার সঙ্গে ফোনালাপ, রিজিয়ার অনুপস্থিতিতে নিবেদিতার বাড়িতে আসা চলতেই থাকে। রিজিয়া মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিস্থিতিতে আনিস জানায় রিজিয়ার লোনের টাকায় বাড়ি করা। সুতরাং মালিকানা রিজিয়ার। অনেক বাকবিতণ্ডা হওয়ার পর রিজিয়া জানায় — "আমারই রোজগারে খাবে, আমারই উপার্জিত আশ্রয়ে থেকে অন্য মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করবে, বেরিয়ে যাও এক্ষুণি।" আনিসের পৌরুষে আঘাত লাগে। আনিস একটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়। কোথায় যাবে সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে উলুবেড়িয়া স্টেশনে যায়। প্ল্যাটফর্মের একজায়গায় ব্যাগটা রাখে। এর মধ্যে রিজিয়া দিশেহারা হয়ে অসুস্থ আনিসকে খুঁজতে লাগে। খুঁজে পায়। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর বাড়িতে আসার সময় ব্যাগটা নিতে ভুলে যায়। আর নিজের মোবাইলটা খালের জলে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে খবর যায় বোমাসহ একটি ব্যাগ কেউ স্টেশনে রেখে গিয়েছে। বিস্ফোরণ হওয়ার ভয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকার কাজ শুরু করে। আনিস জনতার ভিড় ঠেলে প্রমাণ করতে যায় এই ব্যাগ তার। এর মধ্যে কোনো বিস্ফোরক পদার্থ নেই। এক নাটকীয়তার মধ্যে পুলিশ আনিসকে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত করে পুলিশ রিজিয়ার কাছে নিবেদিতার মোবাইল নম্বর চায়। যে নিবেদিতা তাদের দাম্পত্যের টানাপোড়েনে এসেছে — তাদের ঝগড়ার

সূত্র। যাইহোক রিজিয়া নেতা অজয় সেনের সহযোগিতায় স্বামীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ক্লাসমেট অজয় সেনের এই ক্ষমতা প্রদর্শন আনিসের অপমানকর মনে হয়।

আনিস রাকিবের সঙ্গে পরিকল্পনা করে কোলকাতা যাওয়ার। আর ফোন কেনার অজুহাত দেখিয়ে রিজিয়ার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা নেয়। নন্দন আকাদেমি চত্বরে যায়। সেখানে রাকিবের বন্ধু শোভনের সঙ্গে দেখা হয়। এরপর তিনজন মিলে মদ্যপান করে এবং পতিতাপল্লীতে যায়। সেখান থেকে ফিরে রিজিয়ার কাছে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে। রিজিয়ার সঙ্গে সঙ্গমে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু আনিসের মতো একজন ঘৃণ্য ব্যভিচারী মানুষের সঙ্গে থাকতে তার অস্বস্তি হয়। কান্না করা ছাড়া রিজিয়ার আর কিছু থাকে না।

ঔপন্যাসিক নিপুণভাবে নাগরিক জীবনের পটভূমিতে আনিস ও রিজিয়ার দাম্পত্য জটিলতাকে দেখিয়েছেন। মোবাইল কীভাবে সেই জটিলতাকে বাড়িয়ে দেয় সেই প্রসঙ্গও এনেছেন। মনোয়ারার মতো গৃহবধূ নারী যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি রিজিয়ার মতো চাকরিজীবী নারীও মোবাইল আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে। তাই বলা যায়, শিক্ষা-দীক্ষা নয়, মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটলে এই সমস্যার কোনোভাবেই সমাধান হবে না।

**তথ্যসূত্র :**

১। আফসার আমেদ, জীবন জুড়ে প্রহর, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৯।
২। ড. অরূপ কুমার দাস, সমাজদ্বন্দ্ব ও বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, ২০০৫।
৩। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি,২০০২।

## সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের নির্মাণশৈলী

নির্মাণশৈলীর দিক থেকে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণ প্রকৌশল শিল্পীর সৃজনশীল সত্তার প্রকাশক। তাই সাহিত্যের রূপ-রীতি ও নির্মাণ-ভাবনা বিচার করে দেখা খুবই প্রয়োজন। আমরা জানি শ্রী ভাদুড়ী তাঁর এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন সন্ত তুলসীদাসের লেখা 'শ্রীরামচরিতমানস'-এর অনুসরণে। উপন্যাসের শুরুতে পাদটীকা দিয়ে তিনি সেই স্বীকারোক্তি করেছেন। উপন্যাসের নামকরণ থেকে বোঝা যায়, দুটি রচনার বাঁধন সমগোত্রীয় হবে। চরিত্রনাম টুকু বাদ দিলে দুটি রচনায় নামের মিল রয়েছে। 'চরিত মানস' শব্দবন্ধ দুটি রচনাতেই বিদ্যমান। তবে সতীনাথ রচনা করেছেন আধুনিককালের উপযোগী নবভারতের মহান আখ্যান আর তুলসীদাস রচনা করেছেন পৌরাণিক ভারতবর্ষের মহান আখ্যান। সতীনাথের রচনাটি উপন্যাস আর তুলসীদাসের লেখা 'শ্রীরামচরিতমানস' মহাকাব্য বিশেষ। কালের হেরফেরে দুই বিশেষ রীতিতে সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে।

তুলসীদাস রচিত 'শ্রীরামচরিতমানস' প্রচলিত হিন্দি ভাষায় রচিত। ভারতবর্ষের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যরূপে এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ভাষা অতি সহজ সরল। সাধারণত তা গীত আকারে বিশেষ সুরে পঠিত হয়ে থাকে। গ্রাম্য ভাষায় এমন সহজ সুন্দর করে ভাবের প্রকাশ তুলসী রামায়ণের কাব্যসৌন্দর্যকে মাধুর্যমন্ডিত করেছে। সংস্কৃত ছাড়া আর কোনও অলংকার মোড়া ভাষাতেই যেন এর প্রকাশ সম্ভব হত না। তুলসীদাসের এই কাব্যটি তে 'শ' নেই বললেই চলে। প্রায় সকল স্থানে 'স' ব্যবহৃত হয়েছে। যার উচ্চারণ অনেকটা ইংরাজি 'saw'-এর মত। তুলসীদাসের রামায়ণে 'ষ' ও 'খ'-এর একই উচ্চারণ। সুর করে না পড়লে 'শ্রীরামচরিতমানস'-এর শ্রবণ মাধুর্য ও সাহিত্য মাধুর্য আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। ছন্দের মিল রাখার জন্য 'ই' কার ও 'ঈ' কার কে সুবিধা মতো ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কোথাও বা 'সিয়া' কোথাও বা 'সিতা' আবার কোথাও বা 'সীতা' লেখা হয়েছে। চৌপাইয়ের শেষ অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ হবেই। কাজেই সেখানকার বানান দীর্ঘ রাখা হয়েছে। শ্লোকের ভেতরের 'ব' অক্ষরের উচ্চারণ সংস্কৃত অন্তস্থ 'ব' অথবা 'ওয়া' আর মত হবে। সামান্য এই কয়েকটা দিক মাথায় রাখলেই তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিতমানস' পাঠ সাধারণ পাঠকের কাছে সহজ হয়ে যায়।

মহাপ্রাণ তুলসীদাসের বিখ্যাত এই কাব্যটি মোট সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথা 'বালকাণ্ড', 'অযোধ্যাকাণ্ড', 'অরণ্যকাণ্ড', 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড', 'সুন্দরকাণ্ড', 'লঙ্কাকাণ্ড', 'উত্তরকাণ্ড'। বৃহৎ কলেবর এই গ্রন্থটি রচনা করতে তিনি যেমন পূর্ববর্তী বা প্রচলিত কাব্যভাষা, কাব্যশৈলী ও

কাব্যরূপের সমন্বয় সাধন করেছেন তেমনি তৎকালে প্রচলিত অবধীভাষা ও ব্রজবুলি ভাষাকে সার্থকভাবে কাব্যের বাহন করেছেন। শ্লোক রচনার ক্ষেত্রে ও ছন্দোবদ্ধ পংক্তিমালা নির্মাণের জন্য তিনি চৌপাই, দোহা, সবৈয়া, কবিত্ত, ছপ্পয়, সোরঠা প্রভৃতির সুন্দর ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই কাব্য শিল্পরূপ ও কাব্যরসের বিচারে যেমন অভূতপূর্ব তেমনি ভক্তিরসের ফল্গু প্রবাহেও এটি টইটম্বুর।

উপন্যাসের জন্ম কাব্যের অনেক পরে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-কার তাঁর এই উপন্যাসটিকে তুলসীদাসের অনুকরণে মোট সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত করেছেন। বিষয় এবং প্লট কিঞ্চিত আলাদা বলে কাণ্ডগুলির নামে খানিক অমিল আছে। উপন্যাসটি মোট দুটি চরণে রচিত। দুই চরণের সাতটি কাণ্ড এরকম, 'আদি কাণ্ড', 'বাল্যকাণ্ড', 'পঞ্চায়েত কাণ্ড', 'রামিয়া কাণ্ড', 'সাগিয়া কাণ্ড', 'লঙ্কা কাণ্ড', 'হতাশা-কাণ্ড'। 'দেশ পত্রিকা'য় প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নাম ছিল 'সটীক ঢোঁড়াই চরিত মানস'। 'সটীক' শব্দটি টীকাভাষ্য সমন্বিত 'শ্রীরামচরিতমানস'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

মহাকাব্যের মতোই বিশাল পটভূমি, অজস্র ঘটনা, চরিত্র ও কাহিনির সমাবেশ, সর্বোপরি করুণ ও শান্তরসের সংমিশ্রণে তৈরি এই উপন্যাসে লেখক মহাকাব্যিক রসাস্বাদন করাতে চেয়েছেন। বরাবর উপন্যাসের উপযোগী নির্মিতি প্রকরণ তিনি তৈরি করেছেন। জটিল ও বৃহৎ বিষয়কে সহজ সরল রূপে প্রকাশ করার ভাবনা তাঁর মাথায় ছিল। তবু উপন্যাসের ডেমোগ্রাফি সমগ্র ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে যায় বলেই প্রচলিত চলতি বুলির পাশাপাশি হিন্দি এবং বিকৃত বা অশুদ্ধ ইংরাজীর ব্যবহার এই রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। উপন্যাসের ভাষা আরও বেশি জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয় যখন উপন্যাসের চরিত্ররা নিজমুখে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে। লেখক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' রচনা করেছেন। তাঁর এই উপন্যাস গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে মহাকাব্যোপম। "এই উপন্যাসে এমন একটি চরিত্র নেই যাকে মনে হবে মাত্র দ্বিমাত্রিক। তাদের জীবন বাস্তবতা থেকে সংগৃহীত হিউমারগুলি পর্যন্ত প্রত্যক্ষ মানুষের ঘাম ও চোখের জলের দাগ লাগা।"[১] ভাষার প্রয়োগশালায় সতীনাথ ছিলেন উঁচুমাপের কারবারি। তাই তিনি "সযত্নে ফুল ফোটানোর মতোই সযত্নে নতুন নতুন শিল্পরীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে ছয়টি উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউই উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, যা সতীনাথ করেছেন। বহু প্রচলিত নয় এমন সব আঙ্গিকের প্রয়োগ করেছেন যা তাঁর মতো বিদগ্ধ, বুদ্ধিমনস্ক, অন্তর্মুখী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। ফলে প্রতিটি উপন্যাসে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পকলার প্রয়োগে নিজের শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই শৈলী ধৈর্যশীল বিশ্লেষণে আগ্রহী পাঠক ছাড়া কাহিনী-অনুরাগী পাঠকের মনকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে না। তিনি

বুদ্ধিমনস্ক, স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণের গভীর দৃষ্টিতে মগ্ন বিশেষ চেতনার অধিকারী লেখক। প্রতিটি লেখা সম্পর্কে সযত্ন প্রয়াস ও সচেতনতা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।”[২]

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এর আখ্যান (narrative) বেশ আকর্ষণীয়। ঘটনার বর্ণনায় লেখক পরম্পরা অনুসরণ করেছেন। কোথাও কোথাও স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে চরিত্রের ভেতর জাগরূক ভাবনাকে ব্যক্ত করা হয়েছে, কখনও আবার ফ্ল্যাশব্যাকে (flashback) গিয়ে অতীতের কিংবা পুরাণের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। মনের অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়েছে মুক্তানুষঙ্গে (free association)। লেখক এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ‘সহকথন’ প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। তবে কোথাও কোথাও ‘পূর্বকথন’-এর চল দেখা যায়। সমগ্র উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এতে যে কথনশৈলী অনুসৃত হয়েছে তা ‘সর্বজ্ঞ লেখকের কথন’।

**উপন্যাসের ভাষা :**

সমগ্র লেখনীতে লেখকের নিজস্ব স্টাইলের ছাপ রয়েছে। যেমন ‘আদিকাণ্ডে’ পটভূমির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, “অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে এর নাম লেখা আছে ‘জীর্ণারণ্য’। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেলগাড়ি ইস্টিশানে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে ‘জঙ্গল আ গেয়া’ (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।”[৩] আঞ্চলিক ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের কারণে ভাষা কোথাও কোথাও জটিল বলে মনে হয়। তবে উপন্যাসকে বাঙময় রূপ দিতে এর অন্যকোনও বিকল্প ছিল না। যদি লেখক সভ্য নাগরিক সমাজের ভাষায় এই উপন্যাস সম্পূর্ণ করতেন, তাহলে অচিরেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। উপন্যাসের অন্যতম নায়িকা রামিয়ার মুখের ভাষায় কোনও বাঁধ ছিল। চটুল ও রঙদারি কথা বলতে ‘পাড়াকুঁদুলি’ এই মেয়েটা ছিল সিদ্ধহস্ত। যদি কোথাও গিয়ে এরা অকথ্য গালিগালাজ ভুলে ভদ্রজনোচিত ভাষায় পারস্পরিক ভাবের বিনিময় করত তাহলে ভাষা হয়ে পড়ত নির্জীব, নকল ও প্রাণহীন। “তাৎমাদের ভাষায় অশ্লীল শ্লীলের মধ্যে বাছবিচার নেই। রসিকতা আর রাগের সময় বীভৎস অশ্লীল কথা না বললে তাদের ফিকে ফিকে মনে হয় ভাষাটা।”[৪] লেখক উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনাতেও তাদেরই ভাষা ও আঞ্চলিক শব্দমালাকে পাথেয় করেছেন। লেখকের ভাষার এরূপ একটি দৃষ্টান্ত: “ঢোঁড়াই বড় হয়ে উঠেছে। আর সে তাৎমাটুলির অলিতে গলিতে ‘কনৈল’ খেলার ঘুচচী কাটে না, বাঁশের চোঙের মধ্যে বাসের চোঙের মধ্যে দর ময়দার ফল দিয়ে বন্দুক ফোটায় না, মোরব্বার পাতা দিয়ে ঘর ছাইবার খেলা খেলে না। ওসব বাচ্চারা করুক। সে এখন মোহরমের সময় ফুদী সিংহের দলে ‘মাতুম’ যায় দুলদুল ঘোড়ার মেলায়—

হিন্দু মুসলমান ভাইয়া জোরহুঁরে পীরিতিয়া রে ভাই,
হায় রে হায়!

বর্ষা শেষ হলেও যেমন মরণাধারে জল থেকে যায়, গানহী বাওয়ার হাওয়া পড়ে আসবার পরও সেই সময়ের রেশ রেখে যায় এই মাতুম গানে।"[৫]

**সংলাপ:**

উপন্যাসের প্রাণ হল সংলাপ। এই উপন্যাসে চরিত্রের মুখে ও মনলোকে যে সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে তা সংবেদী পাঠকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। কথা কাটাকাটির মারপ্যাঁচে, ধ্বনিদ্বিত্বে, স্বরাগম ও স্বরভক্তিতে সংলাপগুলি জীবনীয় হয়েছে। এরকমই একটি সংলাপের দৃষ্টান্ত হল :

'সামুয়র : 'কিরে বগুলা ভগৎ, আজকে রবিবার। আজ যে বড় বৌকা বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুসনি?'

ঢোঁড়াই: 'কারও চাকরও না, কারও পয়সাও ধার করিনি! তোদের মতো নয় যে আজকে গীর্জায় যেতেই হবে, নইলে পাদ্রী সাহেব দুধ বন্ধ করে দেবে।'

সামুয়র: 'আরে যা যা লবড় লবড় বলিস না। বাড়ি বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষে করার চেয়ে পাদ্রী সাহেবের দেওয়া দুধ নেওয়া ঢের ভাল।'

ঢোঁড়াই: 'মুখ সামলে কথা বলিস। চুকন্দর কোথাকার। সাধু সন্তকে কি লোকে ভিক্ষে দেয় নাকি? ও তো গেরস্তরা রামজির হুকুম মতো সাধুদের কাছে নিজেদের ধার শোধ করে। না হলে বাওয়া কি 'বরমভূতকে' দিয়ে মরণাধারের নিচে থেকে আশরাফির মড়া বার করতে পারে না।'

সামুয়র: 'থাক থাক, তোর বাওয়ার মুরোদ জানা আছে। সে বার যখন টোলায় পিশাচের উপদ্রব হল, কোথায় ছিল তোর বাওয়া। রেবণগুণীকে 'তুক' করে যেই না বালি ছুড়ে 'বাণ' মারা অমনি সেটা একটা বিরাট বুনো মোষ হয়ে কাশবনের মধ্যে থেকে মরণাধারে ঝাঁপ দিল।তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করিস তোদের মহতোকে।'

ঢোঁড়াই: 'থাম, থাম। ফের ছোট মুখে বড় কথা বলবি তো, পিটিয়ে তোর সাদা চামড়া আমি কালো করে দেব। গির্জেতে যে টুপিতে করে পয়সা নিস তার নাম কী? তুই নিজেই তো দেখিয়েছিস।'

সামুয়র: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ জানা আছে শালা তাৎমাদের।'

ঢোঁড়াই: 'বিল্লীর মতো চোখ, কিরিস্তান, তুই জাত তুলে গালাগালি দিস।"' ৬

**শব্দভাণ্ডার :**

অনেক অপ্রচলিত শব্দ, অশুদ্ধ উচ্চারণ, বিকৃত শব্দ আমরা এই উপন্যাসে পাব যা আমাদের মনে কৌতুক ও রহস্য তৈরি করে। বিকৃত ইংরেজি যেমন আছে, তেমনি দেহাতি

বুলি ও হিন্দি শব্দ ভিড় করেছে এখানে। নিচে উপন্যাস থেকে সংগৃহীত এরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এগুলোকে আমি তিনটি স্থূল বিভাজনের দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। যথা,- বিকৃত অথবা অশুদ্ধ ইংরেজি ও আঞ্চলিক শব্দাবলি, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দাবলি, হিন্দি ও অন্যান্য আঞ্চলিক শব্দাবলি। মনে রাখতে হবে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারনে তাদের অনেকের উচ্চারণেই বিস্তর বিকৃতির ছাপ লক্ষণীয়।

পূর্ণিয়ার ছেলেরা বিকৃত উচ্চারণ করে পন্ডিত মশাইকে চটাত এমন দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে। যেমন "ওনামাসি ধং গুরুজী পড়হং" অর্থাৎ 'ওম নমস সিদ্ধং'। অন্যান্য দৃষ্টান্তঃ 'কিরিস্তান' (খ্রিস্টান), 'অকতিয়ার' (অধিকার), 'পিট্রোল' (পেট্রোল), 'সুরাজ' (স্বরাজ), 'সুয়াজ' (স্বরাজ), 'সাভা' (সভা), 'মিলিট্রি' (মিলিটারী), 'পচ্ছিম' (পশ্চিম), 'অফসর' (অফিসার), 'পোসকাট' (পোস্টকার্ড), 'ওরসিয়র' (ওভারসিয়ার), 'এনজিনিয়র' (ইঞ্জিনিয়ার), 'ডিরেসিং' (ড্রেসিং), 'সরাধ' (সর্দা আইনের বিকৃত উচ্চারণ, সরাধ এর শব্দগত অর্থ শ্রাদ্ধ), 'সার্কাস বাংলা' (সার্কিট হাউস), 'চেরমেন' (চেয়ারম্যান), 'কলস্টর' (কালেক্টর), 'ইনারসন' (ইন্দ্রাসন), 'জুলুস' (জৌলুস), 'মদদ' (সাহায্য), 'সীত্তারাম' (সীতা ও রাম), 'রংরেজ' (ইংরেজ), 'মুরুৎ' (মূর্তি), 'সার্ভে' (জরিপ), 'কাংগ্রিস' (কংগ্রেস), 'এঞ্জিন' (ইঞ্জিন), 'দশারায়' (দশহরা বা দুর্গাপূজা), 'ভগবত্তি থান' (বাঙালিদের দুর্গামণ্ডপ), 'তেরহমা' (তেরোদিনে পালিত ক্রিয়াকর্ম), 'রপোট' (রিপোর্ট), 'মানি আটার' (মানি অর্ডার), 'ওলায়তী' (বিলাতি), 'কোর' (বর্ডার), 'বিলাড়' (বিড়াল), 'পবলিস' (পাবলিক), 'পরমাৎমা' (পরমাত্মা), 'বালিস্টর' (ব্যারিস্টার), 'খত' (চিঠি), 'গিরানীর দোকান' (গভর্মেন্ট স্টোরস), 'টুরমন' (টুর্নামেন্ট), 'হাভেলি পরগণা' (অন্দর মহল), 'বোট' (ভোট), 'তিরবেণী সং' (ত্রিবেণী সঙ্ঘ), 'লিঙ' (লীগ), 'ফারম' (ফার্ম), 'টিরেনি' (ট্রেনিং), 'জপৈনী' (জাপানি), 'ইনরধনু' (ইন্দ্রধনু), 'বিলাক' (ব্ল্যাক মার্কেটিং), 'কেরান্টি' (ক্রান্তি), 'পোরোগারেমের' (প্রোগ্রামের), ইত্যাদি।

এছাড়াও 'সনবেটা' (ধর্ম ছেলে), 'সাহেবের টাট্টু' (আদুরে গোপাল), 'হুক্কা পানি' (হুঁকো জল। যার অর্থ একঘরে করা), 'বগুলা ভকত' (বক ধার্মিক), 'গুণ' (ইন্দ্রজাল), 'লরম' (নরম), 'লচক' (নমনীয়), 'লবড় লবড়' (বাজে বকা), 'চুকন্দর' (বীট পালং; নিন্দার্থে), 'ভিখ' (ভিক্ষা), 'ফুটানি ছাঁটত' (বড়াই করত), 'বাণ মারা' (যাদুবিদ্যার প্রক্রিয়া বিশেষ), 'চক্কর' (জাদুমন্ত্রের প্রক্রিয়া বিশেষ), 'ডাইন' (ডাকিনী বিদ্যা), 'ভিতরঘুন্না' (ভেতরে ঘুনধরা), 'মুখশুধ' (মুখশুদ্ধি), 'খাল' (চামড়া), 'তাথি' (হাপড়), 'ভুচ্চর' (জানোয়ার), 'ঠেকুয়া' (শুকনো পিঠা), 'পীপর' (অশ্বত্থ গাছ), 'থান' (পূজার স্থান), 'শাঁখড়েল' (পেত্নী বিশেষ,এরা পুরুষ দেখলে কাছে ডাকে), 'দাই' (ঝি), 'খাতিরদারি' (সম্মান দেখানো), 'জিইয়ে' (বাঁচিয়ে), 'চৌপাট' (মাটি করে দেওয়া), 'ঔজার' (যন্ত্র বা হাতিয়ার), 'নখোদম' (নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা), 'অলৌচি' (বেলুচি), 'সন্নাটা' (খালি বা চুপচাপ), 'তিসুর সাল' (গতবছরের আগের

বছর), 'সুকৃত' (পুণ্য), হৈজা' (কলেরা), 'উপর করা' (জোগাড় করা), 'খড়মহরা' (কানাকড়ি), 'দহিচুড়া' (দই ও চিড়ে), 'কিয়ালি' (ওজন করার পারিশ্রমিক বাবদ ফসলের একটি অংশ), 'ভূমিহারী চাল' (ভূমিহার ব্রাহ্মণদের কূটনীতি), 'দররৈয়ত আধিয়াদার' (রায়তের অধীনে ভাগচাষী), 'হিড়িক' (প্রবণতা), 'জনানী' (ছেলেমেয়ে), 'জনৌ' (পৈতা), 'ধরম' (ধর্ম), 'পরণাম' (প্রণাম), 'পুরুব' (পূর্ব), 'বজর' (বজ্র), 'মুরত' (মূর্তি), 'কুটুম' (আত্মীয়), 'কুটমৈতি' (কুটুম্বিতা), 'গদ্দাদার' (গদিযুক্ত), 'ফুলে কুপো' (আঙুল ফুলে কলাগাছ), 'ক্ষেতের মূলো' (সামান্য লোক), 'নালায়েক' (অযোগ্য), 'পাক্কি' (পাকা রাস্তা), 'কাচ্চি' (কাঁচা রাস্তা), 'শিউজী' (শিব জী), 'চোৎ বোশেখ' (চৈত্র ও বৈশাখ মাস), জৈঠ' (জ্যৈষ্ঠ মাস), 'দেহাতী' (স্থানীয়), 'পোয়াল' (খড়), 'পোয়ালের পাহাড়ের ঘুর' (আগুন পোয়াবার স্থান), 'নাখোদম' (প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া), 'কামাত' (খামার), 'সুই' (টিকা), 'গুড়বাগনর' (কাঁচাকলাপাকা বা পূজার নৈবেদ্য বিশেষ), 'নরম পানি' (খারাপ জল), 'কলিজা' (কলজে বা হৃদয় বা সাহস), 'রামদানা' (একপ্রকার গাছ বিশেষ যা থেকে খই হয়), 'কলালী' (মদের দোকান), 'সটক-দম' (আক্কেল গুড়ুম), 'বহলমান' (গরুর গাড়ির গাড়োয়ান), 'নিমকিন' (সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত), 'কুরুক্ষেত্র' (ঝগড়া), 'সিলবরের পৈড়ি' (জার্মান সিলভারের মল), 'তাকৎ' (জোর), 'কবরগা' (কবর দেবার জায়গা), 'মুসহর' (অনুন্নত এক জাতি), 'কিচিন' (একশ্রেণীর পেত্নী), 'অঠর পটর' (ছাইভস্ম), 'কোদারী' (কোদাল), 'খুরপি' (যন্ত্র বিশেষ), 'পিদিপ' (পিদিম বা প্রদীপ), 'লোট' (টাকা বা নোট), 'লম্বরী' (একশো টাকার নোট), 'দশ-টাকিয়া' (দশ টাকা), 'পুরুখ' (স্বামী), 'ছিনার' (চটুল মেয়ে), 'ঢঙ্গিলা' (ঢলানি মেয়ে), 'সুরদাস' (অন্ধ অর্থে), 'একচিমটি' (এতটুকু), 'বিলিতি লণ্ঠন' (ডিজ লণ্ঠন), 'খাপড়া' (ঘর ছাইবার মাটির টালি বিশেষ), 'বমমা' (টিউবওয়েল), 'গোড়' (পা), 'গোড় লাগবে' (প্রণাম করবে), 'পুতহু' (পুত্রবধূ), 'পানকাট্টি' (বিয়ের সময়ে একটি স্ত্রী-আচার), 'দুয়ার লাগা' (বিয়ের সময় চলা একটি অশ্লীল আচার), 'সমধী' (বেয়াই), 'সমধীন' (বেয়ান), 'উখলি' (উদুখল), 'মাড়োয়ার' (মণ্ডপ), 'কনিয়া' (কনে বৌ), 'বোটহী' (পথিক), 'ঘসর ফসর' (বাজে কথা), 'ভাথি' (হাপড়), 'মারুয়া' (একপ্রকার খাদ্য শস্য), 'নেওতা'(নিমন্ত্রণ), 'পা ভারী' (সন্তান সম্ভবা), 'ভারী গা' (সন্তান সম্ভবা), 'জল চড়ানো' (তর্পণ করা), 'পচানো' (হজম করা), 'ভক্তাই' (কবীরপন্থী একটি শাখা), 'উজাড়' (গরু মোষকে দিয়ে অন্যের ফসল নষ্ট করা), 'আমনসভা' (শান্তি সভা), ভৈসোয়ার' (মোষ চরাবার রাখাল), 'লোহা মানা' (পরাজয় স্বীকার করা), 'মার্কার' (কথার মত কথা), 'পেট কাটা' (রোজগার মারা), 'মুখিয়া' (মুখ্য বা মাতব্বর), 'তৌহার' (পর্বের দিন), 'পাক সাফ' (পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন), 'সিনুর' (সিঁদুর), 'মোর্চাবন্দী' (ব্যূহ রচনা করা), 'জাতিয়ারী' (জাতের পক্ষ থেকে), 'এক্কা' (এটি দ্ব্যর্থবাচক শব্দ, এর অর্থ একতা, অপর আরেক অর্থ টেক্কা), 'খলিহান' (যেখানে ফসল কেটে প্রথম জড়ো করা হয়), 'সরগনা

আদমী' (গণ্যমান্য লোক), 'পুটুর পুটুর' (পিট পিট করে), 'কামদার' (এগ্রিকালচারাল ফার্মের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী), 'সতিয়াগিরা' (সত্যাগ্রহ), 'বাঙালিয়া' (বাঙালিদের তাচ্ছিল্য করে বলা হয়), 'হয়ে আসা' (জেল খেটে আসা), 'সুরুজজী' (সূর্যদেব), 'বুধভগমান' (ভগবান বুদ্ধদেব), 'ইনরজী মহারাজ' (ইন্দ্রদেব), 'আড়গড়িয়া' (খোঁয়াড় রক্ষক), 'লে সুধনি' (খা কলা পোড়া), 'আজাদ দস্তা' (স্বাধীন দল), 'ডিং হাঁকা' (বড় বড় কথা বলা), 'কায়ের' (কাপুরুষ)।

আরও কিছু এরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত হল, 'বিল্লি' (বেড়াল), 'আদমী' (মানুষ), 'সো যা' (ঘুমিয়ে পড়), 'লৌরী' (মোটর গাড়ি), 'মোচ' (গোঁফ), 'মরদ' (পুরুষ মানুষ), 'খুশ খবরী' (সুখবর), 'পরদেশী শুগা' (বিদেশি টিয়াপাখি), 'রস সি ভর' (এক রশি বা সিকি মাইল), 'সাদী' (বিবাহ), 'ফুফা' (পিসেমশাই), 'ভেট মুলাকাত' (দেখা সাক্ষাত), 'বিয়াসাদী কিরিয়া-করম' (বিবাহ ও অন্যান্য কর্ম), 'বিলকুল লাখেড়া' (একেবারে লক্ষীছাড়া), 'বুজুর্গ' (গুরুজন বা বড়), 'মুহতোড়' (মুখভাঙা জবাব বা কড়া জবাব), 'পানি' (জল), 'আওর' (আর বা আরও), 'বুখার' (জ্বর), 'খাব্বাস' (চাকর), 'বিমারী সিমারী লোগ' (রুগ্ন মানুষ), 'বিমারী' (অসুখ), 'পানওয়ালা' (পান বিক্রেতা বা ব্যবহারকারী), 'ভাগরেকা বৈগন' (ডালার বেগুন), 'হিম্মৎওয়ালা' (ক্ষমতা আছে যার), 'দোস্ত' (বন্ধু), 'সাফসুৎরা' (পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন), 'পুছ' (কদর বা বুঝাশুনা), 'বনভোঁয়সা' (বুনোমোষ), 'মর্জি' (ইচ্ছা), 'ভাইয়া' (ভাই), 'ফূর্তি' (আনন্দ), 'চাঁদি' (রূপা), 'নানী' (দিদিমা), 'পাতলী কোমরওয়ালী' (পাতলা কোমরের নারী), 'ঢেরী আমদানীর নৌকরি' (বেশি বেতনের চাকরি), 'রহন সহন কিরিয়া করম' (আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম), 'কমজোর' (দুর্বল), 'বালুবুর্জ' (বালিভরা মাটি), 'তরিবৎবালী' (আদব কায়দা জানা স্ত্রী-লোক), 'ছমকী আওরৎ' (উড়ু উড়ু ভাবের স্ত্রী-লোক), 'হল্লা' (গণ্ডগোল বা ঝামেলা, চিৎকার-চেঁচামেচি), 'পচ্ছিমবালী' (পশ্চিমে বসবাসকারী স্ত্রী-লোক), 'চিড়িয়া' (পাখি), 'রেলকিরায়া' (রেলের ভাড়া), 'হিসসা' (অংশ বা ভাগ), 'কভভী নেহি' (কোনদিন নয় বা কখনও নয়), 'ময়দান' (মাঠ কিন্তু এখানে পায়খানা করবার স্থান অর্থে ব্যবহৃত), 'তকদীর' (ভাগ্য), 'মাহিনা' (মাস), 'ঝুঠঠা' (মিথ্যাবাদী), 'ভাবী' (ভ্রাতৃবধূ), 'হালতের সুধার' (অবস্থায় উন্নতি), 'সুভা' (সকাল), 'কালোঝাম্বাবালী' (কালো ঘাঘরা পরা), 'খুফিয়া' (গুপ্তচর), 'আন্ডা' (মুরগীর ডিম), 'কুত্তী' (কুক্কুরী), 'দাবাখানা' (ওষুধের দোকান), 'মোহব্বত' (ভালোবাসা), 'চুনৌতি'(চ্যালেঞ্জ), 'আলবৎ' (অবশ্যই), 'মেহমান' (অতিথি), 'রোকশোদি' (দ্বিরাগমন), 'হরাভর' (সবুজ বা সোনার সংসার), 'পাখণ্ডী চামড়াবালা' (পাষণ্ড চামড়াওয়ালা), 'সাগাই' (সাঙা), 'বরহমভুতবালা' (ব্রহ্মদৈত্য থাকে এমন জায়গা), 'সওয়াল' (প্রশ্ন), 'রঙ্গেলি' (রঙিন আলপনা), 'সুলবাই' (সাধারণ আমাশয়), 'মাইগে' (মাগো), 'বার্লিস' (বার্লি), 'বেলাবাড়ার পাখি' (যে পাখি বেলা বাড়লে ডাকতে থাকে), ইত্যাদি।

**প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা :**

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসে লেখক বেশ কিছু প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা ব্যবহার করেছেন। প্রবাদ প্রবচনে লুকিয়ে থাকে মানুষের দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতার ছাপ। এগুলি লোকমুখে প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লেখক কখনও বিষয়ের বর্ণনায়, কখনও চরিত্রের মুখ দিয়ে এইসব প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারার প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি এই উপন্যাস রচিত হয়েছে তুলসীদাসের ‘শ্রীরামচরিতমানস’ অবলম্বনে। সেখানে কবি যেমন কৌশলে এগুলোর ব্যবহার করেছেন, তেমনি সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীও তাঁর রচনায় এরকম কিছু বাগধারা ও প্রবচনের প্রয়োগ করেছেন। এতে রচনার গুনগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারাসমূহ বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অথবা সেগুলি নিজেই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য হয়ে রচনাকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এ ব্যবহৃত প্রবাদ ও বাগধারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলা হলেও দু’একটি শব্দবন্ধ, বাগধারা বা প্রবাদ আমরা হিন্দি ভাষাতেও উচ্চারিত হতে দেখি। এর কারণ অবশ্যই ডেমোগ্রাফি ভাগলপুর, পূর্ণিয়া অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ভাষিক পটভূমি। উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা হল

১. ‘ক্ষেতের মূলো’ (সামান্য লোক। ‘মশা বলে কত জল’ এই অর্থে)
২. ‘এ শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, ও শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, দুনিয়ার শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা’ (সর্বঘটে বিরাজমান থাকা অর্থে)
৩. ‘মরদের কথা আর হাতির দাঁত’
৪. ‘জিস গাছপর বগুলা বৈঠে, জিস দরবার মে মৈথিলি পৈঠে’ (যে গাছে বক বসেছে আর যে দরবারে মৈথিলি ঢুকেছে, তা গেল বলে)
৫. ‘শুয়েছি তো কার পাঁজরার উপর মুখ ডলেছি’ (পাকা ধানে মই দেওয়া অর্থে)
৬. ‘যাদের মুলুক যেমন, তাদের মুলুক তেমন’
৭. ‘পরদেশী শুগা’ (বিদেশি টিয়াপাখি)
৮. ‘বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা’
৯. ‘খোসা দেখে কি সবসময় ধরা যায়, বেগুনের ভেতর পোকা আছে কিনা’ (সঠিক জিনিস চেনা)
১০. ‘পানি পিলা কর ছোড়না’ (জল না খাইয়ে ছাড়বে না বা নাকানি চোবানি খাওয়ানো)
১১. ‘নভ দুহি দুধ, চহত এ প্রাণী’ (আকাশ দুয়ে দুধ চায় লোক)
১২. ‘না আগে নাথ, না পিছে পগাহা’ (যে লোক আগে পিছে ভাবে না)

১৩. 'যাহা খেলে বোঁচাবোঁচি চলু দেখে যাই' (যেখানে পুরুষ কুমীর ও নারী কুমীর খেলা করছে। নারী পুরুষের রমন প্রসঙ্গে)

১৪. 'ছমকী আওরৎ' (উড়ু উড়ু ভাবের স্ত্রী-লোক)

১৫. 'পান চিরে দু টুকরো করেছে' (পান থেকে চুন খসা)

১৬. 'তুমহসন মিটহি কি বিধি কে অঙ্কা' (বিধির বিধান খণ্ডন করা অসম্ভব)

১৭. 'ভিতরঘুন্না' (যার মনের কুটিলতা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল)

১৮. 'ঢোল, গঁবার, শূদ্র, পশু, নারী' (এই পাঁচশ্রেণীর বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। উৎস: রামায়ণ)

১৯. 'পচা তেলী, নয়শ আধুলি' (মানুষ গুণে ব্যবহার)

২০. 'খিরা, সবেরে হীরা' (শশা সকালে হীরা)

২১. 'চার কাঙলা, তো এক বাঙলা'

২২. 'ন এক পাই, ন এক ভাই' (এক পয়সা সাহায্য দেব না, একটি লোক দিয়েও সাহায্য করব না)

২৩. 'যার এক বাপ, তার এক রাত'

২৪. 'ডিং হাঁকিস না' (বড় বড় কথা বলিস না)

২৫. 'দাল গলল না' (মুরদে কুলোল না)

২৬. 'ছেলের তাকৎ মায়ের দুধে আর মায়ের (তাকৎ) দুধ হয় মসুর ডালে'

২৭. 'আশ্বিনের পর জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে'

২৮. 'ঝটদে বিমার পটদে খতম' (ঝটিকার অসুখে পড়লে লোক তাড়াতাড়ি মরে)

২৯. 'পেট খারাপ করে মুড়ি আর ঘর খারাপ করে বুড়ি'

৩০. 'ছুট গয়ী নৌকরি, সটক গয়া পান' (চাকরিও গেল, অমনি পান খাওয়াও শেষ হয়ে গেল)

৩১. 'বাজা ছাজা কেস, তিন বাঙ্গলা দেশ' (বাদ্য, ঘর ছাউনি, মেয়ে মানুষের মাথায় চুল- এই তিন জিনিস বাংলাদেশের ভালো)

৩২. 'বিলি ভকত আর বগুলা ভকত' (বিড়াল তপস্বী আর বকধার্মিক)

৩৩. 'মোর্চাবন্দী' (ব্যূহ রচনা করা)

৩৪. 'মিহি চাল খেলে বুদ্ধি খোলে'

৩৫. 'বুকের উপর মুগের দানা রগড়াচ্ছে' (পাকা ধানে মই দেওয়া)

৩৬. 'সাহেবের টাট্টু' (আদুরে গোপাল)

৩৭. 'বগুলা চুনি চুনি খায়' (বক বেছে বেছে খায়)

৩৮. 'ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়াতস; রাহ চলতে বুদ্ধ পাঁচ; কচহরী গয়ে তো একো ন সুঝে; যে হাকিম কহে সো সচ' (বাড়িতে থাকলে বুদ্ধি হয় পঁয়ত্রিশ, পথে বেরোলে বুদ্ধি হয় পাঁচ, কাছারি পৌঁছে একও দেখতে পাওয়া যায় না, হাকিম যা বলে তাই সত্য মনে হয়)

৩৯. 'খাইতো গেহু, নহিতো এহু' (খাই তো গম, না হলে কিছুই খাই না। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার অর্থে)

কথাকোবিদ সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন ভাষার ভাণ্ডারী। তাঁর এই উপন্যাস ভারতীয় ঐতিহ্যের বাণীমালা। পূর্ণিয়া জেলার মাটি ও মনকে তিনি চিনেছিলেন গভীর আকাঙ্খা নিয়ে। তাই জিরানিয়া ও তাৎমাটুলির লোকাচার, লোকায়ত বিশ্বাস, প্রবাদ প্রবচন, লোককথা, প্রাকৃতে অপ্রাকৃতে বিশ্বাস, খাদ্যরুচি, খাদ্যসংস্কার, সহজাত শ্লেষক্ষমতা ও ধ্বন্যাত্মক শব্দবাহুল্য নিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন অপরূপ সরস্বতী। সেই অনন্য ভাষা প্রতিমাই 'শ্রীরামচরিতমানস'—এর সাগরজলে স্নান করে ভারতীয় সাহিত্যে নিজের অক্ষয় আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথে ও পথের প্রান্তে, সতীনাথ ভাদুড়ী, জীবনীগ্রন্থমালা ১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৭ (২য় সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০০), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪৮

২. স্বস্তি মণ্ডল, প্রস্তাবনা, সতীনাথ ভাদুড়ী, ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, প্রথম প্রকাশ- ২০০২ (২য় মুদ্রণ- ২০১০), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পৃষ্ঠা- অনুল্লেখিত

৩. সতীনাথ ভাদুড়ী, আদিকাণ্ড, ঢোঁড়াই চরিত মানস, ষষ্ঠ মুদ্রণ- আগস্ট ২০১৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ০৩

৪. তদেব, রামিয়া কাণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৪

৫. তদেব, বাল্যকাণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪

৬. তদেব, পঞ্চায়েত কাণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬

মৌনী চ্যাটার্জী

## মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' (১৯৭৬) গল্পে ব্যক্তি ও সমষ্টির সংকটের নানাদিক

ক.

পঞ্চাশের দশকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদের ভাষা যাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়ে ওঠে, তিনি হলেন মহাশ্বেতা দেবী। ১৯২৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। বাবা মণীষ ঘটক, কাকা ঋত্বিক ঘটক তৎকালীন সাহিত্য, সাংস্কৃতিক জগতের উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে পড়াশুনা করেন। টিউশন করে নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে পড়াশুনার খরচ চালান তিনি। শৈশবে রাজশাহীতে পড়াশুনা করেন। পরে বিশ্বভারতী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। এরপর তিনি অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হয়। বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনা করাকালীন তিনি ছত্তিশগড়, ছোটোনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় লোধা, শবর, খেঁড়িয়া প্রভৃতি জাতি, উপজাতির কাছে যান, তাদের জীবনযাত্রা নিজের জীবন দিয়ে অনুধাবন করেন। মহাশ্বেতা দেবী প্রান্তজনের সখা, উচ্চবিত্তের লেখিকা নন। উচ্চবিত্ত মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, প্রেম, ভালোবাসা, প্রভৃতি তাঁর রচনার বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে চাননি। তিনি সখের কলমজীবী নন। সাহিত্য রচনা করার জন্য করেননি, তাঁর রচনা জীবন্ত, সময়ের দলিলীকরণ। তিনি বলেন:

...আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বার বার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি The Voiceless Section of Indian Society. এই অংশ এখনও শুধু নিরক্ষর, স্বল্প সাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ো বিচ্ছিন্ন...।[১]

সমাজের অন্ধকারময় দিকটি মহাশ্বেতার রচনায় ধরা পড়েছে। অন্ত্যজ প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাত্রা, সুখ দুঃখের শরিক হন তিনি। সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া মানুষদের প্রত্যক্ষ করেন, সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেন তাদের জীবন্ত রূপ। তারা যে শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষ করার জন্য জন্মায়নি, তারাও প্রতিবাদ করতে জানে, তাই দেখান মহাশ্বেতা দেবী রচনার মধ্য দিয়ে। মহাশ্বেতা দেবী জনদরদী কথাসাহিত্যিক, শিল্পের জন্য তিনি শিল্প রচনা করেননি। তাই তিনি সমাজের নিম্নবিত্ত, শোষিত, অত্যাচারিত মানুষদের শ্রেণি সংগ্রামের চিত্র, সুনিপুণ ভঙ্গীতে তুলে ধরেন। মহাশ্বেতা দেবী ১০০টির বেশি উপন্যাস এবং ২৫টির বেশি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেন। তাঁর রচনার এক বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে গোষ্ঠীচেতনা, উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা। মহাশ্বেতা দেবী ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন বহু উপন্যাস, ছোটগল্পে। 'হাজার চুরাশির মা', 'দ্রৌপদী', 'চোট্টিমুন্ডা ও তার তীর', 'স্তনদায়িনী', 'শিকার', 'অরণ্যের অধিকার' প্রভৃতি। মহাশ্বেতা দেবীর নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতকে ঘিরে ব্যক্তি ও সমষ্টি সংকটের নানা দিক এবং গল্পের মুখ্য চরিত্র দোপ্‌দি, প্রতিবাদী সত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৭৬ সালে 'দ্রৌপদী'

গল্প প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। পরে ১৯৭৭ সালে পরিচয় পত্রিকায় মহাশ্বেতা দেবী গল্পের বানানের সংস্করণ ঘটিয়ে 'দোপ্‌দি' করেন।

কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সৃজণ মাত্রেই পাঠকের মধ্যে একটি সংগ্রামী চেতনার কলম আভাসিত হয়ে ওঠে। সচেতনভাবেই তিনি নিজের কলমে সেই সমস্ত প্রান্তিক মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন, যাদের হয়ে বলার মতো মানুষের অভাব রয়েছে ধণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। এতখানি ঋজু এবং দ্বিধা দ্বন্দ্বহীনভাবে ভাষাহীন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য মহলেই মানুষের অভাব। আমারা মহাশ্বেতা দেবীর প্রান্তিক অর্থাৎ The Voiceless Section of Indian Society এর সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতাতন্ত্রের সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব এবং সমগ্র দ্বিরালাপের জায়গাটি নতুনরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেখানে শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কোনো একাংশের বক্তব্য প্রাধান্য পাবে না। একদিকে পুলিশ প্রশাসনের হাত থেকে জল জঙ্গল রক্ষার লড়াই এবং অন্যদিকে নারীর নারীত্বের প্রতিবাদী দিকটি গল্পে তুলে ধরা হয়েছে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে।

**খ.**

মহাশ্বেতা দেবী একদিনে গল্পকার মহাশ্বেতা হয়ে ওঠেনি। পড়াশোনা শেষ করেই তিনি পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন। যেকোনো কাজকেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহন করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর কোনো বাহুল্য ছিল না। জীবিকা অর্জনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ব্যক্তি জীবনের সংগ্রাম, ঘাত-প্রতিঘাত পরবর্তীকালে তাঁর লেখনীর ক্ষেত্রে জ্বলন্ত প্রভাব ফেলে। মহাশ্বেতা দেবী বড় পরিবারের সন্তান ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই গল্প বলা এবং শোনা দুই এর প্রতিই তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তিনি তাঁর বোনেদের গল্প বলে শোনাতেন এবং নিজের জ্ঞানের ভান্ডারও সমৃদ্ধ করতেন। মহাশ্বেতার লেখক জীবনের প্রথম সূত্রপাত ১৯৩৯ এ 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার মধ্যে দিয়ে। মূলত দেশকালের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁর লেখনী জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বলা হয়। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ তাঁর রচনার বহুলাংশে ধরা পরে। মহাশ্বেতার সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ থেকে। স্বাধীনতার পরবর্তী দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদির ফলে মহাশ্বেতার রচনাগুলির মধ্যে দেখা যায় শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব, কোথাও শোষিত শ্রেণির ওপর অত্যাচার, যে অত্যাচার শোষক শ্রেণি মাথা নত করে সহ্য করে আবার কোথাও উদ্যত চিত্তে প্রতিবাদ জানায়। প্রথম জীবনে মহাশ্বেতা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস 'ঝাঁসির রানি' (১৯৫৬) সালে প্রকাশ করেন। ইতিহাস, প্রেম প্রথম জীবনে মহাশ্বেতা দেবীর রচনার মূল অনুষঙ্গ ছিল। সেই ইতিহাসে অতীত জীবনের রাজায় রাজায় যুদ্ধ, লড়াই, বিবাদ, ব্যর্থতা ইত্যাদি থাকায় মহাশ্বেতা তা তাঁর লেখার বিষয় হিসাবে প্রথম জীবনে তুলে ধরেন। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ

থেকে সময় বা সমাজকে দেখলেও তা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তাই তো তিনি বিজয়গড় কলেজে শিক্ষকতা করাকালীন চলে গেলেন শবর, খেড়িয়াদের মাঝে। সেখানে তাদের সঙ্গে থেকে তাদের জীবনযাপন, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিলেন। তিনি দূর থেকে জীবনকে না দেখে প্রান্তিক আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে মিশে গেলেন এবং তৎকালীন সময়কে তুলে ধরলেন তাঁর রচনায়। করলেন সময়ের দলিলীকরন। মহাশ্বেতা ছোটোগল্প রচনার মধ্য দিয়ে শৈল্পিক দৃষ্টিতে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রান্তিক মানুষদের জীবনচিত্রের বাস্তব দিকটি বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এই প্রতিবাদী সৃজণীপ্রবণতার গর্ভেই 'দ্রৌপদী' গল্পের জন্ম।

সত্তরের দশক নকশাল আন্দোলনের সময়। ১৯৬৪ সাল থেকে বামপন্থী (মার্কসবাদী) কর্মীরা নকশাল বাড়িতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। চারু মজুমদারদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ক্ষমতাসীন অভিজাতদের উৎখাত করে সাধারন কৃষক, শোষিত শ্রেণিকে একত্র করার ডাক দেয়। তাদের আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল শোষক অভিজাত সম্প্রদায়ের থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে শোষিত ভূমিহীন বঞ্চিত কৃষক শ্রেণির কাছে তা বিতরন করা। ১৯৬৭ সালে এই ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি এক সদস্যদল গঠন করে যার নেতৃত্ব দেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল। এই প্রেক্ষিতেই নকশাল আন্দোলনের জন্ম। আর এই নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতকে ঘিরেই সাঁওতাল প্রান্তিক সম্প্রদায়কে নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী রচনা করেন 'দ্রৌপদী' ছোটগল্পটি।

গ.

মহাশ্বেতার ছোটোগল্প বাস্তব ও শিল্পের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন। সেখানে জীবনের কঠিন বাস্তবতা ধরা পড়ে বিভিন্ন গল্পের চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে। শিল্পের জন্য শিল্প রচনার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা কোনটাই তাঁর ছিল না। মানুষের জীবন, জীবনে পাওয়া না পাওয়া, সেই জীবনের অন্ধকারময় দিকটি সাহিত্যের পাতায় জীবন্ত রূপে নিজের ভাষায় তুলে ধরেন। মহাশ্বেতার গল্পগুলিতে মুখ্য হল প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার। গল্পে ব্যক্তি হল এক নির্দিষ্ট শ্রেণির। এই ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলে। তাঁর রচনায় ব্যক্তি কিন্তু নির্দিষ্ট একজন নয়। এই ব্যক্তি হল সমস্ত প্রান্তিক আদিবাসী সমাজের প্রতিভূ। মহাশ্বেতা তাঁর নিজের মুখের কথাই বাস্তবতার ভিত্তিতে 'দ্রৌপদী' গল্পের চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন জীবন্ত রূপে।

গল্পটি প্রথমে এক সমষ্টির সংগ্রাম থেকে শুরু হলেও সমাপ্তিতে আমরা দেখি এক নারীর অসাধারন আত্মপ্রতিষ্ঠা। শোষক শ্রেণির কাছে নারীবাদীসত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ। আইভি রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী গল্প প্রসঙ্গে বলেন—

'দ্রৌপদী' গল্প বিশেষ একটা আন্দোলনের কথা নিয়ে লিখেছি। ৭০ এর দশকে বিশেষ

একটা জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের জায়গা জমি সব চলে যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রতিবাদ মূলক পটভূমি তৈরি করেছিল...।[২]

ঝাড়খন্ড এর জঙ্গলে সাঁওতালদের ওপর প্রশাসনের দুর্দমনীয় অত্যাচার এবং সেই অত্যাচারে প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা গর্জে ওঠে। লড়াই করতে থাকে দুলন, দোপ্দি ও তার লোকজন। রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় দুলন ও তার লোকজন। সেই সময় যখন বীরভূমে খরা, জলকষ্ট তখন জোতদার সূর্য্য সাউ তার বাড়িতে টিউবওয়েল বসায়, কুয়ো খোঁড়ে তিনটি। চারিদিকে যখন জলের তীব্র সংকট তখন ক্ষমতার অধিকারী সূর্য্য সাউ জমিদারের বাড়িতে অথৈ জল। এর মধ্যে দিয়ে মহাশ্বেতা ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষদের আধিপত্য কায়েম রাখার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। সাঁওতাল আদিবাসী মানুষেরা কিন্তু থেমে থাকে না। সহ্য করে না তাদের অত্যাচার। তারা লড়াইয়ে নামে। সূর্য সাউ এর বাড়ি রাতারাতি তারা ঘেরাও করে। ড্রাউট এর সময় আপার কাস্টের ইদারা ও টিউবওয়েল দখল করে দুলনরা। দোপ্দি সবেতেই ছিল মেইন। সূর্য সাউ ও তার ছেলেকে তারা খুন করে। এরপর দীর্ঘদিন দুলনের লোকেরা নিয়ানডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে। তারা লড়াই করতে থাকে সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই ছিল প্রশাসনের সামরিক শোষনের বিরুদ্ধে সমষ্টির লড়াই। জল জঙ্গলের লড়াই। দোপ্দি ও দুলনা যেহেতু আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রতিভূ তাই তারা টাঙি-তীর-হেঁসো ইত্যাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। তারা সেই ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, কারণ নিরন্তর তারা দিনের পর দিন অস্ত্র অভ্যাস করেন। এরপর সমস্ত ঝাড়খানীর জঙ্গল সেনাবাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর দোপ্দি ও দুলনা প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করছে সেহেতু তারা সব ঘিরে দেয় এবং স্বগর্বে ঘোষণা করে "তারাও সেনানী, র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল"। সমস্ত জঙ্গলে সেনানবাহিনী তল্লাশি চালায়, সমস্ত বনভূমি কেটে কেটে তাদের খোঁজার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় দুখীরাম ঘড়ারী দুলন মাঝিকে দূর থেকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। জঙ্গলে যে লড়াই চলতে থাকে তাতে দুলনকে হত্যা করার মধ্যে দিয়েও কিন্তু সংগ্রাম বন্ধ থাকেনি। এরপর তাদের চোখ পড়ে দোপ্দির উপর। সাঁওতালদের গোষ্ঠী সংগ্রাম আধিপত্য বিস্তারের লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই, জল জঙ্গল রক্ষার লড়াই। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করে তারা সেনানায়কের বিরুদ্ধে। মহাশ্বেতা দেবী প্রান্তিক মানুষদের এই জল জঙ্গল রক্ষা, তাদের আধিপত্য বিস্তার, শোষক শ্রেণির সঙ্গে সমষ্টির সংগ্রামকে এই গল্পের একাংশে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। দুলন মাঝিকে ধরতে পারলেও সহজে তারা দোপ্দিকে ধরতে পারে না। প্রথম ফেজে জঙ্গলের টপোগ্রাফি না জানায় পলাতকরা ধরা পড়লেও পরবর্তী ফেজে তারা ধরা দেয় না। এক্ষেত্রে যে দোপ্দির ভূমিকা প্রধান তা বুঝতে সেনানায়কদের সময় লাগে না। দোপ্দি নারী হলেও বিপ্লবী

চেতনার পরাকাষ্ঠায় জীবন্ত বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। দোপ্দিকে ধরতে পারলে তাদের অপারেশন সফলতা পাবে, তাকে ধরলেই সমগ্র দলকে ধরা যাবে এই ধারণাই ছিল তাদের মনে বদ্ধপরিকর। মুসাই টুডুর বউ ভাত রেঁধে দিলে দোপ্দি সেই ভাত আঁচলে বেঁধে চললে সে যেন কারোর ডাক শুনতে পায়, দোপ্দি সাড়া দেয় না। মহাশ্বেতার দোপ্দি দৃঢ়তায়, সংকল্পে, সক্রিয়তায় সমকালীন সময়ের নারী। যারা অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে না। গল্পে দোপ্দি জানে অন্যায়ের সঙ্গে কিভাবে মোকাবেলা করতে হয়। ধরা পড়লে তাকে কাঁউটার করবে তাও সে জানে। দোপ্দি সামনে তাকিয়ে উদ্ধশ্বাসে হাঁটতে থাকে, জঙ্গল তার একমাত্র লক্ষ্য। একদিকে দোপ্দির নির্ভিক সক্রিয়তা অন্যদিকে তাকে ধরার জন্য সেনাবহিনীর মরিয়া প্রচেষ্টা। মাইলের পর মাইল দোপ্দি হেঁটে চলেছে পেছনে কার পায়ের শব্দ। অবশেষে দোপ্দি ধরা পরল সেনানায়কের হাতে। সে বুঝেছে তার দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতাতেই সে ধরা পড়েছে। তবুও দলকে সতর্ক করার চেষ্টায় ধরা পড়ার মুহূর্তেও সে কুলকুলি দেয়।

মহাশ্বেতা দেবী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান সত্তরের দশকের সংগ্রামী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রান্তিক আদিবাসী সাঁওতালদের ওপর জোতদার মহাজনদের পাশবিক নির্মম অত্যাচার। সেই অত্যাচারিত সাঁওতালদের একজোট হয়ে তাদের জঙ্গলে পলায়ন, সমষ্টি সংগ্রাম, আধিপত্য কায়েম রাখা এবং নিজেদের বিপ্লবী চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

আধিপত্যবাদীদের কাছে দুলন, দোপ্দিসহ তার দলের সকলের সমষ্টি সংগ্রামকেই তিনি বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে তুলে ধরেন। নিজের বক্তব্যকেই যেন মহাশ্বেতা দেবী সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন।

**ঘ.**

মহাশ্বেতা দেবীর নারী জগৎ সমসাময়িক এবং তাঁর পূর্ববর্তী লেখিকাদের থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন। মহাশ্বেতা পূর্ববর্তী লেখকদের নারীরা একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেখানে মহাশ্বেতার নারী প্রতিবাদী, সমাজের শোষনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা যার তীব্র। মহাশ্বেতার নারী জানে যে নারী মাত্রেই ভোগ্যপণ্য নয়, তার নিজস্ব সত্তা আছে। সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার আছে। তার একটি জ্বলন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহাশ্বেতা দেবীর "দোপ্দি" নামক ছোটগল্পটি।

সত্তরের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনের আগুন যখন পশ্চিমবঙ্গের সারা জায়গায় প্রবহমান, এই পরিস্থিতিতে একদল যুবক-যুবতী বিদ্রোহে সোচ্চার হয়। তারা শপথ গ্রহন করে এই সমাজকে যেভাবেই হোক রক্ষা করতে হবে। একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে দোপ্দি, দুলন ও তার লোকজন। কিন্তু সমাজের রাষ্ট্রনেতা, পুলিশ, সেনাবাহিনীর কাছে তাদের সেই স্বপ্ন মূল্যহীন। ফলে স্বপ্ন ফলপ্রসূ তো দূরের কথা, তাদের স্বপ্ন দেখার

আগেই পুলিশের হাতে নিহত হতে হয়। অনেকেরই জায়গা হয় জেলখানায়। তাদের স্বপ্ন গড়ার আগেই ভেঙে যায়। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় তাদের আগামী দিনের সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ার পরিকল্পনা। "দোপ্দি" গল্পে এই দোপ্দি মেঝেন এমনি এক সাঁওতাল নারী যে কিনা বিপ্লবী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে জোতদার বা শোষিতের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে সমষ্টি সংগ্রামে নেমেছিল। একদিকে তার বিপ্লবী মানসিকতা অন্যদিকে নারী ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত রূপটি তুলে ধরেছিলেন মহাশ্বেতা দোপ্দি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। "দোপদি" গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখি অবশেষে পুলিশ প্রশাসনের হাতে দোপ্দি ধরা পড়ে। তারপর থেকেই দোপ্দির উপর পাশবিক অত্যাচার চলতে থাকে। সন্ধ্যে ৬ টা ৫৭ মিনিটে ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর এক ঘন্টা জেরা করা হয়। কিন্তু গায়ে হাত দেওয়া হয় না। এক ঘণ্টা পর সেনানায়কের নির্দেশে তাকে বানিয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই বানানোর মাত্রা বিভৎস সাংঘাতিক। একটা নারীর নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়। দোপ্দির উপর চলতে থাকে যৌন অত্যাচার। চেষ্টা চলতে থাকে তাকে ভিতর থেকে ভেঙে ফেলার। মহাশ্বেতা দেবী দোপ্দি চরিত্রের প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে কীভাবে নারীত্বের মুক্তি ঘটে তা পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। গল্পে দেখি:

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কী বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে।... পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত......বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?"[৩]

দোপ্দি বুঝতে পারে ওকে বেশ ভালোভাবে বানানো হয়েছে। উত্তর ভিক্টোরীয় যুগে নারীর শরীরের উপর এইভাবে যৌন নির্যাতন চালানো হয়। যে যৌনতা সমাজ অনুমোদিত নয়, যা চলে দোপ্দির ওপর, অথচ সমাজ যার প্রতি সমানভাবে আক্রমণাত্মক। এই অবস্থায় দোপ্দিকে সেনানায়কের তাঁবুতে নিয়ে আসার হুকুম দেওয়া হয় অর্থাৎ এখানে পুলিশ যেমন একদিকে রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতার প্রতীভূ। রাষ্ট্রের দমননীতি তার হাতে। সেই ক্ষমতাবলে সে দোপ্দিকে প্রথমে অত্যাচার করে, জেরা চালাতে থাকে, কিন্তু দোপ্দি ধরা দিলেও মুখ থেকে কোন কথাই বার করতে পারে না। কারণ মহাশ্বেতার দোপ্দি সেই নারী যে তার সংকল্পে অবিচল। অপরদিকে সেই প্রশাসন পুলিশ কিন্তু পুরুষ যাদের কাছে নারী ভোগ্যপণ্য লালসা চরিতার্থের রসদ মাত্র। তাই দোপ্দিকেও সেই পণ্যের রসদ হতে হয় জোরপূর্বক। তবে মহাশ্বেতার এই দোপ্দি নারীর সঙ্গে আর পাঁচটা নারীর একটু তফাৎ আছে। সে কিন্তু ধর্ষিত অবস্থাতেও এগিয়ে যায় বড় সাহেবের সামনে, এ যেন সমগ্র পুরুষ সমাজের কাছে দোপ্দির ব্যক্তিগত লড়াই। নিজের আত্মসম্মান রক্ষার লড়াই :

দোপ্দি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। স্তন দুটি ক্ষতবিক্ষত।[৪]

এ যেন নারীত্বের চরম প্রকাশ। পুরুষ সমাজ যেন নারীর ব্যক্তিগত লড়াইয়ের কাছে নতি স্বীকার করে। দোপ্‌দির এই নগ্নতা তৎকালীন সময়ের রাষ্ট্রব্যবস্থার উলঙ্গতাকে তুলে ধরে। পরিহাস করে :

দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানয়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?[৫]

এ যেন সমগ্র পুরুষ জাতির পৌরষত্বের প্রতি এক ঘৃণা, তাচ্ছিল্যের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় দোপ্‌দি। যে পুরুষ নারীদের লেংটা অর্থাৎ বস্ত্রহরণ শুধু করতে পারে নারীজাতির সম্মান সে রক্ষা করতে পারে না। নারী যে শুধু ভোগ্যপণ্য নয় সমাজের চোখে সেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে দোপ্‌দির এই ব্যক্তিগত লড়াই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের লড়াই। দোপ্‌দি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এভাবেই যেন হাজার হাজার দোপ্‌দি তৈরি হতে পারে আগামী ভবিষ্যতে, তাই দেখান "দোপ্‌দি" গল্পের মধ্যে দিয়ে। মহাশ্বেতা দেবী নিজের প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশ করেন দোপ্‌দি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। গল্পে দেখি:

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।[৬]

দোপ্‌দির এই ব্যক্তিত্ব, সাহসীকতা সমগ্র পুরুষজাতির আদিম বর্বর রূপটি টেনে খুলে দেয়। এই আক্রমণাত্মক সামাজিক অবস্থান, নারীর স্বাধীনতাহরণ তাকে শাসন ও শোষনের অস্ত্র হিসেবে দেশান্তরে ও কালান্তরে ব্যবহৃত করে আসছে। দোপ্‌দির ব্যক্তিগত লড়াই এই অবস্থানের বিপক্ষে। এখানেই সে ব্যতিক্রমী। সমস্ত নারী জাতির কাছে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী নারী সে। যার ব্যক্তিগত লড়াই, প্রতিবাদ সমগ্র ক্ষমতাবাণের মুখোশের আড়ালে পাশবিক, বর্বর, নৃশংস রূপটাকে টেনে খুলে দেয়, বর্তমানের মাটিতে। এখানেই মহাশ্বেতার 'দোপ্‌দি' গল্প স্বতন্ত্র।

**মূল্যায়ন :**

Social Realist দের কথা বলতে গেলে সর্বহারা প্রান্তিক মানুষদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন জনদরদী লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর কথা স্মরণে আসে। তাঁর কলম থেকেই বেরিয়ে আসে বাস্তব সময়ের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন সংগ্রাম। একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর গভীর জীবনবোধ থেকে উঠে আসা গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হলো "ধৌলী", "স্তনদায়িনী", প্রভৃতি। মহাশ্বেতা দেবীর নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা অনবদ্য ছোটগল্প দোপ্‌দি। এই দোপ্‌দি গল্পটির ব্যক্তি ও সমষ্টি সংকটের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পুরো প্রবন্ধটির মধ্যে। এখানে আলাদা আলাদা করে বিষয়গুলি অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে সমগ্র অংশটির পূর্ণাঙ্গ অবয়ব গঠন করা হয়। গল্পের প্রথম পর্যায়ে দেখি রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী

ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রান্তিক গোষ্ঠীর সমষ্টি সংগ্রাম, জল জঙ্গলের লড়াই। দ্বিতীয় পর্বে গল্পের মুখ্য নারী চরিত্র দোপ্‌দির নগ্ন রূপ প্রতিবাদী নারীসত্তার প্রকাশ ঘটায়। পুরুষ সমাজ ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে নারীকে যে ভাবে ভোগ করে আসছে দোপ্‌দির মধ্যে দিয়ে মহাশ্বেতা নিজে তার প্রকাশ ঘটান। মহাশ্বেতা দেবী গল্পের শেষে এই বার্তাটি আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন যে সমাজে এইরকমই হাজার হাজার দোপ্‌দির জন্ম হোক এবং তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিক। শেষ ভাগে বলা যায় মহাশ্বেতা দেবীর জৈবনিক সংগ্রাম, দোপ্‌দির তথা বিশ্বনারীর জৈবনিক সংগ্রাম একই বিন্দুতে উপনিত। দোপ্‌দি যেন মহাশ্বেতা দেবীর নিজস্ব চরিত্র। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিবাদী রূপটি দোপ্‌দি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মহাশ্বেতার কথাসাহিত্যে বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের যে আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটে তার পূর্ণ প্রতিফলন এই দোপ্‌দি গল্পটির চরিত্র চিত্রনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এখানে মহাশ্বেতার সংগ্রামী জীবনের এক অপূর্ব সংগ্রামী সৃজণ এই গল্প।

**তথ্যসূত্র :**

১। রহমান, আইভি, মহাশ্বেতা দেবীর সাথে এক সন্ধ্যা, দেশ পত্রিকা, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৫
২। দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, কোলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৬৩
৩। দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, কোলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৬৯
৪। দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, কোলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৭০
৫। দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, কোলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৭১
৬। দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, কোলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৭১

**গ্রন্থপঞ্জি**

**আকর গ্রন্থ**

১। রহমান, আইভি, ২০১৪, মহাশ্বেতা দেবীর সাথে এক সন্ধ্যা, ঢাকা, দেশ পত্রিকা
২। দেবী, মহাশ্বেতা, ২০০৪, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং

**সহায়ক গ্রন্থ**

৩। মল্লিক, দীপঙ্কর (সম্পাদক), ২০১৮, ২য় সংখ্যা, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, তবু একলব্য, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক), ২০১৫ মহাশ্বেতা নানা বর্ণে ও নানা রঙে, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন

প্রশান্ত কুম্ভকার

## চার গল্পকারের লেখনীতে 'চোর' গল্প : বিবিধ প্রেক্ষণ

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে চারজন জনপ্রিয় গল্পকার হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং প্রফুল্ল রায়। এই চারজন গল্পকারই 'চোর' নামক একটি করে বিখ্যাত ছোটগল্প রচনা করেছেন। কিন্তু গল্পগুলির দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাদ একেবারে আলাদা। আমরা সাধারণত ভাবি, যারা চোর তাদের কোনো মানবিকতা নেই, হৃদয়, সহানুভূতি, ভালোবাসা, এমনকি তাদের কোনো ইতিহাসও নেই। তাদের জন্মটাই হয়েছে বোধ হয় চুরি করার জন্য। চুরি করা ছাড়া তাদের আর কোনো সাধারণ জীবন নেই। চুরিই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গল্পকারগণ তাঁদের রচিত 'চোর' গল্পের মাধ্যমে দেখিয়েছেন তারাও মানুষ, তাদেরও হৃদয় আছে এবং জীবন-ইতিহাস আছে। যদিও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' গল্পের বিষয়বস্তু ও ব্যাঞ্জনা পৃথক। সেকথা নির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা করবো। এখন আমরা গল্পগুলির বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে গল্পকারদের বিবিধ দৃষ্টিকোণ আলোচনা করতে পারি।

সমাজের নিচুতলার মানুষদের প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতির প্রমাণ তাঁর 'চোর' গল্পে পাওয়া যায়। এই গল্পে তিনি বলেছেন- '...... চোরেরা জীবনে বড়ো একা। ওদের আপন কেহ নাই। কবির মত, ভাবুকের মত, নিজের মনের মধ্যে ওরা লুকাইয়া বাস করে। যে স্তরের অনুভূতিই ওদের থাক্, যে রুক্ষ শ্রীহীন সীমানার মধ্যেই ওদের কল্পনা সীমাবদ্ধ হোক্, ওদের অনুভূতি, ওদের কল্পনা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র, পরিবর্তনশীল। অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে ওরা বেশী চিন্তা করে। জীবনের এমন অনেক সত্যের সন্ধান ওরা পায়, বহু শিক্ষিত সুমার্জিত মনের দিগন্তে যাহার আভাস নাই।'[১] সংসারে সাধু মানুষ প্রচুর আছে। কিন্তু তাদের জীবনে কোনো গল্প নেই। অপরপক্ষে চোরের জীবন প্রেমিকের মতো গল্পময়।

গল্পের নায়ক মধু ঘোষ চোর। বৈধ উপায়ে আজ পর্যন্ত সে একটি পয়সাও উপার্জন করে নি। কোনো রকম নীতির সে ধার ধারে না। পয়সার জন্য মধু সব করতে পারে। শিশুর গলার হার ছিনিয়ে নিতে হাত কাঁপে না, পকেট কাটতে সিদ্ধহস্ত, মেলায় জুয়াড়ী সাজতে পারে, সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করে গৃহস্থের বাড়িতে সিঁধ কাটতেও পারে। অবৈধ ভাবে টাকা রোজগার করার প্রায় সমস্ত কৌশল তার আয়ত্বে। তবে প্রতিদিন সে চুরি করে না। একবার চুরি করার পর যা উপার্জন করে যতদিন না সেগুলি শেষ হয় ততদিন সে চুরি করে না। এই তার স্বভাব। এজন্য মাঝে মাঝে অভাবের পীড়নে তার ও কাদুর কষ্টের সীমা থাকে না। কাদু তার স্ত্রী। কাদুকে সে অত্যন্ত ভালবাসে এবং সবসময় তার মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা

করে। এখন বর্ষাকাল এবং মধুর জ্বর। সেইসঙ্গে আগের উপার্জন শেষের মুখে। ফলে এসময় একবার সিঁধ কাটার কথা মধুকে ভাবতে হয়।

বর্ষাকালের রাত্রে চুরি করার বিশেষ সুবিধাগুলিও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। যেমন অমাবস্যার রাত্রির চেয়েও বর্ষাকালে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়, বর্ষার ঠাণ্ডায় মানুষ গভীরভাবে ঘুমায়, শত প্রয়োজনেও সহজে কেউ ঘর থেকে বাইরে যায় না, গ্রামের কুকুরগুলি আশ্রয় খুঁজে মাথা গুঁজে থাকে এবং অল্প পদশব্দে খাঁ খাঁ করে ওঠে না, গৃহস্থের ঘরের দেওয়াল বর্ষার জলে নরম হয়ে থাকার জন্য সিঁধ কাটা সহজ এবং শব্দ কম হয়।[২] অথচ এতসব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মধু নিরুপায়। কারণ মধুর গায়ে এখনো জ্বর। স্ত্রী কাদুর মন মেজাজও ঠিক নেই। কবে যে সে কাদুর মুখে আবার হাসি ফোটাতে পারবে কে জানে। তার মনে হয়েছে যত দিন যাবে অভাব বাড়বে আর কাদুর বিরক্তিও সেই অনুপাতে বাড়বে। ইতিমধ্যে কাদুর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটিও হয়ে যায়। কাদুর মন্তব্য, মজুর খাটলেও মানুষ মধুর থেকে বেশী টাকা রোজগার করবে। মধুকে বিয়ে করে তার সাধ আহ্লাদ সব চুলোয় গেছে। চার বছর ঘর করে ক-গাছা রুপোর চুড়িই শুধু জুটেছে তার কপালে। অন্য লোক হলে কত কী দিত। কাদুর মুখে এইসব শুনে মধু অবাক হয়ে যায়। চার বছর আগে দু'শ টাকা পণ দিয়ে সে কাদুকে বিয়ে করেছে। তিন-চার বছর জেলে যাওয়ার বিপদ মাথায় করে এতগুলি উপার্জন করা টাকায় কাদুকে বিয়ে করে মধু একদিনের জন্যও আপসোস করে নি। কাদুর ভালোবাসার কাছে সে টাকা তার তুচ্ছ মনে হয়েছে। কাদুর প্রতি তার অপরিসীম মমতা আছে। কাদুর চোখে জল দেখামাত্র সে গলে জল হয়ে যায়। তাই কাদুর মুখে হাসি দেখার জন্য সে সবকিছু করতে পারে।

কয়েকদিন আগে মধু খবর পেয়েছিল, গ্রামের রাখাল মিত্র অনেক টাকা নিয়ে বাড়ি এসেছে। রাখালের বৌ স্বামীসেবার সুবিধার জন্য একটা ঝি রাখার কথা ভাবে। ঘরের সন্ধান এনে দেবার জন্য মধু কাদুকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে ঐ ঝিয়ের কাজে পাঠায়। কোন্ ঘরের কোন্ দিকে রাখাল ঘুমায়, তার ছেলে পান্নালাল কোন্ ঘরে থাকে, বাক্স-প্যাঁটরা কোথায় থাকে, এসব খবর কাদু তাকে দিয়েছিল। কিন্তু রাখালের বাড়ী কাজ করতে যাওয়ার পরই কাদুর হাবভাব বদলে যায়। মধু ভেবেছিল লোকের বাড়ি ঝিয়ের কাজে পাঠানোর জন্য হয়তো কাদু তার ওপর অভিমান করেছে। কিন্তু মধু লক্ষ্য করেছে জ্বরের কয়দিন কাদু মধুর ভালো করে যত্ন নেয় নি, না ডাকলে কাছে আসে নি, সময়মত খেতে পর্যন্ত দেয় নি। ঝিয়ের কাজ ছেড়ে দিতে বললে সে বলেছে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে লোকে সন্দেহ করবে। মাঝখানে একদিন আবার রাখালের ছেলে পান্নালাল এসে বলে যে দিন পনেরো তার স্ত্রী রাজুর সঙ্গে কাদুকে রাজুর বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। মধু অবশ্য রাজি হয় নি। তাতে কাদু মধুর সঙ্গে দু'দিন ভালো করে কথা বলে নি। আপসোস করে বলেছে, রাজুর বাপের

বাড়ি গেলে দশ টাকা মাইনে দিত, মধুর জন্য দশটা টাকা জলে গেল। কয়েকদিন আগের কথার সুত্র ধরেই মধু মনে করেছে যে, তার থেকে কাদু টাকাকেই বেশি ভালোবাসে। সোনার চুড়ির বদলে তাকে রুপার চুড়ি দিয়েছে বলেই কাদু তার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তাই কাদুকে সোনার চুড়ি দিতে গেলে তাকে একটা বড়ো রকমের চুরি করতে হবে এবং সেটা এই বর্ষার রাত্রিতে।

অথচ কাদু যদি মধুর গলা জড়িয়ে ধরে একবার বলত, 'অসুখ শরীরে আজ তুমি যেও না গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কথা শোন, লক্ষী, নইলে আমি গলায় দড়ি দেব'- তাহলে হয়তো মধু আজ জ্বর গায়ে নাও বেরোতে পারত। কিন্তু আজ মধুর কোনো কথাকেই কাদু গুরুত্ব দিল না। তাকে গায়ে মাখার তেল দিল না, সিঁধকাঠি ধারালো করার জন্য শিলটাও এনে দিল না। বলল 'বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে আছে, ওতেই হবে।' শেষে যখন মধু প্রশ্ন করে 'তোর ভাবখানা কি বল্ ত ? ও-রকম করছিস কেন? তখন কাদু থতমত খেয়ে বলেছে যে, মধুর জন্য তার ভাবনা লাগছে, গৃহস্থের বাড়ির লোক সজাগ থাকলে মধু যেন সিঁধ না দেয়। মধু ভাবে তবু যেতে বারণ করবে না। প্রেমিকের বুক ভরা অভিমান এবং অসন্তোষ নিয়ে মধু ঘনঘোর বর্ষার রাতে চুরি করতে বেরিয়ে গেল। রাস্তার পাশে সবচেয়ে ভাঙাচোরা ঘরটি দেখে তার মনে হল, এ বাড়ির বৌ সাতদিন ধরে অভুক্ত থাকলেও বোধহয় তার স্বামীকে এই অন্ধকার বাদলের রাতে ঘরের বাইরে যেতে দেবে না। ঐ স্বামীটির ভাগ্যের সঙ্গে তার নিজের ভাগ্যের পার্থক্য তার অজানা নয়। ও চোর নয়, সে চোর। তাই নিজের সুখের জন্য কাদু তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অনেক দিন পর আজ ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্যের সংস্কার মধুর মনে জাগ্রত হল। নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হল। লেখক বলেছেন- '......রত্নাকরের মত সহসা মধু অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, এতকাল সে অতি ঘৃণ্য জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে। অকথ্য কদর্য জীবন। পাপের তাহার সীমা নাই। নরকেও তাহার ঠাঁই হইবে না।'[৩] একবার তার মনে হল চুরি করে কাজ নেই, ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু কাদুর কথা মনে হওয়ায় ফেরার ইচ্ছাটা তাকে দমন করতে হল। এমন অবস্থাতেও তার মনে হয়েছে যে, এতদিন কাদু তাকে তার দুর্লভ রূপ-যৌবন ও স্নেহ দিয়েছে, আজ না দিক এতদিন তো দিয়েছে। সেই দাবিতে কাদুর এই সোনার চুড়ির জন্য প্রার্থনা মধুর কাছে অসঙ্গত নয়। তাই ফিরে গেলে তার চলবে না। চুরি করে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। ফলে পাপ-পূণ্য সম্পর্কে ধারণা তার বদলে গেল। সে ভাবল—' কিসের পাপ? জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে। কেউ করে আইন বাঁচাইয়া, কেউ আইন ভেঙে। স্বাধীনতার মূলধন লইয়া এ ব্যবসায় নামিতে যাহাদের সাহস নাই, চুরিকে পাপ বলে শুধু তাহারাই। পারিলে তাহারাও চুরি করিত। চোরের চেয়েও তাহারা অধম। তাহারা ভীরু, কাপুরুষ।'[৪] চুরি করার মধ্যে মধু

আত্মপ্রসাদ লাভ করতে লাগল। এই ভেবে সে কৌতুক বোধ করতে লাগল যে রাজার খাজনা মেটাবে বলে, দেনা শোধ করবে বলে, মেয়ের বিয়ে দেবে বলে রাখাল বিদেশ থেকে খেটেখুটে টাকা উপার্জন করে নিয়ে এল; সেই টাকা কয়েক মিনিটের মধ্যে মধুর হয়ে যাবে।

রাখালের ঘরে সিঁধ কেটে প্রবেশ করার পর আরেকবার মধুর হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়। ঘুমন্ত রাখালের কিশোরী মেয়েকে দেখে একটু স্পর্শলাভের জন্য তার মন কেঁদে উঠল। একটি সুখী ঘুমন্ত পরিবারকে দেখে নিজের জীবনের সঙ্গে ভদ্রলোকের জীবনের তুলনা করতে লাগল। চুরি না করে সে কি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারে না? প্রয়োজনে সে মজুর খাটবে, গরু কিনে দুধ বিক্রি করবে, জমি কিনে চাষ করবে। চুরি করে লাভ কী? পরক্ষণেই গল্পকার মন্তব্য করেছেন- 'প্রত্যেক চোর মধ্যে মধ্যে নিজেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। চোর চুরি না করিয়া করিবে কি? চুরি ছাড়া চোরের জীবনে আর সবই যে আকাশকুসুম।'[৫] ফলে মধুর এত অনুতাপ, সৎ হওয়ার আকুল বাসনা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল এবং রাখালের তোরঙ্গটি সিঁধের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমবাগানে ঢুকে তোরঙটি ভেঙে নোট ও খুচরা টাকা দেখে মধুর মন আনন্দে নেচে উঠল। এক-দেড় বছরের উপার্জন সে একদিনেই করেছে। কাদু কত যে খুশি হবে তার ঠিক নেই। এই সব ভাবতে ভাবতে মধু বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু কাদুর কোনো সাড়া নেই। মধু ভাবল ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রদীপ জ্বেলে মধু দেখল বিছানায় কাদু নেই। কাদুর কাপড়-গয়না কিছুই নেই। চুরি করা টাকার খোলটি মাটিতে পড়ে গেল। মনে হল তার আবার জ্বর আসছে। তার বুঝতে বাকি থাকল না যে তার ঘরের মানুষ, তার ভালোবাসার মানুষটি চুরি হয়ে গেছে। মধুর মনে পড়ে যায়, জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোর' গল্পে দেখা যায় চোর অমূল্যের স্ত্রী রেণু স্বামীর চৌর্যবৃত্তিকে ঘৃণা করলেও অবশেষে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেই চুরি করে চোরে পরিণত হয়েছে। অমূল্য চুরি করে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসে। স্ত্রী রেণুর তা অসহ্য লাগে এবং বাধা দেয়। কিন্তু অমূল্য তার কথা গ্রাহ্য করে না। উল্টে চুরি করায় তার হাত যে বেশ পাকাপোক্ত এই ভেবে সে গর্ব অনুভব করে। যে দোকানে অমূল্য চাকরি করে সেখান থেকেও মাঝে মাঝেই জিনিস সরিয়ে নেয়। অমূল্যের আরও একটা দোষ ছিল। সে বাসে-ট্রামে উঠলে টিকিট কাটত না। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি লেগেই থাকত। এই লোকটির সঙ্গে সে সারা জীবন কাটাবে কী করে? এই ঘৃণা করা মানুষটিকেই ভালবাসতে হবে, জড়িয়ে ধরে আদর-সোহাগ করতে হবে, তারপর ছেলে-মেয়ে হবে; অথচ অমূল্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। তার ধারণা চুরির স্বভাব মানুষের কখনো যায় না।[৬] একদিন ভোরে উঠে অমূল্য তার স্ত্রীকে বিনোদবাবুদের ঘরে কাঁসার বাটি চুরি করতে বলে। কারণ বিনোদবাবুর বৌয়ের সঙ্গে রেণুর

খুব ভাব। তার ছোটছেলেটি রেণুর হাতে ছাড়া খেতেই চায় না। অমূল্য বলে, 'তবে তো আরও সুবিধে। দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে কাপড়ের তলায় করে বাটিটা অনায়াসে তুলে আনতে পারবে।' ওঘরে রেণুর অবাধ গতিবিধি।

কয়েকদিন পর অমূল্যকে চুরির দায়ে চাকরি খোয়াতে হল। অনেক জায়গায় চেষ্টা করেও চাকরি জোগাড় করতে পারল না। দিন কয়েকের মধ্যেই ঘরে চাল, তেল, নুন, ডাল বাড়ন্ত হয়ে পড়ল। অমূল্য চুরি করা স্নো আর সাবানের বাক্স বিক্রি করতে চাইল। রেণু বলল, কদিন আর এভাবে চলবে। এর পরেই গল্পের মোড় ঘুরতে থাকে। অমূল্য আবার চুরি করতে শুরু করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রেণু চুরির জন্য আর অমূল্যকে বকাবকি করে না। দুদিন পরেই তাদের বাড়ি চালে-ডালে-তেলে-কয়লায় ভরে ওঠে। রেণুর জন্যও এল সুগন্ধি নারকেল তেল এবং স্নো। রাত্রে স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে এত সাহস ভালো নয়, তার এখনো গা কাঁপছে। অমূল্য বলে, সাহস না থাকলে এতদিন তাদের উপোস দিয়ে মরতে হত। সে আরও বলে, রেণুর চুরি করার এত সুযোগ, কিন্তু ভীরু এবং অকর্মার ধাড়ী সে। অভিমানে রেণুর ঠোঁট ফুলে উঠতে লাগল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে এর যোগ্য জবাব একদিন সে অমূল্যকে দেবে।

দু'তিন দিন পর সুযোগ এল। রেণুর হাত কাঁপে আর বুক ঢিপ ঢিপ করে। কোনোরকমে বিনোদবাবুর হাত ঘড়ি ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। রাত্রে অমূল্যের হাতে ঘড়িটি পরিয়ে দেয়। অমূল্য অবাক হয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলে— 'কি সর্বনাশ! এ তুমি কোথায় পেলে?' উত্তর না দিয়ে রেণু জানতে চাইল ঠিক মানিয়েছে কিনা। লেখক বলেছেন, মানাবারই তো কথা। আজ রেণু তার যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য অমূল্যর কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে দু'খানি হাত তার কণ্ঠে জড়ানো রয়েছে তা আজ তার কাছে শ্রীহীন, কলঙ্কিত মনে হয়েছে।[৭] স্ত্রী রেণুকে সে ভালোবাসে। তাই মুখে বললেও স্ত্রী'র চোর হয়ে ওঠা তার অসহ্য মনে হয়েছে। গল্পে অমূল্যের চুরি থেকেও রেণুর চোর হয়ে ওঠার কাহিনীটি অধিক আকর্ষণীয়। একদিকে সংসারের অভাব অন্যদিকে চোর স্বামীর সংস্পর্শ তাকে ধীরে ধীরে চোরে পরিণত করেছে।

প্রফুল্ল রায়ের 'চোর' গল্পে আমরা দেখি খলিলের বউ আকলিমাকে রজিবুল চৌধুরি চুরি করে মেঘনার এপারে মামুদপুরে এনে তুলেছে। খলিল আকলিমাকে অনেক খোঁজে কিন্তু পায় না। যে সারিন্দা বাজিয়ে খলিল আকলিমাকে গান শোনাত, সেই সারিন্দা নদীতে সে ভাসিয়ে দেয়। বেঁচে থাকার জন্য একপ্রকার বাধ্য হয়েই খলিলকে আবার বিয়ে করতে হয়। ছেলে-মেয়েও হয়। তারপর অভাবের তাড়নায় চুরি করতে বাধ্য হয়। মেঘনা নদী পার হয়ে যে ঘরে খলিল সিঁধ কেটেছে সেই ঘর যে আকলিমার, তা সে ভাবতেও পারে নি। গভীর বর্ষার ঘনঘোর রাত্রে আকলিমার সঙ্গে এত বছর পর আবার তার দেখা হয়ে যায়।

আকলিমা জানায়, কয়েক বছর আগের সেই অভিশপ্ত রাত থেকে অসহ্য বন্দী জীবন তাকে মেনে নিতে হয়েছে। রজিবুল আকলিমাকে বিশ্বাস করে না। তার মনে সারাক্ষণ সন্দেহ, এই বুঝি আকলিমা পালিয়ে যায়। সেই জন্য বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তালা লাগিয়ে ভয়ঙ্কর শাসিয়ে যায়- ‘পলানের মতলব করবি না। যেইখানেই যাস আমারে ফাঁকি দিতে পারবি না। ধরতে পারলে এক্কেবারে শ্যাষ্ কইরা ফেলুম।’[৮] শয়তানটা তাকে শেষ করে দিয়েছে। তাই আর এখানে সে থাকতে পারবে না। সে খলিলের সঙ্গে চলে যেতে চায়। কিন্তু খলিল বাধা দেয়। কারণ তার অভাবের সংসার। সেখানে গেলে সে না খতে পেয়ে মরবে। তার থেকে এখানেই থাক, অন্তত খেয়ে পরে বাঁচতে তো পারবে।

খলিল অন্য কোথাও গিয়ে চুরি করার কথা বলে। গভীর বিষাদে আকলিমার মন ভরে যায়। ফুপিয়ে কাঁদে। তারপর অন্ধকারে গা থেকে রুপোর গোট, বেসর, নাকফুল- সব খুলে খলিলকে দেয়। আর বলে খলিল যেন আবার আসে। একবার নয়, বারবার। তারপর গলা নামিয়ে বলে- ‘পারলে একখান সারিন্দা কিন্যা লইও।’ হঠাৎ বাইরে তালা খোলার শব্দ হয়। খলিলকে সিঁধ দিয়ে আকলিমা বাইরে বের করে দেয়। তারপর রজিবুলের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে —‘তুমি আমারে একা ফেলাইয়া যাও এই জঙ্গলে। এই দ্যাখো সিঁদ কাইটা চোরে আমার গয়নাগাটি কাইড়া লইয়া গেছে। একা আছি ডরে চিল্লাইতে পারি নাই।’[৯] বোঝা যায়, এইভাবেই আকলিমা রজিবুলকে ঠকিয়ে তার ধনসম্পত্তি চুরি করে খলিলের হাতে তুলে দেবে এবং তিলে তিলে রজিবুলকে শেষ করে দেবে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘চোর’ গল্পটি একটি ক্ষুদ্র পেঁপে গাছের চারাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। স্কুল যাবার পথে নর্দমার ধারে কচু আর কাঁটানটের জঙ্গলের মাঝে সদ্য লিকলিকে একটি পেঁপে চারা গল্পকথক মিন্টুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে সেটিকে সযত্নে উপড়ে বাড়ি নিয়ে এসে রান্না ঘরের পিছনে ছাই আর জঞ্জালের মধ্যে রোপণ করে। সেই দিনেই বড়বাড়ির চাকরী খুইয়ে মদন এ বাড়িতে এসে কোনরকমে কাজ জুটিয়ে নেয়। এরপর মিন্টু আর মদন পেঁপে চারার পরিচর্য্যায় উঠে পড়ে লাগে। ঘটনাচক্রে মদন আবার বড়বাড়িতে কাজ পায় এবং মুহূর্তে এবাড়ির মায়া কাটিয়ে ওবাড়িতে গিয়ে ওঠে। তারপরই হঠাৎ মিন্টুর পেঁপে গাছটি উধাও হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে বড়বাড়ির ছেলে সুকুমারের সঙ্গে মিন্টুর বন্ধুত্ব হয় এবং ক্রমশ তা প্রগাঢ় হতে থাকে। ছ’মাস পরে মিন্টু জানতে পারে যে বিত্তশালী মনিবের বাড়িতে চাকর নিযুক্ত হওয়ার পর মদনই এই গাছটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে অনুভব করে যে মদন পেঁপে গাছটিকে চুরি করে নিয়ে যায় নি, পেঁপে গাছটিই মদনকে তাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। শুধু মদনকেই নয়, তাকেও। না হলে তাদের ছোট ঘরের উঠোন, বাগান, মায়ের স্নেহ ভুলে গিয়ে কি করে সুকুমারদের বাড়িতে সবসময় সে পড়ে থাকে। তারপর আর কোন দিন মিন্টু ওবাড়িতে যায় নি।[১০]

গল্পের বিষয়টি মোটামুটি পেঁপেচারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও বিষয়ের অন্তরালে লেখক আসলে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও সর্বহারা শ্রেণীর মানসিকতা এবং সামাজিক অবস্থানকেই বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুকুমারদের পরিবার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা মানবিকতার ধার ধারে না। তাই অসুস্থ হয়ে চাকর মদন দেশের বাড়ি গেলে তাকে আর কাজে নেয় নি। অন্যদিকে মিন্টুর পরিবার হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই শ্রেণীর মধ্যে মানবতাবোধ, সততা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি কাজ করে। তাই বড়বাড়ির লোক মদনকে তাড়িয়ে দিলে তারা আশ্রয় ও কাজ দিয়েছে। আবার মদন এই গল্পে সর্বহারার প্রতিনিধি। এরা যেদিকে সুবিধা থাকে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। তাই দেখা যায় মিন্টুদের বাড়িতে কাজ পেয়ে বড়বাড়ির বদনাম করেছে। আবার বড়বাড়িতে কাজ পাওয়ার পর ঐ বাড়িতেই থেকে গেছে। আসলে অভিজাত বাড়ির চাকর হওয়ারও যে একটা আভিজাত্য আছে তা মদন বিশ্বাস করে।

**তথ্যসূত্র :**


১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : স্ব-নির্বাচিত গল্প, শুয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ৭ই আষাঢ়, ১৩৬৩, পৃ : ৫৪।

২। তদেব, পৃ : ৪৩।

৩। তদেব, পৃ : ৫১।

৪। তদেব, পৃ : ৫৩।

৫। তদেব, পৃ : ৫৬।

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্র : গল্পমালা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৫৬, পৃ : ৩১।

৭। তদেব, পৃ : ৩৪।

৮। প্রফুল্ল রায় : গল্প সমগ্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৫১, পৃ : ২০৩।

৯। তদেব, পৃ : ২০৫।

১০। নিতাই বসু : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ : ১৮৪-১৯৭।

মহ: নিসার সোহেল মিদ্দ্যা

## সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে নারী মন ও মনস্তত্ত্ব

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকেই পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রের কথাও উঠে এসেছে সমান্তরালভাবে। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে ঘুরে ফিরে এসেছে নারী মনের বিচিত্র অনুভূতির কথা। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো পুরুষ চরিত্রকে পিছনে রেখে নারী চরিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং তার বৈচিত্র্য বহু ধারাই বিভক্ত হয়েছে। ১৯৩০ সালের ১৪ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এই গ্রাম্য লেখকের উপন্যাসেও নারী চরিত্রেরা উঠে এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। তাঁর লেখায় চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও বৈচিত্র্যময়। গ্রাম ও শহর উভয় প্রেক্ষাপটেই নারীর স্বতন্ত্র উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। নারী কেবলমাত্র তাঁর নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কখনো  হয়ে উঠেছে প্রতিবাদিনী, আবার কখন হয়েছে বিদ্রোহী তো কখনো আত্মসংযমী। 'অলীক মানুষ'  (১৯৮৮) উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিচিত্র অনুভূতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম অন্তঃপুরের মহিলাদের মনোবেদনার কথা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কাছে কখনো নির্বিকার থাকা আবার কখনও অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যধিক সচেতন হয়ে উঠা সবই এই উপন্যাসে নারী চরিত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে।

উনিশ শতকীয় ফরাজী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারীজন্মের প্রতিবাদহীন অসহায় জীবন যন্ত্রণাকে দেখানো হয়েছে দিলরুখ ওরফে রুকু চরিত্রের মধ্যে। জীবন রসের প্রাচুর্যে ভরপুর রুকু তার জীবনকে উপভোগ করতে ছেয়েছে। শফিকে প্রথম দেখা মাত্রই সে তার প্রেমে আসক্ত হয়েছে। এ প্রেম যেন তার জীবনে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। ভালোবাসার সমস্ত রূপ ও রসকে আস্বাদন করতে চেয়েছে শফির মধ্য দিয়ে কিন্তু তার এই মনবাসনা পূর্ণ হয়নি। শফির সাথে বিয়ে ঠিক হবার পরেও কেবলমাত্র বারি চাচার অমতে সে বিয়ে হয়নি। কেবলমাত্র পরিবারের কথায়  নিজের ভালবাসাকে আত্মবলিদান দিয়ে পরিবারের মতকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের পছন্দের পাত্র মনিরুজ্জামানের সাথে বিয়েতে রাজি হয়েছে। পরিবারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুকুর পক্ষে  যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক একদিকে যেমন মুসলিম অন্তঃপুরের অশিক্ষিত, অপরিণত এক গ্রাম্য প্রতিবাদহীন অসহায় কিশোরীকে দেখিয়েছেন ঠিক একইভাবে তিনি দেখিয়েছেন নারী জন্মের জীবন যন্ত্রণাকে। রুকুর উপর চলে মনিরুজ্জামানের অকথ্য কামার্ত অত্যাচার। রজঃস্বলা অবস্থাতেও তার রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয় অসহ্য যন্ত্রণাকে। নিজের শরীর

ও মন তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। সে নিজের মুক্তির জন্য খোঁড়া পিরের শরানাপন্ন হয়েছে। তাঁর মাজারের দিকে সকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের পরিত্রাণ প্রার্থনা করেছে—

"না-সত্যিই সে ভালো নেই। যখন-তখন একটা জন্তুমানুষের কামার্ত আক্রমণ, এমনকি রজস্বলা অবস্থাতেও রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে রুকু তার অবশ শরীর রেখে পালিয়ে যায়—পালাতেই থাকে, দূরে —বহুদূরে। কিন্তু কোথায় যাবে? কার কাছেই বা তার এই মানসিক সফর?"[১]

নারী চরিত্রের এই যে যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তা প্রকাশ পেয়েছে রুকুর মধ্যে যা তৎকালীন সময়ে নারীর সহজাত ক্ষমতাকে তুলে ধরেছে। সমাজে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হতে ক্রমশ সেই বঞ্চনাকেই ভবিতব্য ভেবে শুধু মানিয়ে নিয়েছে তাই নয়, মেনেও নিয়েছে। রুকু কখনই সংযম হারিয়ে ফেলেনি। বিশেষ ভাবে সক্ষম স্বামীকেও নিজের মত করে ভালবেসেছে। একটা সময় রুকু নিজে উপলব্ধি করেছে যে নিজের স্বামীকে বঞ্চনা করে শফির প্রতি তার যে অবৈধ টান ছিল তা তার নৈতিকতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। সেইজন্যই শেষ পর্যন্ত সে তার স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অন্যদিকে এই রুকুর মধ্যেই আবার প্রতিবাদী মানসিকতা দেখা গেছে। শেষপর্যন্ত রুকুও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যারা তার কথা ভাবেনি তাদের সঙ্গে কোন সংসর্গ রাখতে চায়নি। শেষপর্যন্ত রুকুর জন্য তার মায়ের ব্যাকুল প্রাণের কথা বুঝতে পেরেও তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। রুকু এখন অনেক পরিণত, সেই আবেগ আর উচ্ছ্বাস নেই। নিজের জন্য বাঁচতে শিখেছে রুকু। তার না বলা কথাও যে একপ্রকার মৌন প্রতিবাদ তা লেখক ফুটিয়ে তুলতে ছেয়েছেন। এসব সহ্য করতে না পেরে রুকুর মা আত্মঘাতী হয়েছে। নৈঃশব্দের প্রতিবাদ ছাড়াও রুকুর মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা দেখা গেছে। রুকুর কথায়—

"ও জমি হারাম। শ্বশুর-হজরতের হুকুম অমান্য করতে পারব না।"[২]

'অলীক মানুষ' উপন্যাসের আর একটি বহুল চর্চিত চরিত্র হল পীর বদিউজ্জামানের স্ত্রী সাইদা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও প্রেক্ষাপটে লেখক এই চরিত্রকে তুলে এনেছেন। সে কেবলমাত্র পীরের স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কখনো হয়ে উঠেছে মা, তো কখনো শাশুড়ি আবার একজন বাঙালি মুসলিম সংস্কারী গৃহবধূ। পীর পরিবারের সমস্ত ধর্মীয় রীতি, আচার অনুষ্ঠান ও বিধি সবকিছুই একজন বধূ হিসাবে ভালভাবেই মেনে চলত। যেহেতু সে ছিল পীরের স্ত্রী তাই আর পাঁচ জন গৃহবধূর মত খোলামেলা ও স্বাধীনতা ছিল না। এত কিছুকে উপেক্ষা করেই সবকিছুকে মন থেকে মেনে নিয়েছিল সংস্কারী সাইদা। ধর্মীয় আদাব ও আচারে কোন আপত্তি ছিলনা বরং মন থেকে ভালবাসত। স্বামীর যত্ন ও সেবায় সর্বদা সচেতন থাকত। সুফি পীর বংশের একজন স্ত্রী হিসাবে নিজে গর্ববোধ করত। স্বামী সেবা পরম ধর্ম এই মতে বিশ্বাসী হয়ে স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। তার স্বামীর জীবন ছিল

একঅর্থে যাযাবর জীবন। সুস্থির জীবন যাপন কে না ভালবাসে কিন্তু সইদার ক্ষেত্রে হয়েছে ঠিক উল্টো। শফির জন্মানোর পর থেকে যাযাবর জীবনে কাঁঠালিয়া, পোখরা, নবাবগঞ্জ, খয়রাডাঙ্গা, থেকে মৌলাহাট এরকম অনেক জায়গায় তারা বাসা বদল করেছে কিন্তু সইদা একবারের জন্যও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেনি। এ সব কিছুকেই সে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করেছে। একজন সুদক্ষ ও লক্ষ্মীবান বধু হিসাবে নিজের পরিচিতি মজবুত করেছে। লেখকের কথায়—

“এতো গেল দায়িত্বশীলা গৃহকত্রীর রূপ। জননী হিসাবেও সাইদা যেমন কর্তব্যপরায়ণ তেমনি স্নেহশীলা। পুত্রদের সম্পর্কে স্বামী বদিউজ্জামান উদাসীন ছিল বলে সাইদা অতিরিক্ত মনোযোগ সহকারে সে উদাসীনতার শূন্যস্থান পূরণ করে দিত। কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ও প্রতিবন্ধী হওয়ায় মনিরুজ্জামানের দিকে ছিল তার অধিক আগ্রহ ও দায়িত্ব পরায়না। আবার ছোট পুত্র শফিকেও সে সদাসর্বদা আগলে-আগলে রাখত। এমন-কী শফির এনারকিস্ট জীবনে সে যখন যাযাবরের মতো সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সাইদার সকাতর মাতৃ-হৃদয়ের অনবদ্য প্রকাশ তাকে জীবন্ত করেছে।”[৩]

সাইদা চরিত্রের মধ্যে লেখক দ্বিবিধ সত্ত্বাকে তুলে ধরেছেন, একদিকে যেমন সে রক্ষণশীল গৃহবধূ ঠিক উল্টোদিকে সে একজন বিদ্রোহিনী নারী। এযাবৎ পাঠক মনে তার সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল তা পুরো পাল্টে যায়। যে স্বামীকে সর্বদা মাথায় তুলে রাখত সেই স্বামী যখন দ্বিতীয় আর একটি সম্পর্ক তৈরি করে সেই মুহূর্তেই স্বামীর বিরুদ্ধে গিয়ে প্রবল প্রতিবাদ গড়ে তোলে এবং তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাকে বিদ্ধ করে। বদিউজ্জামান যখন অনেক দিন পর সাইদার কাছে তার যৌন তৃপ্তি মেটাতে এসেছিল তখন সে দৃঢ় গলায় তা প্রত্যাখ্যান করেছে যা সাইদা চরিত্রের স্বরূপকে উন্মোচিত করেছে। নারীরও যে একটা মন আছে যখন খুশি যা ইচ্ছে করা যায় না সেই ভাবনারই প্রতিফলন হয়েছে। এই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সাইদা তার স্বামীকে অলৌকিক জগত থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে টেনে নামিয়েছে যা সাইদাকে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী করেছে।

এই উপন্যাসে আমরা ইকরাতুন এর পরিচয় পেয়েছি কুষ্ঠ রোগী আবদুলের বউ হিসাবে। একদা ইকরাতুন ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। স্বামীর সহমরণের চিতা থেকে তুলে এনে তাকে বিয়ে করেছিল আবদুল। ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় ইকরাতুন ছিল বেশরম মহিলা, সর্বদা বেপর্দা হয়ে থাকত, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এতে তার কোন দোষ ছিলনা কেননা সে উভয় ধর্মের সংস্কৃতিকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। যখন সে সমাজে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর ঠিক সেই সময়েই বদিউজ্জামান তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় কিন্তু ইকরাতুন প্রত্যাখ্যান করে বলেছে আমার ইচ্ছে নেই হুজুর। পুরুষ মানুষেরা নেমকহারাম, তাদের জন্য আমার ঘেন্না হয়। একজন ধর্ম গুরুর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের

মধ্য দিয়ে পুরুষ তন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার জবানীতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পুরুষের কাছেই তাকে হার মানতে হয়েছে। বদুপীরের সন্তান তার গর্ভে ধারণ করেছে, তার নামে কুৎসা রটানো হয়। ইকরা পালিয়ে গিয়ে করুনা নাম নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। পীরের নামে অপবাদ রটবে আর ভক্তরা তা সইবে কিভাবে তাই ডাইনি অপবাদ দিয়ে ইকরাতুনকে হত্যা করা হয়। ধর্মীয় আবেগকে মানুষের মধ্যে বজায় রাখতে গিয়ে বলী হতে হয়েছে ইকরাতনকে। নারীর আবেগ, ইচ্ছা, কামনা, বাসনা যুগ যুগ ধরে অবহেলিত সেই ধারায় বহমান ইকরাতুন চরিত্রের মধ্যে। নারীর জীবনের চরম ব্যর্থতাই ধরা পড়েছে ইকরাতনের মধ্যে।

অলীক মানুষ উপন্যাসের আর একটি আলোচিত চরিত্র হল দরিয়াবানু। উপন্যাসিক সিরাজ তার উপন্যাসের নামের সার্থকতা যেন এই দরিয়াবানু চরিত্রের মধ্যে খুঁজেছেন। বাস্তব জগত এর বিপরীতে হেঁটে পরকালের জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে তার কার্যকলাপে। দুই কন্যা সন্তানের মাতা, স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উত্তরাধিকারের সঠিক বণ্টনের দায়িত্বে নিষ্ঠাবান থেকেছে। যখন থেকে এই কাজটি সমাধা হয়ে গেছে তখন থেকে দরিয়াবানু ইহ জগতের সবকিছু ছেড়েছে এবং পরজগতের জীবনকেই কাঙ্খিত করেছে। নিজের দুই কন্যার বিবাহ দিয়েছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু যখন সে রুকুর মানসিক কষ্টের কথা বুঝতে পেরেছে তখন সে অনুসূচনায় দগ্ধ হয়েছে এবং রুকুর সম্ভাবনাময় জীবনকে উপলব্ধি করে বলেছে—

"দরিয়াবানু তার থান কাপড়ের আঁচাল খুঁটতে-খুঁটতে মুখ নামিয়ে বলল, আবার কাজিয়া করে গেল। বললে কী, একটা ছেলের জিন্দেগি আমি নষ্ট করে দিয়েছি। এটার শাস্তি আমাকে না দিয়ে ছাড়বে না। চাষার বেটি, মুরুক্ষু হারামজাদি বলে একশো গালমন্দ"[৪]

আর এই ধারণা থেকেই দরিয়াবানু অলীক জীবনকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে এবং তার ইহজগতের মৃত্যু ঘটেছে। যে দরিয়াবানু দায়িত্বশীল মাতা ছিল সেখান থেকে আত্ম-উপলব্ধি করেছে সম্পত্তি রক্ষা করতে পারলেও সন্তানের ভালোবাসাকে রক্ষা করতে পারেনি তাই সে মানসিক দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছা মৃত্যু বেছে নিয়েছে আর এভাবেই সে উপন্যাসে অলীক মানুষে পরিণত হয়েছে।

রত্নময়ী শফিউজ্জামানের জীবনে আসা একটি প্রতিবাদিনী নারী চরিত্র। জমিদার বাবার সুশিক্ষিতা মেয়ে। শফিউজ্জামানের সাথে রত্নময়ীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ব্রহ্মপুর আশ্রমে মন্দিরের পিছনে। শীর্ণ, ছিপছিপে গড়ন, কাঁধে খোঁপা ঝুলছে, তার মুখের রঙ ছিল পাতাচাপা ঘাসের মতো। রত্নময়ী মনে করতেন তার বাবাই তার মাকে হত্যা করেছে এমনকি তার ইংরেজি শিক্ষিকা কেটি উডবার্নকেও ধর্ষণ করতে চায় তার অমানুষ বাবা। এহেন বাবার প্রতি একরাশ ঘৃণা বর্ষণ করেছে মেয়ে। শুধু তাই নয় রত্নময়ী বাবাকে পশুর সাথে তুলনা করেছে। বাবার বিরুদ্ধে শানিত বাক্য প্রয়োগ করে—

"হি হ্যাজ কিলড মাই মাদার। হি লিভস উইথ এ কনকুবাইন-ইউ নো, এ বাইজি!"[৫]

আত্মমর্যাদায় ভরপুর রত্নময়ী তার বাবার লাম্পট্য মেনে নিতে পারেনি তাই একাকীত্বে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে জিন ধরেছে বলে মনে করা হয় এবং তার বাবা চিকিৎসার জন্য বদুপীরের কাছে নিয়ে গেলে তর্ক বাঁধে পীরের সঙ্গে। পীর ও অলৌকিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে একজন নারী হিসাবে প্রতিবাদ করার সাহস দেখিয়েছে রত্নময়ী যা তাকে একজন সাহসী ও নির্ভীক নারী সত্ত্বার জাগতিক উত্তরণ হিসাবে লেখক তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে স্বাধীনবালা চরিত্রের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী নারী চরিত্রের বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। যামিনীবাবু ও সুনয়নীর সুশিক্ষিতা মেয়ে এক রহস্যময়ী নারী। হরিনারায়ণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল কিনা তা জানা যায় বিধবার সাজ পরার পর। বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য সে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠে তাই হরিনারায়ণ ও শফির কপালে নিজের হাতের আঙুল কেটে রক্ততিলক পরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে উদ্দীপিত করে স্ট্যানলিকে হত্যা করতে। পিতার প্রতি কন্যার যে ভালোবাসা তা প্রকাশ পায় স্বাধীনবালা চরিত্রে। এই উপন্যাসে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বাইরে অবস্থানকারী এক মুক্ত চিন্তার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। পীর বংশের সন্তান শফিউজ্জামানের অবদমিত ইচ্ছা ও পার্থিব জীবনের প্রতি আকর্ষণের অগ্রভাগে ছিল স্বাধীনবালা।

উনিশ শতকীয় ফরাজি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত সিরাজের এই বহুল প্রচলিত উপন্যাসে মুসলিম পীরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। এই উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে নারীর মন ও মনস্তত্ত্ব দিকটি অত্যন্ত জটিল ভাবে চিত্রিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের রক্ষণশীল গ্রাম্য মুসলিম সমাজের প্রেক্ষিতে নারীর ইচ্ছা, অনুভুতি, প্রেম, ভালোবাসা ও অবদমিত আকাঙ্ক্ষার কথা অত্যন্ত নিপুন ভাবে তুলে ধরেছেন সিরাজ। নিজের অস্তিত্তের বিরুদ্ধে লড়াই, নিজের মনোবেদনার কথা, সন্তান ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য সংগ্রাম এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসন আবার কখনো তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য মনস্তত্ত্বের দ্বান্দিকতা সিরাজ এই উপন্যাসে আলোকিত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য হয়ে আছে।

**তথ্যসূত্র:**

১. অলীক মানুষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১(পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১২১-১২২
২. তদেব, পৃ. ৩১৮
৩. অলীক মানুষ উপন্যাসের অন্দর ও বাহির, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৭০
৪. অলীক মানুষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১২৪
৫. তদেব, পৃ. ২৪৯

ফাল্গুনী তপাদার

## দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন

পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলা ছোটগল্প নতুন পথ অন্বেষণে প্রয়াসী। এই সময়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী গল্পলেখকের আবির্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকের লেখার মধ্যেই স্বকীয় দক্ষতা ফুটে উঠতে শুরু করেছে। আবার এমনও হচ্ছে যে কেউ কেউ নিয়মিতভাবে লিখছেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাত, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা- সবমিলিয়ে এটি ছিল কালান্তরের সময়। বহুবিধ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছিল মানুষের জীবন। সময়ের এই অভিঘাত স্পর্শ করেছিল বাংলা ছোটগল্পের জগৎকেও। যুদ্ধ ও মন্বন্তরজনিত অস্তিত্বের সংকট এসময়ের নানা গল্পে উঠে এসেছে। চল্লিশের দশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে বাংলা ছোটগল্প বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু আগমন মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিপর্যয় ইত্যাদি ঘটনাবলী প্রভাব ফেলেছিল এই সময়ের বাংলা ছোটগল্পে। এই দশকের গল্পে 'মধ্যবিত্ত' নামক বিশেষ একটি শ্রেণীর কথা বারবার উঠে আসছিল। এর পাশাপাশি মূল্যবোধের অবক্ষয় ও বিনষ্টির চিত্রটিও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছিল। খণ্ডিত স্বাধীনতার স্বাদ এই দশকের মানুষের কাছে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্যদিকে বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন সমস্যা দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কল্লোলের লেখকেরা এবং তার পরবর্তী তিরিশ কিংবা চল্লিশের দশকের গল্পকারেরা বাংলা গল্পের যে বিশিষ্ট ধারা তৈরি করেছিলেন তার বাইরে বেরিয়ে আসার একটা তাগিদ অনুভব করলেন এই দশকের গল্পকারেরা। কিন্তু পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে ঠিক কোন ধরনের গল্পের ভুবন নির্মাণ করা যায় তা নিয়ে তাঁরা দ্বিধান্বিত, সন্দিগ্ধ। সমগ্র পঞ্চাশের দশকটাই কেটে গেছে এই দ্বিধা নিয়ে। আসলে এই দশকে রাজনৈতিক- সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে যে দ্বিধা তৈরি হয়েছিল তারই ছায়াপাত লক্ষ করা গেল বাংলা ছোটগল্পের জগতে। স্বাধীনতার মোহভঙ্গের পর একের পর এক নানা ঘটনায় মানুষের জীবন বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রাশিয়ায় স্ট্যালিনের মৃত্যু, কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গূঢ় অস্থির অবস্থা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির প্রায় ব্যর্থতা, উদ্বাস্তু আগমন ও সমস্যা ইত্যাদি ঘটনায় একদিকে যেমন বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কও প্রভাবিত হতে শুরু করে।

মানবমনের নৈতিক অবনতি, বিচ্ছিন্নতা, বঞ্চনা, ছিন্নমূল মানুষের নানা সমস্যা উঠে আসে পঞ্চাশের গল্পে। বাংলা ছোটগল্পে যে মধ্যবিত্ত জীবন ও মূল্যবোধের ভাঙনের সূত্রপাত

হয়েছিল যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ ও কালোবাজারির সময়ে স্বাধীনতা উত্তর বাঙালির কাছে মূল্যবোধের ভাঙন হয়ে দাঁড়াল খুব স্বাভাবিক। বাংলা ছোটগল্পে তার ছায়া পড়ল। সমালোচকের ভাষায়, 'ধ্বস এবং ধ্বংস, ভ্রষ্টজীবন এবং নষ্ট মূল্যবোধ সাহিত্যে নতুন অবয়বে ফিরে এল, বয়ন-বয়ান, চিন্তা-চৈতন্য, কথকতা সব পাল্টে গেল যেন রাতারাতি, ফ্রাসট্রেশন আর মরবিডিটি, মধ্যবিত্ত দুঃস্বপ্ন আর জীবনের তুচ্ছ ক্ষুদ্র নীরক্ত ছবি, ভঙ্গুর বাসনা, বেকারী আর প্রেমের দিবাস্বপ্ন এবং গল্পহীনতা"[১]- এসবই হয়ে উঠল পঞ্চাশের দশকের গল্পের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। এসময় আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় হয়ে উঠল। দেশভাগের সময় থেকেই বাংলা বইয়ের বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে এসে বিষয়টি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। কথাসাহিত্যের জগতে উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের চাহিদা ছিল বেশি। সাময়িক পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করে গল্পমনস্ক মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণি তৈরি হচ্ছিল। গল্প ও কবিতায় এই দশক একটি বড় জায়গা তৈরি করতে সমর্থ হচ্ছিল ধীরে ধীরে।

পঞ্চাশের দশকে যখন আর্থসামাজিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে, বেকারত্ব ঘিরে ধরেছে সমাজ ব্যবস্থাকে সেই সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাপিত জীবন হয়ে উঠেছে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পের বিষয় :

দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক মধ্যবিত্ত (নিম্নবিত্ত সুদ্ধ) জীবনের, এই শ্রেণীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের, এমনসব গলিখুঁজির সন্ধান রাখেন, এমন দুর্লভ এবং তীক্ষ্ম সংবেদনে সেগুলিকে আমাদের গোচরে আনেন যে, অন্য জনপ্রিয় লেখকের অনেকের লেখায় তা আমরা সচরাচর পাই না।[২]

নাগরিক মধ্যবিত্তের মানসিক টানাপোড়েন, নৈতিক অবনমন ও সম্পর্কের নানা জটিলতা উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্পে। পঞ্চাশের মাঝামাঝি কিংবা শেষ থেকে শুরু করলেও ষাটের দশকে এসে তাঁর গল্প পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের যে সামাজিক ও আর্থিক অবনমন তা কীভাবে মধ্যবিত্ত সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল দিব্যেন্দু তাই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। ষাটের দশক জুড়ে আমরা দেখেছি যে মধ্যবিত্ত সমাজে মূল্যবোধের অবনমন দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিচেতনার অবক্ষয় ফুটে উঠেছে।

এই মধ্যবিত্ত বা 'Middle Class'আসলে কারা? সমালোচকের ভাষায় বললে এভাবে বলা যায় :

The idea or identity of Middle class is invoked in every life in contemporary India in a variety of different ways and contests : urban and educated with a salaried job; qualified and independent professionals; enterprising, mobile and young women and men; consumers of luxury goods and services; a housewife of an urban family struggling to keep her domestic economy going with a limited income in timer of rising prices..[৩]

এই শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের জীবনের নানা উত্থান পতনের কাহিনি দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্পে উঠে এসেছে। এই মধ্যবিত্ত জীবনের কথা আমরা দেখতে পাই ১৩৭০ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে প্রকাশিত তাঁর 'বাড়ি' গল্পটিতে। স্কুল শিক্ষিকা মিনতি। সে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু সংসার গড়ে তোলার জন্য মাথার উপর ছাদের প্রয়োজন। সে ও প্রকাশ বিবাহের পর কোথায় থাকবে তা একটি প্রধান সমস্যা হয়ে ওঠে তাদের কাছে। কারণ কলকাতা শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সংসার নির্বাহ করা যে সহজ নয় প্রকাশের বক্তব্যে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'সকলেই টাকা চায়। আরো বেশি টাকা সেলামি। ...সাত আটশোর কমে একটা ঘর পাওয়া যায় না। মাইনের ওয়ান থার্ড যদি বাড়ি ভাড়াতেই যায় তাহলে খাব কী?' বিশ শতকের ষাটের দশকে মধ্যবিত্তের এই আর্থিক টানাপোড়েনের ছবি সঙ্গী হয়ে ওঠে গল্পটিতে। এছাড়াও ষাটের দশকে তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ'-এ তাঁর এই সময়ের গল্পগুলি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এছাড়া কিছু গল্প 'কথামালা', 'দর্পণ', 'জয়শ্রী', 'চতুষ্পর্ণা', 'বেতার জগৎ', 'প্রসাদ', 'সিনেমা জগৎ' কিংবা 'চতুরঙ্গ'-র মতো পত্রিকাতেও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। 'সুখ', 'পলাতকা', 'চিলেকোঠা', 'পাহাড়ে বর্ষা', 'গর্ভ', 'সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা', 'কলকাতা ১৯৬৭', 'শোকসভা', 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', 'টানাপোড়েন', 'জন্ম', 'অসুখ', 'চিঠি' প্রভৃতি তাঁর এই সময়ে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গল্প। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে যুক্ত হচ্ছে একটি অন্যমাত্রা যা তাঁকে ক্রমশ প্রথম সারির গল্পকার করে তুলেছে :

অবশ্য ১৯৬৬ (১৩৭৩) থেকেই তাঁর পূর্ণ স্বকীয়তায় আমরা লক্ষ করি দিব্যেন্দু পালিতকে। সূচনা পর্বের বিনীত আয়োজন পেরিয়ে যিনি ক্রমশ হয়ে উঠছেন বাংলা ভাষার প্রধান গল্পকারদের একজন এবং বাংলা ছোটগল্পে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। কখনো গভীর, কখনো আপাত তুচ্ছ ঘটনা থেকে উদ্ভূত, যে-কোনো বিষয়ই তাঁর গল্পে ধরা দিতে থাকে অপ্রত্যাশিত ও ভিন্ন তাতর্যে।[৪]

নাগরিক জীবনের কথাকার দিব্যেন্দু পালিতের বেশিরভাগ গল্পই গড়ে উঠেছে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে। দিব্যেন্দুর 'সুখ' (দেশ ১৩৭৯) গল্পে এরকমই এক নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। ললিত ও তাঁর স্ত্রী সুরমা। তাঁদের বয়স হয়েছে। সংসারে আছে তাঁদের পুত্র সুবীর, সুবীরের স্ত্রী প্রমীলা ও এক নাতি। এই নাতির শারীরিক অসুস্থতা থেকেই তৈরি হয় সমস্যা। ললিত হোমিওপ্যাথি চিকিতা করেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় বিশ্বাস না করে তাঁর পুত্রবধূ যখন পাড়ার জ্যোতিষ ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ানো শুরু করে তখন থেকেই শুরু হয় ললিতের অস্থিরতা। এরপর ধীরে ধীরে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে সম্পর্কের

অবনতি ঘটতে থাকে। সুবীর বাড়ি ছাড়ার কথা জানিয়ে দেয়। প্রমীলাও বাপের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। টুকরো টুকরো ছবির মাধ্যমে ধীরে ধীরে পারিবারিক ভাঙন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন ও নাগরিক জীবনের অবক্ষয় ও সুখহীনতাকে ফুটিয়ে তোলেন গল্পকার, 'সুখ পলাতক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তাঁর একমাত্র চিন্তা; জাগরণের অতৃপ্তি দুঃস্বপ্নের মধ্যেও হানা দেয়। মারীগুটিকার মতো দেখতে পান তিনি বিবেকবিদ্ধ মানুষগুলি ভীষণরকম এক অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ। কেউই আর সুখী নয়।'

দিব্যেন্দু পালিতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। গল্পটির নাম 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ।' এটি ১৩৭৪ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' গল্পটি আসলে একটি নষ্ট দাম্পত্যের গল্প। এটি কথকের নিঃসঙ্গতার কথা বলে। ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণা, মূল্যচেতনার সংকট ও গ্লানিবোধ ঘিরে থাকে গল্পটিকে। গল্পের সূচনাংশেই গল্পকার কথক ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণার দাম্পত্যের ছবিটিকে স্পর্শ করে তোলেন, 'দুদিন কথাবার্তা বন্ধ থাকার পর এমনকী জরুরি দরকার পড়ল ওর, এখনই যে জন্যে ফোন করতে হল। তেমন কিছু বলার থাকলে ও বাড়িতেই বলতে পারত। কারণ, খুব ভালো করেই জানে কৃষ্ণা, সব কিছুর পরেও আমি বাড়ি ফিরি, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কর্তব্য ও করণীয় যা কিছু সবই করি।' ফুটে ওঠে দাম্পত্য সংকটের প্রকৃত চিত্রটি। কথক ওরফে লাল্টুদার মনের মধ্যে নানা নারী ঘোরাফেরা করে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না তার। স্ত্রীর ফোনের কথাও স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চায় সে। অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হওয়া মুন্নি নামক এক তরুণীর গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করতে থাকে 'লাল্টুটা'। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্য প্রসঙ্গত মনে পড়ে :

দিব্যেন্দুর অনেক অনেক গল্পের অবলম্বন কেবল নারী পুরুষের সম্পর্ক। ... সেই সম্পর্কের অতি জটিল কারিকুরি। কঠিন নয়, অতি নরম লতাতন্তুর মতো জড়িয়ে যাওয়া, কিছু এত ব্যাপ্ত সেই জটিল জাল যে তার থেকে মুক্তির উপায় নেই।[৫]

এই পর্বের বেশিরভাগ লেখকের লেখাতেই আমরা বিশেষ একটি শ্রেণিকে গুরুত্ব পেতে দেখছি, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'। যদিও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছাড়াও মনোজগতের কথাও গুরুত্ব পেয়েছে। কারো কারো লেখায় উঠে এসেছে প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছিন্নতা। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নৈঃস্যও গুরুত্ব পেতে শুরু করছে। মানুষের মূল্যবোধের অবনমন, নৈতিকতাবোধের বিপর্যয়ও ফুটে উঠেছে এই পর্বের গল্পে। এই পর্বের গল্পের ধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী :

প্রথমত, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির রুচি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে তুলে ধরে। প্রজন্ম-দ্বন্দ্ব,

পারিবারিক সম্পর্ক, প্রেম এবং সমাজের বিভিন্ন প্রগতিমুখিন চিন্তনও স্থান পায় ... এসব গল্পে মানবতার সুর থাকে, কিন্তু সাধারণত বিদ্রোহের সুর থাকে না।[৬]

বিচ্ছিন্নতাবোধ, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয় কিংবা একাকীত্বতার পাশাপাশি ব্যক্তি মানসের অবক্ষয়ের সাক্ষী থাকছে এই দশক। ধীরে ধীরে সমাজ থেকে ব্যক্তির দিকে চোখ ফেরাচ্ছে বাংলা ছোটগল্প। আবার কোনো কোনো গল্পে জোর দেওয়া হচ্ছে ব্যক্তির অন্তর্জগতের দিকে।

**তথ্যসূত্র :**

১. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫৯৪।
২. পবিত্র সরকার, মধ্যবিত্ততার মহাকাব্য, আজকাল, ৩ জুলাই ১৯৯৪; দ্র. দিব্যেন্দু পালিত গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৫, পৃ. ৪৭৪।
৩. SurindersJodhka&Aseem Prakash– The Indian Middle class– oxford University Press– New Delhi-01– First Edition– 2016– p. XVIII
৪. প্রাসঙ্গিক কথা, পূর্বোক্ত দিব্যেন্দু পালিতের গল্পসমগ্র, পৃ. ৪৭৪।
৫. সুমিতা চক্রবর্তী, বাংলা ছোটগল্পের স্রোতের সঞ্চয়, দ্র. ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, মে ২০১২, পৃ.৬৫।
৬. পূর্বোক্ত ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পৃ. ৭২।

ড. সেখ পারভেজ হোসেন

## আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' : সমাজ বাস্তবতার নিরিখে

বাংলা উপন্যাসের ধারায় পঞ্চাশের দশক এক অস্থির ও রূপান্তরের সময়। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, অন্যদিকে দেশভাগের ক্ষত এবং মন্বন্তরের দীর্ঘস্থায়ী অভিঘাত। আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গ্রামীণ সমাজের গভীরে প্রবেশ করেছেন। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে তিনি কোনো কল্পিত গ্রাম্যতা বা রোমান্টিক পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনা দেননি; বরং তিনি দেখিয়েছেন ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার আর সমাজপতিদের নিষ্ঠুর শোষণ। সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের শ্রেণিসংগ্রাম এবং মিশেল ফুকোর ক্ষমতা-তত্ত্বের নিরিখে এই উপন্যাসটি এক অনন্য পাঠ্য।

আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' কেবল একটি আখ্যান নয়, বরং এটি ক্ষমতার ভারসাম্য ও সামাজিক নিপীড়নের একটি জটিল টেক্সট। এই উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতাকে বিশদভাবে বুঝতে হলে আমাদের তিনটি প্রধান তাত্ত্বিক কাঠামোর সাহায্য নিতে হবে বলে আমার মনে হয়েছে: আন্তোনিও গ্রামসির 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' (Cultural Hegemony), মিশেল ফুকোর 'ক্ষমতা ও জ্ঞান' (Power-Knowledge) এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের 'সাবঅল্টার্ন' (Subaltern) তত্ত্ব।

ইতালীয় তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসি দেখিয়েছেন যে, শাসক শ্রেণি কেবল গায়ের জোরে নয়, বরং সংস্কৃতি, ধর্ম এবং বিশ্বাসের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে সাধারণ মানুষকে শাসন করে। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে গদাই প্রধান হলো এই হেজিমনি বা আধিপত্যের প্রধান কারিগর।

গদাই প্রধান যে জয়গুনকে 'একঘরে' করার ফতোয়া দেয়, তা গ্রামসিয়ান দৃষ্টিতে একটি আদর্শিক আক্রমণ। গদাই প্রধান জানে যে, জয়গুন যদি রেল স্টেশনে কাজ করে স্বাবলম্বী হয়, তবে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় পুরুষের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হবে। উপন্যাসে দেখা যায়: হাসু জয়গুনকে বলে

"তুমি আর বাইরে যাইও না, মা। মাইনষে কথা কয়, বেপর্দা"[১]

এখানে 'মুরুব্বি' বা সমাজপতিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে আসলে নিজেদের 'হেজিমনি' রক্ষা করতে চায়। জয়গুনের শ্রম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করা আসলে শাসক শ্রেণির একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, ক্ষমতা কেবল ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, এটি সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে নির্দিষ্ট 'ডিসকোর্স' বা ধারণার মাধ্যমে। উপন্যাসে 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র যে মিথ বা কুসংস্কার, তাকে ফুকোর দৃষ্টিতে একটি 'পাওয়ার ডিসকোর্স' হিসেবে দেখা যায়। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয়

'জিনের ভয়' বা 'অশুভ বাতাস' কেবল কুসংস্কার নয়, এটি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজপতিরা এই ভয়ের 'জ্ঞান' উৎপাদন করে সাধারণ মানুষকে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বন্দি রাখে।

"গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ টিকতে পারে না।
যে বাস করে তাঁর বংশ ধ্বংস হয়"।[২]

জয়গুন যখন এই বাড়ির ভয় উপেক্ষা করে সেখানে থাকতে শুরু করে, সে আসলে ফুকোর ভাষায় একটি 'কাউন্টার-ডিসকোর্স' (Counter-discourse) বা প্রতি-আখ্যান তৈরি করে। জয়গুনের যুক্তি পেটের জ্বালা জিনের চেয়েও বড়', এটি মূলত ক্ষমতার প্রচলিত কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি প্রান্তিক মানুষের বিদ্রোহ।

'Can the Subaltern Speak' স্পিভাকের এই বিখ্যাত প্রশ্নের উত্তর যেন আমরা খুঁজে পাই উপন্যাসের জয়গুন চরিত্রের মধ্যে। জয়গুন এখানে 'সাবঅল্টার্ন' বা প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি। সে একইসাথে অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র, সামাজিকভাবে বহিষ্কৃত এবং লিঙ্গীয়ভাবে নিপীড়িত। স্পিভাক দেখিয়েছেন যে, প্রান্তিক মানুষের কথা বা কণ্ঠস্বর অনেক সময় সমাজপতি বা মধ্যবিত্তের বয়ানে হারিয়ে যায়। কিন্তু 'সূর্য দীঘল বাড়ী'তে আবু ইসহাক জয়গুনকে কেবল কান্নারত চরিত্র হিসেবে দেখাননি, বরং তাকে একজন সক্রিয় সংগ্রামী হিসেবে দেখিয়েছেন। জয়গুন যখন ছোট্ট হাসুকে নিয়ে কঠোর পরিশ্রমে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তখন সে আসলে সেই নীরবতাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। তবে উপন্যাসের শেষে তার পলায়ন বা গ্রাম ত্যাগ প্রমাণ করে যে, বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তনের অভাবের কারণে 'সাবঅল্টার্ন' বা প্রান্তিকের লড়াই সবসময় সফল হয় না। উপন্যাসে জয়গুন চিন্তা করে—

'তওবা করলে ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকার অর্থ- না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা। জয়গুনের চোখ ঘৃনায় কুঞ্চিত হয়। সে তীব্র কণ্ঠে বলে- না, আমি তো'বা করতাম না'[৩]

স্পিভাকের তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায় উক্তিটি। জয়গুন এখানে দয়া ভিক্ষা করছে না, বরং সে যুক্তি দিচ্ছে। সে ধর্মের 'পর্দা' ধারণার বিপরীতে 'শ্রমের অধিকারকে' বড় করে দেখছে। এটি প্রমাণ করে যে, চরম দারিদ্র্যেও সাবঅল্টার্ন বা প্রান্তিক মানুষ নিজের হয়ে কথা বলতে পারে।

কার্ল মার্কস সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন অবকাঠামো (অর্থনীতি) এবং উপরি-কাঠামো (ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি)। 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র সমাজ বাস্তবতায় আমরা দেখি যে, যখন দুর্ভিক্ষে অবকাঠামো বা অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়, তখন উপরি-কাঠামো বা নৈতিকতাও ভেঙে পড়ে। মন্বন্তরের সময় মা কর্তৃক সন্তান বিক্রির ঘটনাটি মার্কসীয় তত্ত্বের এক নির্মম প্রয়োগ। লেখক দেখিয়েছেন যে, মানুষের চেতনা বা বিবেক তার অস্তিত্ব দ্বারা

নির্ধারিত হয়, অস্তিত্ব তার চেতনা দ্বারা নয়। জয়গুনের বাইরে কাজ করার সিদ্ধান্তটি তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির (Base) চাপেই তৈরি হয়েছে, যা তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে (Superstructure) চ্যালেঞ্জ করেছে।

উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মূলত পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩) পরবর্তী সমাজ। এই দুর্ভিক্ষ মানুষের নৈতিকতা ও সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। উপন্যাসের প্রারম্ভেই লেখক এক হাহাকারের চিত্র তুলে ধরেছেন:

> “এক মুঠো ভাতের জন্যে বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সঙ্গে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত- বিক্ষত।”[৪]

দারিদ্র্য এখানে কেবল আহারের অভাব নয়, বরং এটি মানুষের আত্মমর্যাদাকে সংকুচিত করে ফেলে। জয়গুন যখন স্টেশনে চালের কারবারের জন্য যায়, তখন তা কেবল পেটের দায়ে নয়, বরং সমাজ-আরোপিত নারীত্বের শৃঙ্খল ভাঙার এক অনিচ্ছাকৃত প্রতিবাদও বটে।

আবু ইসহাকের ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের গল্প নয়, এটি একটি জাতির আর্তনাদের ইতিহাস। এই উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতার মূল ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়েছে ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত) এবং ১৯৪৭-এর দেশভাগএই দুটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনার প্রেক্ষাপটে। এই দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগ গ্রামীণ পূর্ববঙ্গের মানুষের কেবল অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডই ভেঙে দেয়নি, বরং তাদের হাজার বছরের লালিত নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকেও চুরমার করে দিয়েছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর কোনো প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি; এটি ছিল মূলত একটি মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকারের নীতি এবং মজুতদারদের আগ্রাসনে বাংলার মানুষ অন্নহীন হয়ে পড়ে। আবু ইসহাক এই উপন্যাসে মন্বন্তরের সেই ভয়াল স্মৃতিকে জয়গুনের স্মৃতির মাধ্যমে জীবন্ত করেছেন। উপন্যাসে মন্বন্তরের সেই নগ্ন চিত্রটি তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লেখেন :

“নাবিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাংলা তেরশো পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরোশ পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তাঁর পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামেনি। ঘাড় বদল করেই চলেছে একভাবে। হাত-পায়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন তেরোশো পঞ্চান্নে এসেও সে আকাল-দৈত্য তার নির্মম খেলা খেলছে। তাকে আর ঘাড় থেকে নামানো যায় না”[৫]

ক্ষুধার জ্বালায় অনেকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এসময় জয়গুন ভেবেছেঃ “হাতে পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে?”[৬]

জয়গুন বুঝেছে :

"জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূল মন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই"[৭]

জয়গুনের পঞ্চাশ সনের কথা মনে পড়ে:

"এক বাটি ফ্যানের জন্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে কত জায়গায়, কত বাড়ীতে বাড়ীতে তাকে ঘুরতে হয়েছে। এক বাটি খিচুড়ির জন্য লঙ্গর-খানায় লাইন ধরতে হয়েছে".[৮]

এই বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, যখন জৈবিক চাহিদা (ক্ষুধা) চরম সীমায় পৌঁছায়, তখন মানুষের অর্জিত 'সভ্যতা' বা নৈতিকতা' গৌণ হয়ে পড়ে। মার্কসীয় দর্শনে একেই বলা হয় 'অবকাঠামো' (Base) যা 'উপরি-কাঠামো'কে (Superstructure) নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, অর্থনীতি যখন ভেঙে পড়ে, তখন ধর্মীয় বা পারিবারিক নৈতিকতাও আর কাজ করে না।

১৯৪৭-এর দেশভাগ উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি মিললেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে অনিশ্চয়তা। জয়গুন ও তার সন্তানদের ঢাকা ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসা এবং পুনরায় একটি অভিশপ্ত বাড়ির আশ্রয়ে যাওয়া মূলত দেশভাগ পরবর্তী লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসে দেশভাগ সরাসরি রাজনৈতিকভাবে না এলেও এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব গভীর। মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটছে আশ্রয়ের খোঁজে, কিন্তু কোথাও স্থায়িত্ব নেই। রমেশ ডাক্তারের ভাষায়:

"এখন হুজুগে মেতে অনেকেই বাড়ী — ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাদের টাকা নেই তারাও যাচ্ছে। অনেকে বাড়ী-ঘর বিক্রি করে যাচ্ছে।"[৯]

দেশভাগ পরবর্তী 'মোহভঙ্গ' বা ডিস-ইলিউশনমেন্টের এক অমোঘ দলিল এই উপন্যাস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আকালে দেশের মানুষের অবস্থা নাজেলাহ। রাজনৈতিক সীমানা পরিবর্তন হলেও সাধারণ মানুষের ক্ষুধার মানচিত্র যে একই থাকে, আবু ইসহাক তা অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নৃতাত্ত্বিক অস্কার লুইস (Oscar Lewis) বর্ণিত 'কালচার অফ পভার্টি' বা দারিদ্র্যের সংস্কৃতির প্রতিফলন এই উপন্যাসে স্পষ্ট। দারিদ্র্য যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন তা একটি নির্দিষ্ট জীবনদর্শনের জন্ম দেয়। জয়গুন যখন চালের কারবার করে বা হাসু যখন অল্প বয়সে ভারী কাজ করার প্রবৃত্তি পায়, তা মূলত দারিদ্র্যজাত সমাজ বাস্তবতার ফল। উপন্যাসে জয়গুনের জীবন সংগ্রামের একটি দৃশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

'জয়গুন' পরিশ্রান্ত, ট্রেনের ঢুলানিতে ঝিমুনি আসে। কাঠের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।[১০]

এখানে ‘পর্দা’ বা সামাজিক সম্মানকে বিলাসিতা হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে লেখক বুঝিয়েছেন যে, চরম দারিদ্র্যে মানুষের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে কেবল ‘সারভাইভাল’ বা বেঁচে থাকা।

গ্রামীণ দারিদ্র্যকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার পেছনে মহাজনী প্রথার বড় ভূমিকা ছিল। প্রান্তিক মানুষেরা যখন অভাবের মুখে পড়ে, তখন তারা গ্রামের প্রভাবশালী গদাই প্রধানদের মত লোকজন আর বেশি কষ্ট দেয় তাদের। চিনি বন্টনের দৃশ্যর কথা স্মরন করলে সহজেই তা অনুমান করা যায়। গদু প্রধানের মত লোকেরা নিজের প্রতিপত্যি বজায় রাখার জন্য কতখানি নিচে নামতে পারে তা উপন্যাসে দেখা যায়, একে অভাব তার উপর এদের কৌশলী অত্যাচারের কারনে জয়গুণকে তার শেষ সম্বলটুকুও হারাতে হয়। গ্রামীণ এই শোষণের চক্রটি আবু ইসহাক এমনভাবে এঁকেছেন যা আজও অনেক উন্নয়নশীল সমাজের গ্রামীণ বাস্তবতার সাথে মিলে যায়। দারিদ্র্যের প্রভাব কেবল বয়স্কদের ওপর নয়, বরং শিশুদের ওপরও পড়েতা হাসু শফির চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তা ফুটিয়ে তুলেছেন। হাসুর মধ্যে যে প্রবণতা বা শফির  মধ্যে যে ভীরুতা, তা মূলত অপুষ্টি এবং নিরাপত্তাহীনতার ফলাফল। আবু ইসহাক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে একটি আকাল বা দুর্ভিক্ষ একটি প্রজন্মের মানসিকতাকে আজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে পারে।

আবু ইসহাকের ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসে ‘মিথ’ বা কুসংস্কার কেবল গ্রামীণ লোকজ বিশ্বাসের অংশ নয়, বরং এটি প্রান্তিক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশল। উপন্যাসের শিরোনামটি নিজেই একটি লৌকিক কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালি গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, যে ঘর বা বাড়ির দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত (সূর্য-দীঘল), সেখানে অশুভ শক্তির ছায়া থাকে। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, জয়গুন যখন তার সন্তানদের নিয়ে ‘সূর্য দীঘল’ বাড়িতে আশ্রয় নেয়, তখন গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক ও কৌতূহল কাজ করে। গল্পে বাড়িটির সম্পর্কে কুসংস্কারের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে:

“সূর্য-দীঘল বাড়ীর গাবগাছের টিকিতে চুল ছেড়ে দিয়ে একটি বউ দু’পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”[১১]

এই বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, তৎকালীন সমাজ মানসে বিজ্ঞানের চেয়ে অলৌকিকতা ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, এই ‘ভয়’ আসলে এক ধরনের সামাজিক বর্জন (Social Exclusion)। যে মানুষটি সমাজ ও ধর্মের নিয়ম ভেঙেছে (যেমন জয়গুন), তাকে সমাজ এমন এক জায়গায় ঠেলে দিতে চায় যা ‘অভিশপ্ত’।

জয়গুন চরিত্রের অনন্যতা এখানেই যে, সে কুসংস্কারকে ভয় পায় না, বরং তার চেয়ে

বড় ভয় পায় ক্ষুধার। তার কাছে কুসংস্কার একটি বিলাসিতা মাত্র। সে জানে, জিনের আছর তাকে সরাসরি না মারলেও ক্ষুধা তাকে ধুঁকিয়ে মারবে। তাই জয়গুনের ঠিক করে নেয় জিনে ধরুক আর ভূতে মারুক, উপোসে মরার চেয়ে এই বাড়িতে থাকাই ভালো। আল্লা যদি মরণ লেখে, তবে রাজপ্রাসাদেও মরণ আসবে। পাহারা বদলের কথায় জয়গুন বলে: "পাহারা বদলাইতে অইব না আর। পাহারা না ছাই। ফুক্কা দিয়া টাকা নেওনের ছল-চক্কর।"[১২] এখানে জয়গুনের এই যুক্তিবাদ (Rationalism) তাকে গ্রামীণ মধ্যযুগীয় চিন্তা থেকে আলাদা করে। সে তার লৌকিক বিশ্বাসের চেয়ে তার অস্তিত্বের লড়াইকে প্রাধান্য দেয়। কুসংস্কার কীভাবে অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার হয়, তা গদাই প্রধানের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। গ্রামের প্রভাবশালীরা চায় না জয়গুন এই জমিতে স্থায়ী হোক। তারা 'জিনের ভয়' বা 'অশুভ বাতাস'-এর গুজব ছড়িয়ে জয়গুনকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে চায় যাতে সে বাড়িটি ছেড়ে চলে যায় এবং তারা সেটি দখল করতে পারে। মিশেল ফুকো (Michel Foucault) তার 'Power/Knowledge' তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, শাসক শ্রেণি নির্দিষ্ট কিছু 'ডিসকোর্স' বা ধারণা (এক্ষেত্রে কুসংস্কার) তৈরি করে সাধারণ মানুষকে শাসন করে। 'সূর্য দীঘল' বাড়ির মিথটি ছিল গদাই প্রধানদের তৈরি করা একটি 'পাওয়ার ডিসকোর্স'। জয়গুন যখন এই ভয়ের সীমানা অতিক্রম করে সেখানে থাকতে শুরু করে, তখন সে মূলত তাদের ক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জ করে।

উপন্যাসে দেখা যায়, জয়গুনের ছোট ছেলে কাসু যখন অসুস্থ হয়, তখন সমাজ তাকে আধুনিক চিকিৎসার পরিবর্তে ঝাড়ফুঁক ও কবিরাজি চিকিৎসার দিকে ঠেলে দেয়। কুসংস্কার এখানে কেবল বিশ্বাস নয়, এটি একটি মরণফাঁদ। দারিদ্র্য আর অশিক্ষা মিলে যে অন্ধকারের জন্ম দেয়, লেখক আবু ইসহাক তা অত্যন্ত নির্মোহভাবে দেখিয়েছেন। উপন্যাসের একটি দৃশ্যে দেখা যায় কাসু অসুস্থ হলে করিমবকস ফকির ডেকে আনে:

"তখন ফকির কুন্ডলায়িত ধোঁয়াসহ গরম প্রান্তটা কাসুর নাকের মধ্যে বারবার প্রবেশ করিয়ে দেয়"[১২]

এই দৃশ্যটি তৎকালীন গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভঙ্গুর দশা এবং কুসংস্কারের কাছে মানুষের অসহায়ত্বের এক করুণ আর্তি।

পরিশেষে বলা যায়, 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র কুসংস্কারগুলো কেবল অলৌকিক গল্প নয়, বরং এটি গ্রামীণ ক্ষমতার দর্পন। আবু ইসহাক দেখিয়েছেন যে, যতদিন সমাজে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থাকবে, ততদিন এই মিথগুলো শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত। জয়গুন যখন উপন্যাসের শেষে এই বাড়ি ত্যাগ করে, তখন সে আসলে কেবল একটি বাড়ি ছাড়ছে না, বরং সে এক অন্ধ সমাজ থেকে মুক্তির পথে যাত্রা করছে। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' কেবল একটি পরিবারের বেঁচে থাকার লড়াই নয়, বরং এটি দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ সমাজ

কাঠামোর এক শৈল্পিক ব্যবচ্ছেদ। আবু ইসহাক অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দেখিয়েছেন যে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কাছে সব সংস্কার তুচ্ছ হয়ে যায়। সমাজ বাস্তবতার এই নির্মোহ চিত্রায়ন উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক ধ্রুপদী মর্যাদা দিয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ১৯
২. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৮
৩. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৮১
৪. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৭
৫. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ১১৭
৬. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ১২১
৭. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ১২১
৮. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৩৫
৯. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ১০৭
১০. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ২৫
১১. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৯
১২. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৯৩

**গ্রন্থপঞ্জি :**

১. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ সংস্করণ।
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা উপন্যাসের ধারা, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৮৬।
৩. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, বাঙালির জাতীয়তাবাদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (UPL), ঢাকা, ২০০০।
৪. শরীফ, আহমদ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫।
৫. মুখোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭।
৬. Beavoir– Simone de. The Second Sex. Translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier– Vintage Books– 2011.
৭. Gramsci– Antonio. Selections from the Prison Notebooks. International Publishers– 1971.

সুকুমার পরামানিক

## নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত সংসারে নারী চরিত্রের বৈচিত্র্য : অনুভবে ও বিশ্লেষণে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ভাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। দেশভাগের পর স্বয়ং লেখক এবং তার আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি ছিন্নমূল হয়ে ভিটেমাটি ফেলে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য হন। পাশাপাশি ৪৬ এর দাঙ্গা, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, লেখকের মনে এক অনন্য অনুভূতির সৃষ্টি হয়। যার ফলে মধ্যবিত্ত সংসারে দেখা দেয় আর্থিক অনটন। নুন আনতে পান্তা ফুরায়- এর মত অবস্থা। পুরুষদের অনুরোধে বা প্রয়োজনে পরিবারের মহিলাদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত রেখে পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত সংসারের পুরুষগণ বহু প্রাচীন রক্ষণশীল গণ্ডী ভাঙতে অন্দরমহলের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আর্থিক সাহায্যে অংশগ্রহণে নানান ভাবে উৎসাহিত করে। পরিবারের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা, সহমর্মিতা হেতু ধীরে ধীরে মহিলাগণও অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। সমাজে যশ, খ্যাতি, সম্মান লাভ করে ক্রমে তাদের স্বাধীনচেতা চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রতিবাদী মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়। চিরকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অভ্যস্ত পুরুষগণ দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রাণ ধারণের তাগিদে, সংসারে আর্থিক সচ্ছলতার প্রয়োজনে, স্ত্রীর উপার্জন সাগ্রহে গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের (স্ত্রী) সমাজের যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান পুরুষেরা যেন মেনে নিতে পারেনি। নারীগণের স্বাধীনচেতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রতিবাদী মনোভাব পুরুষের মনে অস্থিরতার সঞ্চার করেছে। তারা সেই মধ্যবিত্ত সমাজের রক্ষণশীল নিয়ম-শৃঙ্খলায় অঙ্কুশ লাগাতে বদ্ধপরিকর। তাই পুরুষগণ আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের অধিকার নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। এইসব চরিত্রগুলি লেখকের অতিপরিচিত ও অতিচেনা মুখ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা,' 'সেতার', 'কাঠগোলাপ', 'চাকরি', 'হেডমিস্ট্রেস', ইত্যাদি ছোটগল্পের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের চারিত্রিক বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

**অবতরণিকা :**

অবতরণিকা গল্পে আমরা দেখেছি সুব্রতরা স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ছাড়াও বৃদ্ধ মা-বাবার সাথে নাবালক তিন ভাই-বোন মোট নয় জনের একান্নবর্তী পরিবারের হেঁসেল ঠেলতে হিমশিম খাচ্ছে। যখন সুব্রতর মাসিক উপার্জনের থেকে খরচের পাল্লা ভারী হয়ে যাচ্ছে তখন আরতিকে কখনও খোঁচা মারছে; কখনও বন্ধু পরিমলবাবুর স্ত্রী মাধুরী এক গার্লস

স্কুলে মাস্টারি চাকরি করে, আবার কোন বন্ধু-পত্নী কেরানীগিরি করে এসবের খবর যুগিয়ে আরতিকে উৎসাহ প্রদান করছে কাতর ভাবে- "বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হতো আমার।"[১] আরতি জামাকাপড় লন্ড্রিতে না পাঠিয়ে নিজে কেচে নিচ্ছে, জ্বালানির খরচ কমানোর জন্য নিজে কয়লার গুল দিচ্ছে, সপ্তাহের বেশির ভাগ দিন মাছ-মাংস ছাড়া রান্না হচ্ছে তবু যেন সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। ক্রমে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে শুধু সংসারের খরচ কমিয়ে নয়, সংসারের আয় বাড়াতে মনোনিবেশ করতে হবে। আর এ বিষয়ে তাকে নানান ভাবে সাহায্য করে মন-প্রাণ দিয়ে উৎসাহ, প্রেরণা, উদ্দীপনা জুগিয়ে থাকে সুব্রত। বহু স্থানে চাকরির ফরম ভরে ব্যর্থ হয়েও শেষে ক্যানিং স্ট্রীটের মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী ফার্মের অধীনে কাজের সন্ধান পায়। যদিও সুব্রতর বাবা শত অসুবিধাতেও গৃহের বধূকে ঘরের বাইরে পাঠাতে প্রবল আপত্তি জানায় —"আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব?"[২] মা সরোজনীও আরতির চাকরি করাকে আপত্তি জানিয়ে পটলডাঙ্গায় ভাইয়ের বাসাতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে। ভোম্বল তথা সুব্রতও এগুঁয়েমি নিয়ে পিতার সাথে নানান প্রবল তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অন্তিমে নিজের যুক্তিকে খাড়া করতে সক্ষম হয়। কোম্পানির কাজকে আরতি ধ্যান-জ্ঞান জ্ঞানে গ্রহণ করেছে। বেতন ছাড়াও মেশিন বিক্রির কমিশনের কাজ করে আরও আরও বেশি টাকা সংগ্রহে আরতি উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। আরতির টাকায় সুব্রত নতুন দামি সিগারেটে সুখটান দিচ্ছে। এদিকে ক্রমে আরতি তিনটি ভাষায় কথা বলতে দক্ষ হয়ে উঠেছে। মেশিন-ক্রেতা পরিবারগুলি তাকে যথেষ্ট আদর, আপ্যায়ন ও সম্মান করে। ক্রমে আরতিকে টাকা, যশ, সম্মান, খ্যাতির লোভ পেয়ে বসেছে, তাই প্রতিদিন রাত করে বাড়ি ফিরেছে। স্বভাবতই তার জীবনে কর্মক্ষেত্রের প্রতি কর্তব্য মুখ্য এবং সংসারের প্রতি কর্তব্য গৌণ হয়ে উঠেছে, তবে তা অবহেলার নয়। সুব্রত লক্ষ্য করেছে চাকরির জন্য আরতির দাম্পত্য জীবনের পরিবর্তন শুধু নয়, মনেরও পরিবর্তন হয়েছে। এদিকে সুব্রতও ব্যাংকের কাজ ছাড়াও ইন্সুরেন্সের এজেন্সির কাজে পুনরায় বেরোতে শুরু করলো, পারফিউমারি ফার্মে তাদের খাতা পত্রের হিসাব দেখার পার্ট টাইম কাজ নিল যাতে করে সংসারের অর্থনীতিকে অনেকটা চাঙ্গা করে ফেলা যায় এবং আরতিকে তার কাজ ছাড়িয়ে সংসারের বেড়াজালে বন্দী করা যায়। যখনই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তখনই মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মুক্ত হয়েছে। স্বামীত্বের অধিকার ফলাতে উন্মাদের মত হয়ে বলেছে - "তোমার হয় চাকরি ছাড়তে হবে, নয় আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা কর।"[৩] কিন্তু তাতেও আরতির প্রতিবাদী মন অবদমিত হয় না। চাকরি সে

ছাড়েনি। চাকরি সে কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু যখন সুব্রতর জয়লক্ষ্মী ব্যাংকের চাকরি চলে যায় তখন আরতীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, পাশাপাশি সাবধানও করেছে - কারও কথায় যেন আরতি মাথা গরম করে চাকরি না ছাড়ে। কিন্তু যেদিন হিমাংশু মুখার্জির মুখে এডিথ সম্পর্কে নোংরা বিষয়ে মান-সম্মান খর্ব জনিত কথা শুন; সেদিন আরতি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি, তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করল। এডিথ সম্পর্কে নোংরা কথা তুলে নেওয়ার দাবি জানাল। হিমাংশুবাবু সেই দাবিতে রাজি না হওয়াই আরতি নিজের চাকরি রেজিগনেশন দিয়ে দিল। এখানে আরতির সেন্টিমেন্টাল বাঙালি নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

**সেতার :**

সেতার গল্পে দেখি যখন সুবিমল সংসার চালাতে অক্ষম, পাশাপাশি থাইসিস রোগে আক্রান্ত। সুবিমলের চাকরিই একমাত্র সংসারের ভরসা ছিল কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ায় সংসারে আর্থিক অনটন দেখা দিল। পিতা কালিমোহন দেশি একটা মার্চেন্ট অফিসে হিসেব লেখেন। তাতে তেমন রোজগার হয় না। প্রথম প্রথম বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। পরে বন্ধুদের কাছ থেকে অন্য বন্ধুদের ঠিকানা সংগ্রহ করে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করে কখনও ব্যর্থ, কখনও অব্যর্থ হয়েছে। ঔষধের মূল্য ও টুকটাক হাত খরচের জন্য মাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা থেকে সেই অভাব কিছুতেই পূরণ হয় না। কোথাও কোনো উপায়ান্তর না দেখে নীলিমাকে বলেছে - "অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষে নেওয়ার চেয়ে তোমার রোজগার আমি সহজভাবেই নিতে পারব।"[৪] সাংসারের আর্থিক অনটন মোচনের জন্য শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে নীলিমা রেখার সহায়তায় রায় সাহেবের বাড়িতে তার নাতনি অঞ্জু আর মঞ্জু,ওরফে কৃষ্ণা ও কাবেরীর গানের শিক্ষিকার কাজ করে। বেশ—ভূষা ও শরীরের দিকে না তাকিয়ে সে স্বামীর চিকিৎসার খরচ ও চেঞ্জে যাওয়ার খরচ জোগাতে চেষ্টা করতে লাগল। মোটা টাকা আয়ের জন্য সে সেতার শেখার আগ্রহ জানাল। এই সেতার শেখা একদিন যা ছিল শখের, আজ তা হয়েছে প্রয়োজনের। পুরন্দর বাবুর সহায়তায় ত্রিবেদীজীর কাছে নীলিমা সেতার শেখার সুযোগ পেল। দিনের এক সময় নীলিমা সেতার শেখে, অন্য সময় যত্রতত্র ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতে লাগল। এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চেঞ্জে যাওয়ার তিনশো টাকার লক্ষ্য পূরণের জন্য সে দিন-রাত এক করে দিল। এরপর নীলিমার চেষ্টায় সংসার সচল রেখে স্বামীর চিকিৎসার খরচ জুগিয়ে যেদিন হাসপাতাল থেকে স্বামীকে বাড়ি ফেরাল, সেদিন নীলিমার রংমহল থিয়েটারে নামিদামি শিল্পীদের সাথে সেতার বাজানোর প্রোগ্রাম। যা তাকে শিল্পীর মর্যাদায় খ্যাতি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী করে তুলবে। কিন্তু সুবিমল এই শুভক্ষণে স্বামীত্বের

অধিকার নিয়ে বসে। নীলিমাকে আত্মসম্মানে আঘাত করতে বাধে না তার। বলে— "তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছে নীলিমা বাঈজীর ভূতপূর্ব স্বামী ফিরে এসেছে যমের দুয়ার থেকে আজ কেবল একটিমাত্র জলসা হবে, কেবল তোমাতে-আমাতে।"[৫]

**কাঠগোলাপ:**

কাঠগোলাপ গল্পে আমরা দেখেছি নীরদ গায়ে পড়ে নিজের তাগিদে কলকাতায় নিয়ে গেছে অনিমাকে। এখানে এসে কলকাতার সাধ অনিমাকে পেয়ে বসেছে। কলকাতা তার কাছে যেন স্বর্গ। কলকাতার ট্রাম-বাস তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সিনেমার বিরহ তার পেটের ভাত হজম হতে দেয় না। বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন, পরিজনের মিলনানন্দ তাকে তিষ্ঠতে দেয় না। বিলাস বহুল সাজসজ্জা, বেশভূষা, প্রসাধনী সামগ্রী তাকে ঘুমোতে দেয় না। ফোনের ভিতর মৃদু-মধুর বার্তা তাকে হার্দিক অভিনন্দন জানায়। বেয়াড়া মনোভাবের জন্য অনিমাকে নীরদের ব্যঙ্গোক্তি শুনতে হয়েছিল- "নিজের হাতে খরচ করবার আনন্দই কেবল বুঝে গেলে, নিজের হাতে রোজগার করবার কষ্ট তো আর পেতে হ'ল না।"[৬] সেই ব্যঙ্গোক্তি নীরবে হজম না করে, অণিমা তীব্র প্রতিবাদ জানায়- "অফিসে পাখার নীচে বসে কাজ কর, আর সপ্তাহে একবার ক'রে রেশন নিয়ে আস ঘরে রাঁধাবাড়া, ঝাড়াপোঁছা, সংসারের কোন কাজটায় আমার না থাকলে চলে শুনি? ফিরিস্তি নিয়ে দেখ, তোমার কাজের চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুন আমার কাজ। তোমার মাইনে সোয়াশ' হ'লে আমার মাইনে কম ক'রে ধরলেও হওয়া উচিত আড়াইশ' - তা জান?"[৭]

কিন্তু কলকাতায় থাকা কাল হল এই ফোনকে কেন্দ্র করেই। নীরদের অফিসের ম্যানেজার তথা অফিসের মালিকদেরই একজন, দরকারি কাজেও ফোনের লাইন চেয়ে পায়নি, নীরদের সাথে অণিমার দীর্ঘ মিষ্টি-মধুর ফোনে ব্যস্ত থাকার জন্য। ম্যানেজারের কটুক্তির জবাব দিতে গিয়ে নীরদ মজুমদার বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। নীরদ চাকরি হারায়। অনেক চেষ্টা করার পর সামান্য অর্থের একটা পার্টটাইমের কাজ জোগাড় হয়, যা দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব। চাকরি হারা সংসারের আর্থিক অনটনের হাত থেকে রেহাই পেতে স্ত্রী, পুত্রকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু কলকাতার সাধ, শহরের আনন্দ অনিমাকে চেপে ধরেছে। তার একটাই দৃঢ় বক্তব্য - 'কলকাতা ছাড়ব না আমি।' পারিবারের আর্থিক হাল ফেরানোর তাগিদে অণিমা নানান বিষয়ে প্রয়াস চালায়। সেলাই, গান, সেবা- সুশ্রূষার সমস্ত গুন থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে, বলা চলে শংসাপত্রের অভাবে চাকরি পায়নি। বারাংবার ব্যর্থ হয়ে ম্লান মুখে নাকাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে কিন্তু সংসারের রণাঙ্গনে লড়াই জারি রেখেছে। শেষে অনিমা গর্ভে সন্তান ধারণ করেও মানদা, যশোদা ভগ্নিদ্বয়ের সহযোগিতায়,

শ্রীবিলাসের তৎপরতায় ঠোঙ্গা নির্মাণ প্রকল্পের হাত ধরে অচল সংসারে সচলতা আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

**চাকরি:**

চাকরি গল্পে দেখা যায়, মাধবী নীলাম্বরের প্রেমে পড়ে। পারিবারে আর্থিক অসংগতির কারণে নীলাম্বর বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছে। সে চায় একটা কোন চাকরি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে এবং মাধবীকে ঘরে তুলতে। এই বিষয়ে অবগত হয়ে, মাধবী নীলাম্বরকে নানান উপায়ে আর্থিক সহায়তা করার আশ্বাস দেয়। সংসারকে সচ্ছল রাখার জন্য নীলাম্বরের দুর্বল মনকে সবল করে তুলতে মাধবীর উৎসাহ ও প্রেরণার অন্ত নেই - "মাস্টারি ক'রে যদিও আমি বেশি পাইনে। কিন্তু দু'বেলা টিউশনি করব, তুমিও তাই করবে। আর ফাঁকে-ফাঁকে লিখবে। কোনরকমে চলে যাবেই। একটা ব্যবস্থা হবেই শেষ পর্যন্ত।"[৮] মাধবীর সাহায্য না নিয়েও নীলাম্বর সংসারের চাকাকে সচল রাখতে চিন্তায় বুঁধ হয়ে থাকে, লেখালেখি বন্ধ করে দেয়। তাই মাঝে মাঝে মাধবী নীলাম্বরের খোঁজখবর নিতে আসে তাকে চিন্তামুক্ত করার জন্য। আর্থিক দুরবস্থা ফেরাতে একদিন মাধবী নিজের মাইনের আশি টাকা নিলাম্বরকে তুলে দেয়। যার কাছ থেকে সমস্ত কিছু নেওয়া যায়, কিন্তু তার কাছ থেকে টাকা নিতে অস্বীকার করল নীলাম্বর। তাদের সামাজিক অনুষ্ঠান না হলেও দুটি পরিবার তাদের সম্পর্ককে মেনে নিয়েছিল। নীলাম্বরের মা সেই ৮০ টাকা অর্থ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। পাঠক মাত্রেই জানতে পারে যে বাসা বাঁধার গরজটা পারতপক্ষে মাধবীরই বেশি। বারংবার সে বাড়ির বাইরে বেরুচ্ছে নীলাম্বরের একটা চাকরির খোঁজে। নীলাম্বরও সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে, তাই মাস্টারি কিংবা কোন কেরানীর চাকরি পেলে বিয়ের পীঁড়িতে উঠবে বলে মনস্থির করেছে। নীলাম্বরের বুড়ো মা-বাপ ছাড়াও ভাই-বোন নিয়ে একটা আস্ত সংসার উপোস থাকবে, এই সম্ভাবনার কথা ভেবে মাধবী নিজের মান-সম্মানকে তুচ্ছ করে নীলিমার হাতে পায়ে ধরল, অনুরোধ করল; নীলাম্বরের একটা কাজ জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। নীলিমাও উপায়ান্তর না দেখে বান্ধবীকে আশ্বস্ত করল। একপ্রকার চাপ দিয়েই নীলিমা স্বামী সুবিনয়কে বাধ্য করল নীলাম্বরকে চাকরিটি দিতে; অসিতকে চাকরি দেওয়ার পাকা কথা নাকচ করে। পরে মাধবী জানতে পারল যার চাকরির বিনিময়ে নীলাম্বরের চাকরি হল সে তারই ক্লাসমেট অসিত দত্ত। অসিতের চাকরি-বিনিময়ের বিষয়টি তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। আজ সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল একদিন যে অসিতকে হৃদয়-দানে বঞ্চিত করেছে, আজ আবার তাকে চাকরি-দানেও বঞ্চিত করল। এই কথা ভেবে তার মন দুঃখে, বিষন্নতায়, মমতায়, সহানুভূতিতে ভরে উঠল। মাধবীর বান্ধবী ও মামাতো বোন নীলিমার

তৎপরতায় এবং মিস্টার সুবিনয় দাশগুপ্তের সহায়তায় নীলাম্বর চাকরিটিতে জয়েন করতে পারল। আজ নীলাম্বর তাকে বিয়ের জন্য পীড়া-পিড়ি করতে লাগল, মায়ের একান্ত নির্দেশের কথা জানাল কিন্তু আসিতের দুঃখ, দুর্দশার কথা ভাবতে ভাবতে মাধবী তার নিজের বিয়ে করার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলল। মাধবী জানাল দু-তিন মাস অপেক্ষা করতে ততদিনে আসিতের একটা চাকরি হয়ে যাবে।

**হেডমিস্ট্রেস :**

হেডমিস্ট্রেস গল্পে নায়িকা সুপ্রীতি যদিও প্রথমে শৈলেনের সহাধ্যায়ী ছিল, কিন্তু পরে ধর্মপত্নী হয়। কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই নায়ক-নায়িকা হৃদয়ের খুব কাছে আসে। শৈলেন একটু কবি-সাহিত্যিক গোছের মানুষ। সমাজে সুপ্রীতির সুনাম ও খ্যাতি প্রাপ্তির জন্য শৈলেন তার নামে কবিতা লিখে ছাপায়। এ বিষয়ে সুপ্রীতি প্রতিবাদ জানালে, শৈলেনের বিশ্বাস এতে শুধু সুপ্রীতির খ্যাতিই বাড়বে না, বরং তাতে শৈলেনের স্বত্ব আরও বেশি বাড়বে।[৯] কিন্তু পরবর্তী জীবনে বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থ সংকট বিমোচনের জন্য যখন সুপ্রীতি বালিকা বিদ্যালয়ে হেডমিস্ট্রেস হয়ে আসে, ধীরে ধীরে যখন সম্মানের মোহ, খ্যাতির লোভ, আর্থিক স্বাধীনতার মায়া তাকে পেয়ে বসেছে তখন শৈলেনের কাছে সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বাসা হেডমিস্ট্রেসের, সংসার হেডমিস্ট্রেসের, স্বামী হেডমিস্ট্রেসের; ছাত্রী, অভিভাবক, সেক্রেটারী, গোয়ালা, কয়লাওয়ালা, রেশন দোকানের মালিক সবারই নিকট হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতির পরিচয়ই শৈলেনের একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠেছে; যা সে কিছুতেই মেনে নিতে পরে না। বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষতান্ত্রিক আদিম মানসিকতা স্বামী শৈলেনের মধ্যে ফুটে উঠে। শৈলেনের পৌরুষত্বে আঘাত লেগেছে। মনে সক্রিয় হয়ে ওঠে মনুসংহিতার অমূল্য বাণী - নারীরা বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, এবং বার্ধ্যকে পুত্রের অধীন। তাই শৈলেন অসহিষ্ণু হয়ে মনস্থ করেছে- সুপ্রীতিকে কাজ ছাড়িয়ে, পাড়া ছাড়িয়ে, অন্যত্রে নিয়ে যাবে, যেখানে শৈলেনের পরিচয়ই সুপ্রীতির পরিচয় হবে।[১০] এমনকি সেক্রেটারীর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুপ্রীতির অনুরক্ত নয়, বিনীত অনুগৃহীত রূপটিও যেন শৈলেনকে অনেকখানি খুশি করেছে। পুরুষের কাছে নারীকে মাথানত করার দৃশ্যে, অনুকূল সরকারের সাথে নিজেকে অভিন্ন মনে করেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে নারী চরিত্রগুলির বৈচিত্র্যতা উপলব্ধি করা যায়। মেশিন বিক্রির কমিশন যে সহকর্মী পায়নি, আরতিরা সকলে চাঁদা সংগ্রহ করে তাকে হোটেলে খাইয়েছে। পারিবারিক অর্থ সংকটের কথা ভেবে সুপ্রীতি তার সহকর্মীদেরকে নিজের মাইনের টাকাও অকাতরে দিয়ে দিয়েছে। মাধবীও অসিত দত্তের একটা চাকরির

ব্যবস্থা না করতে পারা পর্যন্ত বিবাহ করতে রাজি হয়নি। এখানে তাদের মানবিক ও সংবেদনশীলতার রূপটি ধরা পড়েছে। রসময় প্রামাণিকের বাড়িতে মেশিনের ব্যবহার শেখাতে গিয়ে কমলার কাছে আরতিকে অপমানিত হতে হয়েছে। আবার যত্রতত্র সেতার শেখাতে গিয়ে নীলিমাকে অপদস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু তারা কেউ পিছু হটেনি, একসাথে ঘর এবং বাহিরের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে। আরতি, স্বামী এমনকি মুখার্জীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব। অনিমাও নীরদকে জানিয়েছে- কোন অবস্থাতেই সে কলকাতা ছাড়বে না। যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠার লোভ যেন আরতি, সুপ্রীতি, নীলিমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আবার সমস্ত নারী চরিত্রগুলিই পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল এবং বাস্তববাদী।

**তথ্যসূত্র :**

১। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা -১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা - ১২৪
২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৭
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৭
৪। তদেব , 'সেতার', পৃষ্ঠা - ৪৪
৫। তদেব, 'সেতার', পৃষ্ঠা - ৫১
৬। তদেব, 'কাঠগোলাপ', পৃষ্ঠা - ৮২
৭। তদেব, 'কাঠগোলাপ', পৃষ্ঠা - ৮২
৮। তদেব, 'চাকরি', পৃষ্ঠা - ২১৬
৯। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'হেডমিস্ট্রেস', গল্পমালা-৩, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা - ১১০
১০। তদেব, পৃষ্ঠা -১১০

মানস ঘোষ

## স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বাংলা গল্পে প্রতিফলিত নারীর জীবন যন্ত্রণা ও সংগ্রাম

অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে, অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে, দাঙ্গার ঘন তমিস্রাকে সরিয়ে, অবশেষে এসেছিল স্বপ্নের স্বাধীনতা কিন্তু সঙ্গে এনেছিল দেশ ভাগের বেদনা ও বিষাদ এবং বিপুল উদ্বাস্তু স্রোত। স্বাধীনতার স্বপ্নভগ্ন ঘটতেও বেশিদিন সময় লাগল না। সময় থেমে থাকে না আর চলমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যও আছে সমান সচল। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ধারায় ছোটোগল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যম। যদিও স্বাধীনতার পর বেশ কিছুকাল বাংলা গল্প বিষয়ের সংকটে ভুগছিল। মূলত নাগরিক জীবন, প্রেম অপ্রেম, সম্পর্কের টানা পোড়েন এই ছিল বিষয়। ছিল দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে প্রেমের বিচিত্র কাহিনি অথবা কাহিনির দারিদ্র্য। সাতের দশক থেকে অবস্থা পালটাতে শুরু করে। বিষয়ের অভাব পূরণ করে দিল রাজনীতি, রাজনৈতিক সংকট ও মানুষের ধারাবাহিক সংগ্রাম। ১৯৬৬'র খাদ্য আন্দোলন, ৬৭ ও ৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা, নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভ্যুত্থান প্রয়াস, জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা, '৭৭-এর সাধারণ নির্বাচন, '৭৮-এর অপারেশনবর্গা তরুণ লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগল।

বহমান জীবনের স্পন্দন ধারণ করতে শুরু করল বাংলা গল্প, গল্পকারগণ আসতে শুরু করলেন মাটির কাছাকাছি। একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের যে বাণিজ্যিক ধারা ছিল তার পাশাপাশি তরুণ ও প্রতিবাদী গল্পকারদের কলমে উঠে এল সমাজের সর্বহারা বিত্তহীন শ্রেণি এবং তাদের উপর যুগ যুগ ধরে ঘটে চলা অন্যায় ও শোষণের নিপুণ ও নির্মম বিশ্লেষণ। গল্পে কলুষিত নাগরিক জীবনের জায়গায় এল দারিদ্র্য লাঞ্ছিত গ্রামীণ জীবন এবং নগরবাসী কিন্তু শিকড়হীন শ্রমজীবীদের কাহিনি।

সমসময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক হলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১) যাঁর গল্পে সমসময় আর সময়ের যন্ত্রণা ধরা পড়ে ছবির মতো। দেশভাগজনিত কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল পরিবারের সন্তান তিনি। নিম্নবিত্ত পরিবারের মায়ের বেদনা খুব স্পর্শ করত বালক স্বপ্নময়কে, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরই 'আত্মসমীক্ষায়।' আত্মসমীক্ষায়[১] তিনি পাঠককে জানিয়েছেন "সাতাত্তর সালে মায়ের মুখে আগুন দি। উশখুশ করতে থাকা ঐসব দুঃখ কথা বলবার ইচ্ছে হতে থাকে আমার। 'শকুন' গল্পের চালওয়ালী আলোমণির গালে আমার মায়ের চোখের জল। 'নকশীকাঁথার মাঠে'র প্রতীকী আগুনে আমার মা পুড়ে যায়। 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা'র পরানের মা যখন পরানের কড়ে আঙুল কামড়ে দেয়, পরানের কানে কানে বলে ঘোষমার বাক্যের নালিশ কিংবা ফতেমার কথায়, নিঃশ্বাসে

মায়ের গন্ধ পাই। 'দুলাল চাঁদ' গল্পের ময়নামতি, 'রক্ত' গল্পের জবা এরকম অনেক দুঃখী মেয়েদের মধ্যে নিহিত রয়েছেন আমার মা"।

'অনুষ্টুপ' থেকে প্রকাশিত 'অষ্টচরণ যোলো হাঁটু' (অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১৫) পুষ্পিকার সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম গল্প 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তাঁর জীবন, অনিশ্চয়তা ছিল নিত্য সঙ্গী, জীবিকাও পরিবর্তন করেছেন বারবার। লেখক রসায়নে স্নাতক, পরে বাংলায় এম. এ। 'দেশলায়ের সেলসম্যান থেকে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ, ল্যান্ডরিফর্ম অফিসার, আবহাওয়া দপ্তরের রাডার চালক, দূরদর্শনের ফ্লোর ম্যানেজার, নানা বিচিত্র কর্মজীবন স্বপ্নময়ের।"[২] স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্য সাধনা 'সৌখিন মজদুরি' নয়, সাহিত্য সাধনা তাঁর প্রাণের সাধনা। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম প্রকাশিত গল্পসংগ্রহ 'ভূমিসূত্র'। অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি 'অষ্টচরণ যোলো হাঁটু' (১৯৮৮) 'ভিডিও ভগবান নকুলদানা', 'জার্সি গরুর উল্টো বাচ্ছা', 'সতর্কতামূলক রূপকথা', 'ফুল ছোয়ানো', 'ব্লুসিডি ও অন্যান্য গল্প', এছাড়াও প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনসপ্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত 'স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প', 'দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত 'সেরাপঞ্চাশটি গল্প' (২০১১), মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত 'সব গল্প মেয়েদের' (১৪২৪), প্রভৃতি।

গল্পকারের একটি নারীকেন্দ্রিক গল্প 'ইউসুফের মা'। (শারদ নন্দন' ১৯৯৫)। আদর্শের অবক্ষয়, সুবিধাবাদ, বামরাজনীতির বিভ্রান্তি ও মৌলবাদী শক্তির উত্থানের ইঙ্গিত আছে গল্পটিতে। গল্পটিতে আরও ফুটে উঠেছে আধুনিকতার সঙ্গে অন্তর্লীন ধর্ম প্রবণতার কথাও। ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কোনো কিছুই আমাদের সমাজ থেকে মুছে যায়নি যতই উচ্চশিক্ষার স্বাদ আমরা পাই না কেন। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র জয়ন্ত তার স্ত্রী শ্যামলীর অনুরোধে শ্যামলীকে তারকেশ্বরে পুজো দিতে নিয়ে যায়। জয়ন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বামপন্থী। তারকেশ্বরে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায় গবেষকছাত্র ইউসুফের সঙ্গে, সে হরিপাল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তারকেশ্বরে আসার কারণ গোপন করেও তারা ইউসুফের অনুরোধে ইউসুফের আতিথ্য গ্রহণ করে। হুগলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে তাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে গ্রামীণ জীবনের অপরিসীম দারিদ্র্য ও কলুষিত রাজনীতি। ইউসুফের ভাই মুসলিম কনফারেন্সের প্রার্থী ও মৌলবাদীদের একজন পাণ্ডা। মুসলিম প্রধান গ্রামটি থেকে দূরে পাশের গ্রামে ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছে হিন্দুত্ববাদীরা। ইউসুফ বলল "দেউলপুরের গ্রামপঞ্চায়েত ওরা জিতেছে। দেউলপুরের হাটে একটা রামমন্দির হয়েছে।........ এইসব অঞ্চল কয়েক বছরে কেমন যেন হয়ে গেল। এরকম হত না যদি সবাই কথায় কাজে এক হত। যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা করে না"। একই কথা শ্যামলী বলেছিল জয়ন্তকে "তোমাদের ডিসঅনেস্টির ছিদ্র পথেই এইসব ভাইরাসগুলো ঢুকেছে'। বামপন্থীদের ব্যর্থতা ও সুবিধাবাদ যে ইতিহাসের নির্মম কৌতুকে পরিণত হতে চলেছে তা বোঝা যায়

মন্তব্যগুলি থেকে। সমকালীন রাজনীতির ঘটনাবর্তের বিশ্লেষণ কতটা সত্য তার প্রতিফলন পাওয়া যায় গবেষকের বক্তব্যে "রামরথে চড়ে রাজনীতিক হিন্দুত্বের প্রচার অভিযান, রামকথা নিয়ে বইপত্র ১৯৮০-র দশকের শেষ থেকে এই যে কাণ্ডকারখানা শুরু হলো, তার পরিণতি হলো ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ অযোধ্যায় রামজন্মভূমির নামে বাবরি মসজিদ ধ্বংস।"[৩] কিন্তু ইউসুফের নিরক্ষর মা এসব থেকে অনেক দূরে, তিনি জানেন তাঁর ছোট ছেলে ইকবাল ভুল পথে চলেছে। তিনি গান বাঁধেন, কাঁপা গলায় গান শোনান শ্যামলীকে 'মানুষ যদি না হইত কে গাইত খোদার নাম/কবি যদি না লিখিত কে জানিত বৃন্দাবন ধাম'। শ্যামলীর মনে হয় এ যেন সেই রবীন্দ্রনাথের 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'। ইউসুফের নিরক্ষর মা চেতনার যে প্রান্তে অবস্থান করেন আধুনিক ভারতবর্ষ অবস্থান করে ঠিক তার বিপরীত মেরুতে।

দেশালয়ের সেলস্‌ম্যান হিসাবে কর্মজীবন শুরু হয় স্বপ্নময় চক্রবর্তীর, তারপর ভূমিরাজস্ব দপ্তরে চাকরি নিয়ে চলে যান গ্রামে। তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত বই 'ভূমিসূত্র'। 'শকুন' এই গ্রন্থের অসামান্য গল্প। সন্দেশখালিতে বন্যা হলে ক্ষুধার্ত, অসহায়, জীবিকাহীন আলোমণি তার বাবা মার সঙ্গে কোলকাতা চলে আসে, বাসা বাঁধে খালধারে। কানাই ডোমের সঙ্গে বিয়ে হয় আলোমণির। কানাই ডোম আলোমণিকে তাড়িয়ে দেয় এবং তার ছ-মাসের কচি বাচ্চাটিও মারা যায়। দ্বিতীয়বার তার বিয়ে হয়েছে হাতিয়ারার নারায়ণের সঙ্গে। গর্ভবর্তী আলোমণিকে চাল পাচারের বিপজ্জনক কাজে লাগিয়েছে নারায়ণ। নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে হবার পরও দু-দুবার সে ধর্ষিতা হয়েছে 'শকুন' মানুষের হাতে। আলোমণির কাতর আবেদনেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় কেন-না শকুন মানুষের সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া। আট মাসের পোয়াতি আলোমণির ভাদ্রের রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করে, বুঝতে পারে না অনাগত সন্তানের পিতা কে? 'এ নিশ্চয় গবভযন্তরনা, আটমাসে হয় কী করে? তবে কি হিসাবের ভুল, তবে কি ছোটবাবু? তবে কি পুলিশ? নাকি ছোরা হাতে গুণ্ডা, সোয়ামি গো, আমায় ক্ষমা করে দিয়ো'। গর্ভযন্ত্রণায় কাতর আলোমণি তার সমস্ত সত্তাকে নিঙড়ে দিয়ে অনাগত সন্তানের নিরাপদ আগমন কামনা করে, তার আকুল প্রার্থনায় জাগে কাব্যের রঙ, এই কর্কশ গল্পে তা সম্পূর্ণ বেমানান "হে ভগবান, আমার স্বামীকে একটিবার এনে দাও।... কোথায় আছ শিবঠাকুর, আমার অশথতলার আঁতুর ঘরে এসো। কোথায় ভাঙচ ঢেঁকিতে চাল ঘরের বউ, এসো একবারটি এসো গো। কোথায় গোবর দিচ্ছ ধাইমা, আমার খোকার কাছে এসো, গোরুর খুঁটো তুলতে বিকেল হলে যে আসবে, সে একটিবার আমার কাছে এসো"। তার শরীরে আশ্চর্য পরিবর্তন সূচিত হয়, স্নেহমমতায় তরঙ্গিত হয় তার হৃদয়। "আলোমণির সারা শরীরে ঢাক বাজে। দু'হাতে তালি মেরে মরা ডালে বসে থাকা শকুন তাড়ায় আলোমণি 'যাঃ দূর যাঃ।'

'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ' গল্পটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চবিত্ত বধূ, সর্বহারা পরিচারিকা, ছিন্নমূল অসহায় নারী প্রত্যেকে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী সমাজে তারা যে ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছুই নয় তা প্রমাণিত হয়েছে এই গল্পে। বঙ্গীয় বামপন্থী রাজনীতির বহিরঙ্গ আড়ম্বরের ভিতরে যে আদর্শের অবক্ষয় ঘটেছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধ্যবিত্ত নির্ভর রাজনীতির নির্বীর্যতা ও সুবিধাবাদ এবং প্রচ্ছন্ন ধর্ম ও সংস্কার, তাও নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। নীলাঞ্জনের ধর্মপ্রাণ বাবা ব্রাহ্মণ ছাড়া রান্না ও কাজের লোক রাখে না, বাড়ির নাম রাখে শিবশম্ভুধাম, নিয়মিত নারায়ণকে তুলসী দেয়। নীলাঞ্জন সমাজে অর্থপ্রতিপত্তি চায়, প্রমোশনের আশায় স্ত্রী বিদিশাকে বস হিতেশ তরফদারের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে। বিদিশা এবং সর্বহারা নেত্রী অনিতাদি সর্বহারার নাম করে গাড়ি ভি. সি. আর নিয়ে স্টেটাস বাড়ায়, ধর্ষিতা বস্তিবাসী পরিচারিকা বাসন্তীকে নিয়ে রাজনীতি করে। বাসন্তীর যন্ত্রণা সমাজের কেউ অনুভব করতে পারে না। "বাসন্তী কপাল কুঁচকায়। এনিয়ে কতবার হল, কতবার ওর লজ্জার কথা বলতে হয়েছে কতজনের কাছে। পুলিশের কাছে, ডাক্তারের কাছে, পার্টির লোকেদের কাছে, কত পার্টি, কত মাতব্বর, কত খবরের কাগজের লোক, 'উঃ' শুনেছ 'আ' শুনেছ, আর পারে না। ডাক্তারের কাছে ওর দেখাতে হয়েছে সব। কত জায়গায় কাপড় সরাতে হয়েছে, কান্না পেয়েছে কতবার। মিছিলে যেতে হয়েছে বাসন্তীকে, মিছিলের কথা উচ্চারণ করতে পারে না বাসন্তী। তবু কাল গেছে বন্দেমাতরম আজ গেছে ইনকিলাব। কাল নাকি যেতে হবে, দিদিমণি বলেছে। ধর্ষিতা নামে একটা শব্দ শুনছে দুদিন ধরে, মাইকে মিছিলে কতরকম করে কতবার। কত লোকে ওরদিকে কতরকম করে তাকিয়ে থাকে। কে বাসন্তী, কি বাসন্তী দেখি দেখি... বাসন্তী মাথা নিচু করে থাকে। মিছিলের ভাষা ঠিক ঠিক বলতে পারে না ও। এখন আরও ভয় লাগে ঝুপড়িতে। ভালো মানুষের জন্য ভয়।" যৌনপীড়নের পাত্রী হয়ে উচ্চবিত্ত নীলাঞ্জনের স্ত্রী বিদিশা, আর তার দুই কাজের মেয়ে চিনু ও বাসন্তী একই অবস্থানে উপনীত হয়, এক হয়ে যায় মেয়েমানুষ ও কলাগাছ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পগ্রন্থ 'সতর্কতামূলক রূপকথা'র ভূমিকায় গল্পকার লিখেছেন "টেকনোলজির টর্নেডো উপড়ে নিচ্ছে আমাদের সত্তার অনেকটাই। মানুষের গা ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসা মানবিক পাতাগুলি ঝড় থেকে বাঁচার জন্য রূপান্তরিত হচ্ছে ক্যাকটাস কাঁটায়। যুক্তিহীন প্রযুক্তি-মস্তানি মানুষকে ক্রমশ যন্ত্রদাস করে দিচ্ছে, আমরা দেখছি। যে প্রক্রিয়া মানুষকে ভূমিদাস করে সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। যন্ত্রের শাসনদণ্ডটিকে আমরা যাদুদণ্ড ভেবে দিব্যি সম্মোহনে আছি। দেখতে পাই না, যন্ত্রহাতটিকে রিমোটে নাড়াচ্ছে ব্যবসাবুদ্ধি। এই বিষয় নিয়েই গল্পগুলি।" এই সংকলনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ গল্প 'লজ্জামুঠি'। বিশ্বায়ন পরবর্তী ভোগসর্বস্ব যন্ত্রনির্ভর আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ

মানুষের জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কীকরে মানুষের হাতে মানুষ শোষিত হয় নির্মমভাবে, তার পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত গল্পটিতে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অন্ধমোহে মানুষ যন্ত্রদাসে পরিণত হচ্ছে, মানবিক সত্তা হারিয়ে সে নিজেই হয়ে উঠেছে একটি যন্ত্র। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই সমাজে প্রান্তিক নারীর অবস্থা কত অসহায়, কত করুণ ও কত মর্মান্তিক হতে পারে তার পরিচয় 'লজ্জামুঠি' গল্পে ফুটে উঠেছে। গঙ্গামণির কোলে জন্ম নিল সুচিত্রা, কিন্তু পরিবারে খুশির হাওয়া বইলো না, পর পর তার দুটি ভাই হল চুনি ও পান্না "পাড়া প্রতিবেশী শাঁখ বাজাল, উলু দিল হুলুস্থুল কাণ্ড হল।" দারিদ্র্যের জন্য সুচিত্রাকে কোলকাতায় বাবুর বাড়িতে কাজ নিতে হল। গঙ্গামণির আদরের মেয়ে সুচিত্রা এক অফিসার ও অফিসারণীর বাড়ি কাজ করে এবং বাবুর অফিসের বেয়ারা রতনকে ঘিরে স্বপ্নও দেখতে শুরু করে। অসাবধানবশত একদিন মিকসি মেশিনে সুচিত্রার আঙুলের ডগা কেটে যায়, বাবুদের বাড়ির কাজও চলে যায়, মুখ ফিরিয়ে চলে যায় রতন। নিঃসন্তান চাকুরিজীবী দম্পত্তি কথা দিয়েছিল তাকে নিজের সন্তানের মত দেখবে কিন্তু সুচিত্রাকে চলে আসতে হয় তার মায়ের কাছে। পরের দিন ভাইফোঁটা, 'ভায়ের কপালে যম দুয়ারে কাঁটা দিল সুচিত্রা।' দিদির কাটা আঙুল দেখতে পেয়ে হাতের খাবার দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে চুনি বলে ওঠে 'কী ফ্যাসাদ বাধালি অ্যা?' 'ফ্যাসাদ হয়ে যাওয়া গোটা নারীজন্ম' নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে সুচিত্রা। নারীজন্মের গভীর বেদনা ও ক্ষোভ কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন গল্পকার গল্পের অন্তিম চরণগুলিতে।

দেশভাগের যন্ত্রণা ও ছিন্নমূল হওয়া মানুষের অকথিত বেদনার কাহিনি ফুটে উঠেছে 'দেশের কথা' এবং গিরিবালা ও স্বাধীনতার পঞ্চাশবছর' গল্প দুটিতে। 'দেশের কথা' গল্পটি উত্তমপুরুষে বর্ণিত। ছিন্নমূল পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের কথক গল্পকার আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছেন ভিসা নিয়ে, আর তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে দেশভাগের ইতিহাস, যে ইতিহাস, ইতিহাসের পাতায় কখনো ফুটে ওঠেনি। কথকের সামনে ফুটে ওঠে মানুষের ইতিহাস দেশভাগ হয়ে যাওয়ার কারণেই বাকি জীবন অদর্শনে থেকে গেলেও অব্যক্ত ভালোবাসায় পরস্পরের মনের কাছাকাছি থেকে গেল দুই নারী-পুরুষ, এক হিন্দুসধবা ও তার স্বামীর মুসলমান প্রতিবেশী জব্বার আলি।

'গিরিবালা ও স্বাধীনতার পঞ্চাশবছর' গল্পটি মন ছুঁয়ে যায়। প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী বৃদ্ধা গিরিবালা সরকার স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর আজ কেবলমাত্র 'রিফিউজি সার্টিফিকেট' নিয়ে বেঁচে আছেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশনটুকুও পান না'। স্বাধীনতা সংগ্রামী গিরিবালাকে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, জেলযাত্রা করতে হয়েছে, বিধবা গিরিবালাকে ধর্ষিতা হয়ে সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে, এসেছে স্বপ্নের স্বাধীনতা কিন্তু গিরিবালাকে, মাতৃভূমি ত্যাগ করে উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দা হতে হয়েছে। প্রাপ্য সম্মান স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীনতাসংগ্রামী গিরিবালাকে কোনো দিন দিল না।

গল্পকারের আর একটি গল্প 'নকশি কাঁথার মাঠ' গল্পটি আলাদা করে আমাদের নজর কাড়ে। গল্পটি লেখকের প্রথম এবং গ্রামকেন্দ্রিক গল্পগ্রন্থ 'ভূমিসূত্র'র অন্তর্গত। গল্পটি গ্রামের গোবরমাখা দরিদ্র 'জগার বউ'-এর গল্প, তার স্বামী অসুস্থ, নিত্য শাশুড়ির গঞ্জনা সহ্য করতে হয় তাকে। স্বামীর চিকিৎসা করতে গিয়ে তাদের বাস্তু বন্দক দিতে হয়েছে। তাদের একটিমাত্র অসামান্য শিল্প সম্পদ আছে, জগার দিদিমার হাতে তৈরি আশ্চর্য সুন্দর 'নকশিকাঁথা'। যদিও শীত ফুরালেই 'নকশিকাঁথাটি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তারা বিক্রি করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কোলকাতায় বাবুদের। উপায়ন্তর না দেখে, জগার বউ চাল পাচার করতে গিয়ে রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, সব চাল কেড়ে নেয় পুলিশ। হতাশ জগার বউ গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করার কথা ভাবে আর প্রতীকী আগুনে পুড়ে যায় নকশিকাঁথা। গল্পটিতে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, পাঁচালি যার ফলে আমরা বেদনাবিধূর গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সুরটিকে ধরতে পারি।

গল্পকারের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'অষ্টচরণ ষোলহাঁটু'র নাম গল্পটিকে কেন্দ্র করেই গল্পগ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া ও তার নির্মমতা যে গ্রামজীবন থেকে মুছে যায়নি, এই বাস্তবতা গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাববস্তু ধারণ করে আছে একটি গ্রামীণ ছড়া বা 'শোলোক'। ছড়াটি আসলে একটি হেঁয়ালি "অষ্টচরণ ষোল হাঁটু/মাছ ধরিতে যায় লাটু/শুকনো ভূমে পেতে জাল/ মাছ ধরে সে চিরকাল"। ছড়ার অর্থটি খুবই সহজ-মাকড়শা, যে জাল পেতে মাছ ধরে। কিন্তু গল্পে এই ছড়া প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। মাকড়শা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নির্মম শোষণনির্ভর সমাজব্যবস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে যে ঊর্ণনাভের জালে বন্দি হয়ে যুগ যুগান্তর ধরে ছটপট করছে অসহায় মানুষ। বাঁকুড়া জেলার ধনী মাতঙ্গী রাজপরিবারের বর্তমান প্রজন্মের চিকিৎসক কন্যা মনীষার চোখ দিয়েই গল্পটির বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন গল্পকার। গল্পটিতে গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের নির্মম হিংস্ররূপ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি অধ্যাপক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নাগরিক শিক্ষিত মানুষের নির্লজ্জ সুবিধাবাদ, ভণ্ডামি ও হীন মনোবৃত্তির নগ্নরূপ প্রদর্শন করা হয়েছে। দরিদ্র কিশোর পবনকে সিংহ বংশের কবল থেকে মুক্ত করে কলকাতায় এনেছিল মনীষা কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারেনি, কলকাতায় পবন আটকে পড়েছে শিক্ষিত চিকিৎসক ডঃ সেনগুপ্তর জালে। যুগান্তর ধরেই পবনের মতো নিম্নবর্গের মানুষ মাকড়শার জালে বন্দি হয়ে চলেছে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী নারী জীবনকে কেন্দ্র করে যেমন সিরিয়াস গল্প রচনা করেছেন তেমনি নারীজীবনের অতিসাধারণ তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার গল্পও রচনা করেছেন। হালকা চালের সাধারণ চাওয়া পাওয়ার গল্প হলেও গল্পগুলিতে নারীর সূক্ষ্মমনস্তত্ত্ব অসামান্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে 'তিস্তা ও লাল কম্বল', 'পায়ের ছাপ', 'সাড়ে তিন কাঠার স্বর্গ', 'ননদ বৌদির অন্য গল্প', 'উত্তম কুমার হঠাৎ একদিন', 'নায়িকা', 'কোন

দেশেতে তরুলতা' প্রভৃতি গল্পগুলি। কয়েকটি গল্পে ফুটে উঠেছে সকরুণ মাতৃত্বের কাহিনি যেমন 'একটি মায়ের গল্প', 'নাস্তিকের মা', 'ভগবানের মা', 'মোবাইল সোনা' প্রভৃতি।

গল্পকার অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে যেমন নারী জীবনের আনন্দ বেদনা, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের ছবি তুলে ধরেছেন তেমনি অনাসক্তভাবে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী নির্মম সমাজ বাস্তবতার কথা তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হননি। তবে প্রতিবাদী নারী চরিত্র তেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে, কেবলই নিপীড়িত নারী চরিত্রের ভীড় তাঁর গল্পে। গ্রামীণ ভূমিহীন বা ভূমিনির্ভর বা নগরবাসী প্রান্তিক নারীদের কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন, তাদের সমতলে নেমে এসে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পকার সত্তার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত আছে আমাদের দেশজ সংস্কৃতির মৃত্তিকার গভীরে। বিশেষত প্রান্তিক নারীনির্ভর গল্পগুলি মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ লোকজীবন সম্পৃক্ত। মঙ্গলকাব্য, গ্রামীণ প্রবচন তথা লোকায়ত ভাষার নিপুণ প্রয়োগ যেমন প্রাকরণিক অভিনবত্ব এনেছে তেমনি গল্পগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. আত্মসমীক্ষা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, শারদীয়, ১৩৯৭
২. 'অষ্টচরণ ষোল হাঁটু' গ্রন্থের ব্লার্ব, অনুষ্টুপ, ২০১৫।
৩. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কামারের এক ঘা, ২০০৩, পাভলভ ইন্সটিটিউট, পৃ. ১০

**রচনাপঞ্জি :**

অষ্টচরণ ষোল হাঁটু, অনুষ্টুপ, ২০১৫
সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ, ২০১১
সবগল্প মেয়েদের, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৪

চন্দ্রিমা মৈত্র দুবে

## সমরেশ বসুর গল্পে শৈলীর অভিনবত্ব

বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিশালী ছোটগল্পকার সমরেশ বসু। নানান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল তাঁর জীবন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তিনি রচনা করেন একাধিক গল্প এবং উপন্যাস। ব্যক্তি জীবনের অন্তহীন অভিজ্ঞতার সুবাদে তাঁর প্রতিটি ছোটগল্প ছিল সমাজে ঘটতে থাকা নানান ঘটনার প্রতিবিম্ব। একবার শান্তিনিকেতনে লীলা রায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন,মানুষকে জানার জন্যই তিনি লেখেন। আসলে মানুষকে জানার এই অবাধ কৌতুহলই লেখককে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। সমরেশ বসুর গল্পে কাহিনি থাকে যতখানি,তার থেকেও বেশি থাকে জীবনের কথা, মানুষের কথা।

পারিপার্শ্বিক সমাজের নানান মানুষকে জানতে জানতেই সমরেশ বসু পরিচিত হয়েছিলেন বৈচিত্র্যময় ভাষার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাঁর গল্পের ভাষারীতির বদল ঘটেছে। কোথাও ব্যবহার করেছেন মধ্যবিত্তের শিক্ষিত ভাষা তো কোথাও সরল গভীর কথ্যভাষ্য,আবার কখনও গম্ভীর ক্লাসিক্যাল ভাষা। তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন এমন সব মানুষদের যাদের সমাজ কখনই স্বীকৃতি দেয়নি। চরিত্র অনুযায়ী তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছে উপযুক্ত ভাষারীতি।গল্পে তাঁর বৈচিত্র্যময় ভাষাই তাঁকে ভিন্ন করে তুলেছে। এ কথা সত্য যে প্রত্যেক লেখকেরই লেখার মধ্যে কিছু নিজস্বতা থাকে। ধ্বনিবিন্যাস, অনুচ্ছেদ তৈরি, বাক্যে শব্দের ব্যবহার, লেখার সূচনা এবং উপসংহার সবকিছুর মধ্যেই সেই নিজস্বতা ধরা পড়ে। এই নিজস্বতা বা লেখার স্টাইলই হল শৈলী। শৈলীর কোনো নির্দিষ্ট সহজ সংজ্ঞা নেই। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের কথায় - 'শৈলী হল লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা/এবং অচেতনভাবে নিয়োজিত সেই সব ভাষাগত উপায় যে সবের দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করেন।'[১] লেখকের ভাষা নির্বাচন করতে গিয়ে দুটি বিষয়ে মাথায় রাখা প্রয়োজন। প্রথমত - লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, চিন্তা যা তিনি নিজের ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত - কোনশ্রেণির পাঠক লেখকের লেখা পড়বেন সেই মতো ভাষা নির্বাচন করা।

অনেকে মনে করেন শৈলী কেমন হবে তা লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। একথা যে আংশিক সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখক কী বলতে চাইছেন তা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়েই পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনি কীভাবে অন্যদের থেকে নিজেকে ভিন্ন করেছেন তা অনুসন্ধান করার জন্যই সমরেশ বসুর গল্পের শৈলীর দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করব।

বাংলা সাহিত্যের একজন কালজয়ী সাহিত্যিক সমরেশ বসু। তাঁর গল্পের চরিত্ররা সবসময় নিজের ভাষায় কথা বলেছে, যা পড়লে সহজেই চরিত্র গুলির শ্রেণি, পেশাগত

পরিচয় বা ভৌগোলিক অবস্থান অনুমান করা যায়। বাঁধন সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'টপিক্যাল লেখক হিসেবে একদা পরিচিত সমরেশও নানা পর্বে নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন। সচেতন এই লেখক তাই এক জায়গায় তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুকে আবদ্ধ রাখতে চান নি।'[২] সমরেশ বসুর গল্পগুলির মধ্যে এই ভাঙ্গা গড়া লক্ষ্য করা যায়।লেখক তাঁর নিজের পুরনো বিশ্বাসের জগতকে ভেঙে চুরমার করে গড়ে তুলেছিলেন নতুন জগত, যেখানে সমাজ, সভ্যতা, অর্থনীতির প্রেক্ষাপট থেকে সরে গেছে যৌনতা,ভাগ্য নির্ভরতা, ব্যক্তিস্বার্থের দর্শনে।

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের প্রথম গল্প “আদাব”, এখানে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি করেছেন।এই গল্পে চরিত্রদের কোন নাম নেই। গল্পটি পড়ে দেখলে দেখা যায় যে চরিত্রের নাম না দেওয়ার জন্য গল্পের মূল বক্তব্য কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি। আসলে লেখক এই গল্পে প্রথম পুরুষের ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম পুরুষ হিসেবে যে দুই চরিত্রের মুখে লেখক কথা বলিয়েছেন সেখানে চরিত্র গুলির নাম দিয়ে তাদেরকে সীমাবদ্ধ করতে তিনি চাননি। চরিত্রগুলির সংলাপ তথা চরিত্রের মুখের ভাষা থেকেই তাদের শ্রেণিগত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পের লেখক সমাজে ঘটতে থাকা নানান ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেই বর্ণনার ভাষা এবং চরিত্রের মুখের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

**লেখকের বর্ণনার ভাষা :**

'রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।'[৩]

**চরিত্রের মুখের ভাষা :**

সুতা মজুর আতঙ্কিত কণ্ঠে, 'ধারে কাছেই য্যান লাগছে।'[৪]

মাঝি, 'হ,চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই।'[৫]

আবার এই আলোচনার সূত্র ধরেই বলা যায় লেখক এখানে হিন্দু সুতা-মজুর এবং মুসলিম মাঝির ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেননি। এখানে অবিভক্ত বাংলাদেশের ভাষাই প্রয়োগ করা হয়েছে যাকে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি পূর্ববঙ্গের ভাষা। এই ভাষা লেখক গল্পে ব্যবহার করেছেন কারণ দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। গল্পের অপর চরিত্র পুলিশ অফিসারের মুখে বসানো হয়েছে আরেকরকম ভাষা যাতে গল্পের চরিত্রের বৈচিত্র্যময়তার সাথে সাথে ভাষার ভিন্নতাও লক্ষ্য করা গেছে।

পুলিশ অফিসারের ভাষা : ' - হলট.......।'[৬]

'ডাকু ভাগতা হ্যায়।'[৭]

এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি-হিন্দি মিশ্রিত একটি ভাষা। অর্থাৎ মানুষের শ্রেণিগত

অবস্থান অনুযায়ী যে ভাষার বদল হয় তার দৃষ্টান্ত লেখক নিপুণভাবে এখানে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

গল্পের মধ্যে লেখক মাঝির কথার মধ্যে ব্যবহার করেছেন,"বাপজান", "পোলা-মাইয়া", "সোভানআল্লাহ", "বিবি", "মিয়া সাহেব"। সাধারণত "পোলা মাইয়া" আঞ্চলিক কথ্য ভাষা হলেও বাকি শব্দগুলি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মুখেরই প্রচলিত ভাষা। অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্য না হলেও জাতিগত দিক থেকে যে ভাষার পার্থক্য খুব স্বাভাবিক বিষয় তা বোঝানোর জন্য এই ভাষার ব্যবহার।

লেখক সমাজের তৎকালীন রাজনৈতিক বিভীষিকার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে- 'কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এলো দাঙ্গা।এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি-'৮ এখানে খুব সচেতন ভাবে তিনি "কোথা > থেকে = কোত্থেকে", "বলাবলি" > কওয়াকওয়ি" শব্দগুলি উচ্চারণ করেছেন যাতে করে গ্রামীন কথ্যরূপ এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গল্পের সামগ্রিক অংশ জুড়ে অসংখ্য জায়গায় অপিনিহিতির ব্যবহার যেমন—

চলে > চইলা

থেকে > থেইক্যা

উঠে > উইঠা

করে > কইরা

স্বরধনির পরিবর্তন - কেন > ক্যান(এ > অ্যা) লক্ষ্য করা যায়।বোঝা যায় লেখক বঙ্গালী উপভাষার প্রয়োগ এই গল্পে করেছেন।তাছাড়াও গল্পের মধ্যে দেখা যায়-

সুমুন্দি (অর্থ : আত্মীয় অথবা সম্বন্ধী)

পিত্যেক (অর্থ : প্রত্যেক) এরকম প্রচলিত কথ্য গ্রাম্য ভাষা এবং

ফারসি/হিন্দি শব্দ কচহরি > কাছারি ( অর্থ: আদালত বা প্রশাসনিক কার্যালয়)

বখশিশ (ফারসি শব্দ, অর্থ:পুরস্কার)

কেরায়া (ফারসি শব্দ থেকে আগত এবং প্রাকৃত ভাষা হয়ে বাংলায় প্রবেশ, অর্থ:ভাড়া) এসব নানান বিদেশী শব্দের ব্যবহার।

তৎকালীন পরিস্থিতি অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সেই উত্তেজনার মুহূর্তের মধ্যে লেখক এই গল্প রচনা করে অনন্য হয়ে উঠেছেন। তৎকালীন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গল্প রচনার সাথে সাথে নিপুণভাবে এবং অত্যন্ত সচেতন ভাবে ছোট্ট ছোট্ট শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে গল্পের শৈলী নির্মাণে সচেতন থেকেছেন।

সমরেশ বসু তাঁর "প্রতিরোধ" (৪৩-এ ঘটে যাওয়া তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট) গল্পে মন্বন্তরের শেষে আশায় বুক বাঁধা কৃষকদের কথা বলেছেন। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে

দাঁড়িয়ে আছে গান যা লেখকের নিজস্বতা।তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের অবস্থা,তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের জন্য লড়াই সবকিছুই উঠে আসে গানের মাধ্যমে। গানের মধ্যে সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরার জন্য সহজ সরল কথ্য ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে।

'শুন গো দেশবাসী, শুন মন দিয়া,
কহিতে পরান কান্দে,কান্দে আকুল হিয়া।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইল,মইল উলুখড়,
আশি টাকা মন চাউল হইল বাড়ল ধানের দর।
শুকনা মাঠ দৈত্যের মতো হাঁ কইরা রইছে,
পানি দেওয়ার লোক নাই সব মরণশয্যা লইছে,
কামারশালে আগুন নাই-হাপরে নাই টানা-
বাজারে নাই লোহা-কামারের পগটে নাই দানা।'[৯]

সমাজের খুব কঠিন সত্য বিষয় গতানুগতিকভাবে না বলে গানের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- গানগুলিতে অন্তমিল লক্ষ্য করা যায়।
- এই গানে লেখক ৮/৬, ৮/৬ মাত্রা বিভাজন করেছেন।
- মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে এখানে।

গল্পের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য শুধুমাত্র সমাজের বাস্তব চিত্র নয়, গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা, স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের কথা এবং সুবল-রাধার বন্ধুত্বের চিত্রও ধরা পড়েছে গানে।সমরেশ নিখুঁতভাবে যেমন দেখেছেন, পাঠকের কাছেও সেসব অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চেয়েছেন স্বচ্ছতার সঙ্গে।

যে প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে এই গল্প,সেখানে প্রধান ঘটনা তুলে ধরার পাশাপাশি নারীমনের অব্যক্ত বেদনার কথাও ব্যক্ত করেছেন লেখক। 'কিন্তুক- আমার যে পোলা হইবে না গো! আমি যে-'[১০] কিছু না বলেও লেখকের অনেকখানি বলে যাওয়া পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। পাঠকের চিন্তাশক্তির উপর আস্থা রেখে লেখক গল্পের ব্যঞ্জনা বাড়িয়ে দেন অনেকখানি। রাধা (যে নারীর কথা বলা হয়েছে) যে বন্ধ্যা সেকথা সে নিজের মুখে বলতে গিয়েও ডুকরে ওঠে কারণ নারীমনে এ এক স্পর্শকাতর জায়গা।একথা লেখক যেমন কোন অতিরিক্ত ভাষার ব্যবহার না করে শুধুমাত্র চুপ থেকে পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিক একইসঙ্গে তুলে ধরেছেন গ্রাম্য নারীদের আটপৌরে ভাষা। দুঃখের সাথে সাথে রাধার আনন্দ মিশ্রিত লজ্জার ভাষাকেও লেখক একইভাবে দেখিয়েছেন পাঠকদের।রাধা পরবর্তী সময়ে যখন সন্তানসম্ভবা হয় তখন লেখক দেখান, '-প্রায় চার-পাঁচ মাস। আমার কিছু— রাধার মুখে কথা ফোটে না।এত অসম্ভব লজ্জাবতী সে কবে থেকে হল।'[১১]

একই নারীর দুঃখ-যন্ত্রণা,আনন্দ যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি তার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠেছে গল্পের মধ্যে। দুঃখে লজ্জায় তার মুখে কোন কথা না বলালেও একজন নারীকে গর্জে উঠে খুব সহজেই 'ঢ্যামনা'[১২] র মত শব্দ উচ্চারণ করাতে পারেন। অপরের পর্দানশীন বিবিকে তার প্রাক্তন স্বামীকে বাঁচানোর জন্য কাটারি হাতে ছুটিয়ে আনতে পারেন লেখক।

পরবর্তী গল্প "অকাল বসন্ত" লেখক শুরুই করেছেন, 'অবশেষে একটা ঠাঁই পাওয়া গেল। বর্ষার শেষ শরতের শুরু।'[১৩] গল্পটির নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্যঞ্জনা। এখানে বর্ষা এবং শরৎ ঋতুর উল্লেখ থাকলেও কোথাও বসন্তের উল্লেখ নেই। লেখক গল্পে উল্লিখিত তিন বোন এবং মূল চরিত্র অভয়পদ-র মনের মধ্যে হতে থাকা সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলোর মাধ্যমে তাদের জীবনে যে অসময়ে বসন্ত এসেছে তা পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন।

গল্পের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে দিয়ে নানান জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। বিভিন্ন বিষয়ের ছোট্ট ছোট্ট বর্ণনা অন্যান্য গল্পের থেকে এই গল্পকে ভিন্ন করে তুলেছে।

**অভয়পদর বর্ণনা :**

'অভয়ের গায়ে সবজেটে জাপানি খাকীর জামা ও ঢলঢলে লম্বা প্যান্ট। মাথায় একটা চাষাদের টোকার মতো দীর্ঘবেড় টুপি।পায়ে ভারী বুট। চেহারাটা তার সাধারন বাঙালির তুলনায় অনেক লম্বা।'[১৪]

**বাড়ির বর্ণনা :**

'একটা ভাঙ্গা বাড়ি। পোড়োবাড়ির মত। বাড়িটাতে ঢোকবার দরজা নেই, একটা ছিটে বেড়ার আড়াল হয়েছে। দেওয়ালের ইঁট চোখে পড়ে না। সর্বত্রই গোবর-চাপটির দাগ।'[১৫]

এই গল্পে উপমার ব্যবহার নজর কাড়ে। গলির পথের সঙ্গে নর্দমার তুলনা, কচুরিপানার পুষ্ট লকলকে ডগার সাথে কালকেউটের ফণার তুলনা আবার আকাশের খইফোটা নক্ষত্রের সঙ্গে হলুদ লাল কালকাসুন্দ ফুলের তুলনা, যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে আমাদের চোখের সামনে ভাসে।

লেখক সহজ-সরল-সাবলীল ভাষায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বর্ণনা করেছেন, শীতের রুক্ষতার পর যেমন আসে সুন্দর বসন্ত, ঠিক তেমনি অভয়পদ যেন তিন বোনের রুক্ষ জীবনে বসন্তের মতই এসেছে। আবার বসন্ত বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে আসে গ্রীষ্মের দাবদাহ। এখানে সেই দাবদাহ হল অভয়পদ-র ট্রান্সফার। লেখক এক অভিনব স্টাইলের মাধ্যমে গল্পের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এবং নামকরণটিকে ব্যঞ্জনাবাহী করে তুলেছেন।

পরবর্তী এবং চতুর্থ গল্প "ও আপনার কাছে গেচে"। এখানে লেখক গল্প বলেছেন

স্মৃতিচারণা, বিবৃতি এবং একটি চিঠির মাধ্যমে। গল্পের ফর্ম নির্মাণে লেখকের মনোযোগ চোখে পড়ার মতো। চিঠি এসেছে এক নিকট আত্মীয়ের থেকে যার বাসভূমি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার, দাশপুর থানার একটি গ্রাম। চিঠির মধ্যে লেখক যে ভাষার ব্যবহার করেছেন সেখানে ব্যবহৃত শব্দগুলি- "চলচে", "পারচেন", "গেচে","দেখেচে","উবজে", "উটে", "পাটিয়ে", "ভেসেচে" ইত্যাদি,এখানে দেখা যায় মহাপ্রাণ বর্ণগুলি অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়েছে। আবার,

শুক্রবার > শুক্কুরবার

একমাত্র > একমাত্তর

রূপনারায়ণ > রূপনারাণ

তিনতলা > তেতলা

চিঠির মধ্যে এইসব শব্দের সচেতন ব্যবহারে বক্তার গ্রাম্যকথ্য রূপকেই লেখক স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছেন।

কিছু কিছু আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও এই গল্পে করা হয়েছে, যেমন -"চাতাল"- অর্থ "পাকা সড়ক" "মিছিল গাড়ি"- অর্থ "মিটিং মিছিলে আসা গাড়ি"।

লেখক গল্পের বিষয়বস্তুকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নতুন একটি ফর্মে। মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যার কথা ভেবে ছটফট করতে থাকা মন এবং 'কী লিখবো, এই সিদ্ধান্ত নিতে না পারা'[১৬] থেকেই এই গল্পের সৃষ্টি। গল্পের মধ্যে চিঠির 'স্যাঁতস্যাঁতে দোমড়ানো,কাদার দাগ লাগা, জলে ধুয়ে যাওয়া অক্ষর, ভাঁজের মুখে ছিঁড়ে যাওয়া'[১৭]র যে রূপ বর্ণনা করেছেন তা যেন বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরই প্রতিচ্ছবি। খুব অল্প কথায় দক্ষ ভাবে তিনি বন্যা কবলিত মানুষের অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর পাঠক শ্রেণির কাছে।

শৈলী বিচার করার কাজ কিছুটা হাতড়ে অনুসন্ধান করে এগিয়ে চলার কাজ। সেই অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধারণা করা যায় লেখকের আত্মদর্শনও এই গল্পে কাজে লেগেছে। আমরা জানি লেখক সর্বদা বিশ্বাস করতেন 'সাহিত্য থেকে জীবন বড়।'[১৮] এই গল্পে লেখক নিজেকে সেই প্রশ্নেরই সম্মুখীন করেছেন,'সাহিত্যের থেকে কি জীবন বড়?'[১৯] তাহলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে শৈলী শুধুমাত্র লেখকের শব্দবিন্যাস, বাক্যবিন্যাস, স্তবক রচনা, ভূমিকা বা উপসংহার নয়; নিজের জীবন অভিজ্ঞতা তথা আত্মদর্শনের দ্বারাও প্রকাশিত হয়।

সমরেশ বসুর রাজনৈতিক গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল "জলসা"। একটি অঞ্চল, যেখানে মুসলমান -বিলাসপুরি-বিহারী-মাদ্রাজি-উড়িয়া শ্রেণির মানুষের বাস সেখানে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হবে। গল্পটি লেখক বলেছেন বিবৃতির মাধ্যমে। মূলত এই গল্প এগিয়ে গেছে একটি জলসাকে কেন্দ্র করে সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়-শ্রেণির মানুষের জল্পনাকে তুলে

ধরার মাধ্যমে। তার সাথে সাথে এখানে শ্রেণিগত যে ভাষার তারতম্য তা প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রথমেই লেখক মুসলমান লাইনের কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার সাথে সাথে মুসলিম নামগুলি ব্যবহার করেছেন- "শরীফ","সোলেমান","হাফিজ","ফুল মহম্মদ", "রহমত"।ফুল মহম্মদ গায়ক, সে "কাওয়ালী" দলের সঙ্গে যুক্ত।কাওয়ালী হল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সুফি ভক্তিমূলক গান যা সাধারণত ফারসি এবং উর্দুতেই রচিত হয়। লেখক চরিত্র গুলির মুখে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলি সাধারণভাবে মুসলমান জনসম্প্রদায়ের মুখেই শোনা যায়।

→ বিমারি (ফারসি)

→ রোজানা (ফারসি)

→ তখলিফ (আরবি)

→ বিবি (ফারসি /তুর্কি)

→ দাওয়াই (ফারসি)

দ্বিতীয় হল "বিলাসপুরী" লাইন।তাদের নামের মধ্যেও আছে ভিন্নতা -"বৈজু", "কুন্থি", "ছেদি", "মনোহর"। এদের ভাষা হল সরকারিভাবে হিন্দি এবং এই বিলাসপুর অঞ্চলের মানুষ অধিকাংশই ছত্তিশগড়ীয় ভাষায় কথা বলে যা হিন্দির উপভাষা। তাছাড়া এখানে ভোজপুরি ভাষার চলও লক্ষ্য করা যায় যা লেখকের লেখনীতে ধরা পড়েছে।

● মেহেরারু (ভোজপুরি ভাষায় এর অর্থ হল স্ত্রী)

● মর্দানা,জেনানা,সাবুন, আদমি এসব প্রচলিত হিন্দি ভাষা যা চরিত্রের মুখে ব্যবহার করা হয়েছে চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

তারপর আসে "বিহারী লাইন"। এখানে লেখক বিহারীদের মুখে যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তা হল মূলত "খোট্টা" ভাষা।

● 'কাঁ হো শুকালু, গান্ধীবাবাকি তর্পণকে জলসা হো রাহা হ্যায়।'[২০]

● 'কালী কেলকাত্তামে বৈঠল বারম্বার ভারতমে।'[২১]

লেখক এখানে হরিশচন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বর কথা উল্লেখ করেছেন। বিহারী গোষ্ঠীর "শুকালু"র ধারণা জলসায় রোহিতাশ্বের গান হবে। কাইমুর পাহাড়ের শাহবাদ জেলায় রোহিতাশ্বের একটি ঘাঁটি ছিল।কাইমুর পাহাড় মূলত বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি পর্বত শ্রেণি। দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ভাষার ব্যবহার নয় ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লেখক অঞ্চল কেন্দ্রিক এমন সব তথ্য দিয়েছেন যার থেকে সহজেই অঞ্চলের কথা বুঝে নেওয়া যায়।

চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত "খোট্টা" ভাষা সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী

এলাকার লোকেদের মুখের ভাষা। খোট্টাভাষীদের মুখে এই ভাষা উচ্চারিত হয় হিন্দি বা উর্দুর মত আর এর বাক্য গঠনও প্রায় হিন্দিরই মতন।

"মাদ্রাজি লাইনে" কোনও চরিত্রের মুখে ভাষা প্রয়োগ না করলেও তারা যে তেলেগু ভাষায় সীতা উদ্ধার নাটক উপস্থাপন করবে তা লেখক গল্পে উল্লেখ করেছেন।এক চরিত্রের নামও দিয়েছেন-"আপ্পারাও"।

এরপর "উড়িয়া লাইনে" নিজেদের মধ্যে বাগবিতণ্ডার মাধ্যমে উঠে আসে তাদের নিজস্ব ভাষা।

- 'নইলে বাবুসাহেব আর লিবারবাবু সাদা টুপি মাথায় দিয়ে খাটতে আসিল কাঁই ?'[২২]
- 'নন্দের নন্দন বক্কাকোঁ রাই।'[২৩](গান)
- 'সড়া'[২৪]

উড়িয়া ভাষার সাথে বাংলা এবং অসমিয়া ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

এই গল্পের শেষে ইংরেজ সাহেবের মুখে লক্ষ্য করা যায় ইংরেজি মিশ্রিত ভাষা-

- "বুলাড়ি ডামগুড" "বহুটআচ্ছা'[২৫]
- "জোয়হিন্ড"।[২৬]

গল্পের শৈলী বিশ্লেষণ করে দেখা গেল গল্পের মধ্যে ভাষাগত তারতম্য। বোঝাই যায় যে সমরেশ বসুর ভাষা নিয়ে কোন ছুঁৎমার্গ ছিল না। অবলীলায় গল্পের ঘটনা, চরিত্র বদলের সাথে সাথে তাদের মুখে প্রয়োগ করেছেন সঠিক ভাষা। অঞ্চলভেদে, শ্রেণিভেদে, জাতিভেদে যে ভাষার তারতম্য ঘটে তা এখানে স্পষ্ট।

সমরেশ বসু তাঁর গল্প রচনার ক্ষেত্রে নানা রকম কৌশলের ব্যবহার করেছেন তা আমরা এতক্ষণ দেখলাম। তাঁর "সানা বাউরির কথকতা" গল্পে বর্ণনামূলক রীতি এবং কথোপকথন উঠে আসে। গল্পে সাঁওতাল পরগনার পূর্বে বীরভূম ঘেঁষা এক গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে - '.......... অন্ধকারে, গায়ে গায়ে জড়ানো বন মেঘের মত জমে আছে এখানে ওখানে, উঁচু-নিচু উঁচুতে। শালবন,তারপর হঠাৎ খাড়া খাড়া তালের সারি। সারি নয় তো ঘিরে থাকা জটলা।'[২৭] ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় গ্রামের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক গ্রামের প্রান্তীয় মানুষদেরই একসঙ্গে জটলা করে থাকার কথা বলেছেন। এখানে লেখক দ্ব্যর্থবোধক ভাষার ব্যবহার করেছেন। গল্পটিতে প্রতীক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।সাঁওতাল মেয়ের কাপড়ের টুকরোর সাথে তুলনা হয়েছে ভালুকের নখে ছেঁড়া কাপড়ের। গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষ শোষিত, অত্যাচারিত হতে হতে গ্রামটির বর্তমান যেমন অবস্থা -'অভিশপ্ত,নিশ্চল,বোবা'[২৮] সেরকম হয়ে গেছে।

গল্পে সুন্দর রায়, জীবন বাঁড়ুজ্জে এবং হারান গাঙ্গুলী জামশেদপুরের "আপিসে" কাজ করা বাবু শ্রেণির এবং সানা বাউরী নিচু প্রান্তিক শ্রেণির মুটে বওয়া মানুষ। দু'জনের কথা

বলার ধরন ভিন্ন। তথাকথিত বাবু শ্রেণি সানাকে একাধিক বার “তুই” বলে সম্বোধন করলেও সানা তাদের “আপনি- আজ্ঞে” করেই সম্বোধন জানিয়েছে। ‘ভদ্র-অভদ্রের এক ভাষা,মাতৃভাষা’[২৯] এই কথার মধ্যে দিয়ে লেখক গল্পে বর্ণিত গ্রামের মানুষদের ভাষা যে বাংলা তা সচেতন ভাবে দেখিয়েছেন।

কোথা > কুথা, তোরা > তুরা, বলেন > বুলেন, শুয়ে > শুয়্যা, মূর্খ > মুখ্যু, পেট > প্যাট, ভেসে > ভেইস্যা, স্বামী > সুয়ামি, দুঃখ > দুঃখুক, শরীর > শরীল, শাশুড়ি > শাউড়ী ইত্যাদি নানারকম শব্দগত পরিবর্তন, বিষমীভবন,স্বরাগম, শব্দের বিকৃত রূপ, অপিনিহিতির ব্যবহার গল্পে ধরা পড়েছে। গল্পের প্রাণ আনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রামীণ সাঁওতালকেন্দ্রিক আদিমতা- তাড়ি-পচুয়ের কলসি, হাঁড়িকাঠের কোলে জমে থাকা নিহত পশুর রক্ত, সাঁওতাল-বাউরীদের আদাড়ে-পাদাড়ে পড়ে থেকে মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে খোয়ারি কাটানো,সাঁওতাল নাচিয়ে মেয়েদের খোঁপার বাসী ফুল, বলির পশুর রক্তের সাথে মিশে যায় সাঁওতাল মরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের রক্ত ইত্যাদি। শুধুমাত্র সানা বাউরির সংলাপের সঙ্গে লেখক নিপুনভাবে যুক্ত করেছেন নিম্নবর্গের মানুষের কথা।

সমরেশ বসুর জীবনধারার মতই তাঁর গল্পের ভাষা-শৈলীও বিচিত্র। ভাষাক্ষেত্রে লেখকের প্রবল অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। তাঁর গল্পের ভাষা নিজের জীবন-দর্শনেরই প্রতিফলন। কোনও আরোপি ব্যাপার এখানে নেই। লেখক তাঁর গল্পগুলিকে অত্যন্ত সহজ-সরল ও স্পষ্টতার মধ্যে দিয়ে বলে চলেছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর গল্পে উপমা, অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ দেখা গেছে। সমাজকে খুব কাছ থেকে নিজের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করার কারণে তার গল্পের চরিত্রদের যেন চোখে দেখা যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। লেখক একটি লেখা সৃষ্টি করেন পাঠকের কথা মাথায় রেখে। তিনি জানেন তিনি পাঠককে হাসাতে চান নাকি কাঁদাতে চান নাকি শিক্ষা দিতে চান। গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং পাঠকের অনুভূতির কথা মাথায় রেখে তিনি তৈরি করেন গল্পের টেকনিক। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে শেখা স্টোরিটেলিং শিল্পরীতি ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশিষ্ট কথনশৈলী যা আয়ত্ত করেছেন জীবনকে জানতে জানতে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ বসুর গল্পের শৈলী সম্বন্ধে বলেন-‘নিছক স্টোরি প্রধান গল্প নয়, যে গল্পের আপাত বর্ণ বিরল ঝিনুকের দুটি পার্টির মধ্যে লুকানো থাকে আশ্চর্য মুক্তা, জীবন নামক সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে লেখক তুলে আনেন।’[৩০]

**তথ্যসূত্র :**

১. পবিত্র সরকার, (জুলাই ২০১৬) গদ্যরীতি পদ্যরীতি,পৃ. ১৩৯
২. বাঁধন সেনগুপ্ত, আজ বসন্ত (শরৎ-শীত ও বইমেলা সংখ্যা), দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা(অগাস্ট ১৯৮৮- জানুয়ারি ১৯৮৯),পৃ. ১

৩. সমরেশ বসু, মুহূর্তকথা (সমরেশ বসুর নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ,১ম খন্ড),পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৫,পৃ. ২৭১

৪. তদেব, পৃ. ২৭২

৫. তদেব, পৃ. ২৭২

৬. তদেব, পৃ. ২৭৬

৭. তদেব, পৃ. ২৭৬

৮. তদেব, পৃ. ২৭৩

৯. তদেব, পৃ. ৫২

১০. তদেব, পৃ. ৫৫

১১. তদেব, পৃ. ৫৮

১২ তদেব, পৃ. ৬০

১৩. তদেব, পৃ. ৯৮

১৪. তদেব, পৃ.৯৮

১৫. তদেব, পৃ. ৯৯

১৬. সমরেশ বসু,বাছাই গল্প(১৪২৯),পৃ. ৩৭৪

১৭. তদেব, পৃ. ৩৭৫

১৮. নবকুমার বসু, “ফিরে দেখা দেখি নাই ফিরে”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০২৩,পৃ. ১১৭

১৯. সমরেশ বসু,বাছাই গল্প(১৪২৯),পৃ. ৩৭৩

২০. তদেব, পৃ. ১৮৪

২১. তদেব, পৃ. ১৮৫

২২. তদেব, পৃ. ১৮৭

২৩. তদেব, পৃ. ১৮৭

২৪. তদেব, পৃ. ১৮৭

২৫. তদেব, পৃ. ১৮৮

২৬. তদেব, পৃ. ১৮৮

২৭. সমরেশ বসু,সমরেশ বসুর বাছাই গল্প(অক্টোবর,১৯৫৮),পৃ. ১৩৮

২৮. তদেব, পৃ. ১৩৮

২৯. তদেব, পৃ. ১৩৮

৩০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,“জীবনকে জানতে জানতে নিজেকে”, সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রথম প্রকাশ: ১৯৬১), প্রমা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৫

**মানস আচার্য**

## ইতিহাস চেতনার আলোকে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

নিরন্তর সাহিত্যচর্চা ও প্রতিবাদী চিন্তা চেতনার আবহে যাপিত হওয়া, ইতিহাস চেতনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বিশ শতকের ষাটের দশকে সাহিত্যভূমে আবির্ভূত এক উজ্জ্বল ব্যাক্তিত্ব হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি জানিয়েছেন তাঁর লেখার কোনও পূর্বসূরি ছিল না। তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী। তিনি যেখানেই দেখেছেন বঞ্চনা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অসাম্য, অশিক্ষা সেখানেই গিয়ে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করেছেন। সেই দুর্বল মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর তাদের পরিসেবা দিতে দিতেই তিনি লেখক হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর লেখক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বলেন

"আমার লেখার প্রস্তুতিতে কোনো ইনস্পিরেশন নেই, কঠোর পরিশ্রমই আছে শুধু। সারা বছরই নানা ধরণের লেখা আমাকে লিখতেই হয়। গল্প উপন্যাস সাংবাদিকতার লেখা প্রত্যেক দিন ১০-১৫ টি চিঠি এই সব। কোনো লেখাই সহজ নয়, প্রত্যেকটি লেখাই আমার কাছে সমান সিরিয়াস। এই সব লেখা লিখতে লিখতেই লেখক হয়ে গেলাম। চলে এলাম পুরোপুরি লেখার মধ্যে।"[১]

তাঁর লেখার বিষয়গুলিও উঠে এসেছে তার দৈনন্দিন জীবনচর্য্যা থেকেই। তিনি সে বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন —

"আমি তাদের কাছে যাই, যাচ্ছিই শুধু নয়, তারা আমার কাছে আসে থাকে,তাও মাত্র নয়, তাঁদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষ ভাবেই যুক্ত। সেই সব দূর গাঁয়ে-গঞ্জে কোথায় রাস্তা তৈরি হবে কি না, হওয়া উচিত। কোথায় দরবার করতে চায়, দাবি তুলতে হবে। এ সবই আমার কাজ আর সে সব নিয়েই আমার লেখার চেষ্টা, সেগুলিই আমার লেখার বিষয়।"[২]

কোন সখের মজদুরি নয়, শুধু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি বার বার ছুটে গেছেন বাংলা-বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে। জড়িয়ে গেছেন সিংভূম ইংরেজ চিহ্নিত অপরাধ প্রবন জাতি মুণ্ডা শবর লোধাদের সঙ্গে। তাঁর বালিগঞ্জের বাসায় প্রতিদিন প্রায় দু—তিনজন শবর এসেছে নানান সমস্যা নিয়ে। তাদের কাজ তাদের সমস্যা শোনা ও সে গুলির সমাধানের সঠিক পরামর্শ দেওয়া — এ সবই তাঁর জীবনের অঙ্গ। এই সব মূঢ়মুক মানুষগুলির কাছে তাই তিনি যথার্থ অর্থে-ই মা (শবরজননী) হয়ে উঠেছেন।

এভাবেই মহাশ্বেতা দেবীর লেখালেখির জগতে প্রবেশ। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি লেখালেখিকেই পাকপাকি ভাবে জীবিকা হিসেবে বেছে নেন। প্রায় আড়াই'শ-র বেশী গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। আর এই লেখালেখির স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি — ম্যাগসেসাই, জ্ঞানপীঠ,

সাহিত্য আকাদেমি, দেশিকোত্তম, পদ্মশ্রী, নেনিনো প্রভৃতি পুরস্কার পেলেও তাঁর প্রকৃত আনন্দ আর তৃপ্তির জগৎ হল অসহায় মানুষ গুলির সেবা, তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাঁর লেখাগুলি তাই যথার্থই প্রমাণ করে দেয় তিনি একজন লেখক সর্বোপরি এক জন সমাজকর্মী। তাঁর রচনা সম্ভারের দিকে এক দৃষ্টি নজর দিয়ে দেখতে পারি। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ — 'ঝাঁসির রাণী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নটী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। এরপর 'যমুনা-কি-তীর', 'মধুরে-মধুর', 'তিমির লগন', 'এতটুকু আশা', 'প্রেমতারা', 'পরমপিপাসা', 'রূপরেখা', 'তারার আঁধার', 'সন্ধ্যার কুয়াশা', 'লায়লী আশমানের আয়না', 'অমৃত সঞ্চয়', 'বায়োস্কোপের বাক্স', 'দিনের পারাবার', 'অজানা', 'আঁধারমাণিক', 'তীর্থশেষের সন্ধ্যা', 'বিপন্ন আয়না', 'দুস্তর', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু', 'স্বামীর ঘর', 'ধানের শীষে শিশির', 'হাজার চুরাশির মা', 'স্বাহা', 'অরণ্যের অধিকার', 'ঘরে ফেরা', 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর', 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা (একত্রে দুটি উপন্যাস), 'অক্লান্ত কৌরব', 'পলাতক', 'বিবেক বিদায় পালা', 'সুরজ গাগরাই', 'তিতুমীর', 'শৃঙ্খলিত', 'আশ্রয়', 'স্বেচ্ছাসৈনিক', 'নীলছবি', 'বিশ-একুশ', 'বৈসূচনের সেনা', 'বন্দোবস্তী', 'টেরোড্যাকটিল', 'পূরণ সহায় ও পিরথা', 'সতী', 'পারিবারিক', 'প্রথম পাঠ' ( একত্রে দুটি উপন্যাস), 'ক্ষুধা', 'মার্ডারারের মা', 'হিরো: একটি ব্লু-প্রিন্ট', 'আই.পি.সি.৩৭৫', 'সাত নম্বর আত্মহত্যা', 'আগুন জ্বলেছিল', 'ব্যাধ খণ্ড', 'কৈবর্ত খণ্ড', 'সাংবাদিক', 'বেনেবউ', 'প্রতি ৫৪ মিনিটে', '৬ই ডিসেম্বর পর', 'প্রস্থানপর্ব', 'মিলুর জন্য', 'ঘোরানো সিঁড়ি', 'যে যুদ্ধ থামল না', 'ঊনত্রিশ নম্বর ধারার আসামি', 'জটায়ু', 'দশটি উপন্যাস' (গান্ধারী পর্ব, পোস্টমর্টেম, সাংবাদিক, ঝাঁঝরি-কড়া-বেড়িহাতা, মনে মনে, রেজিস্টার্ড নম্বর ১০৩৪, ওয়ান্টেড, গোহ, বেদনাবালার আত্মকথা দুস্তর), স্বপ্ন দেখার অধিকার (পাঁচটি উপন্যাস) গুস্বপ্ন দেখার অধিকার, ধানকুড়ানি, সম্পর্ক, একটি রাত কহানি, এলাটিং বেলাটিং সই লো।৪ 'দিয়া ও মেয়ে নামতা' (দুটি ছোট উপন্যাস)[দিয়া, মেয়ে নামতা], 'তিন কন্যা ও অধবা' (দুটি ছোট উপন্যাস) পাঁচটি উপন্যাস 'রূপরেখা', 'নিরুদ্দেশযাত্রা', 'মধুরে মধুর', 'দুর্ঘটনা', 'মিলুর জন্য'। নানা রসের নয়টি উপন্যাস [মিলুর জন্য, প্রস্থানপর্ব, আই.পি.সি. ৩৭৫, প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে, পারিবারিক, মুখ, কেয়ারটেকার, ঘোরানো সিঁড়ি] 'ন্যাদোশ', 'পরিশিষ্ট ছিন্ন পাতার ভেলা', 'অস্থির পঞ্চম'(পাঁচটি উপন্যাস) [রাহুকাল, মৃত্যু সংবাদ, বিনীতা মিত্র, লক্ষ্মণরেখা, অস্থির পঞ্চম]। এ ছাড়াও কিছু উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে — যেগুলি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করেনি — 'ফানুস'(শারদ বসুধারা), 'সামনে তাকাও' (গল্প-ভারতী), 'গোলাপের যুদ্ধ' (শারদীয় দীপান্বিতা), 'দেবিকার জন্মদিন' (উল্টোরথ) 'জন্ম যদি তব' (শারদীয় দক্ষিণীবার্তা), 'মাস্টার সাব' (শারদীয় প্রমা), 'হুলমাহা' (শারদীয় যুগান্তর), 'পিতা'(শারদীয় যুগান্তর), 'জঙ্গল' (ঋতুপত্র গাঙ্গেয়), 'পোস্টমর্টেম' (শারদীয় নবকল্লোল), 'জনক' (শারদীয় প্রসাদ),

'মহাকাল' (শারদীয় দৈনিক বসুমতী), 'সময় এই সময়' (শারদীয় ওভারল্যাণ্ড), 'গান্ধারী পর্ব' (শারদীয় প্রসাদ), 'সংবাদ' (শারদীয় নবকল্লোল), 'লক্ষ্মণরেখা' (শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন), 'ম্রু' (শারদীয় প্রতিক্ষণ), 'হাইরাইজ' (শারদীয় মনোরমা), 'রেজিস্টার্ড নং ১৪০৩' (শারদীয় নবকল্লোল), 'রাতকাহানী' [প্রথম পর্ব] (শারদীয় প্রতিক্ষণ), 'ধানকুড়ানি' (শারদীয় প্রসাদ), 'একটি রাত কহানী' (শারদীয় আজকাল), 'সম্পর্ক' (শারদীয় প্রসাদ), 'স্বপ্ন দেখার অধিকার' (শারদীয় সংখ্যা প্রতিদিন)। এছাড়া অসংখ্য ছোটগল্প, অনুবাদ, প্রবন্ধ। উপন্যাস রচনার এই দীর্ঘ পথ চলায় — বারে বারেই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। বারে বারেই তিনি নিজেকে ভেঙেছেন আবার গড়েছেন। এই ভাবে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাস সৃষ্টির ধারাবাহিক প্রবাহটিকে সচল রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচক সুমিতা চক্রবর্তী যথার্থই বলেন — "মহাশ্বেতাই সম্ভবত সেই ঔপন্যাসিক যিনি বারবার পাঠে পর্বে নিজেকে ভেঙ্গে আবার গড়েছেন। পথ চলতে চলতে নিজেকে বদলেছেন, বদলেছেন নিজের শিল্পরূপ, কোনো বাইরের চাপে নয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের চাপে নয়, সম্পূর্ণ নিজের হৃদয়ের তাপে নিজের সচেতন ইচ্ছায় এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রবাহটিই রেখেছেন আত্মনিয়ন্ত্রণে"[৩] তাঁর উপন্যাসের প্রধান তিনটি উপাদান হলহ) ইতিহাসহ) আদিবাসী বা নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষহ) মানসিক টানাপোড়েন। তাঁর উপন্যাস গুলির বিষয় বস্তুর বিবর্তনটি লক্ষ্য করার মতে। তাঁর রচনার প্রথম পর্বে-বিষয়বস্তু-প্রধানত ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রসের উপন্যাস। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস গুলিতে ইতিহাস নির্ভর গণ আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত। এবং তৃতীয় পর্বে এসে উপন্যাস গুলি রাজনীতি নির্ভর হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস চেতনা প্রধান হলেও এর বাইরেও বেশ কিছু অন্যধরণের রচনাও তিনি লিখেছেন — উদাহরণ হিসাবে বলা যায় — 'সামনে তাকাও', 'অজানা', 'বিপন্ন আয়না', 'তীর্থ শেষের সন্ধ্যা', 'দুস্তর', 'গোলাপের যুদ্ধ', 'বাসস্টপে বর্ষা', 'অবিশ্বাস্য', 'স্বামীর ঘর', 'জন্ম যদি তব', 'ঘরে ফেরা' — ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর প্রধান সিদ্ধি ইতিহাসরস সমৃদ্ধ উপন্যাসেই। তিনি জানান — "ইতিহাসই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম লেখা থেকেই। আর বেশ ক'বছর ধরে মনে হচ্ছে ইতিহাস — মনস্কই বলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিভাজন ও বিদ্বেষ, মেয়েদের বিষয়ে সমাজ মানসিকতার অন্ধকার সঙ্কীর্ণতা এমন অনেক সমস্যাই আমরা সম্পূর্ণতায় বুঝতে পারছি না।"[৪]

ইতিহাস চিরকালই মহাশ্বেতা দেবীর প্রিয় বিষয়। তাঁর চর্চিত ইতিহাস হল সমাজ জীবনাশ্রিত ইতিহাস। তাঁর মতে ইতিহাসের পাতায় লেখা রাজা-রাজড়াদের কথাই একমাত্র ইতিহাস নয়, তাদের বাদ দিয়েও বাকী নিরানব্বই শতাংশ সাধারণ মানুষের ইতিহাসই হল প্রকৃত ইতিহাস। এই ইতিহাসই সব চেয়ে বড় সত্য, সব থেকে বেশী বিশ্বাসযোগ্য। নীহাররঞ্জন রায়, রামশরণ শর্মা প্রমুখগণ ইতিহাসের নোতুন যে ধারার চর্চা করেছিলেন — মহাশ্বেতা দেবী সেই ধারারই অনুগামী। অর্থাৎ তাঁর কাছে ইতিহাস চেতনা প্রচলিত ধারার থেকে

স্বতন্ত্র। তিনি প্রথাগত ইতিহাস ধারার বাইরে গিয়ে এক বিকল্প ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান দেন তাঁর উপন্যাস গুলিতে। এতদিন ইতিহাস ছিল সরল রৈখিক এক ডাইমেনসনযুক্ত, তিনি সেখান থেকে এগিয়ে থ্রি-ডাইমেনসনযুক্ত ইতিহাসের চর্চা করলেন। গনবৃত্তের ইতিহাস চেতনার আলোকে যেন তিনি তাঁর উপন্যাস গুলিতে ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটালেন। তাঁর মতে "ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে মানুষের অন্তর্মুখী পুরুষার্থকে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া।"[৫] তিনি আরো বলেন — "আমি বিশ্বাস করি গণ ও সমাজ আশ্রিত ইতিহাস চর্চায়। ইতিহাস চর্চা আমার মতে সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক মূল শিক্ষা।"[৬] তাঁর মতে ইতিহাসের মধ্যে হতে হবে সমষ্টি চেতনার প্রকাশ। ব্যক্তি মানুষ নয় সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন আলেখ্যই হল ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন এর দুপেয়ে চাল একদিকে ঐতিহাসিক রস অন্যদিকে উপন্যাস। অর্থাৎ সত্যভিত্তিক তথ্য নিষ্ঠা যেমন থাকবে তেমনি কল্পনাও সম্পৃক্ত থাকবে। এই দুয়ের পার্বতি পরমেশ্বরের মেল বন্ধনেই সার্থক হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক উপন্যাস। অনুরূপ ভাবেই মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্য স্রষ্টার দৃষ্টি দিকে ইতিহাসকে ব্যবহার করলেন তাঁর উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে। তিনি ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠাকে বিকৃত না করে জীবন ব্যাখ্যার দুঃসাধ্য কাজে মন নিবেশ করলেন। তাঁর উপন্যাসে উঠে এল ইতিহাসের কালপরম্পরায় ঘটে যাওয়া ইতিহাস নির্ভর কাহিনি। তাঁর সাহিত্যে প্রেক্ষাপট হিসাবে উঠে এসেছে তেভাগা আন্দোলন, কোল বিদ্রোহ, সিধু-কানুর হুল, তামাড় বিদ্রোহ, নকশাল আন্দোলন, কেন্দ্র রাজ্য আঁতাত, ভোটসর্বস্ব রাজনীতি, গনতন্ত্রের কুফল আর অন্তজ মানুষের অসহায়তা। তিনি আরো একধাপ এগিয়ে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে সাহায্য নিলেন — ম্যাপ, দলিল, পুরানো পুঁথি। তিনি গণবৃত্তের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতেই লোকবৃত্ত থেকে সংগ্রহ করলেন ইতিহাসের উপাদান। তিনি বলেন — "আমার গল্প কাহিনি পড়বার সময় যদি মনে রাখেন, এই দুরাকাঙ্খী লেখক শুধুই অন্বেষণ করেছেন ইতিহাস অলিখিত ইতিহাস, যা বইয়ে মেলে না। আমি সেই কবে এই স্থির প্রত্যয়ে উপনীত যে জনবৃত্তের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। যে ইতিহাস লেখা হয়নি কখনো।"[৭] এবার আমরা মহাশ্বেতা দেবীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোক প্রকাশিত উপন্যাস গুলির সাধারণ পরিচয় নিতে পারি।

মহাশ্বেতা দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম করতে হয় — 'ঝাঁসির রাণী'। গ্রন্থটি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ লাভ করে ১৯৫৫ সালে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। অনেকে এটিকে উপন্যাস মনে করলেও এটি উপন্যাস নয়। লেখিকা ১৯৫০ সালে সপরিবারে বোম্বে গিয়ে — বড় মামা শচিন চৌধুরীর বিশাল লাইব্রেরীতে সাভারকারের লেখা '১৮৫৭' নামক বইটি

পড়ে ঝাঁসির রাণীর জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হন। তিনি গ্রন্থের কাহিনি সংগ্রহ করেন রাণির ভাইপো গোবিন্দ চিন্তামণী তাম্বের কাছ থেকে। এছাড়া তিনি ঝাঁসি, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে ঘুরে রাণি সম্পর্কিত বহু উপাদান লোকবৃত্তের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করেন। এখানে কেবল মহাফেজখানার তথ্যই নেই আছে লোকসাধারণের কাহিনি। তিনি বলেন—“আমি গণবৃত্তের ইতিহাসে বিশ্বাসী। সিপাই বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত কৃষকদের সংগ্রাম। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে লোকবৃত্তের গান গাঁথা মূল্যবান সম্পদ। লক্ষ্মীবাঈ — এর জন্য স্মরণীয় যে ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন যে রাণিকে কেন্দ্র করে মধ্য ভারতে এক ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান গড়ে উঠেছিল।”[৮] মহাশ্বেতা দেবী দেখান আজও বুন্দেলখন্ডের গরিব মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনে রাণি বেঁচে আছেন। এমনকি সেই ইংরেজ যে রাণিকে পরাজিত করেছিল তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন রাণীর শ্রেষ্ঠত্ব তার অবিনাশীত্বকে। তাই রাণি এখানে শক্তিরূপী দুর্গা রূপে কল্পিত।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম উপন্যাস ‘নটী’ রচিত হয় ১৯৫৭ সালে। মহাবিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত — প্রেক্ষাপট ঝাঁসির প্রান্তর। উপন্যাসে ইতিহাস হিসেবে এসেছে রাণি লক্ষ্মীবাঈ কথা। যদিও উপন্যাসে প্রধান হয়ে ওঠে রাজনর্তকী মোতি এবং পাঠান যোদ্ধা খুদাবক্সের প্রেম কাহিনি। ঝাঁসির পথে যে প্রেমের সূচনা তার সমাপ্তি ঘটে ঝাঁসির যুদ্ধক্ষেত্রে। নর্তকী জীবনের প্রেম যে মিলনান্তক হতে পারে না তার ইঙ্গিত মহাশ্বেতা উপন্যাসের শুরুতেই দিয়ে রেখে ছিলেন। উপন্যাসে উল্লেখিত ইউরোজ,স্ট্যার্সফোর্ড, ব্রাইট — প্রভৃতি চরিত্রগুলি ইতিহাস সমর্থিত। এমনকি খুদাবক্স চরিত্রটিও ইতিহাসে রয়েছে। এক রোম্যান্টিক আখ্যানের সঙ্গে লেখিকা ইতিহাসকে যুক্ত করেছেন। আর সাথে সাথে ধরা দিয়েছে সে সময়কার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-লোকজীবনের ইতিহাস। ইতিহাস বিশেষ করে সংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ইতিহাস মহাশ্বেতা দেবীর বহু উপন্যাসেরই উপজীব্য বিষয়। তিনি নিজের প্রথম রচনাটিকে ‘জেদের ইতিহাস’ বলে বর্ণনা করেছেন। তাই সিপাই বিদ্রোহের পটভূমিতে তিনি যে প্রথম উপন্যাসটি রচনা করলেন তাতে ব্যাক্তি প্রেম অপেক্ষা অনেক বড় হয়ে দেখাদিল দেশপ্রেম।

‘ঝাঁসির রাণীর’ পরের বছর প্রকাশ লাভ করে ‘যমুনা কি তীর’(১৯৫৮)। উপন্যাসটির পটভূমি ১৯১১-১২ সালের বেনারস। দয়াল একদিন আবিষ্কার করে বেনারসের রাস্তায় রাস্তায় থাকা বিরল গায়ন প্রতিভার অধিকারী আনন্দকে। আনন্দকে ওস্তাদ জমীর খাঁ সাহেবের কাছে পৌঁছে দিয়ে তার প্রতিভার পূর্ণবিকাশের জন্য তিনি ব্যাকুল হন এবং আনন্দকে নিয়ে আসেন শ্রীনটপুরের জমিদার মহারাজা যোগীশ্বর রায়ের বাড়ি। সেখানে আনন্দ যেমন পেয়েছিল — যোগীশ্বর রায়ের স্নেহ বড় ওস্তাদের কাছে গান শেখার সুযোগ, আর পায়

রাজকুমারী ইন্দুমতীর সঙ্গে অবাদ মেলামেশার সুযোগ। আর এখানেই সূচিত, হয়েছিল কাহিনির ট্র্যাজেডি। শ্রেণী বিভাজনই যে আনন্দ — ইন্দুর বিচ্ছেদের কারণ তা লেখিকা স্পষ্ট করেছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক যে অসম দুই প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা নরনারীর মিলন ঘটাতে পারে না, তা বোঝা যায় আনন্দ এবং ইন্দুর বিচ্ছেদ থেকে।

'অমৃত সঞ্চয়' (অমৃতসঞ্চয়ণ) এর প্রকাশ কাল ১৯৬২। উপন্যাসটির কাহিনির সময়কাল উনিশ শতকের মধ্যভাগ, সিপাই বিদ্রোহ সংগঠনের কাল। ততোদিনে ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে গেছে। রেলপথের বিস্তার ঘটেনি। কোম্পানির আধিপত্য ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশীয় সিপাইদের উপর অপমানকর ব্যবহার তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। উপন্যাসের ভূমিকাংশে উপন্যাসে ব্যবহৃত ইতিহাসের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে লেখিকা বলেন — "অমৃতসঞ্চয়ণ উপন্যাসটির যখন আরম্ভ তখন লর্ড ক্যানিং ভারতে জেনারেল। ডালহৌসি 'Doctrine of Lapse' নীতিটি নতুন করে চালু করলেন। ১৮৫৬ তে অযোধ্যা ইংরেজ শাসিত ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। ফলে সেখানকার তালুকদার ও ভূস্বামী থেকে শুরু করে বিপুল সংখ্যক কৃষক ও সিপাহী বিক্ষুব্ধ হয়। ১৮৫৫-৫৬ তে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে গেছে বাংলা ও বিহারে নীলকরদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়মান। সিপাহী ও অশ্বারোহীরা নিজেদের বেতন, প্রোমোশন ইত্যাদির অবিচারে ক্রুদ্ধ, এরই মধ্যে ছোট ভূ-স্বামী ও সর্দার বণিক ও ব্যবসায়ী সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় ত্রস্ত। শাসিত শাসককে বিশ্বাস করে না, শাসক ও বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ।

বিশাল ভারতের সামগ্রিক রূপটি প্রায়শ তিরোহিত। প্রদেশগুলি দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক। মানুষেরা প্রধানত নিজেতে নিমজ্জিত — অশিক্ষা এবং কুসংস্কার তাদের দাস বানিয়ে ফেলেছে, অন্যদিকে ক্ষমতার লোভ, ঐশ্বর্যের আতিশয্য এবং তারই মাঝখানে হিন্দু — মুসলমান ও ইঙ্গ সমাজের পাঁচমেশালী সভ্যতার কোলাহল। এই সংশ্রবের সময়েই এই উপন্যাসটির আরম্ভ হয়েছে। শেষ হয়েছে এর তেত্রিশ বছর পরে, যখন চেহারায় এবং পারিপাট্যে একটা পরিবর্তনের আভাস প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, চিন্তায় ও চেতনায় শিক্ষা জনিত একটা সুস্পষ্ট সংহতি আকার নিচ্ছে। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে পটভূমির বদল হয়েছে এবং জাগ্রত ভারতের হৃৎপিণ্ড তখন বঙ্গদেশ।"[৯] ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতের ইতিহাসে মানবিক মূল্যবোধ কিভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকল তা তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। কিভাবে ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটছে কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছে তার আভাস এখানে পাওয়া যায় বিচিত্র সব মানুষ বর্ণময় তাদের কর্মবৈচিত্র্য। এই বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যেও প্রেম চির অবিনশ্বর চম্পা — চন্দনের প্রেমের চিত্র তা আর একবার প্রমাণ করে দেয়। ১৮৫৭ -র জানুয়ারির মধ্যে মিরাট, কানপুর, দিল্লি, ঝাঁসি লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় তাঁতিয়া টোপী

বাহাদুর শাহের মত ইতিহাস সমর্থিত নেতারা। মহাশ্বেতা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগিয়ে উনিশ শতকের সামাজিক জীবনের অবক্ষয়িত রূপকে তুলে ধরেন এই উপন্যাসে।

'আঁধার মানিক' (১৯৬৬) উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট অষ্টাদশ শতকের বর্গী আক্রান্ত বাংলাদেশ। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আলিবর্দী খাঁ — এর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত। এটি মূলত লোকবৃত্তের ইতিহাস, কোলকাতা কেন্দ্রিক জীবন গড়ে ওঠার প্রাকমুহূর্তের ইতিহাস। উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে লেখিকা গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ', মেদিনীপুর নন্দীগ্রামের 'চৌধুরী বংশাবলী চরিত' নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছেন। কলিকাতার নিকটবর্তী আঁধার মানিক গ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। কুঠিয়ালদের বাণিজ্য বিস্তার ঘটছে, দিল্লির বাদশাহের আনুকুল্যে বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্য প্রসার ঘটে। সাথে সাথে ইংরেজ বণিকদের ও বাণিজ্য প্রসার ঘটে। অন্যদিকে 'চৌথ' -কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ভাস্কর পণ্ডিত বাংলাদেশ আক্রমণ করে। বাংলাদেশে এই বর্গীর হানা কি প্রভাব ফেলেছিল — সে সম্বন্ধে মহাশ্বেতা দেবী জানান — "১৭৪০ থেকে বার বার মারাঠা আক্রমণ বা বর্গী হানা না ঘটলে বাংলার রাজনীতি এত প্রভাবিত হতো না, বাংলা থেকে দিকে দিকে ঘটত না মানুষের পলায়ন; আলিবর্দি বর্গী ঠেকাতে ব্যস্ত এবং বর্গীরা ঘোড়ায় চড়ে যে নদী পেরোতে পারত না সে নদী পেরিয়ে হানা দিত না বলেই কলকাতা নগরী ক্রমে জনসংখ্যা বেড়ে শক্তিশালী হয়েছিল। আলিবর্দি দৌহিত্র সিরাজকে দত্তক নেন এবং উত্তরাধিকারী করেন, ফলে রাজবৃত্তের গন্ডগোল, বণিক বৃত্তে ক্ষমতার লড়াই, গণবৃত্তে প্রচণ্ড অত্যাচার, এত সব কিছুর যোগাযোগ হয়েছিল বলেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানি শক্তিমান হয়। জার্মান, পর্তুগিজ, ডাচ ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলি হয় হীনবল এবং বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হবার পথ সুগম হয়।"[১০] উপন্যাসে বর্ণিত নবাব আলীবর্দি ভাস্কর পণ্ডিত, দুর্লভরাম সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। বর্গী আক্রমণের ফলে প্রথা সর্বস্ব বাঙালী জীবনে নারীর যন্ত্রণার চিত্র— তিন কুলীন কন্যার আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন — "প্রথমত বাংলাদেশে বর্গীদের আক্রমণ, যা প্রায় হুন আক্রমণের সামিল তাকে কেন্দ্র করে কোন উপন্যাস লেখা হয়নি বলেই আমার ধারণা ছিল, অথচ ইতিহাসের দিক থেকে, ইতিহাসের যাত্রাবদলের দিকে থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের দিক থেকে এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টুকু, ইতিহাসের এই ভগ্নাংশটুকু কালের এই একফালি করিডরটুকু দেশ ও জাতির পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ"[১১] বর্গীদমনের ইতিহাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়।

'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনি ভাগের সময়কাল ১৪০৭ শকাব্দ। প্রেক্ষাপট রাঢ় বাংলা,

বিশেষ করে মেদিনীপুর ও তার চারপাশ। একদিকে শ্রীচৈতন্যের উদার মানবতাবাদ অন্যদিকে আকবরের উদার ইসলাম ধর্ম এর সমান্তরালে বয়ে চলা বর্ণশাসিত সমাজের বাইরে অরণ্যবাসী। উপন্যাসে সেই আদিবাসীদের অকথিত ইতিহাস রচনা করেন জনবৃত্তের অধিকার চেতনার উপরে ভিত্তি করে। চুয়াড় সমাজের একজন কবি হয়ে উঠতে চাওয়ার আকাঙ্খা ও লড়াই এখানে ফুটে ওঠে। কবি কলহন বন্দ্যঘটি কবি। ভীমাদলের রাজা গর্গ বল্লভ কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রিকে তার কৃতিত্বের সম্মান স্বরূপ ভূমি ও মানপত্র দান করে। মাধবাচার্য্য তার কন্যার সাথে বিয়ে দিয়েছে। কবি কলহন ধন চায় না মান চায় না শুধু 'পাঞ্চালী' রচনা করতে চায়। সে নিজের সমাজের বিপরীতে গিয়ে আত্মগোপন করে কবি হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু তা জানাজানি হবার পর সে উভয় সঙ্কটে পড়ে গর্গরাজা না হয় চুয়াড়েরা তাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে মৃত্যু দণ্ড দেবে। ভীমাদল রাজ্যের রাজা গর্গবল্লভ ছিলেন উচ্চবর্ণের এবং তিনি নিম্ন বর্ণের উত্থানকে মেনে নিতে পারেন না। কলহনের কবি রূপে স্বীকৃতি চুয়াড় সমাজকে অগ্রগতির পথে উজ্জীবিত করবে। অপর দিকে চুয়াড় সমাজ তাদের প্রচলিত সংস্কার না মেনে উচ্চবর্ণের অনুকরণের জন্য তার শাস্তিকে যথার্থ বলেই মনে করেছে। তাদের মনে হয়েছে সমাজে যার যা কাজ নির্দেশিত তা না করলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হবে এক বিশৃঙ্খলা শুরু হবে। অপর পক্ষে লেখিকা তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার নবজন্মের সূচনাকে স্বাগত জানালেন।

'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৫) একটি রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল। বিশ শতকের সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে উপন্যাসটি লেখা। উপন্যাসের সৃষ্টি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন — "এসবই আমি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। আমি তখন চুটিয়ে গল্প লিখছি। সেই সময় দুটি ছেলে এসে আমায় বলেছিল, 'আমাদের কথা কে আর লিখবে। আমরা শহরের রাস্তায় এভাবে মরছি'। নকশাল আন্দোলনের প্রতি আমি সহানুভূতিশীল ছিলাম। এখনো আছি। উপন্যাসটি আরম্ভ করার আগে কেবল দুদিন এদের কথা মনে মনে ভেবেছিলাম।"[১২] এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য পুত্র হারা মা সুজাতার একক শোকের কাহিনি। উচ্চবিত্ত স্বার্থসর্বস্ব সমাজের ভোগবিলাশ কেন্দ্রিক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রতী নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছিল। তার বাবা চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট লম্পট প্রকৃতির মানুষ। সুজাতা তার লম্পট স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। তাই চাকরি নিয়ে সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ব্রতী তার মায়ের জন্য কিছু করতে চায় — গরীব উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কিছু করতে চায়। উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে তার পরিবার এক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে মনে করে। কিন্তু মা তা মনে করে না। তার পরিবার বিষয়টিকে চাপা দিতে চাইলেও সুজাতা পাগলের মতো ছুটে যায় তার ছেলের বন্ধু সমুর মায়ের কাছে, ছুটে যায় ছেলের বান্ধবী নন্দিনীর কাছে। ঘরে ফিরে

দেখে উৎসব মুখরিত বিয়ে বাড়ী — সেখানে আমন্ত্রিত তার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে পুলিশ অফিসার সরোজ পাল। সুজাতা দীর্ঘ আর্তচিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। এই আর্তচিৎকারের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে।

'মাস্টারসাব' (১৯৭২) উপন্যাসে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস উঠে এসেছে। সত্তর দশকে বিহারের রাজনৈতিক অস্থিরতা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। মাস্টারসাবের নেতৃত্বে নিম্নবর্গের গণজাগরণ এখানে দেখানো হয়েছে। কাহিনিতে রাষ্ট্র সমাজ ও সময় ঘুরে ফিরে আসে। উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলতে গিয়ে লেখিকা লেখেন — "-৭০ এর দশকে থেমে থাকতে পারেন না। তাঁর চেতনা তাঁকে নিয়ে যায় কৃষি-বিহারের নকশাল আন্দোলনে। মাস্টারসাব, রামেশ্বর আহীর- এ সব নাম আজ ইতিহাস।"[১৩]

মহাশ্বেতা দেবীর সবচেয়ে আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'অরণ্যের অধিকার'(১৯৭৭)। 'বেতার জগৎ'-এ এটি ১৯৭৫ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে লেখিকা কুমার সুরেশ সিং এর লেখা 'ডাস্ট স্টর্ম অ্যান্ড হ্যাং গিং মিস্ট'-এর ঋণ স্বীকার করেছেন। সুরেশ সিং ও তার বই — এর দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করলেন এবং ভূমিকায় লিখলেন — "She (Mahasweta) was instrumental in making me revise the work substantially and produce a new edition"[১৪] অর্থাৎ ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটালেন মহাশ্বেতা দেবী। বইটি রচনা করার ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য নেন মুন্ডা বিদ্রোহের ইতিহাস, তিনি পড়েন শরৎচন্দ্র রায়ের 'দি মুন্ডাস অ্যান্ড দেয়ার কানট্রি', হফম্যানের 'এনসাইক্লোপিডিয়া মন্ডারিকা: অফ ৭০৪'। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিরসা মুন্ডার জীবন সংগ্রাম। কিন্তু উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ফ্লাসব্যাক পদ্ধতি অর্থাৎ শেষের কথা প্রথমে বলবার মাধ্যমে। উপন্যাসের শুরুতে দেখানো হয় বিরসার মৃত্যু হয়েছে রাঁচি জেলে। লেখিকা মুন্ডা বিদ্রোহের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে ইতিহাসের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছেন। এছাড়াও ইতিহাসের পাশাপাশি লোক চেতনায় জন্ম নেওয়া কল্পকাহিনির সাহায্য নেন। যার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের অপূর্ণতা দূর হয়। কেবল মুন্ডাদের বিদ্রোহ নয় এর পেছনে একশ বছর ব্যাপী যে লড়াই সর্দারদের মুলকুই লড়াই, তামাড় পরগণার বিদ্রোহ, পালামৌ বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরের বিদ্রোহ প্রসঙ্গ ক্রমে সবই উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসে রয়েছে অরণ্যের অধিকার নিয়ে সচেতনতা। মুন্ডাদের অরণ্যের উপর জন্মগত যে অধিকার তার উপর দিকুদের আগ্রাসি মনোভাব ও মুন্ডাদের অরণ্যের অধিকার হারানো আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা ফিরে পাওয়া বর্ণিত হয়েছে। বীর সন্তান বিরসা পরাধীন অরণ্যের কান্না শুনে ছিল। বুঝতে পেরেছিল অরণ্য ধর্ষিতা দিকুদের হাতে বন্দি। সেই অরণ্যের মুক্তির জন্য বিরসা উলগুলানের ডাক দিয়েছিল। এ গণ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অরণ্যের অধিকার ফিরে পাওয়া। মুন্ডাদের চোখে বিরসা কোন মানুষ নয় 'ধরতি আবা'

অর্থাৎ মর্তের ভগবান। বিরসা দুবার ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে, প্রথম বার তার দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তি পেয়ে বিরসা মুন্ডা অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্রোহী কার্যকলা সংগঠন করে। ১২ জানুয়ারী ১৯০০ সালে এই বিদ্রোহ গণ-বিদ্রোহের রূপ নেয়। ইংরেজদের সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামে প্রায় চারশো মুন্ডার মৃত্যু হয়। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, বিনা বিচারে জেলে আটক, গ্রেপ্তারের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা। বিনা বিচারে বহু বন্দী মৃত্যু বরণ করে, ডিসেম্বর ১৮৯৯ থেকে এই বিদ্রোহ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। বিরসা ধরা পড়ে বন্দী হয়। বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বিরসার মৃত্যুকে মুন্ডারা মরণ বলে ভাবতে পারে না। তারা মানে উলগুলানের শেষ নাই। তাই বিরসার ও মরণ নাই। আলোচ্য উপন্যাসে লেখিকা ইতিহাসের বহতা ধারায় বিদ্রোহের চিরন্তন গতিকে ধরতে চান। সে ইতিহাস কোন জয় পরাজয়ে শেষ হয় না, তাই তিনি লেখেন — "ওরা সবাই আমাকে বলে চলেছে আমাদের যেমন চিরকালের সংগ্রাম, বিরসার সংগ্রামও তাই। কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে—মুন্ডারী দেশ—মাটি—পাথর- পাহাড়- বন-নদী-ঋতুর পর ঋতুর আগমন — সংগ্রামও ফুরোয় না, শেষ হতে পারে না। পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না, থেকে যায়, কেননা মানুষ থাকে, আমরা থাকি।"[১৫]

'অপারেশন বসাইটুডু' (১৯৭৮) উপন্যাসটি ঝাড়গ্রামের অরণ্য অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা। বসাইটুডু দেখে আসছে বংশানুক্রমে উঁচুতলার মানুষ কর্তৃক ক্ষেতমজুর ও সাঁওতালরা শোষিত নিস্পেশিত হয়ে আসছে। বসাই সত্তরের দশকের বাস্তবতার প্রতীক — ক্ষেত মজুরদের প্রতিনিধি। বসাই দীর্ঘদিন ধরে সি.পি.এম দলের কর্মীরূপে কাজ করে আসছে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি — কৃষকসভা ও ক্ষেতমজুরদের প্রতি উদাসীন হলে বসাই দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে লড়াই করার জন্য নতুন দল খোঁজে। এই পরিস্তিতে প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী বসাইটুডুকে খতম করতে উদ্যত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে লেখিকা পুলিশ প্রশাসন ও পার্টির বাস্তত স্বরূপটিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে।

'চোটিমুন্ডা এবং তার তীর' (১৯৮০) উপন্যাসটি রচনা প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন "১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারী হয়েছিলো — শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ছোট ছেলে সঞ্জয় আর তার যুব কংগ্রেস জনসাধারণকে চরম হয়রাণ করেছিলো, যে অঞ্চলের পটভূমিকায় আমি উপন্যাসটি লিখেছিলাম সেটিও ঐ আক্রান্ত এলাকাগুলির একটি।.......লুম্পেনদের সমর্থনে কেন্দ্রীকরণের বাড়াবাড়ি দেশের শহর ও গ্রামের ক্ষমতা ব্যবস্থায় কাজে নাক গলাচ্ছিল, সেই কারণে জরুরী অবস্থাকে আর চলতে দেওয়া হয়নি, আমি সেটি চোট্টিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি।"[১৬]

প্রথমে এটি ধারাবাহিক ভাবে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, উপন্যাসের কালসীমা ১৯১০-১৯৮০ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজনৈতিক ঘটনাপর্ব। উপন্যাসটি তীরের প্রতীকে বিরসা

থেকে ধানী হয়ে চোট্টি মুন্ডা পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দেড়শ বছরের ইতিহাসকে ধরে রাখে। বিশেষ করে শাসক শক্তির শোষণ, ভোট দলীয় রাজনীতি, কেন্দ্র রাজ্য আঁতাত নকশাল আন্দোলন — প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এখানে স্থান পেয়েছে। মুন্ডা সমাজের রক্ষাকর্তা চোট্টি, চোট্টি নদীর নাম অনুসারেই তার নাম। সে শান্ত সে গান্ধীর মতোই অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হয়। ভারত সরকার মুন্ডাদের বংশ পরম্পরায় পাওয়া ক্ষমতা গুলি কেড়ে নেয়। ১৯৬০-এ খরা। ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে আদিবাসী তপশীলদের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রার্থী জয়লাভ করে। কিন্তু ১৯৭২-এ কংগ্রেসের জয় লাভের পর লুম্পেনরা ঢুকে পড়ে চোট্টি অঞ্চলে। জমির অধিকার নিয়ে বাংলার রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূচনা হয় তা ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের দমন করতে পুলিশ কঠোর অবস্থান নেয়। নির্মম ভাবে কাউকে কাউকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়, এরকম পরিস্থিতিতে পালামো অঞ্চলে চোট্টির নেতৃত্বে হাজার হাজার মুন্ডা প্রতিবাদে সামিল হয়। ব্রাত্য মুন্ডারা মহাশ্বেতা দেবী কলমে সঠিক ভাবে তাদের প্রাপ্য সম্মান পায়। উপন্যাসটি শেষ হয় একদিকে চোট্টি মুন্ডা অন্যদিকে এস.ডি.ও এবং মধ্যে উত্তোলিত হাজার ধনুকের সাবধান বাণী ঘোষণার মাধ্যমে।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় — ‘হুলনামা’, ‘সিধু কানুর ডাকে’, ‘শালগিরার ডাকে’ প্রভৃতি উপন্যাস লেখা হয়েছে, হো বিদ্রোহের পটভূমিকায় ‘সূরজ গাগরাই’। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে ‘গান্ধারীপর্ব’। হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের কথা উঠে এসেছে — ‘শ্রী শ্রী গনেশ মহিমা’ উপন্যাসে, অরণ্য নির্ভর আদিবাসী শবরদের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ইতিহাস উঠে এসেছে ‘ব্যাধখন্ড’ উপন্যাসে। উচ্চ সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে ‘অগ্নিগর্ভ’ উপন্যাসটি। শাসক দলের অত্যাচারের ইতিহাস ফুটে উঠেছে ‘অক্লান্ত কৌরব’ উপন্যাসে। পালা মৌয়ের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অসামঞ্জস্য গুলি ফুটে ওঠে ‘ক্ষুধা’ উপন্যাসে।

এছাড়াও বেশ কিছু ইতিহাস সমৃদ্ধ রচনার পাশাপাশি — ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্স রসের উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে ‘মধুরে মধুর’, ‘তিমির লগন’, ‘এতটুকু আশা’, ‘রূপরেখা’, ‘পরম পিপাসা’, ‘অমৃতসঞ্চয়’, ‘বাসস্টপে বর্ষা’ ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী কেবল নিছক ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে সত্যের মেলবন্ধন ঘটাননি — তিনি প্রতিটি বিষয় ও ঘটনাকে ইতিহাসের গণজাগরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। গণবৃত্তের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন প্রচুর, কিন্তু সে সব তথ্য — উপন্যাসকে কখনো ভারাক্রান্ত করেনি বরং তা ইতিহাসের কার্য্য পরম্পরাকে সংযুক্ত করে সমান্তরালে যুগচেতনাকে তুলে ধরেছেন। তাই তার কলমে বর্ণিত কৈবর্ত বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ,

কৃষক বিদ্রোহ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অধিকারের লড়াই ইতিহাসের অংশ হয়েও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে গণবৃত্তের ইতিহাস চেতনা। আর তাতেই মহাশ্বেতা দেবীর সিদ্ধি।

**তথ্যসূত্র :**

১. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৯, পৃ ১১২৯।
২. তদেব, পৃ ১১২৯।
৩. তদেব, পৃ ১১৩০।
৪. তদেব, পৃ ১১৩৪।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা। এক জীবনেই: স্মৃতিকথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৩, পৃ ২৩৮।
৬. তদেব, পৃ ২৩৮।
৭. মুখোপাধ্যায়, পম্পা। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি, দে'জ পাবলিশিং ২০১৩, পৃ ১১৫।
৮. দেবী, মহাশ্বেতা। এক জীবনেই: স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং ১৪২৩, পৃ ২৪২।
৯. নন্দী, রতনকুমার। অরণ্যের অধিকার — মানুষের উত্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯ পৃ ৫১-৫২।
১০. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী — ১৪২০, পৃ ১৭।
১১. আচার্য, ডঃ দেবেশ কুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খন্ড) ২০১৭ পৃ ৬৩৬।
১২. তদেব, পৃ ৬৩৮।
১৩. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র, (একাদশ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং ২০০৩, পৃ ৫৮৭।
১৪. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী — ১৪২০, পৃ ২০।
১৫. তদেব, পৃ ২১৬।
১৬. বিশ্বাস, কিশোর কুমার (সম্পা) ইতিহাস কথন: মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথোপকথন অনুবাদ ১৪১৮, পৃ ৩৮০।

নাফিসা ইয়াসমিন

## আফসার আমেদের ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ : এক নিখোঁজ মানুষের অনুসন্ধান

আফসার আমেদ-এর ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসে নিখোঁজের নাম — আবিদ আলি, বয়স — বত্রিশ, বাড়ি — বাগনান অঞ্চলের মালিয়া গ্রাম। মার্চ মাসের শেষের দিকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। কিন্তু উপন্যাসে আবিদ আলি বার বার নিখোঁজ হলেও পাঠক হৃদয়ে তার অন্তরের অস্তিত্ব ধরা দিয়েছে সহজভাবে। তবে আবিদ আলির হৃদয় ধরা দিলেও, অধরা থেকে গেছে মানুষটা। কেননা অধরার প্রতিই মানুষের চিরন্তন আকর্ষণ। আসলে মানুষ যা পাই তা চাই না; আর যা চাই তা পাই না।

উপন্যাসে আবিদ আলি কিন্তু প্রথমবার নিখোঁজ হয়নি। চার বছর আগেও সে একবার নিখোঁজ হয়ে যায়। মার্চ মাসের ষোলো তারিখে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক ঝড় জলের রাতে তাকে বাগনান স্টেশনে দেখা যায়। তারপর তাকে আর পাওয়া যায় মালিয়া গ্রামে। অতঃপর তাকে দিলজান এবং বিলালদের বাড়িতে শেষ দেখা গেছে রাতের বেলায়। পরের দিন সকালবেলায় আবার সে নিখোঁজ হয়ে যায়। তবে নিখোঁজ মানুষটার বার বার নিখোঁজ হওয়া, তার অস্তিত্বের সন্ধানে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক আবিদ আলির নিখোঁজ হওয়ার প্রাক্-পর্বের দিকে লক্ষ্য করলে, তার নিখোঁজ হওয়ার কারণগুলি সম্পর্কে আঁচ করা যায়। আবিদ যখন পাঁচ বছরের, তখন তার বাবা-মা বন্যায় বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। নেহাত চাচার বাড়িতে থাকত বলেই আবিদ বেঁচে যায়। প্রথমবার পাশের গ্রামের এক দাদার সঙ্গে মুম্বাই পালানোর কারণ হিসাবে যেমন একদিকে রয়েছে আবিদের প্রতি উপেক্ষা, অন্যদিকে রয়েছে তার মুক্তিকামী মনন। লেখকের ভাষায় স্পষ্ট হয়েছে বিষয়টি—

“পাঁচ বছর বয়সে বাবা মা বন্যায় বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়, চাচার বাড়িতে আবিদ ছিল বলে প্রাণে বেঁচে যায়; না হলে সেও মরত মা বাবার সঙ্গে। চাচার সংসারে চাচাতো ভাই বোনদের সঙ্গে বড়ো। নিজেকে সরিয়ে রাখার মতো অবহেলাও ছিল। মায়ের মতো ডেকে খাওয়াতো না কেউ। কোথাও গেলে খোঁজ করত না। তাই নিখোঁজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। কৈশোরে রূপনারায়ণ নদে নৌকার মাঝির সঙ্গে থেকেছে। কখনো কখনো নিখোঁজ হয়েই থাকত।”[১]

এরপর দ্বিতীয়বার আবিদ কার্যক্ষেত্র থেকে পালাল। মুম্বাইয়ে চশমার দোকানে কাঁচে পাওয়ার লাগানোর কাজ জুটিয়েও সে স্থির থাকতে পারেনি। তিন বছর মুম্বাইয়ে থাকার পর আবিদ আবার গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে ফিরে চাষের কাজের পাশাপাশি ঘরামি ও রাজমিস্ত্রির কাজও সে করতে থাকে। এমনকি বাড়িও বানায় সে, অর্থাৎ বোঝা যায় জন্মভূমির

প্রতি অদম্য টান বশতই তার ফিরে আসা। আবিদের কর্মঠ রূপ দেখে গ্রামের মানুষ তাকে সংসারী করার চেষ্টা করল। জুলেখার সাথে প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান তথা পানচিনিও হয়ে গিয়েছিল তার। ঠিক এমন সময় আবিদ বিয়ের কয়েকদিন আগে তৃতীয়বার নিখোঁজ হয়ে যায়। এই নিখোঁজ হওয়ার প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

“জুলেখার সঙ্গে প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠান পানচিনিও হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের কদিন আগে নিখোঁজ হয় সে। কেন? সে জানে না। মনে করতে পারে; সে ভয় পেয়েছিল।”[২]

এ ভয় ছিল আর্থিক সঙ্কটের ভয়। অত স্বঅল্পায় দিয়ে জুলেখাকে সুখে রাখা যাবে না; তাই আবিদের পালানো। কারণ স্ত্রীকে নিয়ে যেমন-তেমন জীবন কাটানো সে পছন্দ করে না। তাই বিলাল চরিত্রটি যখন চরম আর্থিক অসঙ্গতিতে স্ত্রী দিলজানকে নিয়ে রেলস্টশনে কোনো রকম জীবন কাটানোকেই জীবনের একমাত্র রাস্তা বলে জানিয়েছে, তখন আবিদ স্পষ্ট জানিয়েছে ‘একে বেশ থাকা বলে না বিলাল।’ মূলত জুলেখাকে ভালো রাখার জন্য ভাগ্য ফেরানোর জন্যই তার নিখোঁজ হওয়া। এর স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক—

“মনে পড়ে জুলাখের কথা খুব। জ্যোৎস্নার মতো রূপ নিয়ে সে তার চোখে ধরা পড়েছিল। তাকে ঠিক যত্ন সমাদর দিতে পারবে কি না, এই নিয়ে তার সংশয় হয়েছিল। তখন চাষে খাটত, ফসল ফলাত। আয় কম। ভাগ্য ফেরানোর জন্য নিখোঁজ হয়েছিল।”[৩]

প্রসঙ্গত নজরুল ইসলামের ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসের পুরু চরিত্রটির কথা এখানে মনে পড়তে পারে। যেখানে পুরু চরিত্রটিও আবিদের মতো বিয়ের কয়েকদিন আগে তার বাগদত্তাকে ছেড়ে সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

উপন্যাসে আবিদকে আবারও ফিরে আসতে দেখা যায়। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

“ডাণ্ডাগুলি, নৌকা নদ, খেতের ফসল, জ্যোৎস্না, বৃষ্টির গন্ধ, প্রতিবেশী পরিজন, আত্মীয় কুটুম্ব, এসব কিছুর টানে ফিরে আসতে চাইল নিখোঁজ লোকটি।”[৪]

যদিও এসব টান কাটিয়ে আবারও নিখোঁজ হয়ে যায় মানুষটা। তবে এক্ষেত্রে নিখোঁজ হওয়ার প্রাক্-মুহূর্তটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সকালবেলা জুলেখার বাড়িতে দেখা করতে যাওয়ার আগের রাতে আবারও নিখোঁজ হয়ে যায় আবিদ। অর্থাৎ আবিদ আলির নিখোঁজ হওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে দুটি স্তর এক, আবিদের গ্রামের উদ্দেশ্য তার কাজের ক্ষেত্র থেকে কিংবা বিলাসপুরের পরিবার থেকে নিখোঁজ হওয়ার অন্তরালে ছিল গ্রামভক্তি। যদিও সেখানে জুলেখার প্রতি আবিদের আকর্ষণও ক্রিয়াশীল ছিল। দুই, গ্রাম থেকে নিখোঁজ হওয়ার অন্তরালে কাজ করেছে আবিদের দ্বান্দ্বিক মননের অস্তিত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবিদের দ্বান্দ্বিক মননের পরিচয় মেলে জুলেখাকে কেন্দ্র করে। তাই জুলেখার সই সোনামণির চিঠি আবিদকে সুখ দিয়েছিল। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

“এত ঝঞ্ঝাট ঝামেলার মধ্যেও সোনামনির হাতচিঠিটা সুখ দিল আবিদকে। বার বার

পড়ল। এই চিঠি সম্পর্কের আনন্দ মেখে রয়েছে। তাছাড়া এই চিঠি জুলেখার সই লিখেছে। তার মধ্যে ভালোলাগা ছেয়ে এল। চিঠিটা নিয়ে ঘুরে বেড়াল নানা কাজে।... আর কল্পনা করেছে সে সোনামনির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। দেখা সে করতে যাবে, সেই ভাবনায় থেকেছে।”[৫]

আসলে আবিদ ভেবেছিল জুলেখার সই সোনামনির সঙ্গে সাক্ষাত, হলেই সে জুলেখার সকল স্বপ্ন-সাধ-আহ্লাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারবে। তাই সোনামনিকে আবিদের জিজ্ঞাসা—

“ওকি আজও আমাকে ভালোবাসে ?”[৬]

কিন্তু সোনামনির কাছে জুলেখার খবর সুখ দিতে পারেনি আবিদকে, বরং সোনামনির বিভিন্ন বাক্যবাণে আবিদের মন চরম দোলায়িত হয়েছে। তাই অনুশোচনায় আবিদের উচ্চারণ—

“জুলেখাকে আমি কষ্ট দিয়েছি। তার কোনো ক্ষমা নেই। নদী সাক্ষী চাঁদ সাক্ষী।”[৭]

এই অনুশোচনাবোধ থেকেই আবিদ জুলেখার সম্মুখিন হতে পারেনি। যে জুলেখা দীর্ঘপথ হেঁটে আবিদের সঙ্গে দেখা করতে আসে, না দেখা পেয়ে তাকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়; ঘুমের ঘোরে রাত দুপুরে ‘যাই’ বলে খুঁজে ফেরে স্বপ্নে দেখা নিখোঁজ মানুষটাকে। সেই অভিসারিকা জুলেখার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি নিখোঁজ মানুষটা। যদিও জুলেখার স্বামীর একশো দিনের কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, জুলেখার জন্য জামা কাপড় ও তার ছেলের জন্য খেলনা কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে আবিদ, কিন্তু স্বশরীরে দেখা করতে পারেনি সে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

“জেগে থেকে আবিদ জুলেখার কথা ভাবে। তার অপরাধের কথা ভাবে। সে কথাতেই তার আনন্দ। সেই কথা নিয়ে কারো কাছে ধরা দিতে চায় না। সে তো নিখোঁজ মানুষ। হারিয়ে যাওয়া মানুষ।”[৮]

আসলে আবিদের জুলেখার সম্মুখিন হতে না পারার অন্যতম কারণ হল ভয় তথা অস্তিত্বের সংকট। সে বার বার আত্মগ্লানিতে ভুগেছে। তাই কখনও সে সোনামনির কাছে তিরস্কৃত হতে চেয়েছে, আবার কখনও ভুলে দূরে পালাতে চেয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক আচরণ আবিদের রিক্ততা ও দৈন্যতাকে প্রকাশ করেছে, যা তার ‘নিখোঁজ মানুষ’ হওয়ার অন্যতম কারণ।

তবে আবিদ শুধু ভালোবাসার সন্ধানী নয়, গ্রামবাসীর কাছে মানবিকতার মূর্তরূপ সে। মালিয়া গ্রামে থাকা প্রথম জীবনে আবিদ রূপনারায়ণ নদী থেকে ডুবন্ত মানুষদের সে বাঁচিয়েছিল। তার এই সাহসিকতার জন্য সে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পায়। আসলে আবিদ ঐ অঞ্চলে মিথ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে মুশকিল আসানের চিরাগ। আবিদের আগমনে যেন

প্রাণসত্ত্বায় উজ্জীবিত হয়েছে সমাজ, ঘটেছে সমস্যার সমাধান। বিশেষত বিলাল-দিলজানের জীবনে ঘটে সমস্যার সমাধান। দুর্যোগ ও আর্থিক অনটনের ছিন্নমূলী জীবন থেকে আবিদ তাদের সুস্থ জীবনের ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে বিবাহ নিয়ে গ্রামীণ সংকটেরও সে অন্যতম ত্রাতা। আবিদের এই ত্রাতা রূপের জন্য জুলেখাও চেয়িছল 'নিখোঁজ' মানুষটা তার সন্তানকেও ছুঁয়ে দেখুক, যাতে করে তার সন্তানের মঙ্গল হয়। বলাবাহুল্য আবিদের আগমন গ্রামবাসীর জীবনকে এক প্রাণসত্ত্বায় উজ্জীবিত করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় তা স্পষ্ট হয়েছে—

"ঝড়-বৃষ্টির পর রোদ্দুরের মতোই এসেছিল সংবাদটা। সেই কথার সমাদর করতে লাগল গ্রামগুলো। সেই আনন্দে ভিজে কাপড় জামা শুকোতে দেয়। আগানবাগান রাস্তা ডাঙা থেকে কই শিঙি মাছ মাটির কলসিতে রেখে খলবলানি শব্দ কান পেতে শুনে আনন্দিত হয়। আনন্দ এমনি এমনি আসে না, আনন্দ তৈরি করতে হয়। কোনো বউড়ি সেই সুখে পড়শিকে দু কুনকে চাল ধার দিয়ে দেয়। কেউ একবাটি কচি আমড়ার টক দিয়ে আসে প্রতিবেশীকে। কেউ বাসি করা শাড়ির পাট ভেঙে পরে। কোনো পুরুষ দু হাতা ভাত বেশি খেয়ে নেয়। কোনো বউ দুবার নুন দিয়ে তরকারিতে নিজের বোকামির কথা ভেবে হাসে, কেউ কেউ বার বার বিড়ি ধরায়। মুদি দোকানি পুনর্বার ধারে সওদা দিয়ে বসে খদ্দেরকে।"[৯]

আবার ঔপন্যাসিক আবিদের মিথের সঙ্গে বর্তমান সময়ের সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়কেও একাত্ম করেছেন। তার প্রভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, সোচ্চার হয়েছে অধিকারের দাবিতে। এমনকি বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরকেও প্রতারিত করে আবিদের জীবন মিথিকার উপস্থিতি; পরিণামে গ্রামের আমজনতা তাদের সাধারণ প্রাপ্যটুকু মেটাতে সক্ষম হয়। আবিদের এই জীবন্ত উপস্থিতি আমাদের অঞ্জন দত্ত পরিচালিত 'দত্ত ভার্সাস দত্ত' চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; যেখানে বৃদ্ধ দত্তের উধাও হওয়ার পর হঠাৎ ফিরে আসা, পরিবারকে ভগ্নমূল থেকে ভিন্ন জীবনবোধে বাঁচার অনুপ্রেরণা যোগায়। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যের মূল সুর গতিবাদও উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। তাই ঔপন্যাসিক গতিময় জীবনের কথা শুনিয়েছেন—

"মানবজীবন জুড়ে কতই না কাহিনির জন্ম হচ্ছে। কতক রয়ে যাচ্ছে, কতক হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষগুলো হারিয়ে যায়, আবার নতুন মানুষ আসে।

এভাবেই আবিদ তার মানবিক রূপের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র একটি চরিত্র রূপে নয় বরং গ্রামের এক আনন্দময় সত্তা রূপে ধরা দিয়েছে উপন্যাসে। তাই বলা যায় আবিদের মধ্যে একদিকে যেমন দ্বান্দ্বিকতা তথা অস্তিত্বের সংকটকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক, তেমনি এক আনন্দময় সত্তার গতিময়তাকেও পরিস্ফুটিত করেছেন তিনি।

আঙ্গিকগত দিক থেকেও ঔপন্যাসিক বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন উপন্যাসে। উপন্যাসটির কাহিনিতে একটি নিটল একমুখীনতা বর্তমান। উপন্যাসের মূল চরিত্র নিখোঁজ মানুষ আবিদ।

গোটা উপন্যাসে এই মুখ্য চরিত্রের কোনো বিবর্তন দেখাননি ঔপন্যাসিক। আসলে কোনো চরিত্রের বিবর্তন দেখানো এই উপন্যাসের লক্ষ্য নয় বলেই আমাদের মনে হয়। সেই কারণেই উপন্যাসে কাহিনির শুরু ও শেষে নিখোঁজ মানুষটার আগমন ও প্রস্থানকে দেখানো হলেও, উপস্থাপনার ভঙ্গিতে নিখোঁজ মানুষটার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। রেলস্টশনের পর্ব, মালিয়া জীবনপর্ব, শ্মশানবাস পর্ব ইত্যাদি কাহিনি-চিত্র তথা উপাখ্যানে উপন্যাসটির কাঠামো গড়ে উঠেছে। আবিদের প্রেমসত্তার তীব্র অসহায়তা, মুকুন্দ-সামন্ত-মালতীর সমাজ বহির্ভূত প্রেম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জুলেখার অভিসারিকা সত্তার টানটান উত্তেজনায় উপন্যাসটি পেয়েছে অন্যমাত্রা। যদিও এখানে চরিত্রের মননের গহিন স্তরে আলোকপাত করেছেন লেখক। বিশেষত আবিদ ও জুলেখা চরিত্রের দোলাচল দ্বান্দ্বিক মননকে অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। আবিদের অসাধারণ সংযম চেতনা ও সচেতন বাস্তবতাবোধ এবং জুলেখার স্বামী-সন্তান অন্তপ্রাণতা ও প্রেমিকা সত্তার জয়গান চরিত্র দুটিকে জীবন্ত করে তুলেছে, যা উপন্যাসটির শৈল্পিক মাত্রাকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছে অবশ্যই। এছাড়াও উপন্যাসটি গ্রাম্যজীবনের অনাড়ম্বর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় দেশজ-লোকজ ঘরানার অনুসারী - আর এখানেই আফসার আমাদের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসটি সর্বাত্মক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**

১) আফসার আমেদ। সেই নিখোঁজ মানুষটা। কলকাতা, ভারত : দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৮। পৃ. ১০।

২। তদেব। পৃ. ১০।

৩। তদেব। পৃ. ২২।

৪। তদেব। পৃ. ১০।

৫। তদেব। পৃ. ৪৬-৪৭।

৬। তদেব। পৃ. ৪৯।

৭। তদেব। পৃ. ৪৮।

৮। তদেব। পৃ. ৫৪।

৯। তদেব। পৃ. ২৬।

১০। তদেব। পৃ. ৬০।

অঙ্কিতা রায়

## শৈলজানন্দের ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধ : জীবন-দৃষ্টির প্রতিফলন

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশে যাঁরা বাস্তববাদী ধারাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করেছেন, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ছোটগল্প মূলত গ্রামবাংলা ও প্রান্তিক জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যেখানে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোষণ, সামাজিক অবিচার ও মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক কল্পনা বা অতিনাটকীয়তার পরিবর্তে শৈলজানন্দ জীবনের কঠোর সত্যকে অকপটে উপস্থাপন করেছেন। এই নিরাবরণ জীবনচিত্রই তাঁর ছোটগল্পের বাস্তববোধের মূল ভিত্তি। শৈলজানন্দের সাহিত্যচর্চার পটভূমি ছিল ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা। জমিদারি প্রথা, মহাজনী শোষণ, কৃষকের সর্বস্বান্ত হওয়া এবং দুর্ভিক্ষজনিত বিপর্যয় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাই তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছে। তিনি গ্রামকে কোনো আদর্শ সমাজ হিসেবে তুলে ধরেননি; বরং গ্রামীণ জীবনের অন্তর্নিহিত বৈষম্য, নিষ্ঠুরতা ও অসহায়তার বাস্তব বোধকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। শৈলজানন্দের আবির্ভাব মূলত কয়লা কুঠির গল্পসমূহকে কেন্দ্র করে, ছোটগল্পের ইতিহাসে এই প্রথম এসেছে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা ও নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্র। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের লেখার বিষয়বস্তু যেখানে নগর কলকাতা ও মফস্বলকে কেন্দ্র করে, সেখানে শৈলজানন্দের বেড়ে ওঠা রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে। তাই তাঁর ছোটগল্পে আসানসোল- রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষজনের জীবনচিত্র ও জীবন বাস্তবতা খুব সুন্দর করে ফুটে উঠেছে। তাঁর চোখে দেখা কয়লাখনির শ্রমিক, সাঁওতাল কুলি-কামিনদের জীবন-সংগ্রাম, কষ্ট, প্রেমের অনুভূতি সবই তিনি ছোট গল্পের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। শৈলজানন্দের গল্প উপন্যাস পাঠ করলেই স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, প্রান্তিক মানুষ, দরিদ্র, তুচ্ছ, অতিসাধারণ মানুষের জীবন বস্তুনিষ্ঠভাবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী লেখক, তবে প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিল বাস্তবতা তার প্রকৃতিও তিনি উদ্ঘাটন করেছেন।

শৈলজানন্দের ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধের প্রধান প্রকাশ ঘটে তাঁর চরিত্র চিত্রণে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা সমাজের প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত - ক্ষুধার্ত কৃষক, ক্ষেতমজুর, দরিদ্র শ্রমিক, নারী, অনাথ শিশু। যেমন 'সাঁওতাল', 'বন্দী', 'মরণবরণ' এই জাতীয় গল্পগুলিতে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ কীভাবে দারিদ্র্য ও শোষণের চাপে ক্রমশ ভেঙে পড়ে। এই চরিত্রগুলি কোনো ব্যতিক্রমী নায়ক নয়; তারা সমাজের বৃহত্তর বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করেছে। ফলে পাঠকের কাছে তাদের জীবনযন্ত্রণা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক

বাস্তবতা শৈলজানন্দের গল্পের একটি অপরিহার্য দিক। কৃষকের জমি হারানো, ঋণের বোঝায় জর্জরিত পরিবার, মহাজনের নির্মম আচরণএই সবই তাঁর গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর বহু গল্পে দেখা যায়, সামান্য অভাব কীভাবে ধীরে ধীরে মানুষের নৈতিক ও পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে দেয়। এখানে শোষণ কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; এটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় মাত্র ২২ বছর বয়সের লেখা তাঁর 'কয়লাকুঠি' গল্পটির কথা। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বসুমতি পত্রিকায়। এই গল্পের উপজীব্য বিষয় বাউরি কন্যা বিলাসীর প্রণয় ও তার করুণ পরিণতি। বিলাসী সাঁওতাল শ্রমিক নানকুকে মনে মনে ভালোবাসতো, তাই নানকুকে ছাড়া সে অন্য কাউকে স্বামী বলে ভাবতে পারেনা। অন্যদিকে নানকু আবার ভালোবাসতো মাইনু পিয়ারীকে। তাই বিলাসীর সঙ্গে বিয়ের পরেও সে পরে থাকতো পিয়ারীর কাছে। এক রথযাত্রার দিনে নানকু বিলাসীর সাথে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে পিয়ারীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই সংবাদ শুনে রাগে অভিমানে বিলাসী কার্যত বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সে দুঃখ বুকে চেপে রমনার কাছে চলে যায়। রমনা প্রথম থেকেই বিলাসীকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসাও স্থায়ী হয় না। এক সময় বিষণ এসে খবর দেয় যে নানকুকে খাদে খুন করা হয়েছে এবং নানকু ও পিয়ারির মৃতদেহ সেখানে পাওয়া গেছে। নানকুর মৃত্যু সংবাদ শুনে তার সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতা ভুলে বিলাসীর হৃদয় যেন সব হারানোর বেদনায় কেঁদে ওঠে। খাদে নেমে নানকুর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে বিলাসীর বিলাপ মর্মভেদী হয়ে ওঠে। আর ঠিক সেই সময়—

"কয়লার একটা মস্ত চাংড়া ধরম করিয়া ছাড়িয়া তাহাদের মাথার উপর সশব্দে নামিয়া পড়িয়া, একসঙ্গে দুজনকে সেই বিরাট কয়লাস্তুপের নিম্নে সমাধিস্থ করিয়া দিল।"[১]

বিলাসী ও নানকুর এই বেদনা ঘন পরিণতিতেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। লেখক এই গল্পের কাহিনীতে Naturalism বা যথাস্থিতবাদকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন এবং তিনি নিজে কার্যত এক ন্যাচারালিস্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কারণ এখানে তিনি যেভাবে মানুষের চরিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর পরিবেশের প্রভাব দেখিয়েছেন তা একমাত্র ন্যাচারালিজিমই বলা যেতে পারে। কয়লা খনি অঞ্চলের পটভূমির এই স্বল্প বর্ণনায় নানকু, বিলাসী, পিয়ারী এই চরিত্রগুলি যেন আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই আঞ্চলিক পরিবেশের বাইরে এই চরিত্র গুলিকে ভাবা সম্ভব নয়। তার সাথে আদিম জনগোষ্ঠীর প্রেম বিবাহিত জীবনের এক মূর্ত ধারনা আমরা পেয়েছি। বলা ভালো আদিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর প্রেমের এক বাস্তব চিত্র তিনি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শৈলজানন্দের ছোটগল্প, বাংলা সাহিত্যে দ্বিমাত্রিক অভিনবত্ব এনেছে। একদিকে যেমন তাঁর গল্পে এসেছে প্রান্তিক মানুষদের কথা, তাদের বহু মাতৃক জীবনচিত্র। যাকে subaltern

realism বা 'নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা' বলা হয়। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ইতিহাসে প্রথম তাঁর লেখনী ধরেই এই Subaltern realism বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

অন্যদিকে, তাঁর গল্পে এসেছে প্রবল স্থানিক চেতনা। সুকুমার সেনের কথায় যাকে বলা হয়েছে 'স্থান-কাল-ভাষা পরিবেশের সৌষ্ঠব'। আঞ্চলিক সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য প্রথম দেখা যায় শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যেই। তাঁর কয়লাকুঠি কেন্দ্রিক গল্পগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় গল্পগুলির কাহিনী, চরিত্র সবই এক একটি অঞ্চল কেন্দ্রিক, যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আরো বাস্তব, আরো জীবন্ত করে তুলেছে। বস্তুত তারা এক একটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

এরপরে যে গল্পটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক গল্প। শৈলজানন্দ প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি এই মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রা নিয়েও খুব সুন্দর গল্প লিখেছেন। যেমন 'বধূ বরণ' গল্পটি। গল্পের কাহিনীতে যৌন অতৃপ্ত নারীর কামনা বাসনা একসময় যে সমাজ সংস্কারকে অতিক্রম করে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে তাই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ননীমাধব, গ্রাম্য বধূ বাসন্তীর পত্র লেখক। শুধু বাসন্তী নয় গ্রামের অন্যান্য অশিক্ষিত, নিরক্ষর মেয়েদেরও সে পত্র লিখতে সাহায্য করে। বাসন্তী তার শহরবাসী স্বামীকে চিঠি লিখে তার কথা জানতে চাই এবং সেই কাজের সহায়ক হলো ননীমাধব। বাসন্তীর মতো তেমনি দুলী, চঞ্চলা, সখী, মালতি সকলেরই সে অত্যন্ত প্রিয়। শুধু চিঠি লেখা নয়, এই চিঠি লেখাকে কেন্দ্র করে সব মেয়েদের সাথে প্রণয়ে লিপ্ত হয় ননীমাধব। কিন্তু এই বউ বউ খেলার মধ্য দিয়ে কখন যেন বাসন্তী তাকে মন দিয়ে ফেলে। তাই ননীমাধব তাকে ছাড়া অন্য মেয়েদের সাথে ঘনিষ্ট হলে কার্‌্যত ঈর্ষাবশত বাসন্তী তার মামীর কাছে ননীমাধবের রহস্য ফাঁস করে তাকে চূড়ান্ত ভাবে অপদস্থ করে। এতে ননীমাধবের জীবনের যে খুব পরিবর্তন ঘটে তা নয়, বরং সে এই নারী সঙ্গ ত্যাগ করে মামার বাড়ি থেকে পালিয়ে যখন বাবার বাড়ি ফিরে গেছে তখন তার সৎ মা মায়া তাকে কেন্দ্র করে তার অবদমিত কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়েছে।

লেখক এখানে ননীমাধবকে কেন্দ্র করে বিবাহিত মেয়েদের সমাজ অতিক্রমী যৌন কামনা বা যাকে বলে Libido, সেই বাস্তব রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি যেভাবে ননীমাধবের প্রতি মায়ার অবদমিত কামনাকে বর্ণনায় ব্যক্ত করেছেন, এর আগে কোন লেখকের লেখনীতে যৌন চেতনা এভাবে ধরা দেয় নি। কল্লোলপন্থী লেখকদের রচনায় এই যৌন চেতনা প্রথম অবগুণ্ঠনের বাইরে বেরিয়ে এসে পাঠকের কাছে অনেক সাহসিকতার সাথে ধরা দিয়েছে। এই গল্পের কাহিনী কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। কাহিনীতে নতুনত্বের সঞ্চার করতে লেখক ননীমাধবের আগামী জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে। সৎ মায়ের এমন ব্যবহার যখন ননীমাধবকে বিতশ্রদ্ধ করে তুলেছে, সে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে অজানার

উদ্দেশ্যে এবং ননীমাধবের ট্রেনে যাওয়ার পথে একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয়, মেয়েটির নাম গৌরী। সে তাকে বিয়ে করে। ইচ্ছে ছিল জীবনকে নতুনভাবে সোজা পথে শুরু করার, কিন্তু মন যে বড়ই বিচিত্র। ইতিমধ্যে তার মামীর একটি টেলিগ্রাম আসে এবং ননীমাধব নববধূকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু হঠাৎ কি যেন হয় ননীমাধবের! যাত্রা পথে স্ত্রীকে নিয়ে একটি স্টেশনে নেমে তার সমস্ত গয়নার বাক্স নিয়ে গাড়ি দেখার ছল করে অন্য একটি চলন্ত ট্রেনের কামড়ায় উঠে বসে এবং এই ভাবে সে ওই মেয়েটির সাথে ও চরম প্রতারণা করে। তবে এই প্রতারণা করে সে নিজেও বিচলিত হয়ে পরেছে। তাই—

"এতদিন পরে সত্যই তাহার মনে হইতে লাগিল নিখিল ব্যাপী এই মিথ্যাচার বাহিরে সত্যবস্তু হয়ত-বা কোথাও কিছু থাকিতেও পারে "[২]

শৈলজানন্দ এখানে ননীমাধবের মনস্তত্ত্বের চমৎকার চিত্র এঁকেছেন। যেহেতু কৈশোর থেকে সে বিভিন্ন নারীর সংস্পর্শে এসেছে তাদের কামনার উদ্যামন দেখেছে সার্বিকভাবেই কোন মেয়ের প্রতি তার প্রকৃত ভালোবাসা গড়ে ওঠেনি। শারীরিক খেলায় মেতে তার মনেও বিকৃত মানসিকতা গড়ে উঠেছে। তাই স্ত্রী গৌরীর ক্ষতিসাধনের সে একটুও দ্বিধান্বিত হয়নি। তবে গৌরীকে ফেলে এসে সে নিস্পৃহ থাকতে পারেনি, তার মনে ঝড় বইতে থাকে এবং এই উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে লেখক ননীমাধবের মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। সেখানে ননীমাধবের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষণীয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জীবনদৃষ্টির দিক দিয়ে যে কতটা বাস্তববাদী তা তার গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায়। তিনি নিজেও যে বাস্তববাদী ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম যথার্থ বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিক কারণ এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বাস্তব উপাদানের সচেতন ব্যবহার ছোটগল্পে সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এখানে খুব বেশি গল্প নিয়ে আলোচনা না করা গেলেও তার ছোট গল্পগুলিতে যে বাস্তববাদের বহুমাত্রিক ছবি ফুটে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না। একদিকে যেমন এসেছে 'external reality', তেমনি কোথাও ফুটে উঠেছে 'Internal reality'. তার এই বাস্তবমুখী জীবন দৃষ্টির, অভিজ্ঞতার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, 'শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেইসঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণায় কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্য সভার মর‍্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রারশ পালায় এসে ঠেকেনি।"[৩]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম ও শ্রেণি-বাস্তবতার এক শক্তিশালী কথাকার। বিশেষ করে তাঁর কয়লা-কুঠিকেন্দ্রিক গল্পগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর যে নিদারুণ বাস্তবতার ছবি ফুটে উঠেছে, তা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন। এই গল্পগুলিতে তিনি কেবল শ্রমিক জীবনের দৈনন্দিন

দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা দেননি, বরং ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ, দেশীয় মহাজনি শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্যের গভীর কাঠামোকেও উন্মোচিত করেছেন।

**তথ্যসূত্র:**


১. ঘোষ বারিদবরণ (সম্পাদনা) : সুনির্বাচিত কয়লা কুঠি গল্প সংগ্রহ (প্রথম সংস্করণ), জানুয়ারি ২০০৪ নিউ এজ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা -১৫

২. মুখোপাধ্যায় শৈলজানন্দ : 'বধূবরণ' , শ্রেষ্ঠ গল্প (সম্পাদনা, বুদ্ধদেব দাশ), প্রথম সংস্করণ, মে,২০০২ , করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা -৫৭

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যের নবত্ব, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২১৭

৪. চক্রবর্তী সুমিতা : ছোট গল্পের বিষয়- আশয়, প্রথম প্রকাশ জুন,২০০৪ , পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৫. দত্ত বীরেন্দ্র : বাংলা ছোট গল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ আগস্ট,১৯৮৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

অনিন্দিতা মুখার্জী

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা : জীবন ও মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান

মন এবং জীবন একে অপরের পরিপূরক। মানব জীবনের সমস্ত গতিবিধির কেন্দ্রে যেহেতু মনের ক্রিয়াই প্রধান, তাই উপন্যাসে মানব মনের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়। মানুষের জীবনের ছোট ছোট স্বপ্ন আশা দুঃখ বেদনা দোলায়িত হয় উপরওয়ালার অদৃশ্য সুতোর টানে। সময়ের সাথে সাথে সেই বাস্তবতাকে লেখক তুলে ধরেছেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আর মূল আখ্যানে। আসলে মানুষের জীবন নানা বৈচিত্র্যে ভরা। একই স্থানে একই পরিবেশে মানুষের আচার-আচরণ -সংস্কার- আবেগ- ইচ্ছা -অনিচ্ছা একে অন্যের থেকে বড় স্বতন্ত্র।

'পুতুল নাচের ইতিকথার' নায়ক শশী চরিত্রের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। একদিকে সে সমাজ ও সংসারের প্রতি কর্তব্যে অবিচল অন্যদিকে নিজের নীরব প্রণয় যন্ত্রণার মানসিক টানাপোড়েনে আকুল। তার দৃষ্টির দর্পণে জীবনের নানা রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। সে জীবনকে অনুভব করেছে পরিবারের বাইরে, পথে-ঘাটে, প্রতিবেশীদের সংসারে নানা মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণায় এবং অস্পষ্ট প্রণয় বাসনায়। গাঁওদিয়ার গেঁয়ো মানুষ শশীর জীবন যে সহজ পথে প্রবাহিত নয় তাই ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসের মধ্যে দেখিয়েছেন। গ্রামের বধূ কুসুমকে কেন্দ্র করে শশীর বিস্ময়ের শেষ নেই। তার নানা লীলাময়ী বিচিত্র রূপ কখনো তাকে আকৃষ্ট করে আবার কখনো তাকে অবাক করে তোলে। কুসুমকে শশী বুঝতে পারেনা। ঔপন্যাসিক তাদের পরকীয়া প্রেমের মধ্য দিয়ে উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কুসুমের উন্মাদ ভালোবাসা কিভাবে একেবারে নীরব হয়ে গেল, তার ইতিহাস শশীকে বলা কুসুমের সংলাপের মধ্যেই নিহিত আছে। সে বলে ওঠে- "কাকে ডাকছেন ছোট বাবু? কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।" "তাই কুসুমের এই পরিবর্তনে শশী অবাক হয় না। উপন্যাসিক দেখিয়েছেন শশীর জীবনের শেষ অব্দি থেকে যায় আত্মগ্লানি, সে নিজেকে আত্মধিকার দিয়ে ওঠে। তার মনস্তত্ত্বে রয়েছে বিবেচনার তীব্রতা। নিজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি বলেই জীবনে এত ট্রাজেডি। পুতুল নাচের ইতিকথার অধিকাংশ চরিত্রই আকস্মিক, অঘটন এবং দৈব বিপাকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপন্যাসে অনন্ত বলে ওঠে 'সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর'। সত্যিই জীবনে যা চাওয়া হয় অধিকাংশই হয়তো পাওয়া হয় না বা পেলেও অবহেলায় হারিয়ে ফেলি। শশীর জীবনে গ্রাম্য মানসিকতার সঙ্গে নাগরিক মানসিকতার দ্বন্দ্ব অহরহ জাগ্রত ছিল। গ্রাম শহরের দ্বন্দ্বের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মানব মনের সংঘাত। শশীর মধ্যে ছিল অদ্ভুত টান এবং তার কল্পনায় ছিল কুসুম প্রেম। সে কুসুমকে মনে করত

'অত্যাশ্চর্য অস্তিত্বহীন মানবী'। যদিও উপন্যাসে শশীর এই প্রেম সোচ্চারিত হয়নি। কর্ম-কর্ত্যবের মাঝে এই প্রেম যন্ত্রের মতো বয়ে চলেছে। কুসুম যখন তাকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে, তখন শশীর জগত অন্ধকার হয়ে যায়। 'ভয়ানক মন কাঁদবে বৌ, জীবনে আমি কখনো তাহলে সুখী হতে পারব না"- এই উক্তি তার মনে জমে থাকা প্রেমকে এক মুহূর্তে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে তুলে। এরপর কুসুমের গাওদিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া এবং সেনদিদির মৃত্যুর পর তার মনে যে বিষন্নতার ভার গ্রাস করে তাকে সারাতে সে নিজেই অগ্রসর হয়। মনে মনে সে সংকল্প করে "এবার কিছু করতে হইবে তাহাকে। চুপ করিয়া থাকা নয়।" "আসলে আধুনিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজেকে, নিজের ভেতর থাকা অন্তরসত্তা কে অনেকটাই বোঝে। সে চায় তার কর্ম ক্ষমতার মাধ্যমে সমস্ত বিফলতাকে ঝেড়ে ফেলতে। এমনটাই ঘটেছে শশীর সাথে। নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। মনের দিক থেকে তার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা ঘটেছে। উপন্যাসের একেবারে শেষে দেখি জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা শশী অনেকটাই পরিণত। কিন্তু সে বিষন্ন হয়ে পড়ে যখন জীবনের মর্মস্পর্শী স্মৃতি তার কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। চলতে চলতে তার চোখে পড়ে নন্দলালের ভগ্ন প্রায় শূন্য চালা। পন্ডিতের জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ গৃহ, কুসুমের শূন্য বাড়ি, সবশেষে তার ব্যর্থ প্রেমের স্থান তালবন তাকে করে তোলে উতলা। তার জীবনে শহরের যুক্তিবাদিতা ও গ্রাম্য নিষ্ক্রিয়তার ছাপ স্পষ্ট নয়। আসলে সে অবস্থার দাস মাত্র। একেই ঔপন্যাসিক অজানা শক্তির হাতে পুতুল মাত্র বলেছেন। সে দ্বিধাগ্রস্ত তাই সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত হয়েছে কুসুমের কাছে।

উপন্যাসের কুসুম রহস্যময়ী নারী। এই নারী চরিত্র যে কতখানি ভঙ্গুর ছিল তা শশীর অভিজ্ঞতার বাইরে। যখন কুসুম নিজেকে উন্মুক্ত করে মনের কথা শশীকে বলেছে তখন শশী তা অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে; সবশেষে শশীকে যখন কুসুম ফিরিয়ে দিল তখন শশীর গোছানো স্বপ্ন এক মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কুসুম অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শশীকে বলে ওঠে- "মানুষ কি লোহায় গড়া? একরকম থাকবে বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়াকড়িই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।" এই উক্তির মধ্যে কুসুমের তেজ ও অভিমান একইসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। কুসুমের এই পরিবর্তন পাঠকের মনে হয়ত দুঃ খ দেয়। কিন্তু শশী চরিত্রের বিবর্তনে এই চরিত্রটির পরিবর্তন অবশ্যাম্ভাবী ছিল।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা কেবলমাত্র কুসুম শশীকে ঘিরে আবর্তিত হয় না, সেন দিদি, গোপাল ও যামিনী কবিরাজের সম্পর্কের মধ্যেও ধরা পড়ে। সেন দিদির সাথে গোপালের অবৈধ প্রণয় পিতা পুত্রের সম্পর্কের তিক্ততাকে অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছিল। তাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে আচার-আচরণে যে সংঘাত দেখা যায় তাকে ঔপন্যাসিক পুরো উপন্যাস জুড়েই বজায় রেখেছিলেন। গোপাল ও শশীর বিরোধ দুই প্রজন্মের বিরোধ নয়; এখানে বিরোধিতা দুই দৃষ্টিভঙ্গির। শশীর দৃষ্টিভঙ্গিতে যে উদারতা, সামাজিক মঙ্গল সম্পর্কে

সচেতনতা দেখা যায় গোপালের মধ্যে তা দেখা যায় না। পিতা পুত্রের সম্পর্কের জটিলতা গোপালকেও বিমূঢ় করে। তার ভাবনায় ভিড় করে- "ছেলে বড় হইলে কি কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তার সঙ্গে মেশা। সে বন্ধু নয়, খাতক নয়, উপরওয়ালা নয়, কি যে সম্পর্ক দাঁড়ায় বয়স্ক ছেলের সঙ্গে মানুষের, ভগবান জানেন।" গোপালের সঙ্গে তার ছেলের মানসিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে থাকে সেন দিদি। শশী গোপালের এই অবৈধ প্রণয় কে ঘৃণা করেছে, ঠিক তখন; যখন সে নিজে কুসুমের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই তার জন্য কিন্তু শশীর কোন বিবেক যন্ত্রণা ছিল না। লেখক উপন্যাসে এজন্য কটাক্ষ করেননি ঠিকই তবে ঘটনাগুলিকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করেছেন যাতে পাঠক সঠিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

মতি আর কুমুদের প্রেম, বিন্দুবাসিনী এবং নন্দলালের প্রেম, শশী -কুসুমের পাশাপাশি প্রবাহিত। কুসুমের প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ায় শশীর দ্বিধা ও ভীরুতা। কুমুদের প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কুমুদের দুর্বোধ্যতা, অসম্পূর্ণভাবে হলেও লেখক দেখিয়েছেন কুমুদের এই দুর্বোধ্যতাকে মতি জোর করে নিয়ে গেছে অন্য ঠিকানায়। অন্যদিকে বিন্দু নন্দলালের প্রেমে বাধা ছিল তাদের দুজনের চরিত্রের রহস্যময়তা। সাত বছর ধরে যে উত্তেজনাময় অস্বাভাবিক জীবন নন্দলাল বিন্দু কে দিয়েছিল তার অভাবে বৈচিত্রহীন গ্রাম্য জীবন বিন্দুর কাছে খাঁচার সমান হয়ে দাঁড়ায়। সে চায় লজ্জাকর বিলাসিতা,উন্মত্ততা। বিন্দু নন্দলাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক আরেকবার প্রমাণ করলেন জীবনের রহস্যময়তা, মনের কুটিলতা এবং অন্তহীন মানুষের জটিলতাকে। মতি গায়ের মেয়ে। শহরের নতুন জীবনকে সে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা। কিন্তু মনের অপার বিশ্বাসের বলে কুমুদের বন্ধুদের মধ্যে কে খারাপ আর কে ভালো সহজেই বুঝতে পারে। নতুন জীবনধারায় মতির মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জানালার ধারে বসে বসে তার গাঁওদিয়ার জন্য মন খারাপ হয়। যে টানে সে কুমুদের জন্য ঘর ছেড়েছিল সেই টান যেন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। কুমুদের নিয়মহীনতার কথা ভেবে মতি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে হয় কুমুদ হয়তো তাকে কখনো ছেড়ে দিতেও পারে। মতি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ তাই কুমুদের অল্প আঘাতে তার চোখে জল আসে। জয়ার কুমুদের প্রতি আচরণ মতি কে নতুন করে ভাবতে শেখায়। অদ্ভুত মানসিক দ্বন্দ্বে সে জড়িয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে কুমুদের জীবনযাত্রা তাকে কৌতুহলী করে তোলে। নতুন কিছু পাবার আশায় তার মন বারবার আবিষ্ট হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে গাঁওদিয়ার কথা ভেবে তার মন খারাপ হয়। কুমুদ মতি অধ্যায় হয়ে ওঠে উপন্যাসের এক রহস্যজনক অধ্যায়। জয়া বনবিহারী বৃত্তের সার্থকতা মতি ও কুমুদের জীবনে প্রচুর। জয়ার মতো আত্মীয়া ও প্রতিবেশিনির সাহায্যে মতি অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও পরিণত হয়ে ওঠে। মতি জয়ার জীবনযাত্রা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেয়। স্বামী সম্পর্কে যে বোধ তার মনের মধ্যে ছিল পরবর্তীকালে তা

আর থাকেনা। তার মধ্যে কুমুদকে নিয়ে এক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং এই দ্বন্দ্ব থেকে মতি নিজেকে বুঝতে পারে। তার মধ্যে নতুন এক চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। বনবিহারী, জয়া তো বটেই নিজের প্রচেষ্টাতে কুমুদের উচ্ছৃংখল জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কুমুদ মতির জীবনযাত্রাকে হয়তো বনবিহারী জয়া পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, কিন্তু তাদের বাস্তব সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করে। নিজের ঘরকে আগলে রাখার কথা ভাবে আসলে জীবন মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। মতিও বাস্তবতাকে চিনেছে তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাদের জীবনে চলার পথ, যেপথে আজীবন মতি কে সঙ্গী হিসেবে পায় কুমুদ।

লেখক যাদবের সস্ত্রীক আফিম খেয়ে আত্মহত্যার বিবরণ উপন্যাসে দিয়েছেন। শশী তাদের মৃত্যু রহস্য বুঝতে পারল, চোখের সামনে বিষক্রিয়ার ফলাফল দেখলো; কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারল না। তাদের মৃত্যু দেখে শশীর বিজ্ঞানমনস্ক মনেও প্রশ্ন জাগে। তাই লেখক শশীর মন বুঝে মন্তব্য করেন-"বিশ্বাস হয়না, তবু শশীর মনের আড়ালে। লুকোনো গ্রাম্য কুসংস্কার নাড়া খাইয়াছে। এক এক সময় তাহার মনে হয়। হয়তো আছে, অতিরিক্ত বাধা যুক্তির অতিরিক্ত কিছু হয়তো আছে জগতে।" যাদব মরে প্রমাণ করে দেখালেন যে সমাজের কাছে তিনি কতটা দায়বদ্ধ, মানসিক দ্বন্দে জর্জরিত হয়ে তাই তিনি মৃত্যুকে বরণ করতেও ভয় পেলেন না। কেবলমাত্র যাদব পন্ডিত নয়, পাগলা দিদিরও মানসিক দ্বন্দ্বের কথা। লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। পাগলা দিদির সাদর রসিকতা, সদা হাস্যময় মুখ শশীকে করে তোলে বিষন্ন। সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে। সেও স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করল। সে শুধু যাদব কে চেয়েছিল, যাদবের মতো মহিমা চাইনি। শশীর মনের পটে এঁকে আত্মগ্লানির সাথে অদ্ভুত প্রশান্তি স্থাপন করে চরিত্রটি অংকন করেছেন লেখক। "পুতুল নাচের ইতিকথা"-য় কুসুম, বিন্দু, মতি, সেনদিদি সবই এক অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে বিবর্তিত হয়েছে বলে তাদের জীবন সম্পর্কে মানিকের জীবন রহস্যবোধ এত গভীর। বিন্দু চরিত্রের জেদ, তার আসক্তি তাকে পথ থেকে সরে যেতে দেয়নি। গাওদিয়ার সঙ্গে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আবার নন্দলালের কাছে ফিরে গিয়েও সে স্বস্তি পায়নি। নন্দলাল বিন্দুকে আঘাত করেছে, শেষ পর্যন্ত নিজেকে সর্বনাশের গহ্বরে টেনে এনেছে বিন্দু। পরাজিত নন্দলাল শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে পড়েছে। শশীর ট্র্যাজেডি ও নন্দলালের ট্র্যাজেডির মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। তবু প্রত্যেকটি ট্র্যাজেডি স্বতন্ত্র। "পুতুল নাচের ইতিকথা"-র এক একটি চিত্র।

তাই বলা যেতে পারে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' মানিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সমস্ত চরিত্রের মধ্য দিয়েই মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান কে তুলে ধরেছেন। মতি- জয়া -কুমুদ- বনবিহারী বৃত্তের গতি প্রকৃতিতে নারীর অহংকার কিভাবে সম্পর্কের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করে তাও উপন্যাসিক মনস্তত্ত্বগতভাবেই দেখিয়েছেন। শশীর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বিচিত্র মানুষ প্রবহমান

গতিতেই তার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। বস্তুত উপন্যাসের শেষে মানবমন সম্পর্কে বৃহত্তর চেতনায় আমরা উপনীত হতে পারি, যা আমাদের মনের পরিশুদ্ধি ঘটায়।

**তথ্যসূত্র :**

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, উপন্যাস সমগ্র, পৃষ্ঠা নম্বর ২৫৪।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, উপন্যাস সমগ্র, পৃষ্ঠা নম্বর ২৫৬।
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, উপন্যাস সমগ্র, পৃষ্ঠা নম্বর ২৫৩।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, উপন্যাস সমগ্র, পৃষ্ঠা নম্বর ২৫৯।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

**আকর গ্রন্থ:**

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, উপন্যাস সমগ্র, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১। মুখোপাধ্যায় অরুন কুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৫।
২। গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থ নিলয় কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৩।
৩। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জীবন দৃষ্টি ও শিল্প রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮।

**তনুশ্রী নস্কর**

## হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নারী: প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ঘর ছাড়ে বাংলার পুরুষের সাথে নারীরাও। পুরুষশূন্য ঘরে অরক্ষিত নারীরা পালন করেছিল অন্য ভুমিকা। তারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যায়নি কিন্তু অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে সঠিক স্থানে। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া, আহতদের সেবা করা, ও তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা, এই সব কাজই ছিল সমান ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু তাতে বাংলার নারীরা পিছিয়ে যায়নি। তারা যুদ্ধে না গিয়ে ও সমান ভাবে সহযোগিতা করেছে, আর তাই তারা হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী থেকে শুরু করে সেই সময়ের শিক্ষিত নারীরা নানা ভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছে। সে সাহায্য কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ।[১] কোনও যুদ্ধ হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারীরা ও শিশুরা। এই যুদ্ধেও এর অন্যথা হয় নি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলাদেশের নারীরা। তাদের কেউ কেউ হারিয়েছে নিজের স্বামী পরিজন।

সমাজ ও সময়কালের প্রতিফলন সাহিত্য এড়াতে পারেনা। হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পগুলি এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সমাজ ও মানুষ অন্যায়কে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয়নি, সেই কারণেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন সুস্থির নয়। দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবর হত্যা এবং বারংবার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলাদেশের সমাজকে স্থিতাবস্থা দিতে পারিনি। হুমায়ূন আহমেদ এই সময়কালের লেখক (১৯৪৮-২০১২)। হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের কাহিনী উঠে এসেছে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী যেকোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী ও শিশুরা। হুমায়ূন আহমেদের গল্পে সাধারণ নারী চরিত্রগুলি বাস্তবিক সমাজের প্রতিফলন। সেই হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ,মুক্তিযুদ্ধের পরে এই দুটি সময়ে বাংলাদেশের নারীর কি অবস্থান ছিল তার প্রতিচ্ছবি হুমায়ূন আহমেদের গল্পগুলিতে রয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের অন্যান্য নারী চরিত্রগুলোকে পাশে রেখে শুধুমাত্র সেই নারী চরিত্রগুলোকে এই আলোচনায় তুলে ধরা হচ্ছে যারা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় কালের প্রতিনিধি। হুমায়ূন আহমেদের রচনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব এড়ানো সম্ভব নয় কারণ মুক্তিযুদ্ধ তাঁর গল্পের পটভূমি রচনায় একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে দরিদ্র - মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতি সাধারণ গৃহবধূরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের কেউ কেউ হারিয়েছে নিজের স্বামী,পরিজন কেউ বা নিজের সম্মান। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অস্থির অবস্থা তার একটি ক্ষুদ্র চিত্র উঠে এসেছে 'নন্দিনী' গল্পে, নন্দিনীর জীবনের

মাধ্যমে। নন্দিনী একটি হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সুরেশ্বরবাবু অর্থাৎ নন্দিনীর বাবা পাকিস্তানি মিলিটারি আসার আগে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাননি। সে সময় প্রাণ বাঁচানোর জন্য সব হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নিচ্ছিলেন। সুরেশ্বর বাবুকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে। একা নন্দিনী প্রাণ বাঁচাতে হারুনদের বাসায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু হিন্দু নারীকে আশ্রয় দিয়ে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি বাড়াতে চাইনি হারুনরা। আজিজ মাস্টার নামক মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের শিক্ষক নন্দিনীকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু শর্তহীন ভাবে নয়। নন্দিনীকে ধর্মান্তরিত করে, তারপর বিয়ে করেছেন আজিজ মাস্টার। হিন্দু মেয়ের ধর্ম পরিবর্তনের মতো ঘৃণ্য কাজ করার জন্য মুক্তিবাহিনী তাকে প্রাণে মেরেছে। গল্পের ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে নন্দিনীর অসহায় অবস্থার সুযোগ কিভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিয়েছে। শুধু আজিজ মাস্টার নয়, কথক নিজেও নিয়েছে।

'আমি ওর ঘাড়ে একটা চুমু খেয়েছিলাম'।[২]

সমাজ নারীকে পর্দানশীল করে রাখে। নিজেকে রক্ষা করার নিয়ম গুলো না শিখিয়ে অক্ষম করে রাখে। অথচ সামাজিক সমস্যাগুলোতে সবচেয়ে অরক্ষনীয়া হয়ে ওঠে নারী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধুমাত্র হিন্দু নয় অন্যান্য বাংলাদেশীদের ওপর ও অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন পাকিস্তানি সেনা। ঠিক কত সংখ্যক হিন্দু সেসময় মারা গিয়েছেন বা অন্যান্য মৃতদের পরিসংখ্যান সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু সে সময় গণহত্যা চলেছিল এর অনেক প্রমাণ মিলেছে। বাংলাদেশে এই গণহত্যা এবং অত্যাচারের জন্যই মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি (বিতর্কিত) মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর প্রায় প্রায় ৯০ শতাংশ ছিল হিন্দু।[৩]

'পঙ্গু হামিদ' নামক গল্পে হামিদের বয়স ষাটের কাছাকাছি। চামড়া ঝুলে গেছে কিন্তু এখনও শক্ত সামর্থ্য। কিন্তু সে হাঁটাচলা করতে পারে না কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কোমর গেছে ভেঙে। এখন সে হুইল চেয়ারে করে ঘুরে বেড়ায়। গল্পটিতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালকে ধরা হলেও এক অদ্ভুত প্লট সৃষ্টির মাধ্যমে হামিদের অতীত এবং বর্তমানকে হুমায়ূন আহমেদ এক সূত্রে বেঁধেছেন। রাজাকারের দলের থাকাকালীন তার অভিজ্ঞতাগুলি তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধবোধ হয়তো রাধা কি ঘিরে। রাধা নামক মেয়েটিকে তারা তুলে আনে পাকিস্তানী মিলিটারি অফিসারকে খুশি করার জন্য। সাতদিন মেয়েটি এক ফোঁটা জলও খায়নি। এতটাই জেদ ছিল তার। আসলে জেদ নয় নিজের সম্মান বাঁচানোর লড়াই। বিপরীত পরিস্থিতিতে এক সাধারণ মেয়ে নিজের মত করে লড়াই করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার লড়াই সফল হয় না। রাজাকার বাহিনী যখন জানতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর হামলা চালাবে তখন রাধাকে

মেরে দিতে বলে হামিদের কমান্ডার সাহেব। কারণ, রাধা সকলকে চিনে গেছে। সে মুক্তিবাহিনীর কাছে সকলকে ধরিয়ে দিতে পারে। তাই তাকে মরতে হবে।

"রাধারে বস্তায় ভইরা হাওরের পানিতে ফেলায়া যেতে হবে। দশ-বারোটা ইট দিবা বস্তার ভিতরে,যেন না ভাসে"।[৪]

এমন ভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা পরিণত হয়েছে ভোগ্য পণ্যে। ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু ঠিক করে দেয় সেই পুরুষ সমাজ। কোন নারী যদি নির্যাতিতা হয় তাকে রক্ষা না করতে পারার অপবাদ পুরুষের নয়, পুরুষের দ্বারা পুরুষ শাসিত সমাজে অবলা করে রাখা নারীর লাঞ্ছনা দায়িত্ব পুরোটাই তার নিজের। সে তখন সমাজে ব্রাত্য। যে পুরুষ তাকে ভোগ করলো তার চরিত্র নিয়ে আঙ্গুল তোলা সমাজে প্রচলিত নয়। যে লাঞ্ছিত হল তার চরিত্র নিয়ে আঙ্গুল তোলা হবে। এবং পরিবারের কাছে সমাজের কাছে সে ব্রাত্যজন।

'পঙ্গু হামিদ' গল্পে হুমায়ূন আহমেদ তুলে ধরেছেন সেই সব নারীর লাঞ্ছনার ইতিহাস যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় অরক্ষিত অবস্থায় ঘরে ছিল। লাঞ্ছনার বর্ণনা যথেষ্ট পীড়াদায়ক। হুমায়ূন আহমেদ নিপুন বর্ণনার মাধ্যমে অতিরঞ্জিত না করেই মেয়েটির অবস্থা এবং লাঞ্ছনার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। হুমায়ূন আহমেদের বর্ণনা এতটাই নিখুঁতে যে গল্পগুলি বাস্তব হয়ে ওঠে। বিষয়ে মোহাম্মদ আজম বলেছেন :-

"যদি সাহিত্যের কাজ হতো বাস্তবকে তুলে আনা, এমনকি বাস্তবের মধ্যে যেসব অকথিত সুর বা অসুর থাকে, সেগুলোর "বাস্তব" অনুকরণ ,তাহলে হুমায়ুন হতেন দুনিয়ার সেরা লেখকদের একজন। মানুষকে নিপুনতম পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে তার সমস্ত অবস্থা এবং অবস্থানকে কণ্ঠে, অর্থাৎ সংলাপে ধারণ করে তুলে আনার যে ক্ষমতা হুমায়ুন সংখ্যাতীতবার দেখিয়েছেন ,তার তুলনা বিরলই হওয়ার কথা"।[৫]

সংবেদনশীল লেখক হুমায়ূন আহমেদ নিজে এই সময়কালকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। কলেজে পড়া একটি ছেলে যাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশদ্রোহী সন্দেহে। বেঁচে ফিরতে পারবে কিনা নিজেই জানতেন না। পুলিশ অফিসার বাবাকে মারার পরে পরিবারের সবাইকে মেরে দেওয়ার জন্য হন্নে হয়ে খুঁজছে এমন অভিজ্ঞতা ও লেখকের রয়েছে। সম্পত্তি-পছন্দের জিনিসপত্র সমস্ত ছেড়ে শুধুমাত্র প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। স্বাধীন বাংলাদেশে একমাত্র পরিবারের উপার্জনকারী বাবা মারা যাওয়ার পর কিভাবে দিন গুজরান হয়েছে চিন্তায় আর অভাবে সে সব অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্পকে বাস্তবিক করতে সাহায্য করেছে।[৬]

এই অভাব এবং অভাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বাংলাদেশের শিশু বিক্রির মত ঘটনা। 'সুলেখার বাবা' ও 'সগিরন বুয়া' নামক গল্পে এই নির্মম সত্য ঘটনাটির প্রতিফলন ঘটেছে।

সুলেখার বাবা গল্পটি শুরু হয়েছে একটি গরিব মানুষের বর্ণনা দিয়ে। সাধারণত আমাদের চারপাশে যেরকম দেখা যায় সেই ধরনের গরিব মানুষের বর্ণনা। বর্ণনাটি লেখক দিয়েছেন কারণ যাতে গল্পের মধ্যে দুটি বিপরীত ধারা বোঝানো যায়। একদিকে গরিব পিতা অন্যদিকে বিক্রি করে দেওয়া মেয়ে যে সুন্দর ছাড়া সকালে উঠে আর কিছু দেখবে না। লোকটিকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করতে গেলে সুলেখার টাকা লোকটি টাকা নেয় না। ফিসফিস করে বলে —

"খুব অভাবের মইধ্যে পড়েছিলাম গো। খুব অভাব। ভাতের কষ্ট হইল গিয়া খুব বড় কষ্ট। পেটের জইন্যে এই কাম করলাম। ওমন কুকাম করলাম"[৭]

স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যায় যে ওই লোকটিই সুলেখার আসল বাবা।না খেতে পাওয়ার অবস্থায় পরে নিজের পরিবার ও ছোট সুলেখাকে বাঁচানোর জন্য তিনি বিক্রি করে দেয় মেয়েকে।

সন্তান বিক্রি বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে বিক্রি বা নষ্ট করে দেওয়া আমাদের সমাজে খুব সাধারণ বিষয়। হুমায়ূন আহমেদের গল্পে সেই সাধারণ বিষয়টি উঠে এসেছে কিন্তু গল্পের শেষে তিনি একটি সমাজের অমানবিক দিক তুলে ধরেছেন। তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন যে একটি পিতা এবং মাতা কতটা অসহায় হলে তার সন্তানকে টাকার জন্য বিক্রি করতে বাধ্য হন। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থানকে বোঝার জন্য এই গল্পগুলোই যথেষ্ট

"প্রসিডিং অব দ্য সেমিনার অন ফ্যামিলি প্ল্যানিং' শীর্ষক এক নিবন্ধের তথ্য অনুযায়ী ২০ শতাংশ নারীরা পরিবারের উপার্জনকারী পুরুষ বা স্বামীকে হারিয়েছিলেন.৮.৩ শতাংশ পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ৪৯.৫ শতাংশ নারী তাঁদের পারিবারিক সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছিল। [৮] হুমায়ুন আহমেদ নারীদের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলো খুবই নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প 'শ্যামল ছায়া'য় মজিদ মিয়া ও তার ছোট পরিবারের গল্প উঠে এসেছে। যেখানে আমরা দেখি কম শিক্ষিত মা বাবা জমি বিক্রি করে একমাত্র ছেলেকে পড়ায় আনেক স্বপ্ন নিয়ে।ছেলে এম.এ পাস করে মুক্তিবাহিনীর হয়ে মজিত লড়াই করেছে, বেঁচে ফিরেছে কিন্তু হারিয়েছে একটা পা। ক্র্যাচের শব্দে রহিমার বুক ধড়পড় করে কষ্টে। ছেলে তাকে ভাবতে শেখায়—'স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য'। যে শিখা মজিতকে একসময় ভালোবাসতো, তার বাড়ি আসতো। মজিত না বললেও রহিমা বোঝে শিখার বিয়ে হয়ে গেছে। তার ছেলেকে শিখা যে কেবল পঙ্গুত্বের জন্য বিয়ে করেনি তাও বোঝে। ভাবতে চেষ্টা করে স্বাধীনতার কাছে এ ত্যাগ খুবই সামান্য। কিন্তু পারে না। কারণ—

"জীবন তার সুবিশাল বাহু রহিমার দিকে প্রসারিত করেনি।কাজেই তার ঘুম আসে না"।[৯]

আসলে ঘুমটা এখানে প্রতীকী মাত্র। দরিদ্র পরিবারের রহিমা সব হারানো নারীদের প্রতিনিধি মাত্র যে স্বপ্ন দেখে শিক্ষিত ছেলে পড়াশুনা করে রোজগার করে তাদের দুঃখ দূর করবে। আসলে কম শিক্ষিত রহিমা, যাকে "জীবন তার সুবিশাল বাহু" এগিয়ে দিয়ে ভাবতে শেখায় নি। তাই রহিমা নিজের সংসারটুকুর উন্নতি নিয়েই চিন্তিত। তাই সে ভাবতে পারে না মজিদ পা হারিয়ে নিজের কি উন্নতি করলো। তাই চিন্তায় তার পুরাতন অসুখ বেড়ে যায়, রাতের ঘুম ছুটে যায়। তাই বলে রহিমা কে দোষ দেওয়া যায় না। সমাজ মেয়েদেরকে পর্দার ভিতরে রাখতে রাখতে তাদের মন গুলো ও পর্দানশীন করে তুলেছে। সমাজ তাকে এতটাও শিক্ষিত করে ওঠে তোলেনি যে সে নিজের স্বপ্ন নিজের পূরণ করতে পারে বা দেশের সার্বিক হিত কিসে সেটা ভাবতে পারে। রহিমা শুধু স্বার্থপর হয়ে নিজের পরিবারের কথা ভেবেছে, কারণ তার কাছে সঠিক শিক্ষা সমাজ পৌঁছে দিতে পারেনি। এ দায় সমাজের।

"শীত" গল্পে মুক্তিযুদ্ধে মারা যাওয়া শহীদ পরিবারের ছবি উঠে এসেছে। যেখানে তাদের দারিদ্রতার ছবি একটি শীতের রাতের মাধ্যমে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মেহের আলীর স্ত্রী পুত্র এবং পিতা-মতি মিয়ার সংসারের দারিদ্রতা তুলে ধরেছেন লেখক। শহীদ মেহের আলী স্ত্রী ফুলজানকে লেখক বর্ণনায় একটু আড়ালে রেখেছেন। ঠিক যেমনটি সংসারে একটি নারী আড়ালে থেকে সমস্তটা চালনা করে। কিন্তু লেখকের দেয়া তথ্যগুলি গল্পের মাঝে মাঝে এমন ভাবে উঠে এসেছে যে তার বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার কোন সমস্যা থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের শহীদ হলেও তারা কোনো রকম সাহায্য সরকার থেকে পাচ্ছে না। তিনজনের সংসারে কিভাবে খাদ্যের সংস্থান হবে সেটাই বড় চিন্তার বিষয়।

"শীতের শুরুতেই ভাতের কষ্ট দূর হয়েছে। ফুলজান রোজ দারোগা বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসছে।একজনের ভাত কিন্তু তিনজনেরই ভরপেট হচ্ছে।"[১০]

দারোগা বাড়ি থেকে ভাত আসছে, সঠিক করে বলা না থাকলেও বুঝে নেয়া যায় যে ফুলজান দারোগা বাড়িতে ঠিকের কাজ করতে শুরু করেছে। একজনের খোরাক তিনজনে ভাগ করে খাওয়ার মত পরিস্থিতিতে রয়েছে তারা। শীত কাটানোর মত একটা ভালো কম্বল নেই। কারণে বৃদ্ধ শশুর যখন বলে ,রশিদ সাহেব নামক ব্যক্তির কাছে গিয়ে একটি কম্বল চাইতে।তখন ফুলজান কোন উত্তর দেয় না। লেখক এখানে বলছেন —

"যে-কোনো কারণেই হোক রশিদ সাহেবের কাছে সে যেতে চায় না'।[১১]

এসব উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায় যে ফুলজান মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের কাছে তার আলাদা কোন সম্মান যেমন নেই তেমন আর্থিক সাহায্যও নেই। অন্য বিধবা নারীরা যেভাবে সমাজের সকলের নজর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে ফুলজান কেও

হয়তো সেই ভাবেই থাকতে হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ হয়তো বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে কিন্তু ফুলজানদের মত সাধারণ ঘরের কম শিক্ষিত নারীদের জীবনে এনে দিয়েছে বিনিদ্র দীর্ঘ রাত। যেখানে শুধুই না পাওয়ার বেদনা যা বারবার ফুলজানকে না ঘুমিয়ে কাঁদতে বাধ্য করে—

এই কয়েকটি গল্পের নারী চরিত্র গুলোকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বাংলাদেশের সমাজে নারীদের অবস্থানটা খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, অভাবের তাড়নায় কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়া। লেখক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পের শেষটা সুন্দর করার জন্য যতই বাবা-মায়ের অসহায় তার কথা তুলে ধরুক, আসলে কন্যা সন্তানের মূল্য পরিবারের কাছে খুবই কম। তাই তাকে বিক্রি করাটাই তাদের কাছে লাভজনক মনে হয়েছে—

দ্বিতীয়, যুদ্ধের সময় নিজেদের আনন্দের খোরাক হিসেবে সৈনিকরা বেছে নিয়েছে নারীদের। রাধার মত অসংখ্য নারী রয়েছে যারা সেই সময় অবহেলার শিকার হয়েছে। এমনকি তারা গর্ভবতী হলে সেই সব শিশুদের 'যুদ্ধশিশু' নাম দেয়া হয়েছিল। যাদেরকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের সহৃদয় মানুষরা দত্তক নিয়েছিলেন।

"শীত" ও "শ্যামল ছায়া" পেয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তারা হারিয়েছে নিজেদের সম্পত্তি ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। 'শীত' গল্পে মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রীর সামাজিক অবস্থান ও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

কিন্তু প্রকৃতি সমতা বজায় রাখতে জানে। তাই হয়তো ভালো-মন্দ দুই ধরনের মানুষ মিশিয়ে এই সমাজ চলছে। একদিকে যেমন কিছু পুরুষ নারীকে শুধু অপমান করছে না এমনকি মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে। ঠিক অন্যদিকে কিছু পুরুষ যাদের হাত ধরে মেয়েরা পাড়ি দিচ্ছে নিজেদের স্বপ্নের উড়ান। সমাজের একদিকে যেমন নারীর উপর পুরুষের অত্যাচার অন্যদিকে সেই পুরুষেরই যত্ন সম্মানের অধিকারী নারীরা। হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য গল্পে সেই ভিন্ন ছবির দেখা মেলে।

সমাজ পরিবর্তনশীল। আর মানুষ বিপরীত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও নিজের স্বপ্নের মত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্বাধীন বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমান যখন সোনার বাংলা গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন ১৯৭২ সালের প্রথম নির্বাচনে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে মহিলা আওয়ামী লীগ গঠিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাত জন নারীকে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালে আসন দ্বিগুণ করা হয়।[১২]

রাজনীতিতে নারীদের এই উত্থান পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সমাজ গঠনে অনেকটাই সাহায্য করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে এই আশা নিয়ে আগামীর নারীদের কাছে রইল বর্তমানের প্রত্যয়।

**তথ্যসূত্র :**


১। পারভিন শাহনাজ, মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা, কাকলী প্রকাশনী কলকাতা ২০১৩

২। আহমেদ হুমায়ুন, গল্প সমগ্র, নন্দিনী, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা ১৪২১, পৃষ্ঠা ৪২৭

৩। বাংলা উইকিপিডিয়া

৪। আহমেদ হুমায়ুন ,গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, কাকলি প্রকাশনী কলকাতা ১৪২৯ পঙ্গু হামিদ পৃষ্ঠা ১২৫

৫। আজম মোহাম্মদ, হুমায়ুন আহমেদ পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য, প্রথমা প্রকাশনী ঢাকা ২০২০, পৃষ্ঠা ২০১

৬। অন্তরে অম্বরে, হুমায়ূন আহমেদ রচনাবলী ৫, পৃঃ ৪২৭

৭। আহমেদ হুমায়ুন, গল্প সমগ্র, নন্দিনী, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা ১৪২১, পৃষ্ঠা ৪৫০

৮। কেকা বাকেয়া জান্নাতুল বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় নারী উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৃষ্ঠা ৪২

৯। আহমেদ হুমায়ুন, গল্প সমগ্র, নন্দিনী, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা ১৪২১,শ্যামল ছায়া

১০। আহমেদ হুমায়ুন গল্প সমগ্র কাকলী প্রকাশনী কলকাতা ১৪২১ শীত পৃষ্ঠা ৩৭৩

১১। আহমেদ হুমায়ুন, গল্প সমগ্র, নন্দিনী, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা ১৪২১,শীত পৃষ্ঠা ৩৭৪

১২। কেকা বাকেয়া জান্নাতুল বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় নারী উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৃষ্ঠা ৯২

ঈশিতা সিন্‌হা

## মহাশ্বেতা দেবীর ‘দৌলতি’ : পুঁজিবাদ, দাসত্ব ও ভ্রান্ত স্বাধীনতার আখ্যান

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যের এমন এক নাম, যাঁর সাহিত্য ও সমাজকর্ম একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর সাহিত্যে সমাজ, রাজনীতির নানা দিক উঠে এসেছে। তিনি জীবদ্দশাতেই দেশ-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেন এবং একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ হিসেবে সম্মান অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও স্বীকৃতির ফলে বিশ্বের বহু সচেতন পাঠকের কাছে তাঁর লেখার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

ছোটবেলা থেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিত। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শোষিত মানুষের পাশে থাকা ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। সমাজকর্মের পাশাপাশি লেখালিখিতেও মহাশ্বেতা দেবী সবসময় সক্রিয় ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী শুধু শিক্ষিত সমাজের মানুষদের জন্য লেখালিখি করেননি। সমাজের একেবারে নিচু স্তরে থাকা মানুষদের সঙ্গেই তিনি নিজেকে বেশি করে যুক্ত রেখেছিলেন। লোধা, শবর, খেরিয়া প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তিনি কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাঁদের খুব আপন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখায় সমাজের ক্ষমতাবান ও শোষিত শ্রেণির মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে নারীদের এবং প্রান্তিক মানুষের ওপর হওয়া নির্যাতন ও বঞ্চনার চিত্র তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকায়, তাঁর মাতামহের বাড়িতে। তবে তাঁর শৈশব ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়, এক শিক্ষিত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে। তাঁর বাবা মণীশ ঘটক ছিলেন একজন খ্যাতনামা কবি ও কথাসাহিত্যিক। তাঁর মা ধরিত্রী দেবী নিজেও একজন লেখিকা ছিলেন। সম্ভবত সমাজসেবার মানসিকতা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, কারণ ধরিত্রী দেবী লেখালিখির পাশাপাশি সমাজকর্মেও যুক্ত ছিলেন এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার প্রসারে অনেক সময় দিতেন। সিনেমা জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব ঋত্বিক ঘটক ছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর কাকা।

চল্লিশের দশকের উত্তাল সামাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সময় থেকেই মহাশ্বেতা দেবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠতে শুরু করে। দুর্ভিক্ষের সময় একজন কলেজছাত্রী হিসেবে তিনি সহপাঠীদের সঙ্গে ত্রাণকার্যে যোগ দেন খাবার বিতরণ করেন, রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে জীবিত মানুষ খুঁজে বের করেন, তাদের সেবা করেন এবং ত্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে দেন। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রথমবার তাঁর নিরাপদ,

স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত জীবনের আবরণ ভেঙে যায় এবং নির্মম বাস্তবতা গভীরভাবে তাঁর চেতনাকে আঘাত করে।

মহাশ্বেতা দেবী একজন বিশিষ্ট লেখিকা হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক, সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার আদিবাসী সম্প্রদায় এবং ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস ও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। দৌলতি উপন্যাসের পটভূমি ঝাড়খণ্ড— বিহারের পালামৌ অঞ্চল, যা একটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এই অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের জীবন মহাশ্বেতা দেবীর চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর সরাসরি প্রতিফলন তাঁর 'দৌলতি' উপন্যাসে দেখা যায়।

১৯৫৬ সালে পালামৌ অঞ্চলে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী বন্ধকী শ্রমিকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, তাদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখে গভীরভাবে আলোড়িত হন। বন্ধকী শ্রম প্রথা এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে সামান্য অঙ্কের ঋণ নেওয়ার কারণে একজন মানুষ তার স্বাধীন শ্রমিকের মর্যাদা হারিয়ে জমিদারের অধীনে প্রায় দাসের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এই অমানবিক ব্যবস্থা মহাশ্বেতা দেবীকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি পালামৌ জেলার নানা এলাকায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান মাইলের পর মাইল হাঁটেন, কোথাও রাত কাটান, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যান। এইভাবে তিনি বন্ধক শ্রম ব্যবস্থার নিষ্ঠুর শোষণকে কাছ থেকে দেখেন, বিশেষ করে নারীদের ওপর হওয়া ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি শুধু সংবাদপত্রে এ বিষয়ে লেখালিখি শুরু করেননি, পাশাপাশি পালামৌ জেলা বন্ধকী শ্রমিক মুক্তি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং ডাল্টনগঞ্জ শহরে হাজার হাজার বন্ধকী শ্রমিককে নিয়ে মিছিলের নেতৃত্বও দেন।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্রের বিপরীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান। এখানে সরকারকে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে নয়, বরং উপকেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে দেখানো হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রে অবস্থান করে জমিদার ও মহাজন, উপকেন্দ্রে পুলিশ, আদালত ও প্রশাসন যারা মূলত মহাজনের পক্ষেই কাজ করে। আর প্রান্তে অবস্থান করে আদিবাসী, দলিত ও দরিদ্র মানুষ।

'দৌলতি' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থানকারী মহাজন ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রান্তে থাকা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ। ক্ষমতাশালী মুনাবর সিং চন্দেলা, নাগেশিয়া আদিবাসী গোষ্ঠীর উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করে আসছে। এখানে পুঁজিবাদী তথা ব্রাহ্মণ্য-রাজপুত শাসকশ্রেণির উদ্দেশ্য হলো নিজের পুঁজিকে আরও বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্য পূরণ করতে তারা শারীরিক ও মানসিক পীড়ন চালাতেও দ্বিধা করে না। অন্যদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ন্যায্য শ্রমফল কামনা করে। উপন্যাসে মুনাবর সিং চায় যতটা সম্ভব সস্তা শ্রম, যাতে সে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে

পারে। নাগেশিয়া সমাজ প্রত্যাশা করে যে শ্রমের বিনিময়ে তারা অন্তত পরিবারকে খাওয়াতে পারবে। একইভাবে ব্রাহ্মণ পরমানন্দ, আদিবাসী নারীদের ব্যবহার করে নিজের পুঁজি বৃদ্ধি করে, অথচ বিনিময়ে তাদের পেটভরে খাবারটুকুও দেওয়া হয় না। উপন্যাসে নারী কেবল শোষণের শিকার নয়, বরং পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ঋণব্যবস্থায় একটি কার্যকর যন্ত্রে পরিণত হয়। উপন্যাসে দৌলতির শরীরকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের জন্য, পুরুষের ভোগের জন্য এবং ঋণ শোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে, নারীদেহকে মানুষ হিসেবে নয়, সম্পত্তি বা পণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। পুঁজিবাদ নারীদেহকে ব্যবহার করছে নিজের মুনাফার স্বার্থে। এই প্রসঙ্গে মিশেল ফুকোর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> "The body is also directly involved in a political field— power relations have an immediate hold upon it— they invest it– mark it– train it– torture it– force it to carry out tasks– to perform ceremonies– to emit signs. This political investment of the body is bound up– in accordance with complex reciprocal relations– with its economic use— it is largely as a force of production that the body is invested with relations of power and domination."[১]

মিশেল ফুকো বলেছেন, মানুষের শরীর সরাসরি ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ক্ষমতা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, শাসন করে এবং নিজের কাজে লাগায়। কারণ শরীরই হলো উৎপাদনের প্রধান শক্তি। একইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীদেহকে অবজেক্ট বা বস্তুতে পরিণত করা হয়। এখানে মানবিক অনুভূতির কোনো মূল্য নেই। এই ধারণার সঙ্গে মার্কসের শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্বের সংযোগ লক্ষ করা যায়। মার্কসের শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এখানে পুঁজিবাদীরা লাভবান হচ্ছে, আর শ্রমিকরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক পেলে শ্রমিকদের জীবনযাপন অনেকটাই সহজ হতো; অপরদিকে পুঁজিবাদীদের মুনাফা কমে যেত।

এই কাঠামোর বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে দৌলতি উপন্যাসে। দৌলতি ও অন্যান্য নারীরা ঋণের সুদ শোধ করার জন্য নিজেদের শরীরকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। প্রতিদিন ২০—৩০ জন খদ্দেরের সঙ্গে তাদের মিলিত হতে হয়। এইভাবে ১৪ বছরের দৌলতি ২৭ বছরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। অতিরিক্ত ব্যবহারে যেমন যন্ত্র বিকল হয়ে যায়, তেমনি দৌলতির শরীরও ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

উপন্যাসে গ্রামের সামগ্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে। গ্রামের মানুষের প্রকৃত অর্থে কোনো ভোটাধিকার থাকে না; এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে জমিদার ও ক্ষমতাশালী

গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। অস্ত্র ও অর্থের জোরেই নির্বাচনের ফল নির্ধারিত হয়। ফলে গণতন্ত্র এখানে কেবল নামমাত্র রয়ে যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দেশের রাজনীতি, ভোটের গুরুত্ব বা রাজনৈতিক সচেতনতা পৌঁছায় না। এই ব্যবস্থার মধ্যে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই ক্রমাগত প্রান্তিক অবস্থায় আটকে থাকে। এই বাস্তবতারই স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় মুনাবর চন্দেলার কথায়—

> "মুনাবর চন্দেলা ভোটের আগেই বিরোধী প্রার্থীদের বলল, এত তকলিফ কেন উঠাচ্ছেন? আমরা যাকে ভোট দিতে বলব ওরা তাকেই ভোট দেবে। আমরা যাদের ভোট দিতে বলব, ওরা তাদের ভোট দেবে। জয়বন্ত সিং আমাদের প্রার্থী, এবারে তাকেই সকলে ভোট দেবে। আপনারা কি কারণে এত দম খরচ করছেন?"[২]

এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে তথাকথিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর আড়ালে আসলে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতাই সক্রিয় থাকে। স্বাধীনতার আগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা প্রান্তিক ও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ চলত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার উত্তরকালেও এই সামন্তপ্রথা নতুন রূপে থেকে গেছে। এই ক্ষেত্রে ড. রামশরণ শর্মার মতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, স্বাধীনতার পর ভারতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গৃহীত হয়, তার বেশিরভাগটাই এসেছে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রব্যবস্থার মডেল অনুসারে। এই মডেলগুলি ইউরোপের সামাজিক বাস্তবতাকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভারতের সমাজব্যবস্থায় জাতিগত ও ধর্মভিত্তিক বিভাজন ছিল। ফলত দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ব্যাপকভাবে উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও শোষণের বোঝা নিম্নবর্ণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। জোরপূর্বক তাদের ফসল কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষগুলো বাঁচার তাগিদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঋণের পরিমাণ এমন জায়গায় পৌঁছাত যে তা শোধ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। ফলে তারা দাসত্বের ফাঁদে আটকা পড়ত। উপন্যাসে দেখা যায়, গনোরি নাগেশিয়া, মুনাবর সিংয়ের কাছ থেকে ৩০০ টাকা ধার নেওয়ার ফলে কামিয়া অর্থাৎ ঋণদাসে পরিণত হয়। আবার গনোরির মেয়ে দৌলতিকেও কামিয়া হতে হয়। এক ব্রাহ্মণ তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে গিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে দেশ স্বাধীন হলেও সেই স্বাধীনতা আসলে একটি মিথ। দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক স্তরে সেই স্বাধীনতা সকল মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার উপলব্ধিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর মতে স্বাধীনতার তিন দশকেরও বেশি সময় পর তিনি দেখেননি যে, আদিবাসীরা খাদ্য, জল পেয়েছে। যারা ঋন দাস তারা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেনি। গোনোরির মতো মানুষের কাছে স্বাধীনতা মুক্তি নয়, ভ্রান্তি হিসেবেই আখ্যায়িত হয়। আসলে তারা জানেই না তাদের দেশের নাম ভারত। তাই সাধুজি

যখন সকল গ্রামবাসীকে বলে যে তারা সবাই এক মায়ের সন্তান, অর্থাৎ ভারত মায়ের সন্তান তখন গ্রামবাসীরা বিস্মিত হয়ে যায়—

“সে মাতা নয় বহিনজী, ভারতমাতা।

—সে আবার কে?

—আমাদের দেশ, ভারতবর্ষ।

—এটা আমাদের দেশ?

—নিশ্চয়।

—ও সাধুজী, আমাদের ঘর তো সেওরা গ্রাম। দেশ কাকে বল? তশীল জানি, থানা জানি, দেশ তো জানি না। দেশ তো ভারত নয়।

—আরে, তোমরা সবাই স্বাধীন ভারতবর্ষের আজাদী মানুষ, বুঝেছ?

—না সাধুজী।”[৩]

এভাবে মহাশ্বেতা দেবী স্বাধীনতাপরবর্তী ভারতের রাষ্ট্রীয় ভ্রান্তি ভেঙে দেন এবং দেখিয়ে দেন যাদের জন্য স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে স্বাধীনতা কখনও বাস্তব রূপ পায়নি। দৌলতি আখ্যানটি আদিবাসী শোষণের সঙ্গে স্বাধীনতাপরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি সম্পর্ক স্থাপন করে যেখানে রাজনৈতিকভাবে তারা মুক্ত হলেও বাস্তবে তার রুপায়ন ঘটে না। বনো নাগেশিয়া মুনাবরের দাপট থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করতে পারলেও শহরে গিয়ে উপার্জিত টাকায় সে যখন বাড়ি নির্মাণ করে, তখন মুনাবরের লোকেরা সেই বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। তাকে মারধর করা হয় এবং অন্যদের মতো ঋণ নিতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে সে দাসপ্রথার শিকার হয়ে পড়ে। এভাবে একে একে প্রতিটি মানুষকে বন্ধকী দাসপ্রথার জালে ফেলে দেওয়া হয়। নিজেদের জমি ও বনভূমি থেকে উৎখাত হয়ে আদিবাসীরা শহরে সস্তা শ্রমিক হিসেবে কুলির কাজ করতে বাধ্য হয়। কর্মক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের শোষণের শিকার হয়। সেখানে সরকার, ঠিকাদার, দোকানদার ও বস্তির মালিক সবাই একে অপরের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্রমিক ঠকায়। সপ্তাহের শেষে নানা অজুহাতে শ্রমিকদের মজুরি কেটে নেওয়া হয়। কয়লাখনিতে কাজ করা শ্রমিকদের ওপর যে অমানবিক অত্যাচার চলে তার পরিচয় বনো-র থেকে পাওয়া যায় “ইউনাইন কোন সুরাহা করে না। সরকারী অফিসারকে বল, তো সে হাসবে। বস্তিমালিক ঘর ভাড়া কেটে নেবে। বাজারিয়া দোকানিয়া লোক ভুখা লাকড়ার মতো ছোঁ মারবে। গরহিসাবে হিসাব বুঝে নেবে। কুলির রক্ত সবাই শুষে খায়।”[৪]

একই সঙ্গে মুনাবরের মতো শোষক শ্রেণির মানুষ জাতিভেদকে ঈশ্বরপ্রদত্ত নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মুনাবর তার ছেলেকে বলে জাতিভেদ ঈশ্বরের নিয়ম। সে যুক্তি দেয়, “জাতপাত ভেদাভেদ তো নিয়ম! রামরঘুবরের নাম করছেন, তিনি কি শম্বুককে মারেন নি?

শম্বুক ছিল শূদ্র। তাকে তো মারলেন। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ছুয়াছুত-সব ভগবানের নিয়ম।"[৫] এই ধরনের বিশ্বাস শোষক শ্রেণি কৌশলে গোনোরি/গরিব আদিবাসীদের মনেও ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে আদিবাসীরা মনে করতে শুরু করে যে তাদের দুর্ভাগ্য দেবতানির্ধারিত, এবং ভাগ্যদেবতা যেন মাটিতে নেমে এসে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে।

> "কামিয়া বনে যাওয়াটা সেদিন গনোরির কাছে বিশেষ কোন দুর্ভাগ্য বলে মনে হয় নি। জন্ম থেকেই সে কামিয়া দেখছে'চার ধারে। কামিয়া হয়ে যাওয়া বিধির বিধান। বিধাতাপুরুষ নেড়া-মাথা বামুন সেজে নবজাতকের ললাটলিপি লিখতে আসেন। তিনি যা লিখে দিয়ে যান, কেউ সে লিপি এড়াতে পারে না।
>
> নাগেসিয়ারা এ কথা ভালো করেই জানে যে, একটি নাগেসিয়া শিশুর বয়স যেদিন ছয়দিন হবে, সেদিন আকাশ থেকে বিধাতাপুরুষ ঝুলিয়ে দেবে একটি হলুদরঙা হলুদে ছোপানো সুতো। সেই সুতো ধরে বিধাতাপুরুষ নেমে আসবে পৃথিবীতে। চেহারাটা হবে একটা নেড়া-মাথা বামুনের মতন।
>
> নাগেসিয়ার শিশু আর মা যে ঘরে, সেই ঝোপড়িতে সে ঢুকবেই না কোন মতে। ঝোপড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে খেরো খাতায় মোটা কলমে কায়েথি হিন্দীতে সে লিখে দেয়, যেমন জনম নিয়েছ, তেমন জীবন কাটাবে। ঝোপড়ি ছাড়া ভালো ঘর কখনো বানাবে না।"[৬]

এই মানসিকতার সুযোগ নিয়েই শোষণ আরও গভীর হয়। গোনোরি নাগেশিয়া যখন দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে থাকে, তখন একজন ব্রাহ্মণ গোনোরির কন্যার কাছে গিয়ে খাবার ও কাপড় দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। গোনোরি ফিরে আসার পর ব্রাহ্মণ পরমানন্দ জমিদারের কাছে গনোরির সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে এবং তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, যদিও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেয় না। বিনিময়ে সে দৌলতিকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। গোনোরি এই বিনিময় মেনে নেয়। যদিও সে সন্দিহান ছিল, তবু দারিদ্র্য তার কাছে অন্য কোনো উপায় রাখেনি। বন্ধকী ঋণগ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করে কন্যাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যাওয়াই পরমানন্দের ব্যবসা।

এই শোষণের চরম ও নিষ্ঠুর রূপ দেখা যায় বৈজনাথের চরিত্রে। শোষণের ক্ষেত্রে বৈজনাথ অত্যন্ত নির্মম। একেবারে শুকিয়ে যাওয়া দরিদ্র পতিতাকেও সে ছাড়তে চায় না। তার লক্ষ্য একটাই যতটা সম্ভব বেশি টাকা উপার্জন করা। তাই সে রামপিয়ারিকে প্রশ্ন করে, কে কতজন খদ্দের নিচ্ছে, কেন খদ্দেরের সংখ্যা বাড়ছে না। তার মাথায় সর্বক্ষণ ব্যবসা বাড়ানোর হিসাবই ঘোরে। পতিতালয়ের নারীদের প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটার হিসাব অনুযায়ী খদ্দের নিতে বাধ্য করা হয়। তাদের শরীর নিঃশেষ হয়ে গেলেও কাজ থামে না। বৈজনাথ নির্দ্বিধায় বলে "গ্রামে হাটতলায়,

ভাটিখানার পাশে ওদের ঘর তুলে দিলাম। বারো আনা, আট আনায় গাহক টানুক।"[৭] এই দেহব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতি মাসে নতুন মেয়েদের আনা হয়। বৈজনাথ এই ব্যবসায় শিশুদেরও কোনো রেহাই দেয় না। রাস্তা নির্মাণ, খনি, বড় বড় প্রকল্পের কাজ, ঠিকাদার ও দালালদের ভিড় সব মিলিয়ে মেয়েদের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলে।

প্রসঙ্গত বলাচলে মানবপাচার একটি ভয়াবহ বৈশ্বিক সমস্যা। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী পূর্ব এশিয়ার পর দক্ষিণ এশিয়া মানবপাচারের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ এর শিকার হয় মূলত যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে। বড় বড় শহরে এই পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। বিভিন্ন শহরের আশপাশে এমন সব বাজার গড়ে উঠেছে, যেখানে নারী ও কিশোরীদের গবাদিপশুর মতো কেনাবেচা করা হয়। দৌলতির মতো কুমারী মেয়েদের এখানে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়; পরমানন্দের মতো দালালরা তাদের লাঠিয়া সিংজি প্রমুখ খদ্দেরদের কাছে সরবরাহ করে। ১৯৮৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর, বর্তমান পত্রিকার প্রতিবেদনের অনুযায়ী, বিহারের ছোটনাগপুর থেকে ৮টি জেলার প্রায় ১০ হাজার আদিবাসী নারীর নিখোঁজের কথা বলা হয়েছে, যাদের পতিতা বৃত্তিতে বিক্রি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

গোনোরি কামিয়া ছিল, তাকে ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে শারীরিক শ্রম দিয়ে। অন্যদিকে দৌলতিকে ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে নিজের শরীর দিয়ে। একদিকে মহাজনের জমির ওপর অধিকার, অন্যদিকে পরমানন্দের নারীর দেহের ওপর অধিকার এখানে জমি ও নারীদেহ দুটি অধিকার রূপে এক জায়গায় এসে মিলে যায়। রামপিয়ারির গান, যৌনকর্মীদের গান নারী ও জমির সম্পর্ককে উন্মোচিত করে

"মালিক এদের জমি বানিয়ে নিয়েছে
গরীবের জমি চাষ চষে ফসল তোলে মালিক
ওরা সবাই পরমানন্দের কামিয়া।।"[৮]

সমাজ চিরকাল নারী ও প্রকৃতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে, আর এই ধারণা থেকেই মহিলাদের উপর পিতৃতান্ত্রিক দমন এবং প্রকৃতির শোষণের জন্ম হয়েছে। নারী ও প্রকৃতিকে ত্যাগ ও মাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়; আর এই ভাবনা থেকেই পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায়। এই প্রেক্ষিতেই দৌলতির মর্মান্তিক মৃত্যু গভীর অর্থ বহন করে, কারণ তার মৃত্যু ঘটে স্বাধীনতার দিনে। ১৫ই আগস্ট অঙ্কিত পতাকা জুড়ে দৌলতির দেহ দৌলতি সারা ভারতে ছড়িয়ে —

"আসমুদ্র হিমাচল ভারত-উপদ্বীপের সবটুকু জুড়ে হাত-পা চিতিয়ে পড়ে আছে বনডেড লেবার, কামিয়া-রেন্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতিত, যৌনব্যাধিগলিত

শব ঝাঁঝরা ফুসফুসের সবটুকু রক্ত বমি করে।
আজ, পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা পতাকাদণ্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহনদের ভারতবর্ষে রাখে নি। মোহন এখন কী করবে? ভারত জোড়া হয়ে দৌলতি।"[৯]

এখানে মহাশ্বেতা দেবী ভারতের মানচিত্রের ওপর এক যৌনকর্মীর দেহ লুটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নারী শোষণের বিরুদ্ধে নিন্দা জানান। যতদিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্য না ঘুচছে, ততদিন বাস্তব স্বাধীনতা অসম্ভব। লেখক এর মাধ্যমে মানুষকে স্বস্তির ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে নির্মম বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোর বার্তা দেন। একই সঙ্গে তিনি দেখিয়ে দেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত সমাজের অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তার সুফলও প্রধানত তারাই ভোগ করেছে। ফলে দেশের বৃহত্তর অংশ আগের মতোই উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা শোষিত হয়ে এসেছে, আর এই শোষণের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে আদিবাসী নারীরা।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো প্রান্তিক মানুষ, বিশেষভাবে নারীরা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীরা পুরুষের তুলনায় মানসিকভাবে অধিক শক্তিশালী, কিন্তু প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যের কারণে তারা পুরুষের যৌন লালসার শিকার হয়। তাদের শরীরকে পণ্যের মতো ব্যবহার করা হয়। এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak' -এ লেখেন নারী এমনিতেই প্রান্তিক, আর যারা সমাজের একেবারে প্রান্তে অবস্থান করে, সেই সব নারীরা শোষণের ভাষা বুঝতে পারে না, নিজের কথা বলতেও পারে না। ফলে নারী এখানে দ্বিগুণভাবে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে।

উপন্যাসে দেখা যায় সমাজসংস্কার বা কল্যাণমূলক উদ্যোগ শুরু করা অনেক ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং ধীরে ধীরে নিজেদের সরিয়ে নেয়। তারা প্রকৃত কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না, দৌলতিকেও রক্ষা করতে সক্ষম হয়না। মোহন প্রসাদ বিশ্বাস করত যে আইনের মাধ্যমে বন্ধকী দাসপ্রথার অবসান ঘটানো সম্ভব। ফাদার বামফুলার-এর মতো মানুষরাও পালামৌ জেলায় বন্ধকী শ্রমের পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল, তাদের লক্ষ্য ছিল এই দাসপ্রথা বিলোপের জন্য মামলা করা। কিন্তু দৌলতির মৃত্যু মোহনের মতো মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। দৌলতির মৃতদেহ তাদের সামনে নির্মম বাস্তবতাকে নগ্নভাবে তুলে ধরে এবং সমাজসংস্কারের দাবিকে এক কঠোর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

আদিবাসী নিম্নতলার মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল দাসত্বের মালিকানা বদল এক জমিদারের হাত থেকে অন্য জমিদারের হাতে যাওয়া। এতে তাদের দুঃখ-কষ্টের প্রকৃত

পরিবর্তন ঘটে না। ফলত স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই শব্দগুলো বাস্তবে নয়, কেবল কাগজে-কলমেই রয়ে যায়। এই শোষণব্যবস্থার নির্মম বাস্তবতা দৌলতির জীবনের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাত্র ৩০০ টাকার বিনিময়ে দৌলতি ঋণদাসত্বে আবদ্ধ হলেও আট বছরে সে প্রায় ৪০ হাজার টাকা উপার্জন করে, যার অধিকাংশই চলে যায় দালাল ও শোষকদের হাতে। তার শরীর, শ্রম ও জীবনকে পণ্যে পরিণত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বিপুল মুনাফা অর্জন করে, অথচ দৌলতির ভাগ্যে জোটে না মুক্তি কিংবা মানবিক মর্যাদা।

দৌলতির মৃত্যু প্রতীকী; তার রক্ত যেন সমগ্র ভারতের মানচিত্রকে রাঙিয়ে দেয়। দৌলতি দরিদ্র এবং দরিদ্রতম ভারতের মানুষের প্রতিনিধি। তাই স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতা দিবসে তার মৃত্যু আমাদের বিবেকের ওপর যেন এক কালিমা। দৌলতি তার রক্ত দিয়ে ভারতের মানচিত্রে লিখে যায় আদিবাসী শোষণের নির্মম সত্য। দৌলতি হয়ে ওঠে গোটা দেশের বঞ্চিত মানুষের এক শক্তিশালী রূপক। সে প্রতিনিধিত্ব করে সেই অগণিত প্রান্তিক মানুষদের, যাদের কণ্ঠস্বর কখনও শোনা যায় না, যাদের অধিকার বরাবরই উপেক্ষিত। একই সঙ্গে সে প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় লালবাতি এলাকায় বন্দি থাকা হাজার হাজার দৌলতির যারা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্ন তো দেখেছে, কিন্তু বাস্তবে শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। প্রশ্ন থেকে যায় এই দৌলতিরা কি কখনও মুক্ত হবে? না কি দৌলতির মতোই তারা নীরবে, অজান্তেই ঝরে পড়বে?

**তথ্যসূত্র:**


১। Foucault– Michel. The Foucault Reader. Edited by Paul Rabinow– Penguin Books– 1991. Page-173. https--share.google-zxPfJMcbO4kBfjLkZ Accessed on 27-12-2025

২। দেবী, মহাশ্বেতা. দৌলতি. নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৭৩. জুন, ১৯৬৫। পৃষ্ঠা-২৭ https--share.googleùin5lexRA5W5Qt8j9r

৩। তদেব, পৃ. ৪০

৪। তদেব, পৃ. ১৭

৫। তদেব, পৃ. ৩৮

৬। তদেব, পৃ. ১২-১৩

৭। তদেব, পৃ. ৯৬

৮। তদেব, পৃ. ৬৭

৯। তদেব, পৃ. ১১৬

**সহায়ক গ্রন্থ ও আন্তর্জালিক লিঙ্ক :**

১। শর্মা, রাম শরণ. ভারতের সামন্ততন্ত্র. কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা. ডিসেম্বর ১৯৭৭। https://share.google/km1UsrXy0bMc2oyYC

২। Chakravorty Spivak, Gayatri. Can the Subaltern Speak? https://share.google/mg0yPfrLMlAuBYzBC Accessed on 7-01-2026

৩। Mishra, Shipra. Tragic Tale of Suffering Humanity: Douloti the Bountiful. International Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST), vol. 9, no. 5, Sept.-Oct. 2022, pp. 348-354, https://doi.org/10.32628/IJSRST229552. Accessed on 12-01-2026

৪। https://share.google/pYqxr8FbY1rdvq7oK Accessed on 30-12-2025

৫। https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/South_Asia.pdf Accessed on 15-01-2026

মৌসুমী সাহা

## প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ বীরসা মুন্ডা : "অরণ্যের অধিকার"

লেখক হিসাবে সামাজিক মানুষ হিসাবে এবং একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী মুন্ডা সমাজের কথা বলেছেন "অরণ্যের অধিকার" উপন্যাসে। গ্রামসমাজের আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্মুক্ত করে দেখানোই যে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, এক মুন্ডা যুবকের নেতৃত্বে প্রতিবাদী আদিবাসীদের সংগ্রামমুখর জীবনের কাহিনী ও তাদের উত্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে তার মনে যে বেদনাবোধের সঞ্চার হয়েছে তারই ফলশ্রুতি "অরণ্যের অধিকার" উপন্যাসটি। "বেতারজগত" পত্রিকায় ১৯৭৫ এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর১৯৭৭- এ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় সুরেশ সিংয়ের "Dust Storm and Hanging Mist" গ্রন্থের প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন লেখিকা এবং অন্বেষণ করেছেন ইতিহাসের দলিল জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি যা তার জীবনবোধের পরিচয় বহন করে।

৯ ই জুন ১৯০০। রাচি জেলে অজ্ঞান হয়ে যায় বীরসা। সুগানা মুন্ডার ছেলে বীরসা "ক্রিমিনাল" হিসাবে অভিযুক্ত হয়ে ধরা পড়েছিল। সরল বীরসা স্বপ্ন দেখেছিল "ভাতের"। মেয়েটা ভাত রান্না করছিল আর নীল আকাশে ধোঁয়া উঠছিল। লোকগুলো ধোঁয়া দেখতে পেয়ে খবর দেয় পুলিশে। এরপর হাতে হাতকড়া পড়ে বীরসার।মুন্ডারা সবাই কাঁদছিল, মেয়েরা বুক চাপড়াচ্ছিল।আসলে বীরসা বিপদের হাত থেকে অরণ্যের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল।

অরণ্য মুন্ডা দের মা যাকে দিকুরা "অপবিত্র" করে রেখেছিল উলগুলান এর আগুন জ্বেলে বীরসা শুদ্ধ করে নিতে চেয়েছিল তার জননীকে তারপর মুন্ডা আর হো, কোল আর সাঁওতাল, ওঁরাও যাদের অরণ্যের অধিকার আছে তাদের ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল "জননীর কোলে", তবে সাঁওতালদের "হুল" বা সর্দারদের মুলুকই লড়াই নয়,বীরসা ডাক দিয়েছিল মহাবিদ্রোহের। এরপর জেল হাজতে বিনা বিচারে আটক বন্দী বীরসা সহসা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কিভাবে মারা গেল তা এক রহস্য। কোনো মুন্ডা তার সৎকার দেখতে পেল না। শুধুমাত্র বৃদ্ধ ধানী বসে রইল স্থির হয়ে। বহুদিন ধরে লড়াই করেছে সে, ও জানে উলগুলানের শেষ হয় না ভগবান মরে না মায়ের কোলে।

বীরসার সংগ্রাম শুধু ইতিহাস নয় মানব বিশ্বের আখ্যান। ব্রিটিশরাজকে অস্বীকার করে মুন্ডা সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে তার আন্দোলনের সূত্রপাত। চাইবাসার জার্মান স্কুলে ছাত্র জীবনে পড়াশোনা ও পরবর্তীকালে রোমান- ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর যখন তার বিশ্বাসে আঘাত লাগে তখন থেকে শুরু হয় তার সংগ্রামী জীবনের আরেক

অধ্যায়। মূলত আশ্রয় ও জীবিকার প্রশ্নে মুণ্ডারা যে আন্দোলন শুরু করেছিল তাকে একটি বিশেষ রূপ দিতে চেয়েছিল বীরসা। ধর্মের জটিলতাকে অস্বীকার করে এগিয়ে গিয়েছিল এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে। ঘর সংসারের প্রতি তার খুব একটা আসক্তি ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে মিশনের উপর মুন্ডাদের ভরসা শুকিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৮৭ থেকে ৮৮ সালের মধ্যে মুন্ডা সর্দারদের সঙ্গে মিশনের বাক বিতান্ডার পরিণামে তাদের প্রতি বীরসার সমস্ত বিশ্বাস তছনছ হয়ে যায়, মিশন থেকে বিতাড়িত হয় বীরসা।তার দুচোখ জ্বলতে থাকে, রাগে পাথর হয়ে সে বলে "সাহেব সাহেব এক টোপি। সরকার যা মিশন তা, সব এক সমান"। মুন্ডাদের হয়ে লড়েছে শুধু ব্যারিস্টার জেকব,কলকাতা থেকে এসে কেস লড়েছে। রোকমবা থেকে ধানী মুন্ডা এসে বীরসাকে সাথ দিয়েছে।আন্দোলনের মাধ্যমে বীরসা চেয়েছিল মুন্ডাদের জন্য নতুন এক জগত সৃষ্টি করতে। ১৮৭৮ সালের "জংলাকানুন" অনুযায়ী পালামৌ, মানভূম, সিংভূম অঞ্চল থেকে নিম্নবর্গের মানুষদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেছিল ইংরেজ সরকার। যে জঙ্গলে তারা গাই -ছাগল চড়িয়েছে জঙ্গল থেকে কাঠ- পাতা -মধু এনেছে তা "এক চোক্ষু" আইনের আওতায় চলে আসে।ফলে তারা আর "শিকার খেলতে" পারবে না। জঙ্গলের ভিতর যত গ্রাম আছে সব উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। অরণ্যের অধিকার ছিল কৃষ্ণ ভারতের মানুষের আদি অধিকার, যখন "সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে" নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল,তখন থেকেই কৃষ্ণ ভারতের কালো মানুষেরা জঙ্গলকে তাদের মা বলে জানতো। কিন্তু শহর থেকে সরকার যখন কানুন বানায় তখন তারা কোল- মুন্ডা- ওরাওদের কথা ভাবে না। বীরসা অরণ্যের মানুষের নীরব সংগ্রামকে ভাষা দিতে চেয়েছিল। ভগবান প্রেরিত দূত হিসাবে বীরসা মুন্ডার আবির্ভাব এবং এই ধর্মীয় ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আমুল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল। প্রান্তিক মানুষ গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ও রাজনীতির সূত্রেই, দেশীয় সামন্ত প্রভু বনাম ব্রিটিশ রাজের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুন্ডা সমাজে নিজের "আইডেন্টিটি" প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। মহাজনদের দখল থেকে অরণ্যজননীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পালামৌ, সিংভূম, চক্রধরপুর, ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজ একইভাবে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল। বীরসা অনুভব করেছিল, "ওর অরণ্য জননী কাঁদছে, অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে আইনের হাতে বন্দিনী"।

আরণ্যক সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিয়ে মহাজন, ব্যবসাদার, দিকু, ঠিকাদার সহ যারা ধর্মান্তকরণের জন্য উদগ্রীব সেইসব খ্রিস্টান মিশনারী সম্প্রদায় থেকে সরে এসে নিজ মহিমায় ভগবান প্রেরিত দূত হিসাবে আদিবাসী মানুষের জীবনে এক নতুন অভুত্থান ঘটাতে চেয়েছিল। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখিকা তার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন-'জীবন বিদ্রোহ যা কিছু চলমান তার সত্যতা কোনোকালে কোন দেশে নেতার মৃত্যুতে শেষ হয় না। কালে- কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারা পথে অব্যাহত থাকে তার অগ্রগতি। বিদ্রোহ থেকে

জন্ম নেয় বিপ্লব। সুগানা মুন্ডার পুত্র বীরসার আদিপুরুষেরা প্রথম পর্বে জঙ্গল সংস্কার করে খুটখাট্টি গ্রামের পত্তন ঘটিয়েছিল ও এরপর গড়ে উঠেছিল তিলমা, তামার, উলিহাতু, চালকাড় ইত্যাদি প্রচুর গ্রাম। বীরসার বংশের আদিপুরুষ ছোটনাগপুর গ্রামের পওন ঘটালেও পরবর্তী পর্যায়ে তারাই অধিকারচ্যুত হয়।

লেখিকা জানিয়েছেন-"১৮৩১-৩২ সালের কোন বিদ্রোহের পর সেসব জায়গাতেও জমিদার ও জায়গীরদাররা চলে আসে। এরা রাজা আর আদালতের কাছে দখলের কাগজ বা পাট্টা নিয়ে মুন্ডা গ্রামগুলি অধিকার করতে শুরু করে। ১৮৬৩ সাল অব্দি ইংরেজ সরকার জমিদারদের পুলিশের কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিল ফলে স্বাধীনতা হারালো মুন্ডারা।

সংগ্রামী বীরসার শরীরটাও যেন "ছোটনাগপুরের পৃথিবী" আর রক্ত নদীর তীরে তার আরণ্যক মা, যাকে দেখে বীরসার বুকে জলে দুঃখের আগুন। বীরসা চায় "ধরতির আবা" হয়ে "ধরণীর লাজ" ঢেকে দিতে।সকল মুন্ডাদের জয়উল্লাসে ডুবে গিয়েছিল নাগারার গম্ভীর ঘোষণা ঢেউয়ের নীচে। মুণ্ডারা তীব্র উল্লাসে বলেছিল—"ভগবান হয়েছে গো বীরসা। সকল রোগা- ভুগা বাঁচবে, মরাকে জিয়াবে, ভুখাকে ভাত দিবে।" অন্তহীন অরণ্যের লড়াইয়ে পথপ্রদর্শক ছিল এই বীরসা কারণ ধানিদের মতো মুন্ডা দের জীবনে ঢুকে পড়েছিল জমিদার, মহাজন, মিশনারী, জেল কাছারি, বাঁধানো রাস্তা, রেলগাড়ি, বেয়নেট, বন্দুক, খরা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, আড়কাঠি, বেঠবেগারী ইত্যাদি। জন্মসূত্রে পাওয়া জমি,জঙ্গল, পাহাড় থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল মুন্ডারি সমাজ। তাদের জীবনটা যেন হয়ে গিয়েছিল কংসের কারাগার। শুধু তাদের ক্ষেত্রে নয়, সাঁওতালদের জীবনেও ঘটে গেছে একই ঘটনা। এরপর শুরু হয়ে যায় লড়াই। মহাজনেরা তাদের থেকে বুড়ো আঙ্গুলের সই নিয়েছিল। মুণ্ডারা শয়ে- শয়ে গ্রাম ছেড়ে দিয়েছিল দিকুদের হাতে। পরবর্তীকালে মুন্ডারা ভোজপুরি মহাজনদের কবলে পড়ে হয়ে যায় দিশেহারা। ওদের নতুন বাসস্থান গড়ে ওঠে চালকোড়েতে।এরপর বীরসার বাবা সুগানা হলো কিরিশচান সুগানা মাসিদাস। বীরসা হল দাউদ মুন্ডা বা দাউদ বীরসা। বীরসার মা বলতো -"সংসারটা হয়ে গেল ছেঁড়া কানির মত। একদিকে সিয়াই, ওদিকে ছেড়ে। সব ছেড়া কোনদিন জুড়তে পারবো না"। বীরসার দাদা বলতো, বড় হলে হাট থেকে ও "এক বস্তা নুন নিয়ে আসবে যার যত খুশি হাত ডুবিয়ে তুলে নিয়ে ঘাটোয় মিশিয়ে খাবে"। সে বলতো, "আজাদ হতে হবে। সকল বিদেশী তাড়াবো। কারেও কোন খাজনা দিবো না। জীবনের যন্ত্রণাময় মুহূর্তগুলো বীরসার জীবনকে ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তুলেছিল। লেখিকা জানিয়েছেন, ভাত তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে-মুণডাদের জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে আর ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুন্ডারা খেতে পছন্দ করে। বীরসা একজন স্বাধীনতাকামী নেতা ছিল। নির্যাতিত, অপমানিত মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সে বলেছিল, "লড়াইয়ের পথে কাটা অনেক, দুঃখ আরও বেশি। হয়তো বা সংসার ছাড়তে হবে উপোসে মরতে হবে, জেলে রইতে হবে কিছু আনো পথ নাই।"

বীরসা ছিল মুন্ডা সমাজের মুখপাত্র বা যোগ্য নেতা। মুন্ডারা যখন শোষিত হয়েছিল, বেঠবেগারী দিয়েছিল, সেবকপাটটা লিখেছিল, খুৎকাট্টি গ্রাম হারাচ্ছিল কিম্বা জমিদার-মহাজন- সরকার তিন হাতেই মার খাচ্ছিল, তখন তাদের কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু নিপীড়িত মুন্ডাদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কোন কোন বিশ্বাসঘাতক তার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে চায়, ধরা পড়ে বীরসা। কিন্তু ভয় কাকে বলে সে জানে না। চীৎকার করে বলে—"শুনহে মুন্ডারা। ধরতি আবা আমি, ...সকল হাতিয়ার তোমাদের দিয়াছি, বুকে সাহস দিয়েছি, চিনায়ে দিয়াছি কে তোমাদের দুশমন। সে হাতিয়ার তোমরা সঁপে দিও না। একদিন তোমরাই জিতবে"। ওয়ার্ডার বীরসার বাক রুদ্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু বীরসার মতো মানুষদের সংগ্রাম শেষ হয়না কখনো। বীরসার কণ্ঠ জ্বলে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, নাড়ী থেকে রক্ত নেমে যায়। যন্ত্রণার্ত, বিভ্রান্ত বীরসা জানায়, "মুন্ডাদের লয়ে, দেশের মাটি লয়ে আমি ছিনা মিনা করব। দুশমনেরে আমি ছোটনাগপুরের বাহান্ন পরগনা হতে খেদাবো"।

প্রান্তিক মানুষ বীরসা মুন্ডার জীবন সংগ্রাম এক অস্থির সময়ের দলিল। বীরসার মত মানুষের মৃত্যুতে সংগ্রাম কখনও শেষ হয়ে যায় না। ভারতবর্ষের সভ্য জনপ্রবাহ থেকে উৎখাত হওয়া নিম্ন বর্ণের জনজাতি তথা অত্যাচারিত আদিম প্রান্তিক মানুষদের অসহনীয় জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেই ঐতিহাসিক জীবন সত্যকে খুঁজে ফিরেছেন লেখিকা। ১৯ শতকের ঘটনা প্রবাহ অবলম্বনে সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী সমাজ সত্য এড়িয়ে যেতে চাননি বীরসার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার কথক স্বর প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে—"তুমি কে? তুমি কি সময়ের আগে জন্মেছিলে, না, সময়- ই তোমাকে সৃষ্টি করেছে? তোমার আন্দোলন কি? মুন্ডারা কি অরণ্যের অধিকার পাবে? খুৎকাটি গ্রামে তাদের জন্মাধিকার স্বীকৃত হবে? তাদের জীবন থেকে মহাজন-বেনে-জোতদার -জমিদার- হাকিম- আমলা- থানা-বেঠবেগারীর পাষাণ ভার নেমে যাবে? যতদিন না যাবে ততদিন কি তুমি মরতে পারো'? বীরসা মুন্ডাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ভগবান হয়েছে। প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে গিয়ে পরিণত হয়েছে দেশদ্রোহীতে।পরিকল্পিতভাবে পুলিশের হাতে মৃত্যু হয়েছে বীরসার। মুন্ডা সমাজের প্রতি প্রশাসনের ন্যায়পরায়ণতার অভাব মুদ্রিত হয়ে আছে ইতিহাসে। জেরায় জেরবার হয়ে মুন্ডরা বলেছে—"মোদের আদি অধিকার চেয়াছি, মোরা কুন দুযে দোষী নয় হে"!

বীরসার স্বপ্ন সফল হয়নি। মুন্ডা সমাজে সে হয়ে উঠেছে এক কিংবদন্তী পুরুষ। কিন্তু তার মত মানুষের পরাজয়ে সংগ্রাম কখনো শেষ হয়ে যায় না। উপেক্ষিত প্রান্তিক মানুষের

প্রতিনিধি হিসাবে বীরসার আত্মত্যাগের ও প্রতিবাদের কাহিনী ও মুন্ডা সমাজের সংগ্রাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।

**তথ্যসূত্র :**

১। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র -৮ দেজ পাবলিশিং

২। মহাশ্বেতা দেবী, এক জীবনেই স্মৃতিকথা সংগ্রহ-দেজ পাবলিশিং

মিঠু রায়

## অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে (নির্বাচিত) ভিন রাজ্যের প্রেক্ষাপট ও সমাজ বাস্তবতা

সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী একজন কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আমলা। কর্মসূত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বিশেষ করে পূর্ব ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন স্থান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সামাজিক প্রেক্ষাপট, অঞ্চলভেদে নানান ভাষাভাষী অচেনা অজানা মানুষের বাস্তব চিত্র। উচ্চপদস্থ আমলা হওয়ার দরুন তিনি যেমন খুব কাছ থেকে দেখেছেন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়, তেমন তাঁর হাতে সম্প্রসারিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের সীমানা। তাঁর উপন্যাসে সারা ভারতবর্ষের বাস্তব চিত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের বাস্তব প্রেক্ষাপটও উঠে এসেছে। আবার ছোট গল্পে এসেছে বহির্বঙ্গের প্রেক্ষাপট।অনিতা অগ্নিহোত্রী সারা জীবন মানুষের সেবায় রত ছিলেন। সত্যিকারের মানুষের ও তাদের জীবন অনুসন্ধানে রত তাঁর মনন। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানান শ্রেণীর মানুষের কথা রয়েছে তার গল্পে। প্রকৃতিপ্রেমী মননে প্রকৃতিকে যেমন দেখেছেন, তেমনি সন্ধান করেছেন মানবাত্মা। তাই তাঁর লেখায় ধরা দিয়েছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জঘন্য রাজনীতি, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক কদর্যতা, পুঁজিবাদের আগ্রাসন, প্রকৃতি নিধনযজ্ঞ, আদিবাসীদের সমূলে বিনাশ ইত্যাদি।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সংহত রূপ বিভিন্ন গল্পে বাণীরূপ লাভ করেছে। 'অংশুঘাত' গল্পটির প্রেক্ষাপট উড়িষ্যা রাজ্যের বরাগড় ও কালাহান্ডির প্রত্যন্ত গ্রাম ফুলাপালি খহরপদর।গল্পের নায়ক স্বদেশ। এখানে এক দিকে তাঁত শিল্পীদের জীবন জীবিকা অন্যদিকে প্রকৃতির মার, খরা ও শীত হাত ধরা ধরি করে এসেছে। শীতে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রিতে নেমে যায়, আর গ্রীষ্মে পঞ্চাশ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে। স্বভাবতই অংশুঘাতে মারা যায় মানুষ। সকাল দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত মানুষ বাইরে বেরোয় না। কিন্তু দিন আনা খেটে খাওয়া মানুষ নিরুপায়, অসহায়। অন্যদিকে আঞ্চলিক অফিসের তিরিশ জন স্টাফ তাদের সমস্যার সমাধান না হলে আগুনে আত্মাহুতির হুঁশিয়ারি দেয়। তাদের অভিযোগ এখানে কোন বদলি হয় না। অংশুঘাতে মারা গেলে তার পরিবার চাকরি পায় না, পেনশন পায় না। অফিসের বস নেই। বসের নামে টাকা তছরূপের মামলা চলছে। একমাত্র টেলিফোনটির বিল না দেওয়ায় সেটিও কেটে দিয়ে গেছে। এই রকমই চরম দুরবস্থা তাদের। সেই চরম প্রতিকূলতায় রাজনৈতিক টানা পোড়নে ধর্মঘটি কর্মচারীদের শান্ত করতে বলির পাঁঠা হয়ে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে স্বদেশের আগমন। গ্রীষ্মের দাবদাহ নিজে অনুভব করে। নিচু তলার কর্মীদের দুরবস্থা দেখে অফিসের অ্যাসবেস্টস এর তলায় কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে স্বদেশ

মর্মে মর্মে অনুভব করে সেই মানুষ গুলোর কষ্ট। পুলিশ তাকে পাথরের মুখোশ পরে থাকার কথা বললেও স্বদেশের বিবেক সায় দেয়নি। কারণ অফিসের অবস্থা— "এ যেন অবসাদগ্রস্ত রোগীর ঘর। যতদিন বাঁচবে, নিজের চারপাশে কোন কিছু ঠাঁইনাড়া না করে বাঁচবে। স্থির পড়ে থাকবে, যাতে মৃত্যুর ক্রম। অগ্রসরমান জল অনিবার্য ভাবে এসে গ্রাস করে নেয় জীবনটাকে"।[১] অগ্নিকুণ্ডে কয়েক ঘণ্টা কাটানোর পর স্বদেশের যেন ভিতর থেকে তালু শুকিয়ে যায়। তাঁর শরীর আর নিতে পারেনা "যদি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় তার হৃদযন্ত্র। বুজে আসে আর্দ্র বাতাসে অভ্যস্ত ফুসফুস, অথবা নষ্ট হয়ে যায় তাঁর কিডনি- পরিবার বেঘোরে ভেসে যাবে। মানবাধিকারের জন্য তো শহিদ হওয়া মুশকিল"।[২]

স্বদেশের সহানুভূতিশীল হৃদয় বিবেক হারিয়ে যায়। এই বেঁচে ফেরা স্বদেশ আর কখনো ওই গ্রামে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে না। কোন অফিসারই আর স্বেচ্ছায় সেখানে ফিরে যাবে না। আসলে লেখিকা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কোন সরকার'ই নিচু তলার কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা ভাবেনা। এই অংশুঘাত গল্পে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন প্রান্তিক বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করতে গেলে একেবারে তৃণমূল স্তরের উন্নতি প্রয়োজন। যা আমরা কখনোই পেরে উঠিনি।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসের ছবি বারবার ধরা পড়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসীদের উপর ঘটে যাওয়া সমাজ-রাজনীতির ছায়া পড়েছে 'ছায়া যুদ্ধ' গল্পে। এটি ২০০৭ সালের 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত হয়। সরকার জোর করে আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ করে। কিন্তু সবাই টাকা পায় না। সরকার সেই জমি তুলে দেয় কোম্পানির হাতে। বছরের প্রথম দিনে কোম্পানি তাদের মতো করে প্রাচীর তুলতে এলে শ-পাঁচেক মানুষ ইঁটপাটকেল নিয়ে তেড়ে আসে। সামনে এক হাবিলদার পড়ে গেলে টাঙ্গি আর বল্লমে ফালাফালা করে একদল মানুষ। তাঁরপরেই পুলিশ রাউন্ডের পর রাউন্ড গুলি চালায়।মারা যায় বার জন। তিরিশ জন আহত হয়ে হাসপাতালে। তারপরেই সরকার- কোম্পানী- পুলিশ- জনতার শুরু হয় নাটকীয় রাজনীতি। নির্মমতা চরমে পৌঁছায় যখন গুলিতে মানুষ মারা যাওয়ার পরেও ছ-সাতটা লাশের কনুই থেকে হাতের পাতা পর্যন্ত কেটে নেয়। "মৃত্যুর পর এই উদাসীন অনাচারের খবরে আরও একবার উথলে উঠে মানুষের ক্ষোভ, শোক, রাগ। গুলিতে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াল মৃত মানুষের প্রতি এই অসম্মান।"[৩] আদিবাসী মানেই জঙ্গলে যাদের অধিকার, সেই জঙ্গল আজ বিলুপ্তির পথে। যেখানে তারা বনের ফলমূল, শিকড়, মধু, কাঠ, কুটো নিয়েই জীবন ধারণ করত। সেখানে কাঠের চোরা কারবারিরা জঙ্গলকে আজ শহরের এক কোনায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এখানকার ধরিত্রী পুত্ররা নিঃস্ব হয়ে আজ ইঁটভাটায় দিনমজুর।সামান্য উঁচু-নিচু টাঁড় জমি,কাঁটা বাবলা, খেজুরের ঝোপ নিয়ে এক একটা ক্ষেত- যেটা তাদের একমাত্র ভরসার জায়গা ছিল, সেই জমি এখন কোম্পানির হাতে।

লেখিকা দেখিয়েছেন কিভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় মানুষের উত্তাপ। রাজনীতি কিভাবে ধামাচাপা দেয় এইরকম গণহত্যাকে। খবরের কাগজে প্রথম প্রথম লম্বা চওড়া রিপোর্টিং হলেও চার-পাঁচ মাসের মাথায় তা নিখোঁজ হয়ে যায়। বিধানসভায় ফাল্গুনী অধিবেশনে বিরোধীরা গলা ফাটালেও শেষে নিস্তেজ হয়ে যায়। কমিশন সাক্ষ্য, জেরা, সমন জারি করে শেষে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। কে দোষী, কার প্ররোচনায় পাথর ছোঁড়া হলো, কিভাবে মানুষ মারার দিকে এগোল তার চুল চেরা বিশ্লেষণ করতে করতে কমিশন দীর্ঘ হতে থাকে। শহীদ বেদীতে প্রথম প্রথম তাজা ফুল পড়লেও তা শুকিয়ে যায়। সরকারের ক্ষতিপূরণ তারা অস্বীকার করে। শুরু হয় মান ভাঙানোর পালা। দালালদের আনাগোনা। শেষে না নেওয়াটাও যেন পাবলিকের গা-সওয়া হয়ে গেল। উন্মত্ত জনতার পথ অবরোধ বিফল হল বিকল্প পথ থাকায়। যারা নির্বিবাদে শীত-বর্ষা-গ্রীষ্ম-বসন্ত বসেছিল, সেটা তাদের অহংকার হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু একসময় নীরবতাই স্মৃতি নষ্টের মূল। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। "এইসব পাগলামি নিয়ে আমরা কোন আলোচনা বা বাক্য ব্যয় করব না, এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই সরকার জিতে গেল। জিতে গেল মানে, প্রসঙ্গটা জনসমক্ষে এলই না আর। শিক্ষিত লোকেরা যা নিয়ে আলোচনা করে না, সেটাতো আর ইস্যু থাকেনা।"[৪] এই গল্পের মূল আকর্ষণ ঋত্বিক ও তিথির দাম্পত্য সম্পর্কের টানা পোড়েন। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছিল। তা সময়ের সাথে সাথে মিলিয়ে গেল। শুরু হলো হাসি ঠাট্টা। চোখে চোখে প্রেমের বন্ধন। তিথি সরকারি কর্মচারী না হয়ে, হয়ে উঠেছিল অত্যাচারী রাষ্ট্রের খুনি পুলিশের স্ত্রী, রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্রের শরিক। এই বাস্তব সমাজ চিত্রের মধ্যেই ফুটে ওঠে রাজনৈতিক,সামাজিক-সচেতনতা, নারীর নীরব সহনশীলতা, অপরাধবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, স্মৃতি ও আতঙ্কের লড়াই।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়ে হৃদি। মা নয়ন ও তাঁর সম্পর্কের মধ্যে কাহিনী এগিয়ে গেছে। যেখানে উঠে এসেছে সরকার ও আদিবাসীদের জমি দখলের লড়াই। এই গল্পের প্রেক্ষাপট উড়িষ্যা রাজ্যের জনকপুর এলাকার। ছায়া যুদ্ধ গল্পের মত এই গল্পে উঠে এসেছে আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় শোষণের কথা। সিনেমার ভায়োলেন্স দেখে যার বুক কাঁপে না, সেই হৃদি টিভির খবর দেখে মায়ের কাছে ছুটে আসে। যেখানে নিজের জমিতেই পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ষোল জন আদিবাসী মানুষ। রাগে এক তহশীলদারকে ফালাফালা করে ফেলে বিক্ষিপ্ত জনতা। অর্ডার দেওয়ার লোক না থাকলেও ঝাকে ঝাকে ছুটেছিল গুলি। সরকার জমি অধিগ্রহণ করলেও বা কোম্পানি যৎ-সামান্য টাকা দিলেও তাদের আপত্তি ছিল। আর সেই জমিতে প্রাইভেট কোম্পানি পাঁচিল দিতে গেলে এই ঘটনা ঘটে। শহীদদের গ্রামের লোকেরা শহরে এসে রাস্তা অবরোধ করে, লাঠি, তীর ধনুক, টাঙ্গী নিয়ে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ ওয়াকিটকি হাতে নির্জীবভাবে রিপোর্ট করে। আসলে অনিতার

রাষ্ট্রীয় শোষণের চিত্র এবং আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বারবার নাড়া দিয়ে যায় পাঠক মনে।

অনিতা উচ্চপদস্থ আমলা হওয়ার জন্য সরকারের ফাঁস হাড়ে হাড়ে চেনেন। কিন্তু তিনি আপোষহীন ভাবে উত্থাপন করেন এই গল্পে। যেমন গান্ধীবাদী লখবীর সিং একজন বন্ধ কারখানার শ্রমিক। অকালে দাঁত পড়ে চামড়া ঝুলে গেলেও রিটারমেন্টের টাকা বা পেনশন কোনো কিছুই পাননি। অসহায় ভাবে সরকারের দরজায় দরজায় ঘুরে তাঁর জুতা ক্ষয়ে যায়। তবুও পেনশনের বা রিটারমেন্টের টাকা অধরা— "কাজ করিয়ে মজুরি না দেওয়াটা রাষ্ট্রের মানবাধিকার ভঙ্গের মধ্যে পড়ে।"[৫] কিন্তু সরকার বড় অমানবিক। সরকারি কর্মীরা পর্যন্ত অবহেলা করে তাদের। হিন্দি ইংরেজি মেশামেশি দরখাস্ত বারবার বাতিল হয়ে যায়। যেখানে তাঁর ফাইল আটকে আছে। সেখানে গেলে তারা মিথ্যে করে বলে এবার বাজেটে তাদের বিল পাস হবে। কিন্তু তা আর হয় না। অন্যদিকে আদিবাসীদের হিংস্রতা লখবীর এর পছন্দ নয়। তাই সে এবার মনের জোর হারিয়ে ফেলে। এটাই যেন সরকারের নিয়তি।

লেখিকা আবার সতেরো বছর বয়সি তরুনীদের যে অধঃপতন, কাজলীর মধ্যদিয়ে তা দেখিয়েছেন। এটা যেন তৎকালীন সমাজের অবক্ষয়িত চিত্র। আমাদের সমাজে যারা অবহেলিত, সরকারের দ্বারা শোষিত তাদের হয়ে লড়াই করতে চায় সতেরো বছরের তরুণী হৃদি। যার জন্য সে সাত বছর বয়স থেকেই প্রস্তুত। আসলে লেখিকা যেন সমাজে শোষিত পীড়িত বঞ্চিত মানুষদের জন্য এই হৃদির মধ্য দিয়ে একটা পথের দিশা দেখিয়েছেন। তাই মধ্যবিত্ত মা নয়ন সোশ্যালি পারফেক্ট মেয়েকে সামলাতে পারেনা। সে চায়-"আমি হিউম্যান রাইটস ল পড়ব। আমাদের দেশে হিউম্যান রাইটস এর ইসুগুলো কেউ বুঝতে চায় না।"[৬] সতেরো বছরের কিশোরীর অদম্য জেদ, আর সমাজকে দিশা দেখাতে তৈরি সঙ্গীতার বাবা মা। "যে দেশে মানবাধিকার আইনজীবীর জীবনই কঠিন সে দেশে মানবাধিকার কর্মী হৃদির কিঅবস্থা? তবুও হৃদির স্বপ্নকে সম্মান দিতেই হবে নয়নের।"[৭]

ভিন রাজ্যের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প 'মনে পড়ে যাওয়া'। এই মনে পড়ে যাওয়া আসলে সমাজের নগ্ন বাস্তবতা। খরা রাজ্যে অন্ন কষ্ট। পেটের দায়ে মানুষ নিজেকে বেয়াব্রু করতে বাধ্য হয়। আর ঠিকাদার সুযোগের সদব্যবহার করে নারী শরীর ভোগ করতে চায়। এক মা যখন অসুস্থ স্বামী ও সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য ঠিকাদারের ট্রাকে চড়ে পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে তখন অসহায় হয়ে পড়ে বাপ-ছেলে। এক বেলা খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খায় ছোট্ট বালু।কখনো লোকের জল বয়ে আনে। কখনো গৃহস্থের বাড়িতে বাসন মাজে। আর কখনো ফল পাকড় চুরি করে দিন কাটায়। না খেতে পেয়ে বাবা মারা যাওয়ার পর বালু পেয়েছিল নতুন জামা, লেবেঞ্চুস, গুঁড়ো খাবার। সেই বালু ধীরে ধীরে প্রথমে

পেটে ভাতে তারপর মজুরে পরিনত হয়। এখন সে জিন্স প্যান্ট, লাল গেঞ্জি, হাতে বালা পরা বালু ঠিকাদারের লোক। অন্যদিকে মায়ের না আছে খবর, না আসে টাকা। আসলে এই গল্পে কঠোর বাস্তবতার সাথে মিশে আছে প্রতীকি ব্যঞ্জনা, 'ধুলোর জান আছে' এই শব্দবন্ধে। বালুর স্মৃতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। যে ট্রাকে বালুর মা উঠতে পারেনি বলে একটা শক্ত সামর্থ্য হাত পিঠ কোমর জড়িয়ে গাড়িতে তুলেছিল। ঠিক তার পুনরাবৃত্তি ঘটে বালুর জীবনে। রোগা মত একটা বউ পা তুলে ট্রাকে উঠতে না পারলে— "বালু পিছন থেকে জড়িয়ে তুলে দিল তাকে। বালুর নাকে ধাঁ করে ঢুকে গেল তার লালচে ময়লা চুলের ধুলোট গন্ধ। আ- কাচা শাড়ির বাস, খিদের ঘ্রান সারা গায়ে।"[৮]

'প্লাবন জল' গল্পে লেখিকা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বা সারদার সরোবর বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষাপটে রচিত। এখানে মানুষের জীবন সংগ্রাম, সামাজিক বৈষম্য ও মানুষের সংকটাপন্ন জীবনকে তুলে ধরেছেন। যে গ্রাম এখনই ডুবল বলে, সেখানকার বসতি উঠে যাবে। সেখানকার মেয়ে কেউ বিয়ে করতে চায় না, বিয়ে দিতেও চাইনা। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার নোটিশ পাঠিয়ে এলাকার দখল চায়।প্রথমে অর্থের বিনিময়ে, তারপর পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে ষড়যন্ত্র করে ছিন্নভিন্ন করতে চাই "বাঁধ বিরোধী" সংগ্রামকে। একদল মানুষ যারা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে। জীবন থমকে যায় অভিশপ্ত রথের চাকার মতো। আর দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে সরকার পুলিশ লেলিয়ে দেয়। যেখানে ধনীদের নামে বেনামী কেনা শত শত একর জমি। হতদরিদ্র মানুষ বাধ্য হয় উদ্বাস্তু জীবন কাটাতে। আর সম্পন্ন গৃহস্থ যারা, যাদের একশ বছরের পুরাতন ভিটে, তাদেরও ঠাই হয় রাজপুরের বস্তিতে।গল্প লেখক নির্ভীকভাবে সরকারের উদাসীনতা, দালালদের রমরমা, ধনীদের স্বার্থপরতা, আর কুটিল ষড়যন্তের বলি হয় সাধারণ মানুষ। তাই সাধারণ গৃহবধূ বনমালার জিজ্ঞাসা-'তবে কেন আমাদের গা ডুবলরে টুকি? তবে কেন আমরা উৎখাত হলাম? কিসের জন্য ঘুরে মরল মানুষটা? বুকের মধ্যে ছটফটাতে থাকা কথাগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে দেশলাই জ্বালে বনমালা। তোলা উনুনের হাঁড়িতে ভাত ফোটে,ভাতের গন্ধ ছড়াই সাঁঝের বাতাসে।'[৯]

অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ করেছে। গল্পে স্থান পেয়েছে শোষিত আদিবাসী সমাজ, নাগরিক জীবনের দগ্ধ বিবেক, গণহত্যা, অপরাধবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, অবহেলিত মানুষ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, সরকারের উদাসীনতা। তাঁর গল্পে নারী মনস্তত্ত্ব নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। নারীর বেআব্রু রূপ, নারীর সুরক্ষা, সমাজে নারীর অবস্থান কোন কিছুই বাদ যায়নি। তবে নারী আবার সমাজের শক্তি ও পথের দিশারী হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোট গল্পগুলি বাস্তব সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল।

**তথ্যসূত্র :**

১। অনিতা আগ্নিনহোত্রী, অংশুঘাত, সেরা ৫০টি গল্প দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৬

২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৮

৩। অনিতা অগ্নিহোত্রী, ছায়া যুদ্ধ ,সেরা ৫০ টি গল্প দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৩

৪। তদেব- পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫

৫। অনিতা অগ্নিহোত্রী, সতের বছর বয়স, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০।

৬। তদেব-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৫।

৭। তদেব -পৃষ্ঠা সংখ্যা -১১৫।

৮। অনিতা অগ্নিহোত্রী, মনে পড়ে যাওয়া, সেরা ৫০ টি গল্প দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৬২।

৯। অনিতা অগ্নিহোত্রী, প্লাবন জল, সেরা ৫০ টি গল্প দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৪০।

বিভাস বিশ্বাস

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' : অস্তিবাদী দর্শনের স্বরূপ সন্ধান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাস এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণ-আন্দোলন ও দেশ বিভাগ জাতীয় বিষয় বিশ শতকের পাঁচের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে, ছয়ের দশকের শেষ পর্বে বাংলা উপন্যাস ক্লান্ত, স্খলিত গতি স্থির হয়ে একটা ভারসাম্যের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হল। সমকালের দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিকে স্বীকার করে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশ বিভাগে জর্জরিত ছয়ের দশকের বাংলা উপন্যাসের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুই মূর্তি গড়ে উঠেছিল। তার এক মূর্তি ছিল স্থায়ী মূল্যবোধের ভাঙন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাসহীনতা এবং আরেক মূর্তিতে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের অবক্ষয়িত চেহারার প্রতিফলন। এই সময় পর্বের অনেক লেখকের রচনাতেই সংশয়, অবিশ্বাস ও হতাশার সুর বেজেছে। বাংলা সাহিত্যে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা অজস্র। বর্তমান কালেও অনেক লেখক কলকাতাকে অবলম্বন করে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের নতুন জটিলতা এবং জিজ্ঞাসাকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। এত সংখ্যক ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের মধ্যেও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫—) আপন স্বতন্ত্রে ভাস্বর। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার তাঁকে বলা যেতে পারে। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের সংকট, হতাশা, বেকার সমস্যা, নরনারীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা, স্বপ্ন ও স্বপ্নহীনতা, ব্যর্থতা, অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি বিষয় তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের ধারায় কোনও ঔপন্যাসিককে এতটা সময় ধরে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনার পরিমণ্ডলকে ঘিরে রাখা সেই ভাবে চোখে পড়ে না। তাই এই ঔপন্যাসিক সম্পর্কে এবং তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে বলতেই হয় উপন্যাস জগতে তিনি স্বতন্ত্র ও অনন্য।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অবসানের পর বাংলা উপন্যাসে শুরু হয় ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাল। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিকের উপন্যাস চর্চার কাল। সোনালী এই পর্ব পেরিয়ে পরবর্তী পর্বে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬ - ১৯৬৫), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ - ১৯৯৫), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০ - ১৯৮৫), বিমল কর (১৯২১ - ২০০৩), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২ - ২০১৮), গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩ - ২০০০), সমরেশ বসু (১৯২৪ - ১৯৮৮), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের (১৯৩৪ - ২০১২) ধারাবাহিকতায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটল আরো কয়েকজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের। যাঁরা মূলত বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে মতি নন্দী (১৯৩১ - ২০১০), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৩৩ - ১৯৭৯), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩ - ২০০১), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩ - ২০০৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪ - ২০১২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫ -)। বিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকের পর্বের ঔপন্যাসিকদের লেখায় মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরলাম। যেমন, রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানুষের ভাঙা - গড়ার দ্বান্দ্বিক সাক্ষ্য রয়েছে।১৯৬২ সালে প্রকাশিত "আরো একজন" উপন্যাসে আমরা দেখি সুখী স্বচ্ছল দাম্পত্য জীবনে গোপন পথে তৃতীয় একজনের প্রবেশ, নারী পুরুষের অবৈধ যৌন সংসর্গ, পুরুষের বহুগামিতা ইত্যাদি বিষয়। অনুরূপ "নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান" (১৯৬৯), "দ্বাদশ ব্যক্তি" (১৯৭০) উপন্যাসেও মধ্যবিত্তের সংকট ধরা পড়ে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস "একক প্রদর্শনী"(১৯৭০) উপন্যাসে আতঙ্ক ও মৃত্যুভয় বা হতাশা মধ্যবিত্ত জীবনকে নানাভাবে উদভ্রান্ত করে। উপন্যাস ছাড়াও তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের অসুখী দাম্পত্য জীবন, অবাধ যৌনতা বড় জায়গা করে নিয়েছে। সাতের দশকের যুদ্ধ, বামপন্থীদের নিজেদের বিরোধ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সবকিছু মিলিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক অবক্ষয়ের চেহারাটা আরো বেশি মাত্রায় করুন করে তুলেছিল। এর ফলে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের কষ্ট ও প্রতিবাদী সত্তা, মেরুদণ্ডহীন নেতিবাচক আগ্রাসী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। কথাসাহিত্যেও তার অনিবার্য প্রতিফলন পড়েছিল। যে ব্যক্তি এতদিন চারপাশের সমাজকে দেখেছিল, সে এখন নিজেকে দেখতে শুরু করল স্বাভাবিক নিয়মেই। এই দৃষ্টি বদলের প্রাথমিক দায়িত্ব যিনি বহন করেছিলেন, তিনি বিমল কর। "দেওয়াল"(১৯৬২) উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভেঙে যাওয়া সমাজের নৈতিক পতন ও মূল্যবোধের ভাঙনের মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত একটি পরিবার কিভাবে বেঁচে থাকতে চাইছে তার ছবি। "গ্রহণ" উপন্যাসে মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল সম্পর্কের চিত্র রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্র পারস্পরিক জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই জটিল সম্পর্ক থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু পারে না। লেখক এইভাবেই মানব জীবনের পর্যালোচনাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

যে কঠিন কদাকার সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সদা বিধ্বস্ত, সেই সমাজের অখণ্ড ছবি না এঁকে সাহিত্যে শোনানো হয় নিম্নবর্গের দলিত শ্রেণীর বিধ্বস্ত মানুষদের অন্তর্লোকের আর্তনাদ। বাইরের লোক সমাজ ও ঘটনা টুকরো টুকরো প্রতীকী হয়ে পড়ে এই সময়। এই প্রতীকী ব্যক্তির মগ্ন চৈতন্যকে নাড়া দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সর্বজনীন কোন অভিঘাত সৃষ্টি হয়নি। এই অভিঘাতের কথা শুনিয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা। তাঁরা দেখিয়েছেন মানুষের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের "আত্মপ্রকাশ"(১৯৬৬), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "ঘুনপোকা"(১৯৬৭), "পারাপার "(১৯৭১) কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তৃতীয় ভুবন"(১৯৫৮) উপন্যাসে দেখা যায় যুবক-যুবতীরা নিজেদের জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন, তাদের নিজের মত করে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের স্বপ্নপূরণ হয় না। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর " গ্রন্থে বলেছেন - 'সময়ের হাত পড়েছে গত কয়েক বছরের বাংলা উপন্যাসে। ব্যক্তি ও সমাজের অন্বয়ে অনন্বয়ে, সংঘাতে ও সংযোগে ব্যক্তি স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে নানাভাবে। বাস্তবের সমস্যা ও শিল্পের সমস্যাকে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করে, স্বর মাত্রায় নানা লয়, নানা স্তর আরোপ করে লেখকেরা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন আজকের সময়ের, সমাজের তথা জীবনের চলচ্ছন্দকে। পাল্টে যাচ্ছে গল্প বলার ধরণটাই, বুনুনি ও বিন্যাসের ধারা ধরন।'[১] ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের দৃষ্টিতে বেশি দেখে থাকেন, সে সমাজের ভাঙনই হোক কিংবা ব্যক্তি মানুষের ভাঙনই হোক। তাঁরা দেখেন তাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, ছবি আঁকতে পারেন স্পষ্ট করে। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তীতার ভাঙন শুরু হয়েছে বিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকের সমাজ ব্যবস্থায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "ঘুণপোকা" উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর "বিবর" উপন্যাসের প্রকাশের দুই বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে। ছয়ের দশক-সাতের দশক এই দুটি দশকই বাংলা উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের, সঙ্গ আর নিঃসঙ্গতার দোটানার কাল। "ঘুনপোকা"র নায়ক অনেক দিক থেকেই "বিবরে"র নায়কের নিকট আত্মীয়। আবার "পরপারে"র ললিতও এদের মতই পরিচয়হারা নিঃসঙ্গ অনাত্মীয় মানুষ। ভাসমান উৎকেন্দ্রিক মানুষকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যতই চিনুক জানুক, এদের নিয়ে ব্যাপৃত থাকার মধ্যে কোন সুখ নাই। নিঃসঙ্গতা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নিত্য নয়, নৈমিত্তিক। নিঃসঙ্গতা তার কাছে বাঞ্ছিত আধুনিকতার অভিজ্ঞান নয় - মূল্য নয়, অনেকটাই অবমূল্য। তিনি মূলত শিকড়ের সন্ধানে গিয়ে বারবার খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছেন গ্রামকে। আর এই ভাবনাকেই উপন্যাসে গ্রাম ও শহর দুটোকে পাশাপাশি রেখে দেখার চেষ্টা করেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জীবন জিজ্ঞাসা অতীব গভীর। জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি পেয়েছেন কি পাননি সে কথা আমি বলছি না। বলছি তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার কথা। হাইডেগার যেমন বলেছেন - "Only the right asking". এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়। অস্তিত্বের রহস্যতে তিনি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে "right asking" এর প্রয়াস বেশ কিছু উপন্যাসে তিনি এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। এই জিজ্ঞাসা শুধু গভীর নয়, গম্ভীরও, যে গম্ভীরতা হয়তো সমকালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ছিল না। তাঁর উপন্যাসে সুস্থির জীবনবীক্ষণে আজকের আত্মসর্বস্ব মধ্যবিত্ত অহমিকাচর্চা কঠিন সমালোচনা প্রধান হয়েছে। "ঘুণপোকা" উপন্যাসের নায়ক মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ

শ্যাম। পারিপার্শিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে ভীষণভাবে নিজেকে সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন ভেবেছে। অস্তিত্বের সংকট তাকে জীবনের এমন এক চরম সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে এই উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তি সত্তার যন্ত্রণার ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট। এই পরিচ্ছেদে আমি মূলত তুলে ধরবার চেষ্টা করছি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মানুষের জীবনের সংকট ও অস্তিবাদী জীবন চেতনা দ্বন্দ্ব। স্বল্প পরিসরে উপন্যাসের বিশ্লেষণ ও নিজস্ব অভিমতের নিরিখে প্রাথমিক পর্বে আমি দেখাতে চেয়েছি "ঘুনপোকা" উপন্যাসটি অস্তিত্বের সংকটে কতটা প্রকাশ হতে পেরেছে।

ছয়ের দশকের কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটির গল্প। এই উপন্যাসটি রচনার প্রেক্ষাপটে লেখক তাঁর একটা নিজস্ব জগত তৈরি করেছিলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন - 'আমার একমাত্র মূলধন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ছেলের মূলধন - স্বপ্নভরা এদেশের যুবকেরা স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠে। কিন্তু আমার জীবনে কিছু কষ্টও আছে। এইসব কষ্ট আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় নানা দিকে। এ জীবনের উৎস কি? কেন এই জীবন? কেন মৃত্যু? এইসব প্রশ্ন অনবরত আমাকে তাড়না করে ফিরেছে।'[২] শেষ অবধি তার স্বপ্ন ও যন্ত্রণা একটি বিন্দুতে এসে শেষ হয়েছে। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের কাছে ১৯৬৫ সালে এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে তিনি দীক্ষা নেন। আর ঠিক তার দু'বছর পরেই প্রকাশিত হয় "ঘুণপোকা"। এই উপন্যাসের নায়ক শ্যাম চক্রবর্তী জীবনে যে যে প্রশ্ন উঠেছে, সেই প্রশ্নই আধুনিক নগর সভ্যতার ফাঁকি, অন্তঃসারশূন্য শ্যামকে বারবার তাড়া করে নিয়ে বেরিয়েছে। নিজেকে জানার বিপুল জিজ্ঞাসায় অস্থির হয়ে উঠেছে, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, ভবঘুরে হয়ে ঘুরেছে চারিদিক, খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে জীবনের অর্থ। এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন - 'জীবন খেলা মাত্র নয়। একজন বহিরাগতের মত সময় কাটানোই জীবনের লক্ষ্য নয়। কেবল সম্পত্তি ভাগ নয়, কেবল ফুর্তি নয়, জীবনের একটা গভীরতর তাৎপর্য আছে। লেখকের কাছ থেকে পাঠক তা জানতে চায়।'[৩] "ঘুণপোকা" র নায়ক শ্যামের জীবন অনেকটাই রহস্যময়। মানুষের জীবন বেশ বৈচিত্র্যময়। মুহূর্তের মধ্যেই যেন সবকিছু পাল্টে যায়। ঘটে যায় অনেক কিছু। সব ঘটনা আবার জানা যায় না। শুধু থেকে যাই কিছু জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসায় জীবনকে খুঁজে নেই, আর হারিয়ে যাই সে নিজেকে নিয়েই। এই নিজেকে হারিয়ে ফেলাটাই হয়তো অন্য এক জীবন। শ্যাম চক্রবর্তী হয়তো এই জীবনটাকেই দেখেছিল। সে তার চাকরিটি ছেড়ে দেয়, তার বস তাকে "বাস্টার্ড" বলেছিল বলে। তার আত্মসম্মানবোধ তাকে সেই জায়গা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, এবং তার আত্মসম্মানী জীবন ও জিজ্ঞাসা তাকে বারবার বলেছে সে চাকরি করবে না। তবুও জীবনে তো বেঁচে থাকতে হবে। এই জীবনে বেঁচে থাকার জন্য সে কি করবে। সবকিছু

ভুলে সে আবার কি তার বসের সামনে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে চাকরি করবে? না সে নতুন ভাবে নতুন কিছু করার চিন্তায় মগ্ন হবে? এই ভাবনা শ্যাম কে অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। তার অনেক কিছুই করার আছে। কিন্তু তার সেসব করতে আর মন চাই না বা ইচ্ছে হয় না। এমন এক পরিমণ্ডল তাকে অবিরত সাপের শরীরের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এক অটল ভাবনা লোকে নিয়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন তার জন্য মেয়েরা পাগল ছিল। এখন তার বয়স একত্রিশ। তেমন বেশিও নয়। ইতু নামের একটি মেয়ে তার প্রতি দুর্বল বলা ভালো তার প্রেমে পাগল। এরপরও কোথায় যেন একটা বাধা শ্যামকে ঘিরে ধরে। ভালো লাগে না শ্যামের। শ্যাম কোন বাঁধনে আটকা পড়তে চায় না। তার মন এবং তার ভাবনা সর্বদা তাকে মুক্ত পাখির মতো রাখতে চাই। পাখির মত সে এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে বেড়াবে, জন্য কোন খাঁচা নয়। সে কোন বাঁধনেই বাঁধা পড়তে চায় না। তবুও ব্যক্তি জীবন সর্বদা পরিবর্তনীয়। এই পরিবর্তনের মায়াজালে কাউকে তার ভালো লেগে যায়। বুকের ভেতর রেলগাড়ি ঝনঝন করতে শুরু করে। সে কি পারবে? তবুও অজান্তেই তার জীবনে এসে উপস্থিত হয় লীলা। হয়তো তার সেই দীর্ঘদিনের খুঁজে চলা সেই মানুষটিই। প্রথমবারের মতো শ্যাম ভয় পায়। এই ভয় পাওয়াটা তার আগে ছিল না। চোখে চাহনি আর ইশারাতে যে কাউকে সে ধরাশায়ী করতে পারতো। ভবঘুরে জীবনে এমন সে বহু বার করেছে। তখন তার অন্যরকম মনে হয়নি। তাহলে আজ কেন তার এমন মনে হচ্ছে? তবে এটাই কি প্রেম? এটাই কি ভালোবাসা? এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি শ্যাম আজ নিজেকে চিনতে বড্ড অপরিচিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রাথমিক পর্বে শ্যামের এই ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের একটা রূপ ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় দেবার চেষ্টা করেছেন। সামগ্রিক গল্পের পরিসরে একটা ছোট্ট সারসংক্ষেপে শ্যামের জীবনের ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। শুধু কাহিনীগত দিকটাই এখানে আলোচিত হল। কিন্তু মানব জীবনের সংকট ও অস্তিবাদী জীবন চেতনার দ্বন্দ্ব কোথায় কিভাবে প্রকাশ পেল সেটি এবার আলোচনা করব।

নায়ক শ্যামের মাধ্যমে যে জীবনের কথা পাই, সে জীবন নৈরাশ্য, অবক্ষয় আর অন্ত:সারশূন্যতায় ক্ষয়ে যাওয়া আধুনিক জীবন। উপন্যাসটি ভোগবাদী জীবনকে অতিক্রম করে মহাজাগতিক এক জীবনের সন্ধান দেয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের এটি হয়তো একটি প্রধান লক্ষণ। জাগতিক জীবনকে মহাজাগতিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, জীবনকে গভীর জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে তোলা এই লক্ষণটিকে হয়তো “কসমিক” লক্ষণাক্রান্ত বললে ভুল হবেনা। জীবনে শুরুতেই তার মধ্যে ভর করেছিল বিষাদ। যে বিষাদ কখনোই জাগতিক ছিল না। উপন্যাসে শ্যামের স্বীকারোক্তি ‘ভোরে উঠে সামান্য ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করত, কয়েকটা বেন্ডিং, আর তিন - চারটে আসন। সে-কথা ভাবতেই এখন ক্লান্তিতে হাই

ওঠে তার। চোখ বুজে সে পুরনো শ্যামকে দেখতে পায়। দেখে, সে মেঝেতে ব্যাঙের মতো হাত - পা ছড়িয়ে ডন মারছে, কখনও নিচু হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, কখনও বা বাতাসে ঘুষি ছুড়তে ছুড়তে অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ফিরছে ঘরময়। সেই ঘুষিতে একবার রূপশ্রী ফার্নিশার্সের ওয়ার্ড রোবটার একটা পাল্লা চোট খেয়েছিল, আর দেয়ালের দুর্বল একটা জায়গায় চুনবালি খসে পড়েছিল বলে বড় খুশি হয়েছিল শ্যাম। পুরনো সেই শ্যামের শরীর নিয়ে এইসব অর্থহীন নাড়াচাড়া মনে করে সে হাসে, তারপর দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শোয়। শরীরের ওপর বড় মায়া ছিল শ্যামের, সব সময় নিজেকে সে চোখে চোখে রাখত। সে খুব সতর্ক ভাবে রাস্তা পার হত, সুন্দর ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠত কিংবা নামত, সুন্দর ভঙ্গিতে টেলিফোন তুলে নিত কানে - সবকিছুতেই তখন বড় মনোযোগ ছিল তার। যেন কখনও কোনও সময়েই তাকে কুৎসিত না দেখায়।'[৪] ঘটনাবহুল বাইরের জগৎ কীভাবে মানুষের জগতকে নির্মাণ করে দেয়, সে কথায় হয়তো ঔপন্যাসিক বলতে চেয়েছেন। জীবন সরল নয়, জটিল; কিন্তু একেবারে লক্ষ্যহীনও নয়। অস্থিরতার শেষে বিশ্বাসের ভূমিতে মানুষ স্থির হয় অথবা হতে হয়। এই আস্তিক্যবোধই হয়তো শীর্ষেন্দুর উপন্যাসের শীর্ষবিন্দু। দেশভাগের যন্ত্রণা, মধ্যবিত্তের অবক্ষয়, মানবিক মূল্যবোধের সংকট, ব্যক্তি সত্তায় বিপন্ন জীবনকেই বারবার তিনি তুলে এনেছেন তাঁর লেখায়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা স্বাভাবিকভাবে বলতে হয় ভারতীয় দর্শনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ বিষয় অস্তিবাদ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস কে দিয়েছে বিশিষ্টতা। "পারাপার" উপন্যাসের ললিত ও অনেকটাই আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের শ্যামের মত। আত্মাকে অধিকার করে যা কিছু আছে সেটাই হয়তো আধ্যাত্মিকতা। এই নিজেকে জানাটা আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে বড় বিষয়। ললিতের শিশু হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসার মধ্যে সেই ভাবনার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। চাকরি হারানো শ্যাম, প্রেমিকা ইতুর প্রতি তার ভালো লাগার মুহূর্ত সবকিছু যেনো শ্যামকে তালগোল পাকিয়ে দেয়। অস্তিত্বের বিপন্নতায় যখন মানুষ নিজেকে আবদ্ধ করে তখন তার ভেতরের ভাবনাগুলো আরো প্রকট হয়। ইতুর সামনে দাঁড়িয়ে শ্যাম অনুভব করে ভেতরের উত্তেজনা। উপন্যাসে দেখি' 'শ্যাম হাসে, শ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে, খেলো ইতু, খেলো। তোমাকে একটু ভালো লাগতে দাও। আমার শরীর গরম হচ্ছে না ইতু, বহুকাল ধরে আমি ঠান্ডা হয়ে আছি। খেলো ইতু,খেলে আমাকে ছোঁও।'[৫] লেখকের এই যে অন্বেষণ, লক্ষ করলে দেখা যাবে, জীবনকে ছাড়িয়ে অস্তিত্বের অনুভবে যেন ছড়িয়ে পড়তে চায়।

এই উপন্যাসের আরেকটি পর্বে আমরা দেখি সুবোধ মিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ। চাকরি হারানো শ্যামের সাথে আলাপ হয় সুবোধ মিত্রের। সে খুবই সাদামাটা

লোক। বিশেষত্ব বলেই কিছুই নেই তার চরিত্রে। এক সন্ধ্যায় দেখা হয় পাইস হোটেলের দরজায়। সেখান থেকে শ্যামকে প্রায় ধরে বেঁধে নিয়ে যায় সুবোধ মিত্র তার নিজের আস্তানায়। অতি সাদামাটা তার আস্তানাটি। দেওয়ালের গায়ে গোটা তিনেক ক্যালেন্ডার, ঠাকুর দেবতার ছবি আটকানো, ইজিচেয়ার, টেবিল আর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্তূপ আকারে বইপত্র। জ্যোতিষ বিদ্যার পত্রপত্রিকাও বিছানায় উল্টানো। টেবিলের উপর রবি ঠাকুরের ছবিতে একটা মালা পরানো, মালাটাও টাটকা বলেই বোধ হয়। দ্রুত পোশাক পাল্টিয়ে, নিজেকে যতটা সম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে পুজোর জন্য আনা ফুল বাতাসা নিয়ে সে পুজো করতে বসে। টেবিলের সামনে আসন পেতে শ্যামকে বসতে বলে। শ্যাম লক্ষ্য করল, টেবিলের নিচে কাঠের এক ছোট পালঙ্কে পিতলের গোপাল, মাটির কালী, রামকৃষ্ণ দেব ও সারদা মনির ছবি। একদিকে এক বোতলের থালায় চকচক করছে শিবলিঙ্গ। তার এই প্রাত্যহিক পুজার কারণ তার মা। কারণ মৃত মায়ের কাছে তার কথা দেওয়া আছে। ঠাকুর দেবতায় আসলে যে তার ভক্তি নেই সে বিষয়টিও জানাতে সে ভুল করে না। তার এমন কাণ্ড দেখে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ভগবান-টগবান আছে বলে মনে হয় আপনার?'[৬] কিন্তু এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনের ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন 'রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আমি যাই না কখনও, শান্তিনিকেতন দেখিনি, রবি ঠাকুরের কবিতাও আমি খুব একটা পড়িনি,..'[৭] গল্প করতে করতেই সুবোধ মিত্র আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, চোখের জল বাঁধ ভেঙ্গে পরল গাল বেয়ে। শ্যাম ও সুবোধ মিত্রের এই কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে প্রসঙ্গ উত্থিত হল তাতে অন্তআত্মা যেন প্রাণের রবি ঠাকুরকে অনুভূতিও স্তরে এক নতুন মাত্রা দান করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুবোধ মিত্রের বাড়ি থেকে শ্যাম ধীর নিঃশব্দ পায়ে যখন উঠে আসে, তখন তার মনে হয় মানুষের জীবনে যা মানুষ একাত্ম হয়ে নিজের মতো করে কাঁদতে চায়। এই সময়ে পাশে কাউকে থাকতে নেই। শ্যামের এই অনুভূতি তার নিজের প্রতি যেন নিজেরই জিজ্ঞাসা।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজে ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, উপনিবেশিকতাবাদের নতুন চরিত্র অর্জন, সর্বোপরি মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের মধ্যে যে অস্থিরতা, সেই অস্থিরতার দ্বৈত রূপ হলুদারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু উপন্যাসে। কৃষ্ণ বাঙালি মধ্যবিত্তের অবক্ষয়দীর্ন দারিদ্রতা, পারিবারিক টানাপোড়নের কাহিনী সবকিছু মিলিয়ে যেন এক একবিংশ শতকের ব্যক্তি সত্ত্বা ও সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র। মানুষ ও জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা, নিকট থেকে দূর, ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয় পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এই অভিযাত্রা তার সাহিত্যকে কালাতিক্রয়ী মর্যাদায় মন্ডিত করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর লেখায় সাবলীল অথচ বহু কৌণিক তাৎপর্যের সঙ্গে পাঠক যেন পেয়ে

যান অনাবিল আনন্দ। অস্তিবাদ এমন একটি দার্শনিক মতবাদ যা মানুষের স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং অস্তিত্বের অর্থ খোঁজার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়। "ঘুণপোকা" উপন্যাসে স্বামীর জীবন যাপনের  ধরন সমাজের সাথে তার যে সম্পর্ক এই মতবাদকেই যেন সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা দেয়। শ্যাম সমাজের বাধা ধরা নিয়মকানুন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এবং নিজের অস্তিত্বের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব অনুভব করে। আর তার থেকে বড় কথা শ্যাম প্রায়শই একাকীত্ব অনুভব করে, যা অস্তিবাদের একটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফলে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের সংকট ও অস্তিবাদের দার্শনিক ধারণাগুলিকে মানবিক প্রেক্ষাপটে ও বাস্তব সম্মতভাবে একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

**তথ্যসূত্র :**


১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ: বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে ”জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা -৩৪৮.
২. মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার: কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর:১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দে” জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা - ৩৩৮.
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৩৯.
৪. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু: ঘুণপোকা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বিংশ মুদ্রণ, মে ২০২২, পৃষ্ঠা-১৪.
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬.
৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭.
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮.

মানসী কুইরী

## গ্রাম বনাম শহর ভাবনার রূপান্তর : প্রসঙ্গ রমানাথ রায়ের উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই নানাভাবে গ্রাম ও শহর জীবনের কথা উঠে এসেছে। নাগরিক জীবন যাপন ও গ্রাম জীবনের মধ্যেকার তল-তফাৎ তখন থেকেই আমাদের চোখে পড়ে। আমরা চর্যাপদে তাই এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হই যেখানে সিদ্ধাচার্য কাহ্ন পাদ লিখেছেন, 'নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।'[১] (১০ নং পদ)। অর্থাৎ ডোম্বীকে নগরের বাইরে কুঁড়ে ঘরে গ্রাম জীবন-যাপনে আমরা আবিষ্কার করি। কিংবা এ প্রসঙ্গে শবর পাদের 'উঁঞ্চা উঁঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।'[২] (২৮ নং পদ) পদটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একসময় ছিল যখন সামাজিক অবস্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য অবস্থান ছিল নির্দিষ্ট। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণিবিভাজন মুছে গেলেও মানুষের মনের ভেতরে গ্রাম ও শহরকে কেন্দ্র করে যে মানসিক দূরত্ব, যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অথবা বলা যায়; যে বৈপরীত্য ভাবনা - তা কোনোকালে মুছে যাওয়ার নয়। মধ্যযুগেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে গ্রাম ও নগরের প্রসঙ্গ রয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আক্ষেটিক খণ্ডে কালকেতু ও ফুল্লরার উপাখ্যানে কালকেতুর জীবন ও জীবিকা নির্বাহ হয়েছে মূলত গ্রামীণ পরিসরে। অর্থাৎ গ্রামজীবনের বর্ণনা এমনকি মুরারি শীলের মতো মানুষের চতুরতা, ভাঁড়ু দত্তের মতো মানুষের ভাবনার সংকীর্ণতা এখানে বড় হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে আমরা পাই, দেবী চণ্ডীর সাহায্যে কালকেতু বিশেষত দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বন কেটে বসতের জন্য গুজরাট নগরের পত্তন-অবশ্য এ কাহিনি আমাদের সকলেরই জানা।

উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের কথাশিল্পীদের কথাবিশ্বে নানাভাবে গ্রামজীবনের ছবি দেখা যায়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিভেদ সাম্প্রতিক সময়ের সাহিত্যেও নানাভাবে ফুটে উঠেছে। আধুনিক যুগের শুরু থেকে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত তেমনভাবে গ্রাম জীবনের কথা উঠে আসেনি। আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তেমনভাবে না পাওয়া গেলেও গ্রামজীবনকে বাদ দিয়ে কোনোকালেই কোনো সাহিত্য গড়ে উঠতে পারেনি। বর্তমান থেকে একটু পিছিয়ে গিয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ সময়কাল পর্যন্ত যদি আমরা সচেতনভাবে দেখি তাহলে দেখবো, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮খ্রি.-১৮৯৪খ্রি.) থেকে শুরু করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩খ্রি.-১৯৩২খ্রি.), রমেশচন্দ্র দত্ত(১৮৮৪খ্রি.-১৯০৯খ্রি.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১খ্রি.-১৯৪১খ্রি.), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬খ্রি.-১৯৩৮খ্রি.), তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮খ্রি.-১৯৭১খ্রি.), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮খ্রি.-১৯৫৬খ্রি.), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪খ্রি.-১৯৫০খ্রি.) পর্যন্ত প্রমুখ কথাসাহিত্যকদের লেখাতে যেভাবে গ্রাম জীবন উঠে এসেছে পরবর্তীকালের অধিকাংশ কথাসাহিত্যিকদের লেখায় সেভাবে গ্রাম জীবনের কথা উঠে আসেনি। আসলে এই গ্রামজীবন তাঁদেরই লেখাতে সবচেয়ে বেশি করে দেখতে পাওয়া যায় যাঁদের ছেলেবেলা গ্রামে কেটেছে। গ্রাম-জীবনের ছাপ রয়েছে যাঁদের মনোজগতে, তাঁদের হৃদয়ে গেঁথে আছে সেই সহজ- সরল সাদামাঠা নিখাদ গ্রাম-জীবনের গল্প।

গ্রামজীবন বলতে আমরা সাধারণত কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা, মানুষের মধ্যে এক আত্মীয়তার বন্ধন, সহজ-সরল জীবনযাপন ও প্রকৃতিনির্ভর চেতনার প্রতীক হিসেবে জানি। অন্যদিকে শহর বা নগরজীবন হল শিল্প, বানিজ্য, প্রযুক্তি ও আধুনিকতার প্রতীক। শহর মানেই নানান সুযোগ সুবিধে, গতিশীলতা ও পরিবর্তন। শহর জীবনের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা, প্রতিযোগিতা ও যান্ত্রিকতায় পিষ্ট মানুষদের জীবনসংগ্রাম। গ্রাম ও শহর জীবনের এই ভিন্ন জগতের মধ্যে কখনও সংঘাত আবার কখনও একে অপরের পরিপূরক। সাহিত্যিকেরা এই দ্বন্দ্বকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। আমার আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয় রমানাথ রায়ের উপন্যাসে গ্রাম ও শহর ভাবনার রূপান্তর। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের (১৯৬৬খ্রি.) উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক রমানাথ রায়(১৯৪০খ্রি.-২০২১খ্রি.) গ্রাম ও শহর জীবনকে তাঁর লেখনিতে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরেছেন। রমানাথ রায়ের ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভাব আটের দশকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ছবির সঙ্গে দেখা'(১৯৮০খ্রি.)। গ্রাম ও শহর জীবন সম্পর্কে আমাদের পূর্বের ধারনার পরিবর্তন হয়েছে। উন্নতশীল জীব হিসেবে মানুষ নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরিবেশ, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবন-যাপনেও পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। শহরের মানুষদের মতোই বর্তমানে গ্রামের মানুষেরাও সেই উন্নত জীবন-যাপন উপভোগ করতে চান। বর্তমান প্রজন্ম উন্নত জীবন ও জীবিকার তাগিদে বা বলা ভালো আধুনিক হওয়ার তাগিদেই এই গ্রাম জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন। বিশ্বায়নের এই যুগে এখন গ্রাম আর গ্রাম নেই। গ্রামে বসবাস করলেও এখন সবাই শহুরে জীবন কাটাতে চান। গ্রাম জীবন ত্যাগ করে অনেকেই সরাসরি হয়ে উঠেছেন শহরবাসী। ফলে ফেলে আসা গ্রাম, এখন তাঁদের কাছে কেবল স্মৃতি। বর্তমানে বেশিরভাগ লেখক ও কবিদের কাছে গ্রাম কেবল স্মৃতিই হয়ে রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখনিতে উঠে আসা 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র'

সঙ্গে এখন আর আমাদের তেমন পরিচয় ঘটে না। এরকম যাপিত গ্রামজীবন এখন বিগত যৌবনা, কল্পনার অতীত। গ্রাম জীবন সমুদ্রে এখন ভাটার টান পড়েছে। গ্রামের সমাজে কাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই উন্নয়ন কেড়ে নিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের চূড়ান্ত প্রভাব।এখনো কিছু কিছু জায়গায় আমরা গ্রামে সেই সাদামাটা জীবনের আভাস পাই কিন্তু সেই আভাস আভাসমাত্রই। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে হিংসার সংস্কৃতি, যার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে সম্পর্কের মধ্যে। তাই সম্পর্কগুলো প্রতিনিয়ত ঠুনকো হয়ে পড়ছে। একে অপরকে প্রতিশোধমূলক প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতিটি সম্পর্কের মধ্য থেকে ধৈর্য, মূল্যবোধ, সহনশীলতা উবে যাচ্ছে। মানুষ হয়ে উঠেছে ভোগবাদী জীবনের প্রত্যাশী। গ্রাম জীবনেও মানুষদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের তীব্র বাসনা ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের মানুষদের মধ্যেও অন্যকে দেখানোর প্রবণতা বাড়তে বাড়তে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। রাজনীতির ঘৃণ্য চিত্রও গ্রাস করে ফেলেছে সাদামাটা গ্রাম জীবনকে। রমানাথ রায়ের উপন্যাসে গ্রাম ও শহর জীবনের কথার পরিসর খুব কম। কারণ তাঁর ছেলেবেলার মাত্র প্রথম দশটি বছর কেটেছে গ্রামে। আর বাকি জীবন কলকাতা শহরে। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানান—

"আমার ছোটোবেলা মানে দশ বছর পর্যন্ত আমি গ্রামেই কাটিয়েছি। এবং সে কাটিয়েছি ইছামতি নদীর ধারে, গোগা বলে একটি গ্রাম, যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত। সেই গ্রামে আমার দশ বছর কেটেছে। তারপরে আমি এখানে এসে সিটি কলেজ স্কুলে, আমহার্স্ট স্ট্রিটে, সেখানে আমি ভর্তি হই ক্লাস সিক্সে। এই শেষ হয়ে গেল আমার গ্রাম জীবন।"[৩]

রমানাথ রায়ের 'ছবির সঙ্গে দেখা'(১৯৮০খ্রি.) উপন্যাসে খুব সংক্ষেপে গ্রাম ও শহর জীবনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। উপন্যাসের শুরুতেই মন্টু চরিত্রের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, রমানাথ রায় কিভাবে তাঁর বাল্যকালীন লোকায়ত জীবন হেলায় হারিয়েছেন। মন্টু চরিত্রটির কথাবার্তার মধ্য দিয়ে টের পাওয়া যায় ছেলেবেলায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে লেখকের হৈ-হুল্লোড় করার দিনগুলি। স্মৃতিই যে মানুষের বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয় হয়ে ওঠে, উপন্যাস পাঠে তা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। কথক বলেন—

"কলকাতা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল না এমনকি কলকাতা যাবার কথাও কোনদিন ভাবতাম না নিয়মিত স্কুলে যেতাম বাড়ি ফিরতাম বন্ধুদের নিয়ে হই হই করতাম।"[৪]

অর্থাৎ কলকাতা সম্পর্কে কোনো আগ্রহই ছোটবেলাতে ছিল না। আসলে ছোটবেলার সেই বয়সে ওই গণ্ডির বাইরে ভাববে না এটাই স্বাভাবিক। উপন্যাসে দেখি, ছোটবেলার সঙ্গী তথা প্রিয়জন ছবি, যার সঙ্গে মন্টু স্কুল থেকে ফিরলেই লুডো, ক্যারম খেলত - সেই

ছবি আর ছোট নেই। বড় হয়েছে এবং বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলে গেছে। ছবি এখন কলকাতা শহরের বাসিন্দা, এখন মন্টুকে সে চেনে না। তার সঙ্গে এখন আর কোন যোগাযোগ নেই। সেসব কথা স্মরণ করেছে মন্টু। তার ছোটবেলার বন্ধু চিনুর কথা স্মরণ করে বলে—"আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে নদী আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেখানে যাই। ছিপ ফেলে দূরে দূরে বসি। তখন আমরা কোন কথা বলি না।"[৫]

লেখক রমানাথ রায় এরকম টুকরো টুকরো গ্রাম জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। মন্টুর আদলে আসলে লেখকের জীবন মুখর হয়ে উঠেছে। লেখকের সেই ছোটবেলার কথা এখানে আমরা মনে করতে পারি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, নদীর ধারে ছিপ নিয়ে বসে থাকা, স্কুল থেকে ফিরে এসেই বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো করা-এসবই তো গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত জীবনের রসদ। রমানাথ এই জীবন উপভোগ করেছেন। কিন্তু সহজ সরল অনাড়ম্বর এই জীবন থেকে মানুষ বর্তমানে ক্রমশই অনেক দূরে সরে যেতে চাইছে। গ্রাম জীবন বর্ণনার পাশাপাশি রমানাথ রায় মানুষ কেমন করে ক্রমশ শহরমুখী হয়ে উঠতে লাগলো তারও বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক উপন্যাসে তাদের নগরকেন্দ্রিক জীবন-যাপনের পরিবর্তনশীল চিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে আরো দেখি, যে সমস্ত শিক্ষক গ্রামে চাকরি পেয়েছিলেন তারা ধীরে ধীরে কলকাতায় বদলি হয়ে যেতে থাকে। অনেকেই কলকাতার সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবে কলকাতায় থেকে যেতে চাইছে। যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত সেই গ্রামের পরিবেশে কে বা থাকতে চায়! উপন্যাসে, মন্টুর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কলকাতা যাওয়ার এই হিড়িক লক্ষ করা গেছে। লেখকের ভাষায়—"আস্তে আস্তে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া পরিচিতদের মধ্যেও এই একই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কেবলই কানে আসতে লাগল অমুক এবার কলকাতা চলে যাবে। অথবা অমুকের এবার কলকাতা যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। অথবা অমুক এবার কলকাতা চলে গেল।"[৬]

লেখক উপন্যাসে কলকাতামুখী প্রবণতা দিনদিন বেড়েছে সেই চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখকের অভিপ্রায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যেভাবে গ্রামীণ সমাজে ভাঙন ধরতে শুরু হয় যা ক্রমে ভয়াবহ রূপ নেয়- কেউ শিক্ষার উদ্দেশ্যে, কেউ সুযোগ সুবিধের কারণে, কেউ আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য, তারই স্পষ্ট চিত্রকেই তুলে ধরা। লেখক এই উপন্যাসে গ্রামের পরিবেশ ও নগরকেন্দ্রিক জীবন যাপনের এই দ্বন্দ্বে মানুষের আবেগ অনুভূতিগুলিও কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মন্টু তার বাবা-মার সঙ্গে কলকাতাতে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে গেলে তিনি বাসি সিঙ্গাড়া খেতে দেন। জ্যাঠামশাই মন্টু ও তার বাবা-মাকে নতুন বাথরুম দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। লেখক গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্বে আসলে

এই পরিবর্তনশীল মানসিকতাটি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। লেখক দেখিয়েছেন দুটি ভিন্ন পরিসরের মানুষের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হতে হতে ক্ষীণ হয়ে আসছে। উপন্যাসে গ্রামীণ লোকাচার বনাম আধুনিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। উপন্যাসে চরিত্রের পোশাক, আচার আচরণে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংঘাত দেখিয়েছেন।

উপন্যাস পাঠে দেখা গেছে, উপন্যাসের চরিত্ররা বার বার নগর-জীবনের ক্লান্তি দূর করতে ছুটে গেছেন ইছামতী নদীর ধারে। বা কেউ গেছেন শান্ত কোন নিরিবিলি প্রকৃতির মাঝখানে। লেখক আসলেই যে গ্রামে বড়ো হয়েছেন, সেই গ্রাম আর এখন নেই। অপুর ছেলেবেলা কাটানোর মতো রমানাথ রায় তাঁর ছেলেবেলাটা বেশ ভালোভাবে উপভোগ করেছেন। লেখক সেই ছেলেবেলা ও গ্রামজীবনের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলার কথাকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

রমানাথ রায়ের 'ভালোবাসা চাই' (১৯৮৩খ্রি.) উপন্যাসের মধ্যেও দেখি, শহরের একঘেঁয়েমি ক্লান্তি কাটানোর উদ্দেশ্যে গ্রামের নদীর পাড়ে গিয়ে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলছে রুরু ও কথক চরিত্রটি। লেখক গ্রাম ও শহরের দিকটিকে তুলে ধরার মধ্যে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কলকাতার বাস্তব চিত্রটি। কথক প্রকৃতির মধ্যে কাটানো সময়টিকে স্বপ্ন মনে করছেন কারণ তা ক্ষণিকের। স্বপ্ন কেটে গেলেই আমাদের এক কঠিন তথা জটিল বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। রাত্রি শেষ হলেই সূর্যের আলোতে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আমাদের সেই নাগরিক জীবনের জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে হবে। কথক উপন্যাসে বলেছেন—

"আমি ভাবতে লাগলাম অফিসের কথা, রাস্তাঘাটের কথা, ট্রাম— বাসের কথা। ভাবতে লাগলাম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা। ভাবতে লাগলাম কিভাবে জনসংখ্যা রোধ করা যায় তার কথা। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল।"[৭]

প্রতিনিয়ত লেখক গ্রাম ও শহরের এই দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন আমাদের বর্তমান সমাজ এক চোরাবালির মধ্যে প্রবেশ করছে এবং তা থেকে আমাদের মুক্তি নেই। কারণ এই নগরে থাকতে হলে আমাদের এসবকিছুকে নিয়েই থাকতে হবে।

'অন্যায় করি নি' (২০০২খ্রি.) উপন্যাসে শহরের শব্দদূষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন লেখক। কিভাবে কলকাতা ভয়ংকর শব্দরূপ দানবের শিকার হচ্ছে। শব্দের হাত থেকে আমাদের কোনো নিস্তার নেই, শব্দই হয়তো একদিন মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বাস, লরি, ট্যাক্সি, টেম্পোর শব্দ মানুষের জীবনে চূড়ান্ত অস্থিরতা এনে দিচ্ছে সেসব প্রসঙ্গকেও তুলে ধরেছেন। ইন্দ্রের জবানীতে লেখকের নগর জীবনের ক্লান্তি, গতানুগতিক জীবন ও অস্বস্তিকর

পরিবেশটির অন্তরালে আসলে রমানাথ রায় এই উপন্যাসে তাঁর জীবনদর্শনটিকেই তুলে ধরেছেন। মানুষ কিভাবে তাঁর বেঁচে থাকার মধ্যে যে আনন্দ সেই আনন্দকে হারিয়ে ফেলছেন। লেখক আসলে উপলব্ধি করেছেন কলকাতা শহরে বসবাসকারী মানুষদের জীবনের জটিলতাকে, যেখান থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সেই আড্ডা, বন্ধুদের হৈ হুল্লোড়।

'স্বেচ্ছাচারী'(২০০৬খ্রি.) উপন্যাসের মধ্যে গ্রাম ও শহরের মানুষজনকে ঘৃণ্য রাজনীতি কিভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে তার স্পষ্ট ছবি রয়েছে। রমানাথ রায় নিজের চোখেই দেখে গেছেন শহরের রাজনীতির থেকে বর্তমানে গ্রামের রাজনীতি কতটা বিষাক্ত হয়েছে। তিনি বিশ্বজিৎ পাণ্ডাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

"শহরের রাজনীতির ঘোঁট আছে। দেখুন, আমি গড়পাড় রোডে থাকি। একেবারে শহরের মধ্যস্থলে। এখানে আমি কী রাজনীতি করি, না করি, তাতে কারও কিছু যায় আসে না। এবং কেউ, পাড়ার কেউই তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এটা সম্ভব নয়। গ্রামের সকলেই জানবে যে এই লোকটা এই করে, এই লোকটা এই করে, এই রাজনীতি করে।"[৮]

লেখক বর্তমান যুগের গ্রাম ও শহরজীবনের অত্যন্ত সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে বারবার কথা বলেছেন। লেখক গ্রামের মানুষদের বর্তমান দুরবস্থার চিত্রটিকেও তুলে ধরেছেন। লেখক উপন্যাসে আরও একটা বিষয়কে তুলে ধরেছেন। লেখক উপন্যাসে সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধনের রূপান্তরকেও তুলে ধরেছেন। গ্রামের আত্মীয়তা, প্রতিবেশী সম্পর্কের ভাঙন দেখিয়েছেন। কথক তাঁর বোনকে বিপদের সময় আত্মীয়দের কাছে রাখতে চাইলে কেউই কিন্তু তাকে রাখতে রাজি হননি। কথকের বোনকে টাকার বিনিময়েও কেউ রাখে নি। কারণ এখন আর সেই গ্রাম নেই, গ্রামের মানুষ ক্রমে বদলে গেছে। বরং সেক্ষেত্রে শহরের ছোট্ট একটি সুবিধের কথায় লেখক বলেছেন-

"আজকাল শহরে অনেক মহিলা নিবাস তৈরি হয়েছে। সেখানে মেয়েরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।"[৯]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষদের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে লেখক তা দেখেছেন নিজের চোখে। শহরের হাওয়া লেগেছে গ্রামের গায়ে তাই আত্মীয়দের মধ্যে আর সেই আত্মিক টান লক্ষ করা যায় না। লেখক শহর জীবনের একঘেঁয়েমি, ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে ছুটে গেছেন সেই প্রকৃতির কাছে। রমানাথ রায় গ্রাম ও শহরের প্রসঙ্গ উল্লেখের মধ্য দিয়ে যেমন শহরের মানুষদের পরিবর্তনের চিত্রটিকে তুলে ধরছেন ঠিক তেমনি পরিবর্তনশীল গ্রামজীবনের বাস্তব চিত্রটিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। রমানাথ রায় উপন্যাসে

গ্রাম ও শহর জীবন বর্ণনার মধ্য দিয়ে দুটি আলাদা জীবনদর্শন ও মানসিক জগতকে তুলে ধরেছেন। তিনি একদিকে যেমন তুলে ধরেছেন গ্রাম জীবনের সহজ সরল দিক তেমনি তিনি সেই গ্রাম জীবনের পরিবর্তিত রূপের চিত্রটিকেও তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। তিনি শহর জীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও মূল্যবোধের সংকট কিভাবে গ্রামজীবনকে গ্রাস করে ফেলছে তারও চিত্র দেখতে পাওয়া যায় উপন্যাস পাঠে। গ্রাম থেকে শহরে আসা চরিত্রগুলির জীবনে চিন্তাজগত ও মানসিক জগতের রূপান্তরটিকেও লেখক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রয়োজন বা সুযোগসুবিধের তাগিদে মানুষের শহরমুখী করে তুলেছেন অন্যদিকে শহরমুখী মানুষদের নিজের শেকড়, মানবিক মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলার বেদনাকেও উপন্যাসে দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস পাঠ আধুনিক জীবনের অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদের অন্তর্নিহিত সংকট ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

**তথ্যসূত্র :**

১) নির্মল দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, প্রথম দেজ সংস্করণ: জুলাই ১৯৯৭, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৪৩
২) উল্লেখসূত্র- ১ পৃ. ১৯০
৩) বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, 'কলম রেখে কথা হোক', সৃষ্টিসুখ, প্রথম মুদ্রণ জুন ২০২৪, পৃ. ১০৩
৪) রমানাথ রায়, উপন্যাস সমগ্র, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১
৫) উল্লেখসূত্র- ৪ পৃ. ১৪
৬) উল্লেখসূত্র- ৪ পৃ. ২০
৭) উল্লেখসূত্র- ৪ পৃ. ১৫৪
৮) বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, 'কলম রেখে কথা হোক', সৃষ্টিসুখ, প্রথম মুদ্রণ জুন ২০২৪, পৃ. ১০৫
৯) রমানাথ রায়, উপন্যাস সমগ্র, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭২২

**রাজীব রজক**

## আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘সীতায়ন’

আর্য শব্দের বিপরীত হল অনার্য। আর্য হল শ্রেষ্ঠ, মার্জিত রুচিশীল জনগোষ্ঠীর প্রতীক। অপরদিকে অনার্য গোষ্ঠীকে এক অসভ্য, বর্বর জনগোষ্ঠী রূপে পরিচিত করানো হয়। প্রাচীন যুগে একদল জনগোষ্ঠী ভারতের বুকে হানা দেয়, তারা এখানকার মূল নিবাসীদের পরাজিত করে, নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে। শাসন চালায় এখানের আদি নিবাসী অর্থাৎ যাদের তারা অনার্য বলে তাদের উপর।

মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘সীতায়ন’ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। তিনি রামায়ণের ‘উত্তর কাণ্ডে’র চিরপরিচিত রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসনের ঘটনাকে সামনে রেখে কাহিনির পুনঃনির্মাণ ঘটিয়েছেন। তাঁর রচনাতে দেব-দেবী পুরাণের মহিমা ছেড়ে বাস্তব সম্মত রক্ত মাংসের মানবে পরিণত হয়েছে। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে সীতাকে সামনে রেখে নারীর অধিকারের কথা, নারীর ব্যক্তিত্ব ও যুক্তিবাদী চেতনার কথা বলেছেন। এছাড়া শম্বুককে সামনে রেখে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে দেখিয়েছেন।

‘সীতায়ন’ উপন্যাসটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনি যদি রামায়ণ হয়, সীতাকে উপজীব্য বিষয় করে রচিত কাহিনির নাম সীতায়ন হওয়ায় স্বাভাবিক। কাহিনির মূল বিষয় রামায়ণের সীতাকে কেন্দ্র করে রচিত। সীতার নির্বাসন, সীতার মুখে রামের সমালোচনা, আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও শুদ্রায়নের মতো বিষয়গুলি উপন্যাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। রামচন্দ্র, অগস্ত্যমুনি, বাল্মীকি এরা হলেন আর্য সমাজের প্রতিভূ, অন্যদিকে রাবণের রাক্ষস বংশ, শম্বুক, ত্রিশিরা, বারুণী এরা হল অনার্য সমাজের প্রতিনিধি।

উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রথম অনার্যদের পরিচয় পাই। তারা ঘন অরণ্যের একপার্শে থাকা তৃণভূমিতে গাভী শিকারে ব্যস্ত। অনার্যরা তাদের আদি প্রতিনিধি বারুণীর কাছে তাদের সম্প্রদায়ের অতীত বীরত্বের কাহিনি শোনে। যেখানে রামচন্দ্র অন্যায় যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ ও রাবণকে পরাস্ত করে। অনার্যদের রাজা রাবণ রামের কাছে পরাজিত হয়, তাই বিভীষণ বর্তমানে রাজা। বিভীষণকে রাজা না বলে রামের হাতের পুতুল বললেই ভালো হয়। সে অনার্যদের রক্ষা করার পরিবর্তে তাদের নির্যাতিত হতে দেখতেই বেশি পছন্দ করে। অথচ এই অনার্যদের একসময় রাজা ছিল, সুখের জীবন ছিল। এই জঙ্গল, জঙ্গলের ফুল-ফুলের প্রতি প্রথম অধিকার অনার্যদের। আর্যরা এসে অনার্যদের উচ্ছেদ করে। অনার্যদের সমস্ত সম্পত্তিতে ভাগ বসায়। সীতা আর্যদের এই কাজকে বারবার সমালোচনা করেছে। সীতা বলেছে—

"অনার্য মানুষগুলি যুগ যুগ ধরে অরণ্যভূমির বাসিন্দা ছিল। ওই অরণ্যের ইঙ্গুদি, আমলক, বিল্ব খেয়ে তাদের পিতৃপুরুষেরা বেঁচে থেকেছে, তারাও ওই ফলের অধিকারী। শুষ্ক বৃক্ষ থেকে তারা সহস্র বছর ধরে অরণি সংগ্রহ করেছে, ওই তমসা, সরযু, গঙ্গা, মন্দাকিনীর জল থেকে চিরদিন তারা মৎস্য শিকার করেছে। কিন্তু আর্য ঋষিরা জনপদ ত্যাগ করে অরণ্যভূমি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বনের ঐশ্বর্যে টান পড়ল। অনার্যদের খাদ্যের উৎস কমে গেল।"[১]

অনার্যরা নিজেদের আহারের তাগিদে একসময় গো হত্যা করে। গো হত্যার ঘটনায় অনার্যরা শঙ্কিত হয়। আর্যরা এই ঘটনার শাস্তি দিতে চায়। ভাবী আর্য আক্রমণের আশঙ্কায় তারাও অভ্যন্তরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। তরতাজা নবীন অনার্যরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও অরণ্যের উপর নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে চায়। তাই তারাও সংঘবদ্ধভাবে জোট বাঁধতে শুরু করে। শম্বুক ভাবী প্রজন্মকে এক স্বচ্ছন্দ জীবন দানের জন্যে আর্যদের অর্থাৎ রামচন্দ্রের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। তাদের সংখ্যা অল্প, তাদের অস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও তারা এই পথ বেছে নেয়। কেননা, তারা বুঝতে পারে কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে বীরত্বের মৃত্যু অনেক গৌরবজনক। অনার্যরা তাদের বংশধর লবনাসুরের পক্ষ নেয়। কিন্তু অন্যায় যুদ্ধে শত্রুঘ্ন লবনাসুরকে হত্যা করে। আসলে আর্যরা শঠতাকে হাতিয়ার করে যুদ্ধ জয় করলেও অনার্যরা তা করেনি। তারা কোন ভাবেই নিজেদের সততাকে বিসর্জন দেয়নি। আর্যদের ব্রাহ্মণরা ছিল সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর। তারা বর্ণাশ্রম প্রথা চালু করেছেন নিজেদের স্বচ্ছন্দ জীবনলাভের নিমিত্তে। উপন্যাসে দুন্দুভির কথাতে জানা যায়—

"সুকৌশলে তারা অন্যের শ্রমার্জিত শস্য, বস্ত্র, তৈজস ভোগ করে, রাজন্যেরা আছে ওই ব্রাহ্মণদের রক্ষাসাধনের জন্য, যখনই ওরা বলে আমরা উৎপীড়িত, অসুরদের বিনাশ করো তখনই রাজন্যেরা সসৈন্যে ছুটে আসে আমাদের মারতে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি লবণবধে রামকে "উত্তেজিত করার জন্য ঋষিরা বলেছিল, প্রজার কর্মের ও ব্রাহ্মণের তপস্যার ষষ্ঠভাগ ভোগ করেও যে রাজা তাদের রক্ষা না করে, সে ঘোর নরকে যায়। এই সব নরক, তপস্যার ফল ভোগ, এর কোনও প্রমাণ, আছে। এ সবই ওদের কূটকৌশলে তৈরি করা পাশার দান।"[২]

অনার্যরা যুদ্ধে পরাস্ত হলে ব্রাহ্মণরা চেয়েছে তাদের শূদ্রায়ন করতে। কেননা শূদ্রায়ণ করলে বিনা রক্তপাতে অনার্যদের করায়ত করা যাবে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে সতর্কের নির্দেশিত পথে সবাই শূদ্র হয়, একমাত্র শম্বুক ছাড়া। অনার্যরা আর্যদের আচার-সংস্কার ও বশ্যতা মেনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। শম্বুক কিন্তু এই শূদ্রায়ণের মতো বিষয়টিকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনে শূদ্রায়ণ বুকের মধ্যে কাঁটার

মতো বিঁধতে থাকে। যুদ্ধে পরাজয়য়, নিজের দলের মানুষদের কাছে ছোট হয়ে যাওয়া এবং মিত্রার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শম্বুক হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে। অন্যান্য অনার্যরা আর্যদের পাদুকা তৈরি করাকে পেশা হিসাবে বেছে নিলেও, শম্বুক তাদের থেকে আলাদা। সে সারাদিন আঁক কাটে, রুদ্রদেবের মূর্তি বানায়। একসময় শম্বুক উপলব্ধি করে সে কারো থেকে ছোট নয়। অগস্ত্য মুনির কথা-তার অনার্য হওয়া কখনো নিকৃষ্ট হওয়ার মানদণ্ড হতে পারে না। সে বলে—

"সে ওই রাজন্য রামের থেকে নিকৃষ্ট মানুষ এটা কীসে প্রমাণ হল। কে ঠিক করে দিল ওই ব্রাহ্মণ অগস্ত্য আর বাল্মীকি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাকে কিছু করে দেখাতেই হবে, এই জনের মানুষেরা সব মেষবৎ হয়ে গেছে, পথ দেখিয়ে শম্বুক প্রমাণ করবে তারাও মানুষ।"[৩]

তাই সে একসময় নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে রুদ্রদেবের সামনে তপস্যায় বসে।

আর্য সমাজের প্রধান স্তম্ভ ছিল ব্রাহ্মণরা। তারা নারী ও শূদ্রদের পুজোর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই শম্বুক তপস্যা করলে ব্রাহ্মণরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা কখনো চায় না কোন শূদ্র তপস্যা করুক। কেননা বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ তপস্যা করলে ব্রাহ্মণদের গুরুত্ব কমে যাবে, কেউ আর তাদের মান্য করে চলবে না। তাই দণ্ডকারণ্য, নৈমিষক্ষেত্র, অযোধ্যার ব্রাহ্মণরা শম্বুককে দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে সমবেত হতে শুরু করে। শম্বুকের প্রাণনাশকে অগস্ত্যমুনি দণ্ড বিধান করে। অগস্ত্য মুনি প্রথমে রামচন্দ্রকে শম্বুক নিধন থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল। কারণ যে রামচন্দ্র প্রজা গুঞ্জনের কারণে প্রাণপ্রিয় পত্নীকে বিসর্জন দেন, সে একজন শূদ্র প্রজাকে তপস্যার কারণে কখনো নিধন করবে না। তাই সমস্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন।

অগস্ত্য, কাশ্যপ, সৌদগণ্য, কাত্যায়ন, গৌতম, নারদ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রের ব্রাহ্মণ সেবা-পরায়ণ মনোভাবকে কাজে লাগাতে চেয়েছে। তারা এতদিন যাবৎ দেখে এসেছে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদের জন্যে বিনা প্রশ্নে সমস্ত কিছু কাজ করে এসেছেন। তাই তারা রামচন্দ্রের মাথায় ঢোকাতে চেয়েছে, শূদ্রের এই তপস্যা করা ঘর অন্যায়। এতে রাজ্যের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। নারদ বলেন—

"আমি নিশ্চিত নই। নারদ বললেন, আসুন আমরা সকলে মন্ত্রণা করি, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাকে দেখলে রামচন্দ্র রাজি হবেন। রাম ধর্মানুসারী, তাকে বোঝাতে হবে শম্বুকের এই কাজ ঘোর অধর্ম। অগস্ত্য শান্তভাবে বলতে থাকেন। বোঝাতে হবে এতে রাজ্যের সমূহ বিপদ হবে।"[৪]

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে কোন এক ব্রাহ্মণের পুত্র মারা যায়। আর এই বিপ্র সন্তানের অকাল মৃত্যুর কারণ হিসাবে শম্বুকের তপস্যা করাকে দায়ী করা হয়। নারদ সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ রামের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এই রাজ্যে পূর্বে কোন অকাল মৃত্যু হতো না,

কিন্তু বর্তমানে শূদ্রকের তপস্যা রাজ্যের অমঙ্গল সাধন করছে। তাই এই অনাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটাই উপায় শূদ্র তপস্বীর নিধন। আসলে ব্রাহ্মণরা কোনোদিন চায়না তাদের স্থানটি অন্য কেউ অর্জন করুক। তাই রামের মতো ক্ষত্রিয় বীরদের কাজে লাগিয়ে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পথকে সুগম ও পদকে সুঠাম করতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণদের এই ছল-চাতুরী রামের চোখে না ধরা পড়লেও সীতার চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই একসময় সীতা বাল্মীকে বলেছেন—

"ওঃ, তাই, তাই অযোধ্যারাজের নির্বাচন! মহর্ষি অগস্ত্য তাঁকে দিয়ে আর কত অধর্মাচরণ করাবেন?"[৫]

ঘটনায় অগ্রগতির সঙ্গে দেখি রামচন্দ্র শম্বুকের নিকট আসেন। প্রথমত শম্বুকের পরিচয় জানতে চায়, পরিচয় জানার পর শূদ্র হয়ে তপস্যা করার অপরাধে তাকে দিব্যদর্শন খড়্গ দিয়ে হত্যা করেন। শম্বুকের মৃত্যুতে মিত্রা উন্মাদের মতো হাহাকার করতে থাকে। অনার্যের দমন করে রামচন্দ্র পরম তৃপ্তিতে অগস্ত্যের আশ্রমে ফিরে যান।

আসলে ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে রামায়ণের কাহিনিকে সামনে রেখে সমাজ বাস্তবতার কথা তুলে ধরেছেন। সমাজে প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথা যে কতটা হিংস্র হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাই বলতেই হয় মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'সীতায়ন' উপন্যাসে খুব সচেতনভাবে আর্য-অনার্যদের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

**তথ্যসুত্র :**

১। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। সীতায়ন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৩৩

২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮০

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১০৮

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১১৪

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১১৯

উজ্জ্বল প্রামাণিক

## 'নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা' : প্রসঙ্গ কমল চক্রবর্তী ও তাঁর গল্প

"আমার বসন্ত বেলা কেটে যায় ফার্নেসের পাশে
চারিদিকে জমাট কার্বন
দেওয়ালে ঝোলানো হাত, মানুষের দীর্ঘ আঙুল
আর তার পাশাপাশি লোহার সাড়াশি
কীভাবে সে সন্ধ্যা আসে?
দূর কোন মাঠ
শেষ ফাগুনের সেই লাজুক বৃষ্টি"

('চার', 'জল'- কমল চক্রবর্তী)

জামশেদপুরের টাটা কারখানার চিমনির ধোঁয়ার নিচে, গলিত লোহার হাঁপরের পাশে বিষাক্ত কার্বন হজম করেও যিনি অন্যের হৃদয়কে ফটোসিন্থেসিসের সবুজ আলোয় বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখতেন তিনি 'বৃক্ষনাথ', তিনি কমল চক্রবর্তী। ভালোপাহাড়ের স্রষ্টা। যাঁর চোখ দুটি বৃক্ষের মতোই কোমল অথচ মেকি নগর সভ্যতার অসভ্য চাকচিক্যের প্রতি ঝরে পড়ে একরোখা তীব্র ঘৃণার আক্রোশ। পুরুলিয়ার শুখা মাটিতে সবুজায়ন ঘটাতে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। অরণ্যসংকুল আদিবাসী জীবনের সুস্থতার জন্য জারি ছিল যাঁর অদম্য লড়াই। তাঁর 'প্রিয় ফরেস্টার' হাতে নিলেই মনে হয় বোধিবৃক্ষের মূলে দাঁড়িয়ে বৃক্ষপূজারী উপনিষদের সম্যক বাণী প্রচার করছেন,

"বৃক্ষ আরাধ্য! বৃক্ষ সেবক প্রয়োজন! বৃক্ষ বোধ বা বৃক্ষ দর্শন প্রয়োজন।" (বৃক্ষ বেদ)

তাঁর হাত দুটি কলম নয় মাটি কোপানোর কোদাল, গাঁইতি ধরতে চেয়েছে সবার আগে। সাহিত্য বিশ্বকে বাঁচাবে না, বৃক্ষ বাঁচাবে। বৃক্ষ বন্দনাই তাঁর দর্শন। সে দর্শন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব দর্শন। একজন অক্ষরকর্মী হিসাবে তিনি সেই চেতনার প্রজ্ঞা-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। নির্জন প্রান্তরে বসে তাঁর কলমে ঝরে পড়েছে গাছ-গাছালির সবুজ স্বপ্নের এক নিষ্পাপ, পবিত্র ভোরের আখ্যান।

১৯৪৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর কমল চক্রবর্তীর জন্ম বাংলাদেশের বিক্রমপুরে। এক দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলামায়ের কাঙাল ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন তিনি। তিন ভাই, চার বোনের নিত্য অভাবের সংসারে অনাহার আর অভুক্তিকে সঙ্গী করে তাঁর শৈশব থেকে কৈশোর হয়ে যৌবনে পদার্পণ। এরপর এলেন কলকাতায়। ১৯৬৬ তে বিষ্ণুপুরের কে জি ইঞ্জিয়ারিং

কলেজ থেকে মেকানিক্যাল পাস করে জামশেদপুরের টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড লোকমেটিভ কোম্পানি লিমিটেডের কাজে যোগ দিলেন। শ্রমজীবনের পাশাপাশি চলতে লাগল সাহিত্যযাপন। তাঁর লেখা 'সূর্যের বুকে ফসিলের নীড়' নাটকের অভিনয় সাড়া ফেলে দিল মঞ্চকেন্দ্রিক সাহিত্য মহলে। পরিচিতি বাড়ল কমলের। জামশেদপুরে বসেই একঝাঁক উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে মলাটবন্দী করতে নেমে পড়লেন মাঠে। জন্ম দিলেন 'কৌরব' পত্রিকার। ১৯৯৬, ভালোপাহাড়ে জমি কেনা হল, নক্সা হল। গড়ে উঠল প্রাণের প্রতিষ্ঠানে- পশুকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র। সবমিলিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ। পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধির আয়োজন। অন্ধকারে বুকে একমুঠো আলোকবহ্নি! এ হেন কমল সমাজ জীবনে যতটা বর্ণময়, সাহিত্যের জগতেও ঠিক ততটাই। তেরোটি কাব্যগ্রন্থ, কুড়িটা নাটক, ত্রিশটির বেশি উপন্যাস, একডজন গল্পগ্রন্থ আর দেড়শটার বেশি ছোটগল্প নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্বভূমি রচনা করেছেন। তবু আক্ষেপের কথা, বাংলা সাহিত্যের অলিগলিতে কান পাতলে শোনা যায় কমল চক্রবর্তী আজও বহুচর্চিত নয়! মৃত্যুর আগে তো নয়ই! বাঙালি পাঠক লেখকের প্রতি যেটুকু আগ্রহ দেখিয়েছেন মৃত্যুর পর! কলেজস্ট্রিটগামী পাঠক ফুটপাতের উপর বুকস্টলে সাজানো 'কৌরব' পত্রিকা হাতে তুলে নিল। আর কফি হাউসে কবি-আড্ডায় দু'চারজনের মুখে কমলের কবিতা স্তুতি শোনা গেল। এর বাইরে গদ্যকার কমল নিয়ে তেমন চর্চা নেই! উইকিপিডিয়া বা ইনফিনিটি নেট ঘাটলেও তেমন লেখা চোখে পড়ে না! বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার তালিকাতেও তেমন আলোচনা কই! এই উপেক্ষার মাঝেও ব্যতিক্রমী কেউ কেউ আছেন! 'গহন' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক মোস্তাক আহমেদ তৃতীয় সংখ্যায় 'কমল চক্রবর্তী' তর্পণ করেছেন। ৬৫০ পাতা জুড়ে তাঁর কমল-কথার আয়োজনকে কুর্নিশ জানাতেই হয়।

গদ্যকার কমল চক্রবর্তীকে নিয়ে অলস বাঙালি পাঠকের উত্তেজনা কম থাকার একমাত্র কারণ তাঁর সাহিত্য-সংরূপ প্রচলিত ভাবনা থেকে আলাদা। অথচ প্রথা ভাঙার প্রথাতে তিনি হাঁটলেন না! নিম সাহিত্য, হ্যাংরি আন্দোলন, শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্য আন্দোলন কোনো কিছুতেই তেমন আগ্রহ ছিল না তাঁর। স্বঘোষিত শ্লোগানমুখী সাহিত্য ধারা একপ্রকার উপেক্ষা করে বহির্বঙ্গে বসে বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী স্বর উচ্চারণ করলেন তিনি। ছক ভাঙা জীবনের মতোই ছকভাঙা গদ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্য অভিজ্ঞান। গত শতাব্দীর সাতের দশকে কমল চক্রবর্তী যখন বাংলা গদ্যে এলেন তখন অনেকেই তাঁকে বাতিলের দলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু 'প্রিয় ফরেস্টার'কে আটকাবে কার সাধ্যি! সাহিত্যিক বিমল কর নাকি উপন্যাসটির ধারাবাহিক বন্ধ করে দিয়েছিলেন! পরবর্তীকালে জমে থাকা সেই রাগ, অভিমানকে তিনি ব্যক্ত করেছেন এক সাক্ষাৎকারে,

"বিমল কর নাকি সাহিত্যিক! অসম্ভব শূন্য কথা। তিনি যদি সাহিত্যিক হন তাহলে কীভাবে 'প্রিয় ফরেস্টার' বন্ধ করতে পারেন! ওই ল্যাঙ্গুয়েজ, ওই দ্যাখা, ওই জঙ্গল নিয়ে কথা বলা পারবেন না কোনোদিন। অন্ততপক্ষে হাজার জন বলেছেন, 'আরণ্যক'-এর চেয়ে 'প্রিয় ফরেস্টার' বেটার লেখা। বলেছেন যে 'আরণ্যক' এ আছে অরণ্যবাসীদের কথা, আর এখানে আপনি গাছেদের মানুষ করে দিয়েছেন। গাছ এখানে নায়ক-নায়িকা। গাছেরা এখানে কথা বলেছে, প্রকৃতি কথা বলেছে।" (কবি সম্মেলন, শারদ সংখ্যা ২০২৪)

আসলে পণ্যসাহিত্যের বেস্টসেলারের বিচার্যে বাংলাসাহিত্যে যখন লেখক বাছাই চলছে তখন নামি প্রকাশনার চোখের আড়ালে কমল থেকে গেলেন ঝাড়খণ্ড সীমান্তে জল-জঙ্গল-পাহাড়-মাটি আদিবাসী মানুষের অন্তরালে। সাহিত্যে সুনীল- শক্তি- উৎপল -শরৎকুমার-সন্দীপ ঘিরে যখন গড়ে উঠল লোকমনোরঞ্জনের স্তুতি তখন তিনি থেকে গেলেন আত্মদীপ্ত অস্তিত্বের আবডালে! বাস্তব-অবাস্তব, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছের রহস্য কাটিয়ে এক সর্বব্যপ্ত মুক্তির সঞ্চারে তাঁর কলম চলতে লাগল বিমূর্ত আলোর সন্ধানে।

তিনি গল্পকে এনে ছেড়ে দিলেন ছোটগল্পের বাঁধা ছকের বাইরে। এক অপরিসীম অকৃত্রিমতায় গল্পের গতি নিজস্ব ভঙ্গিমায় এগোতে লাগল। 'পৃথিবীর এক টুকরো অনিমেষ' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র অনিমেষ একজন স্বভাব লাজুক, পেশায় অধ্যাপক মানুষ। সহকর্মী রীনা যথেষ্ট সুন্দরী, বৈভবশালী। রূপের আকর্ষণে অনিমেষকে সে কাছে টানতে চায়। নিজের ফ্লাটে নিয়ে যায়। রোহিত আর রীনার একসময় বিয়ে হয়েছিল, তাদের সন্তান রোহন। রোহিত এখন আমেরিকাতে থাকে, কোন যোগাযোগ রাখে না তাদের সঙ্গে। ছেলেটা প্রথম সাক্ষাতে অনিমেষকে বাবা বলে ডাকে। রীনা প্রথম অবস্থায় ভেবেছিল রোহনের উপস্থিতি, বাবা বলে ডাকা হয়ত অনিমেষের চোখেমুখে হতাশার ছাপ ফেলতে পারে তাই কাজের মেয়েকে দিয়ে তাকে সরিয়ে নিতে বলা হয়। কিন্তু এতে প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত! অনিমেষ কোন রকম উদ্বিগ্ন দেখালো না, বরং রোহনকে কাছে টেনে নিল,

"--রোহনকে আমার কাছে আসতে দাও রীণা, ও বোধহয় কাঁদছে। অনিমেষ এ বাড়িতে ঢুকে প্রথম কথা বলল।" (পৃ.- ১৬২)

সম্পর্ক এগিয়ে চলল নিজের গতিতে। নিত্যদিন তাদের দেখা হয়, প্রচুর কথা হয় কাজের, অকাজের! কাছাকাছি আসা হয়, লোকমুখে কটূক্তি শোনা হয়! অনিমেষ রোজই আসে রীণার ফ্লাটে। তবে রীণার জন্য যতটা না আসে, রোহনের টানে বেশি। তার পরিচর্যা করে, পার্কে নিয়ে যায়, গান শোনায়, ঘুম পাড়ায়। পিতার মতোই সব দায়িত্ব সামলে দেয়। রীণা খানিকটা অবাক হয় কিন্তু বাধা দেয় না। এভাবেই বছর দেড়েক পর রীণা চাইল এই

সম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতি পাক। হঠাৎ করে গল্প অন্য পথে মোড় নিল। রোহন একটা চিঠি এনে অনিমেষকে দিল,

প্রিয় অনিমেষ,

ফরাসি গভর্নমেন্টের স্কলারশিপ নিয়ে চললুম। কবে ফিরব, আদৌ ফিরব কিনা জানি না। তোমাকে জানাতে পারিনি বলে লজ্জিত। আমাকে তুমি অন্তত ভুল বুঝো না। তুমি আমার জীবনে সবথেকে বড়ো আশীর্বাদ। রোহনের তুমি একমাত্র আশ্রয়। আমার স্থাবর-অস্থাবর সমান্য যা আছে তোমায় দিয়ে গেলুম। সব তোমার। অন্য কেউ হলে বলত প্রতারণা করেছি। কিন্তু জানি তুমি বুঝবে, কোনো কিছু ভেবে করিনি, যেভাবে যা হল। রোহনের তুমি বাবা মা। সে আমার কোনো অভাব অনুভব "করবে না জানি। তুমি ওকে যা দিয়েছ তা আজ পৃথিবীতে দুর্লভ। তুমি, রোহন সুখে থাকো। আমাকে ভুল বুঝো না।

তোমার রীণা। (পৃ.-১৭০)

এরপর যা ঘটল তা সাধারণ পাঠকের হজম করার মত ক্ষমতা তৈরি হয়নি এখনো। পুরো ব্যাপারটিতে অনিমেষের নির্লিপ্ততা অনেক প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় আমাদের। চির আকাঙ্ক্ষিত দুটি নর-নারী প্রেম সম্পর্কে আঘাত করলেন গল্পকার। রোহনকে নিয়ে অনিমেষ পার্কের দিকে এগিয়ে চলল। পার্কের যে দোলনাতে রীনাকে বসিয়ে ভালোবাসার দোদুল দোলায় দুলতে চেয়েছিল অনিমেষ সেখানে আজ ঝরে পড়ছে বাৎসল্য প্রেম!

'গেস্টাপোর দিনগুলি' গল্পের পারমিতা অসীম নামে এক বিবাহিত পুরুষকে ভালোবাসে। কিন্তু সে তার সংসার ভাঙতে চায় না। অথচ তার ভালোবাসার পুরুষটির সঙ্গে পরিপূর্ণ একটি সংসার করার বাসনা জাগে। পাখি পাখি জীবন থেকে একটি স্থির বাসা খোঁজা জীবনের স্বাদ পেতে চায়। অফিস ফেরার পথে দু-তিন ঘন্টার আড্ডা নয়, যে সঙ্গ অসীম তার স্ত্রীকে দেয় তার পুরোটা পেতে চায়। ঘরে স্ত্রী, কন্যা তাই এই সম্পর্কে থাকাটা কখনোই সম্ভব না অসীমের পক্ষে! সমস্যা অনুভব করে পারমিতা ছয় মাসকে কমিয়ে তিন মাসে নিয়ে আসে। এই তিনমাসের জন্য নিজের ফ্ল্যাটে গৃহস্থালির যাবতীয় উপকরণ নিয়ে আসে। তারা স্বামী-স্ত্রীর মতোই সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, রাগ, অভিমানে কাটাতে চায়। একজন নারীর যাবতীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে চায় পারমিতা এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই,

"আমি তোমাকে তিন মাস চেয়েছি। ভাবছ কেন? তোমার আনন্দে আমার শরীরে গর্ভসঞ্চার হোক। আমি শুধু একবার টের পেতে চাই, আমার গর্ভধারণের ক্ষমতা আছে। আঃ! এ আনন্দ!"(পৃ.-৩১)

গল্পের শেষে দেখা যায় তিন মাসের চুক্তি শেষ হলে অসীম তার পরিবার পরিজনের

কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে পারমিতা সত্যি সত্যি প্রেগনেন্ট। অসীম স্বার্থপরের মতোই বলতে বাধ্য হচ্ছে অ্যাবরশন করিয়ে নিতে। পারমিতার চোখে মুখে গাঢ় অভিমান, আক্ষেপের সুর,

"না আমি কথা দিচ্ছি, রাখবো না। রাখার জন্য চাইনি। ঘরসংসারের ওটাই শেষ খেলা।" (পৃ.-৩৩)

মিথ্যা মিথ্যা সংসার খেলায় তার মূল্য এতটুকুই ছিল। অথচ গল্পে পুরুষটিই নারী অনুগত। পারমিতাই এই গল্পের চালক। তার নিজেকে নিজের ইচ্ছামতো ভোগ করতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত। তার দায়িত্ব তার নিজেরই। অন্য কারও নয়। নারীর এই আত্মনিবেদনে নারীবাদীরা হয়তো পুরুষতন্ত্রের স্বীকৃতি অনুভব করবেন। কিন্তু সময়ের স্রোতে পুরুষতন্ত্রবাদ আর নারীবাদের বৈষম্য পালটে যায় শরীর ও মনের অতৃপ্ত বাসনার কাছে।

'আম-কাঁঠালের লতা' প্রেম-প্রকৃতি-নারীর ত্রিবেণী সংগম। সোমনাথ আসানসোলে কাজ করে, মোহনা কলেজে পড়ায়। দুটিতে প্রেম ছিল, বিয়ের কথা ছিল! পরিকল্পনার অন্ত্য ছিল না, "এখন তো বিয়ে করতে কোন বাধা নেই? দু'খানা ঘর, রান্না ঘর, বড়ো বাথরুম, দুজনে এক সঙ্গে স্নান করা যায়।" অথচ কোথা থেকে কি হয়ে গেল! সোমনাথ ছন্দাকে বিয়ে করল, এক সন্তান হল। এ বিয়ের কথা মোহনাকে কখনও মুখ ফুটে বলতে পারল না সে। আজ পাঁচ বছর তিন মাস পর মোহনার কোয়াটার্সের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। দরজা খুলে দিয়েছে সেই চিরকাঙ্ক্ষিত নারী, যার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। কিন্তু সে নারীর চোখে মুখে কোন বেদনার চিহ্ন নেই, ভেঙে চুরে যাওয়ার কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। একেবারেই সহজ ভঙ্গিমায় সোমনাথকে ডেকে নিল বাড়ির অন্দরে।

"কথা বলতে বলতে পাঁচ বছর আগের মোহনার মতোই উজ্জ্বল, সে সোমনাথের সামনেই পোশাকপালটে শর্টস আর গেঞ্জি পরে নিল। মেঝেতে সতরঞ্জি বিছাল। একটি পরিপূর্ণ মোমের পুতুলের মতো, পদ্মাসন, হলাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন, দুরূহ সব আসন করতে লাগল। অপূর্ব সুন্দরী সেই যুবতী নওল কিশোরির মতো লাবণ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল।" (পৃ.-১৫৩)

যোগাভ্যাস আর নিবিড় প্রকৃতির পরিচর্চায় জীবনের সমস্ত কষ্টের দাগ মুছে ফেলেছে মোহনা। সোমনাথের দূর্বল চিত্তে চাঞ্চল্য থাকলেও মোহনা ধীর, স্থীর, সংযমী। সে ত্যাগ ও ধৈর্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিখাদ সোনা মতো করে তুলেছে। সোমনাথকে সে আগের মতই ভালোবাসে অথচ কোন দোষারোপ করেনি। সমস্ত ব্যক্তিপ্রেম রূপান্তরিত হয়েছে

প্রকৃতি প্রেম। সোমনাথের ভালোবাসাকে মনের মণিকোঠায় জমিয়ে রেখেছে মৃত মাধুরির কোণার মতোই। উদ্যান-অরণ্য-ঘাসজমি-ট্যাঁরাজমি টবে লাগানো ফুলের গাছ সবকিছুর মধ্যে বেঁচে আছে তাদের প্রেম। গল্পের বয়ানে উঠে এসেছে সে অপরিসীম অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর;

"সোমনাথ অবাক হয়ে দেখছে। অবিশ্বাস্য। আমলতা কিংবা বেললতা।—আমি তো সেসব মজা করে বলেছিলুম মোহন। সব আজগুবি চিন্তা মাথায় আসত আর তোমায় বলতুম, তুমি বিশ্বাস করেছ। তুমি করে ফেলেছ। সোমনাথের চোখের কোনা সত্যি উত্তরে হাওয়ায় জল এনে দিল" (পৃ.-১৫৮)

মোহনার জীবন-যাপন নিসর্গের এই অবিমিশ্র রূপ আসলে এক অর্থে লেখকেরই আত্ম-বীক্ষণ।

'দেশলাই কারখানার প্রস্তুতি' গল্পে দুটি স্বভাবগত বিধর্মী নর-নারীর একসঙ্গে কাছাকাছি থাকার অদম্য প্রয়াস। তাদের মিলের চেয়ে অমিল বেশি। তবু একান্তে একটু বসার জন্য তারা ছটফট করে। আলোক আর নন্দিনী পরস্পরকে ভালোবাসে। তাদের মনের মধ্যে প্রেম প্রেম ব্যাপার রয়েছে। তবে অমিলগুলো বড্ড বেশি, "আলোক হয়ত বলল, 'চলো আজ শক্তিগড়ে যাই, আজ ক্লাসে গিয়ে কাজ নেই আমিও অফিস যাব না নন্দিতা যাবে। ফাঁকা ট্রেনে উঠে এমন এমন কঠিন কথা বলবে যা আলোকের পক্ষে প্রেমহীনতার কারণ। আয়ান ব্যান্ডের সাহিত্য চেতনা, সেজানের এক শাশুরির তৃতীয় বিবাহের পার্টি, মাকর্সবাদ এবং লেলিনবাদের গোড়ার কথা। আলোক কী শুনবে? সে তখন লাইনের ধারে বস্তি লোকালয় ছাড়ানো ধানখেতে উচ্ছে লতা, ফালতু পাখির দু-এক ওরা। এবং অনেক পরে বলবে এলে কেন?" (পৃ.-২৫৪)

তবু তারা একে অপরের হাত ধরে থাকতে চায়, বিয়ের স্বপ্ন দেখে। অর্থের অভাব তবু সংসার পাততে চায়। যৌথভাবে থাকতে চায়। লড়াই করে জিততে চায় সমস্ত অভাবের বিরুদ্ধে। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসার ঘাটতি নেই। অনেক অনেক অমিলের মাঝেও তারা দুজনে ঘর বাঁধতে চায়। এই বড়ো সত্য। গল্পের শেষে দুটি বিপরীতমুখী সরলরেখা যেন নিজেদের প্রয়োজনে যুক্ত হয়ে যায়, "তবু ওদের যেখানে অমিল নেই তা হল দুজনেই ডটপেন, এয়ারপিলো, থ্রি টায়ার, কোল্ডকফি, বুধবারে পিকনিক, ব্রিজের ওপারে বাড়ি, আঁশফল, বেতগাছ, নুনের বন্দর, পরিত্যক্ত রানওয়ে, আতা ডায়ারি ভালোবাসে। দুজনে বড়লোক হবার জন্য দেশলাই কারখানা খোলার কথা কতদিন ভেবেছে।" (পৃ.-১৫৮)

কমল চক্রবর্তী কোন গোষ্ঠীভুক্ত লেখক নন। তাঁর লেখা বাংলা সাহিত্যের সাধারণ

প্রবণতার বাইরে। আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত কথাবৃত্তসর্বস্ব প্লট ভাবনাকে সরিয়ে রেখে ইন্দ্রিয় সংবেদী অভিব্যক্তিকে তিনি প্রকাশ করলেন বাংলা গল্পে। সেখানে নির্দিষ্ট কোন দার্শনিক স্বর নেই, বহুস্বরিক বাচনে একান্ত নিজস্ব গদ্য ভাষায় কাহিনিশূন্য আশ্চর্য সংহিতা তৈরি হল। কমল চক্রবর্তীর গল্প সম্পর্কে শেষকথা বলেছেন অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী। তাঁর কথা দিয়ে শেষ করলাম আমার এই স্বল্প পরিসরের কমল-বন্দনার, "গল্পের ধরন-ধারণ একটু আলাদা। তাঁর গল্প জীবনের বাস্তবতার গল্প ঠিকই; কিন্তু সেই সঙ্গেই জীবনের স্বপ্ন, কল্পনা আদর্শ-কে মিলিয়ে নেবার গল্প। তাঁর গল্পে যেমন থাকে পৃথিবীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের সৌন্দর্য, ঠিক তেমনই থাকে, জীবনানন্দের ভাষায় "রক্ত-ক্লেদ-বসা"। তাঁর গল্পে বহির্বাস্তব আর অন্তর্বাস্তব অবিচ্ছিন্ন। তাঁর গল্পে প্রেমের সঙ্গে বিষাদ, বন্ধনের সঙ্গে অ-বন্ধন, মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় নাড়ির টানের সঙ্গেই বিনিদ্র থাকে সেই মানুষ যার অন্তরের বাণী রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে/ আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।" (ভূমিকা/কমল চক্রবর্তীর ছোটগল্প: স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর)

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১। 'কমল চক্রবর্তীর গল্প সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা- মোস্তাক আহমেদ। অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০২৪।
২। 'গহন' কমল চক্রবর্তী, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪, সম্পাদক- মোস্তাক আহমেদ। প্রকাশক রিমা সোম, হাবড়া, ডিসেম্বর ২০২৪।
৩। 'কবিসম্মেলন' শারদ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২৫, সম্পাদক-শ্যামলকান্তি দাস। ৭২/২ পটুয়ালেন, কলকাতা।

কৌশিক পান্ডে

## জাদুবাস্তবতার আলোকে অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প

উনিশ শতকের শেষ পর্বে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের যে বীজ পোঁতা হয়েছি বিশ শতকের প্রথমার্ধে তা মহীরূহ আকার ধারণ করে। স্বাধীনোত্তর কালপর্ব থেকে বিগত সত্তর বছরে বাংলা ছোটগল্প যে বিস্তার ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে তার বিচারে এই সময়কাল একার্থে স্বর্ণযুগই বটে। স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক পালাবদল, ১৯৬৬র খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন - এসব পেরিয়ে এসে ১৯৬৭-এর নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান গণচেতনায় ব্যাপক ধাক্কা দেয়। রাজনৈতিক হত্যা, প্রচলিত আইনের অপব্যবহার, জমি বিবাদ, কৃষকদের অধিকার আদায়, জোতদার-অধিয়ার দ্বন্দ্ব, শ্রেণি-বন্ধু ও শ্রেণি-শত্রু চিহ্নিতকরণ, উত্তাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাকে কালের সাক্ষী হিসেবে যেসব গল্পকার তথা কথা-শিল্পীরা দর্পণের মত তাদের মস্যাধারে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষিতের ভিন্নতায় জীবনকে দেখার ধরন ভিন্ন হতে বাধ্য। তাঁদের গল্পে মূলত উঠে এলো গ্রাম বাংলার অনালোকিত অথচ প্রাসঙ্গিক একটা বড় অংশের মানুষের দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়ার বাস্তব কাহিনীবৃত্ত। সাত-আট দশকে বাংলা ছোটগল্পের এই পালাবদলের সূচনা হয়েছিল প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবীর নেতৃত্বে। তাঁর গল্পে ধরা হয়েছে এই সময়ের আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা প্রবাহ। তাঁর সঙ্গে আরো যেসব গল্পকার এই সময়কালকে দর্পণ আকারে তাদের গল্পে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁরা হলেন আবুল বাশার, অমর মিত্র, আফসার আহমেদ, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, কিন্নর রায় এবং অভিজিৎ সেন প্রমুখ।

এই সময়ের গল্পকাররা সমাজ জীবনের প্রতি এক অনিবার্য দায়বদ্ধতা থেকে সংকটগ্রস্ত, বিপন্ন, অস্তিত্বের সঙ্গে নিত্য লড়াই করে চলা প্রান্তিক মানুষদের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে কলম ধরেছেন। এঁদের লেখায় কখনো প্রশাসনের নেপথ্যে থাকা শ্রেনিশত্রু জোতদারদের, রাজনৈতিক নেতাদের আর শাসন কাঠামোর অংশীদারদের মুখোশ টেনে খুলে দেন, আবার কখনো গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকা সরকারি আমলা ও পুলিশদের স্বার্থপরতা আর বিভিন্ন চক্রান্তকে করেন অনাবৃত। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এইসব লেখকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পূর্বের দশক গুলির লেখকদের মতো এই লেখকেরা ঘরে বসে গল্প লেখেননি। এই নতুন অধ্যায়ের গল্প ধরার একজন সার্থক রূপকার হলেন কথাসাহিত্যিক

অভিজিৎ সেন। তাঁর বক্তব্যে এই অভিজ্ঞতার কথা স্পষ্ট — " সত্তর দশকের রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে হঠাৎ আমি এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান পেয়েছিলাম। এ জগতের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতা অবাস্তবতা আমার পরিচিত জগতের থেকে একেবারেই আলাদা। দুই দিনাজপুর ও মালদা পুরোপুরি, কখনো কখনো দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার বিক্ষিপ্তভাবে দেখা হয়েছে আমার। দিনাজপুর এবং মালদা এমন এফোঁড় ওফোঁড় করে দেখেছি, যে কোনো গল্পকথকের কাছে তা ঈর্ষণীয় হতে বাধ্য। দেখেছি মুর্শিদাবাদকেও। মহানগরের মানুষের কাছে তো বটেই ওসব জায়গার শহরবাসী মানুষের কাছে আমার গল্পের জগতের মানুষ একদম অপরিচিত।"[১] অভিজিতের প্রথম দিকের 'ধানপোকা'(১৯৭৬), 'আইনশৃঙ্খলা'(১৯৮০), 'দেবাংশী'(১৮৮১), 'শেয়াল'(১৯৮১), 'ব্যবচ্ছেদ'(১৯৮১), 'বিষ'(১৯৮১), 'বর্গক্ষেত্র'(১৯৮১) ইত্যাদি গল্পগুলো সহ ১৯৭১ থেকে ৮১- ৮২ সাল পর্যন্ত তিনি যে কটি গল্প বা ছোট উপন্যাস লিখেছেন তার সংখ্যা প্রায় পঁচিশ।এই লেখাগুলির মধ্যে বিশেষ মতাদর্শের আবেগ বেশ জোরালো ছিল। নতুন লেখক হিসেবে বেশ পরিচিতি ও লাভ করেন। মহাশ্বেতা দেবীর প্রশংসাধন্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু সময়ের দাবি আর কালের নিয়ম যেন লেখককে দিয়ে আরো কিছু লেখিয়ে নিতে চেয়েছিল। ১৯৮৫ সালে সেই দাবি পূর্ণতা পেল 'রহু চন্ডালের হাড়' নামক সেই বিখ্যাত উপন্যাস রূপে। (১৯৯২সালে বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত এই উপন্যাস বর্তমানে বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।)। সময় ও পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও অভিজিতের লেখায় খুঁজে পান ভিন্ন স্বাদ। সচেতন ভাবে লেখক তাঁর লেখার বাঁক পরিবর্তন করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে লেখক কে কি আমরা শুধুমাত্র তাঁর পুরস্কার প্রাপ্ত দু-একটি গল্প উপন্যাসের মধ্যে দিয়েই খুঁজে নেব? অজস্র চূড়া আছে অভিজিৎ সেনের গল্প উপন্যাসের। সূর্যোদয়ের অরুনিমা যেগুলিকে উদ্ভাসিত করে অনেক সময় তার বাইরেও থেকে যায় লেখকের অনন্য প্রতিভা। অভিজিতের এমন প্রতিভা রয়েছে।

অভিজিৎ সেনের গল্পের বৈচিত্র বিস্ময়কর। তিনি প্রচলিত ধারাতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার লেখক নন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব পরম্পরার মধ্যে তিনি একটা বিকল্প ধরন খুঁজে চলেছিলেন। আর এই বিকল্প ধরনের খোঁজই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে নতুন পথের অগ্রদূত হতে ইন্ধন যোগায়। 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে অভিজিৎ সেন লিখছেন — "রূপকথার গল্প নয়, লোককথাও নয়, কিন্তু লোককথার বাস্তবতার (যদি এমন কিছু বলা যায়) শক্তিশালী মাধ্যম দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্য এক নয়া আধুনিকতা এনেছে। এই আধুনিকতায় যুক্ত হয়ে আছে অপরিচিত এক রহস্যের সৌন্দর্য।

ইউরোপীয় বুদ্ধি এবং মনস্তত্ত্বচর্চার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমের ক্লান্তিকর কসরাতের অনুসরণের বদলে আমাদের সাহিত্যিক মুক্তি বোধহয় ওই পথেই সম্ভব হতে পার”[২] আসলে অভিজিৎ সেনের মনে হয়েছিল যে - “ প্রতীচ্যাগত ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সর্বগ্রাসী মোহ কাটিয়ে ওঠার জন্য লাতিন আমেরিকার স্বতন্ত্র পথ-পরিক্রমার তাৎপর্য নিবিড়ভাবে অনুশীলন করতে হবে। বাস্তবতার ভিন্ন আদল আর বয়ানের নতুন সংহিতা সেখানে পাওয়া সম্ভব। মধ্যবিত্ত-মেদুর জগৎ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ব্রাত্যজনদের সেই প্রান্তিকায়িত পরিসরে যেখানে অনায়াসে অধিবাস্তব মিশে যায় বাস্তবে। উচ্চ সংস্কৃতির মান্যতা প্রাপ্ত আচরণবিধির বিপ্রতীপে রয়েছে যে কালো মহাদেশ, সেখান থেকেই তুলে আনতে হবে ছোটগল্পের রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা।”[৩] আসলে লাতিন আমেরিকার মতো ভারতও তৃতীয় বিশ্বের দেশ। তাই উভয় জায়গাতেই যুক্তিবাদীতার বাইরেও যে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ লোকবিশ্বাস তথা লোকসংস্কার রয়েছে তার কথা না বললে সুবিস্তৃত ব্রাত্য সমাজের চিত্রায়নের বৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা হাজার হাজার বছরের ভারতের এই কালজয়ী স্বরূপটিকে ধ্বংস করতে পারেনি। শ্যেন দৃষ্টির অভিজিৎ সেনের কাছে বিষয়টি এড়িয়ে যায়নি।

অভিজিৎ সেন সাম্প্রতিক সময়ের এক বিশিষ্ট গল্প লেখক। তিনি অনায়াসে গল্পের কাহিনীকে বাস্তব থেকে মিথ আর মিথ থেকে বাস্তবে ঘুরপাক খাওয়ান। জাদু বাস্তবতার ভিন্ন বয়ান রচিত হয়েছে অভিজিৎ সেনের ‘স্ফিংকস’ গল্পটিতে। গ্রিক পুরানে বর্ণিত মানুষ ও পশুর মিলিত অবয়বের সঙ্গে যৌনতা আবহ মিশিয়ে গল্পটিতে গড়ে উঠেছে এক অভিনব ফ্যান্টাসি। গল্প বলার ঢঙে গল্পের শুরু। বাস্তব জগতের একটি মদের আসরে সুরঞ্জন তার বন্ধু সব্যসাচী ও তার ভাইরা নির্মলের কাছে পনেরো বছর আগে কাউকে কিছু না বলে ডুয়ার্স থেকে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে আসার নেপথ্যের রহস্য উদঘাটন করেছে।

ডুয়ার্সের পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা, দৈনন্দিন অভাব বঞ্চনায় পীড়িত এক গ্রাম আলতাবাড়ির ফার্মার্স সার্ভিস সোসাইটি (সুরঞ্জনের কর্মস্থল) হয়ে উঠেছে গল্পের কেন্দ্রীয় স্থান। নির্জন পরিবেশ, অধস্তন সহকর্মী নকুলের স্ত্রী আমাতির স্ফিংকসের মত(যদিও গল্পে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই স্ফিংকসের কথা) রহস্যময় অবয়ব, বশীকরণ, যৌন উত্তেজনা, পুরালৌকিকতা সৃজনে বুড়ির থান, রহস্য তৈরিতে ভুটানি তিব্বতিদের গুহ্যমন্ত্র, পাহাড়ের ওপার থেকে আসা মায়াবী স্ত্রী-আত্মা, সমকালীন ঝিনঝিন রোগ (গণ হিস্টিরিয়া) এর উল্লেখের মধ্য দিয়ে আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে জাদু বাস্তবতার অবস্থানকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন লেখক।

যৌনতা, শিক্ষিত সুরঞ্জন এর স্ফিংসের লৌকিক বিশ্বাস, কম শিক্ষিত তথাকথিত নিম্নবর্গী আমাতীর পেটকাটি বুড়ির থানে মানতের লোকসংস্কার, সুরঞ্জন-আমাতীর পরকীয়া, সমবায় সংস্থার দুর্নীতি, সব কিছুকে ছাপিয়ে আমাতীর মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষা - যা তার স্বামী পূরণ করতে পারেনি - তা পূরণের চোরা স্রোত গল্পটিতে সুক্ষ্মভাবে বইয়ে দিয়েছেন লেখক। সচেতন পাঠক জাদুবাস্তবতার কুহকে এই অস্পষ্ট ইঙ্গিত ঠিক খুঁজে পাবেন।

গল্পের শেষে এক অদ্ভুত উপলব্ধি হতে দেখা যায় সুরঞ্জনের। সে তার পকেটে খুঁজে পায় একটা গাছ। বশীকরণের বিষয়টা এখানে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রায় চার মাস ধরে এক প্রাচীন, নির্জন, কুহকী পরিমণ্ডলে আমাতীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে সুরঞ্জন এর মনে এই সম্পর্কের পরিণতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঁকি দেয়। সঙ্গে অনুভব করে শরীরের যৌন অক্ষমতার যন্ত্রণা। গল্পের টানটান উত্তেজনা ধরে রাখেন লেখক। সে কলকাতা চলে আসতে চেয়েও অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় ফিরে আসে আলতাবাড়িতেই। আমতীর জাদুবিদ্যাকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। শিক্ষিত সংস্কার হেরে গেছে লৌকিক সংস্কারের কাছে। যদিও সবশেষে টানটান উত্তেজনার মধ্যেই রিক্সাওয়ালাকে একশ টাকার বকশিস দিয়ে আলতাবাড়ির স্ফিংকসের ফ্যান্টাসির জগত থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় সুরঞ্জন।

গল্পের মধ্যে দিয়েই লেখক তাঁর বার্তা স্পষ্ট করেছেন- "আমি জানি তোমরা কী ভাবছ। আমি নিজে মানুষ হয়েছি কলকাতায় সম্পন্ন কুসংস্কারহীন একটি পরিবারে। মাস হিস্টিরিয়া শুধু শিক্ষিত শ্রমজীবী গরিবদের রোগ নয়, স্থান-কাল পরিবেশের বিভিন্নতায় তোমাদের মত আধুনিক মানুষকেও এক নিমেষে ওইখানে নামিয়ে আনতে পারে। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি পাশাপাশি সজাগ থাকলেও ওটা হতে পারে।"[৪] গল্পে সুরঞ্জনের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক এক চরম সত্যের সম্মুখীন করেছেন পাঠককে। আর এভাবেই মার্কেজের মতই বাস্তব ও মায়ার যে জগৎ অভিজিৎ সেন গড়ে তুলেছেন তা আমাদের পরিচিত জগতের মধ্যে থেকেও অপরিচিত। আর এখানেই অভিজিৎ সেন এর অভিনবত্ব।

মঙ্গলকাব্যের সংস্কার যে আধুনিক জগতে দারুণভাবে বর্তমান 'লখিন্দর ফিরে আসবে' গল্পটি তার বড় উদাহরণ। এখানে পাঠক এক আশ্চর্য কাহিনীর সম্মুখীন হবে। এ কাহিনীতে দুটি সংস্কার যুক্তিবাদের কাছে হার মেনে নিয়েছে। কমল সাধু তিন দিনের সাপে কাটা মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলেছে। অন্যদিকে শিক্ষিত অশোক পা ধোয়া জল পান করিয়েছে তার পূর্বজন্মের ছেলেকে। ছেলেটি তার পূর্ব জন্মের পিতা অশোকের প্রতি অবহেলার জন্য রোগে ভুগছিল। অশোক যখন জানতে পেরেছে যে উক্ত জলপান করে আর অশোকের কাছে ক্ষমা লাভ করেই তার রোগমুক্তি সম্ভব, মার্কসবাদী পরিবারে বড় হয়ে ওঠেও অশোক

এমনকি তার কমিউনিস্ট পিতা সংস্কারের হাজার বছরের স্রোতকে উপেক্ষা করতে পারেনি। অশোক তাই ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করেছে।

শিক্ষক সংগঠনের সম্মেলনে মেদিনীপুর যাওয়ার সময় কথক চরিত্রের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে সহপাঠী অশোক ও অনিমার দেখা। উল্লেখ্য গল্পে পটভূমি রেলস্টেশন, তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য বর্ণনা গল্পের বাস্তবতাকে সজীব করেছে। এরপর স্টেশনে এক অপরিচিত দম্পতি বাবা-মা সম্বোধন করে অনিমা ও অশোক কে প্রণাম করলে গল্পকথকের মনে বিষয়টি নিয়ে রহস্য দানা বাঁধে। সেই দম্পতির সাথে অশোকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক গল্পকে নিয়ে যান উত্তরবঙ্গের মফস্বল জনজীবনে। গল্পের স্রোত আবর্তিত হতে থাকে কমল সাধুর আধি দৈবিক, প্রাক-পুরাণিক অভিচার ও ক্রিয়াকাণ্ড আর সেসবের প্রতি শিক্ষিত, সচেতন ও মার্কসবাদী পরিবারের আবহে বড় হয়ে অ অশোকের মনের দ্বন্দ্ব এই দুইয়ের মাঝে।

জরিবুটির কারবারি কমল সাধুর টিনের হাত বাক্সে থাকা মানুষ অন্যান্য জন্তুর হাড়, লোম, চামড়া, নখ, দাঁত, রুদ্রাক্ষ, বিচিত্র রঙের খনিজ পাথর, ফাঁসুরের দড়ির পাট, আগুনে পুড়ে যাওয়া মরা মানুষের চুল, আরকে ভেজানো অপরিচিত সরীসৃপা আর পতঙ্গ ইত্যাদির উল্লেখের সাথে তার দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্ত পার হয়ে ওপার বাংলার লালমনি হাট অঞ্চলে চলে যাওয়ার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া এত নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

কলার ভেলায় ভেসে আসা সর্পাঘাতে মৃত স্ত্রীলোকের প্রাণ ফেরানোর অলৌকিক কান্ড ঘিরে উপযুক্ত পরিবেশ- আবহ রচনা করেছেন লেখক। নদীর কিনারায় বটগাছের গোড়ায় মনসা - শীতলার পূজার স্থলে মনসা পূজার মধ্য দিয়ে কমল সাধু মরা জাগানোর আয়োজন করেছে। গ্রাম্য পটুয়ায় আঁকা দেবী বিষহরি, লোহার বাসর ঘর, মৃত লখীন্দর, অসংখ্য সাপ, সনকা, বেহুলা কী নেই সেখানে! মরা জাগানো ক্রিয়া পদ্ধতিও বেশ বিচিত্র ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। "এবেলা মনসা পূজা ও বেলা গান, তাবাদে মঞ্জুষ নদীৎ ঘুরবে। মাঝরাত তক এমন চলবে। তা বাদে জবার ডাল আর চামড়া দেয় মড়াক জিয়াবে গুরু। সব ঠিকঠাক হলে ভোর ভোর তক মড়া উইঠে জলখাবার খাবে।"[৫] - এভাবে পাঠককে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক লোক বিশ্বাসের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন লেখক। আমরা যতই লোকসংস্কারকে এড়িয়ে চলতে চাই, লোকচক্ষুর অগোচরে লোক বিশ্বাস আর লোকসংস্কারের যে ফল্গু ধারা আজও সমানভাবে বহমান- এই চরম সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তিনি। তবে আসলে সচেতন ভাবে নয় গল্পের বিশেষ আঙ্গিক তৈরি করতেই এই লৌকিক সংস্কারের অবতারণা। লেখক নিজেই বলেছেন - "সংশয় আছে,

সচেতন ভাবে লোককথা লেখাতে ঢোকানো সম্ভব কিনা, কিংবা তাতে শেষ পর্যন্ত কিছু দাঁড়াই কিনা। আসলে গল্প বা উপন্যাসের বিষয়ে একটা বিশেষ আঙ্গিক তৈরি করে। আমাদের লৌকিক অস্তিত্ব, লোকায়ত সংস্কৃতির প্রভাব যখন আড়াইশো বছরের ইউরোপীয় শিক্ষাতেও নির্মূল হয়নি, তখন বুঝতে হবে অনেক বেশি শক্তিশালী সেই শিকড় মাটির অনেক গভীরে।"[৬]

অনেক সময়ই মনে হতে পারে অভিজিৎ সেন কি লোকসংস্কারের কাহিনী লিখতে গিয়ে নিজেই অনেক সময় এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন? আশ্চর্য হয়েছি আমিও। সত্যিই অভিজিৎ সেন অনেক জায়গায় এসব বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখেছেন। জনপদ প্রয়াস পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন — " সাপের কামড়ে বোঝার শরণাপন্ন হওয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গলায় সাপ এবং মুখে মন্ত্রতন্ত্র, ঝারণ- মারণ- বশীকরণ - ডাইনি-জাদু-দৈব মাদুলি-আংটি-পাথর এসব শুধু লোকায়ত বিশ্বাস নয় বোধহয়। উচ্চতর অশিক্ষিত বিদ্বজ্জনের সমাজও তো এসব বিশ্বাস বা আবেগ থেকে মুক্ত নয়। বরং আমার তো একসময় বলতে ইচ্ছা হয় যে মন্ত্রতন্ত্র, ওঝালি, মারন উচাটন, বশীকরণ, ভূতপ্রেত, পরি-এসব আমাদের "সত্যি সত্যিই" আছে। আছে মানে আরো পরিষ্কার করে আমি বলতে চাই, হ্যাঁ 'লখিন্দর ফিরে আসে' নদী বেয়ে আসা বাসি মরাকে সত্যিই সাধু 'জিয়ায়'। বালা কালমাশনার কোপে হরিনার দহে ঘূর্ণিপাকে পড়লে কবিরাজ গুণমান মন্ত্র পড়া ধুলো ছুড়ে তাকে উদ্ধার করে।"[৭] (কথা সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন পাঠে বহু পাঠে ২৫- ২৬ পৃষ্ঠা)। এমন নির্মোহ, সাবলীল আর নিবিড় দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত অভিজিৎ সেনকে সাম্প্রতিক সময়ের লেখকদের মধ্যে একক করে তুলেছে। মধ্যবিত্ত-মেদুর জগৎ থেকে অভিজিৎ দৃষ্টি মেলেছেন প্রান্তিকজনের সেই প্রান্তকায়িত পরিসরে যেখানে অধিবাস্তব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জাদুবাস্তবতার এমন অনেক কাহিনী রয়েছে অভিজিতের ছোটগল্পের ঝুলিতে।

যেহেতু প্রান্তিক মানুষদের জীবনচর্যার বিচিত্র স্বরূপ চিত্রণ অভিজিতের অধিকাংশ গল্পের মুখ্য বিষয়, স্বভাবতই সেখানে এসে পড়ে লোকজ কৌম সমাজের সংস্কারের বিচিত্র বিচিত্র স্বরূপ গুলি। এই সংস্কার যে কত গভীর আর কত পুরনো, আমরা তার প্রমাণ পাই লেখকের 'জেহাঙ্গী', 'মাটির বাড়ি', 'বখিলা', 'বালা লখিন্দর', 'ডাইন', 'পাথরে জলের বিন্দু' - এরকম প্রায় ডজন খানেক ছোটগল্পে।এগুলি পাঠের পর সাধারন পাঠক নতুন ভাবে উপলব্ধি করেন- ডাইনি, ফোকসিন, বশীকরণ, গুপ্তবিদ্যা, ওঝা, গুণমান, কবিরাজ একটা বড় অংশের মানুষের সুপ্রাচীন বিশ্বাসকে ঘিরে আজও জোড়ালভাবে আমাদের সমজে অবস্থান করছে।

'দেবাংশী' গল্পের একজন সাধারণ মানুষ থেকে সারবান লোহারের দেবাংশী হওয়ার কাহিনী ফুটে উঠেছে। 'চোখে ঘুম নেই' গল্পেও এমনই দেবাংশীর কথা ফুটে উঠেছে। সেখানে দেয়াসিনি শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও আলোচনার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে আমরা দেবাংশী গল্পের আলোচনা ছোট আকারে করতে চাইব। সরবান তার দেবাংশী হওয়া থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। সে বারবার দেবীর কাছে প্রার্থনা করে "মাও মাও রে ই দায় থিকা রেহাই দে মাও!" এই দেবাংশী বিবেকবান। সাধারণকে ঠকিয়ে সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে চায়না। সমাজের সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে সে মিথ্যা স্তোক দিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চায়নি, তাই সেতু বর্মনের মেয়ে বারুণীবালা তার ধর্ষকদের শাস্তি দেবার জন্য দেবাংশের কাছে প্রার্থনা জানালে সারবান অকপটে বলে — "তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, সোয়ামী আছেন, আপন আপন বেটির বুনের ইস্তিরির ইজৎ বাঁচাবার দায় তুমহোরের সব্বার। তুমরা যদি সব্বাই চান ই পাপ বন্ধ হউক, তবে ই পাপ বন্ধ হবে। ই দায় দেবাংশীর একার লয়।"[৮] শেষ পর্যন্ত এক সংঘবদ্ধ জনতার আক্রোশের শিকার হয় ধর্ষক দৈত্যারির ছোট ছেলে বিনোদ। অধিবাস্তবতা থেকে সংঘবদ্ধ জনচেতনায় উত্তরণের এই অভিনবত্ব অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পে জাদুবাস্তবতার এক অনন্য দিক। এই গল্পটি যখন এর নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করা হয় তখন তা সার্বিক সাফল্য লাভ করে। লেখকের বক্তব্যে উঠে আছে এর সাফল্যের কথা- "গল্পটা ভালো লাগেনি একজন লোকও পাইনি। পরে 'দেবাংশী' নাটক হয়। নাট্যরূপ দেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদের দল এই নাটক মঞ্চস্থ করে খুবই সফল হয়।"[৯] এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়ে উঠছে, কারণ যখন এই প্রবন্ধ লিখছি তখন টেলিভিশনের পর্দায় "হরিমাধব মুখোপাধ্যায় পদ্মশ্রী পেলেন" এই শিরোনাম ভেসে উঠছে।

আসলে অভিজিৎ 'দেবাংশী'র সারবান লোহার, 'বালা লখিন্দর' এর বিদ্যাধরী, লখিন্দর, মায়নোমতি, কবিরাজ গুণমান এদের মত অসংখ্য মানুষকে আর সংশ্লিষ্ট দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পুরুলিয়া সহ পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে স্পর্শ করেছেন। তার অসংখ্য গল্পে এসব লোকসংস্কারের কথা তুলে ধরেছেন অভিজিৎ সেন। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে অভিজিতের লেখার শৈলীতেও। তাঁর দুই শতাধিক ছোটগল্প তাই শুধুমাত্র তার বিস্তারের জন্য নয় বিষয় ভাবনা, আঙ্গিক এবং উপস্থাপনার নানা শিখরে সমৃদ্ধ হয়ে তৈরি করেছে শৈলমালা। অতএব অভিজিতের গল্পবিশ্ব ও গল্পবীক্ষা নিয়ে যেকোনো আলোচনা

একটিমাত্র প্রতিবেদনে তুলে ধরতে গেলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যেতেই বাধ্য। তবে লেখককে অনুসরণ করে এটুকু বলা যায় লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসকে কথাসাহিত্যে তুলে আনার পেছনে তিনি সন্ধান করেছেন প্রাচীন ঐতিহ্যকে। ইতিহাসের ছাত্র বলে হয়তো অভিজিৎ সেনকে এ বিষয়গুলি আরো বেশি করে আকর্ষণ করেছে। তাই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে সচেতন এই লেখক লোককথা আর অলৌকিক বাস্তবতার মধ্যে সাহিত্যের উত্তরণ খুঁজে পেয়েছেন এভাবে —"লোককথা, লোককথার ঢং, মিথের অলৌকিক বাস্তবতা, এসবের মধ্যে নতুন চিন্তা ও চেতনার সন্ধান হয়তো পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে আমাদের সাহিত্যের বর্তমান বন্ধ্যা দশা হয়তো ঘুঁচতে পারে।"[১০]

**তথ্যসূত্র :**

১। অভিজিৎ সেন, 'আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি', গদ্য সংগ্রহ, চিন্তা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা ১৪০
২। অভিজিৎ সেন, 'মিথ ও লোক কথার সম্ভাবনা', 'গদ্য সংগ্রহ', চিন্তা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা ২৫০
৩। তপধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের সুলুক সন্ধান (উত্তরার্ধ), আগস্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৪
৪। অভিজিৎ সেন, 'স্ফিংকস', 'পঞ্চাশটি গল্প', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০,প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫৮
৫। অভিজিৎ সেন, 'লখিন্দর ফিরে আসবে', সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৬৯
৬। অভিজিৎ সেন, 'মিথ ও লোক কথার সম্ভাবনা', 'গদ্য সংগ্রহ', চিন্তা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা ২৫০
৭। 'কথা সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন পাঠে বহু পাঠে', ২৫- ২৬ পৃষ্ঠা
৮। অভিজিৎ সেন, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, ২০০০, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৫
৯। অভিজিৎ সেন, 'মিথ ও লোক কথার সম্ভাবনা', 'গদ্য সংগ্রহ', চিন্তা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা ২৪৭
১০। অভিজিৎ সেন, 'মিথ ও লোক কথার সম্ভাবনা', 'গদ্য সংগ্রহ', চিন্তা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা ২৫৭

সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

## বোহেমিয়ান নবারুণ এবং বিকল্প বাস্তবের গল্প

বাস্তব কাকে বলে? ক্ষমতাসীনরা যেটি বানিয়ে দেন আর আমরা যেটি মানিয়ে নিই? সারভাইভ্যাল অফ দা ফিটেস্ট তত্ত্বটি সত্য বুঝে ডারউইনীয় ডরে যেটির সঙ্গে অনবরত অভিযোজিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করি? হ্যাঁ, সেই তথাকথিত বাস্তবকেই ব্যঙ্গের অস্ত্রে একপ্রকার বানচাল করে দিয়ে সাহিত্যে বিকল্প বাস্তবের কথা বলেও নিজের সময়েই যিনি নজর কেড়েছিলেন, তিনি নন আদার দ্যান নবারুণ ভট্টাচার্য! যাঁর গল্পে আপাত অবাস্তবতার ব্যালকনিতে উঁকি দিতে থাকে প্রকৃত বাস্তবের বিকৃত হাঁ-মুখ।

যে দুটি নাম নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে জন্মসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে, তাঁদের ওজন সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের সব ধরনের পাঠক বরাবরই ওয়াকিবহাল। বিজন ভট্টাচার্য এবং মহাশ্বেতা দেবীর একমাত্র সন্তান নবারুণ। গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে হেঁটেও নিজের সময়েই নবারুণের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সমীকরণটি কি তবে তৈরি হয়েছিল সেলিব্রেটি অভিভাবকের সীমাহীন সাফল্যের এস্কেলেটারে চড়ে? অনেকেই বাসুদেব দাশগুপ্ত- সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় -সুবিমল মিশ্র কিম্বা উদয়ন ঘোষের উদাহরণ টেনে সেসব ইঙ্গিত করতে চান। কিন্তু নবারুণের জাত পাঠক মাত্রই জানেন নবারুণ কী জিনিস!

ছত্রে ছত্রে স্ল্যাং খুঁজে পাওয়ার ফুর্তিতে অবশ্য যাঁরা নবারুণ পড়েন, তাঁদের এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই বিন্দুমাত্র। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনাতেই তাঁরা বেজায় খুশি। প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠার তেমন তোয়াক্কা না করেই নবারুণ নিজের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন কেবল প্রতিভার জোরে বা পারিবারিক উত্তরাধিকারে এমন সিদ্ধান্তেও খুব সহজে পৌঁছনো যায় না। নবারুণের হয়ে ওঠার পিছনে সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর যাপন, যা তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছিলেন। বিস্তর পড়াশুনা, বিচিত্র মেলামেশা, মার্কসবাদে গভীর আস্থা, অস্তিত্বের সঙ্গে আদর্শকে আজীবন অন্বিত রাখতে পারার মতো মানসিক দৃঢ়তা, ক্ষমতার আগ্রাসনকে প্রত্যাখান করার অপরিসীম সাহস, ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত শুনতে পাওয়ার মতো সংবেদনশীল মন, গড়পড়তা বাস্তবকে বাতিল করে সৃষ্টিতে বিকল্প বাস্তবতা বানিয়ে তোলার মতো আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিলে তিলে তৈরি হয়েছেন নবারুণ।

প্রথমে অবশ্য কবি হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি। কবিতার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন। একটি পংক্তির যে কি আশ্চর্য শক্তি প্রথম দিকেই তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন! "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না"- এই আত্মপ্রত্যয়ী অনুভব, এই সাহসী উচ্চারণ, এই নির্ভয় ঘোষণা, এই প্রবাদপ্রতিম শব্দস্রোত কেবল সেই সত্তরের উত্তপ্ত সময়ে নয়, আজও, হ্যাঁ, এই বর্তমান সময়েও প্রতিটি সচেতন মনে একটি বলিষ্ঠ মেরুদন্ড

নির্মাণ করে দিতে পারে, পারবে ভবিষ্যতেও। ১৯৭৩-এ যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না" প্রকাশিত হচ্ছে, তখনও মাত্র তিনচারটি গল্প ছাপা হয়েছে দু'একটি ছোট পত্রিকায়। যদিও শুরু থেকেই গল্প বলার ধরনে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক। ১৯৬৮ তে "পরিচয়"-এ বেরিয়েছে প্রথম গল্প "ভাসান"। তারপর "সপ্তাহ", "সাহিত্যপত্র", "দিকচিহ্ন", "বর্তিকা" প্রভৃতি পত্রিকায় আরও কয়েকটি গল্প লিখেছেন নবারুণ। প্রথম গল্পগ্রন্থ "হালাল ঝান্ডা" প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ তে। গল্পকার তথা কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি তখনও ততটা পরিচিতি পাননি। ১৯৯২ এ "প্রমা" সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যায় "হারবার্ট" উপন্যাসটি প্রকাশিত হতেই পাঠক পড়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেছেন নবারুণকে। তারপর ক্রমে নরসিংহ দাস পুরস্কার (১৯৯৪), বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৯৬) এবং সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯৭)! "হারবার্ট"-এর জন্য পাওয়া এই তিন চাকতির চক্করে তত সহজে আর বাতিল করা যায়নি নবারুণকে। শিষ্ট সাহিত্যের নিয়মনীতির নির্ধারক আপনি মোড়লরাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন একপ্রকার। নাকউঁচু বুদ্ধিজীবী বিদ্বজ্জন নানা সময় বিষোদগার করলেও এড়িয়ে যেতে পারেননি। ততদিনে অবশ্য তিনি আরও কিছু গল্প লিখেছেন। আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ফেলেছেন নিজস্ব পাঠকবৃত্তের পরিধি। প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ "নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প" (১৯৯৬)।

রুট ম্যাপ এঁকে নিয়েছিলেন আগেই। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নবারুণকে সরাতে পারেনি তাঁর সেই পূর্ব পরিকল্পিত পথ থেকে। আসলে কোনও স্বীকৃতির স্বর্গে চড়ে সেলেব সুলভ আচরণ করে বহালতবিয়ত জীবনযাপন করতে চাননি নবারুণ। যে যন্ত্রণা থেকে তিনি লিখতে এসেছিলেন, যে যন্ত্রণার কথা তাঁকে লিখতে হয়েছে তার সুর ঘুমপাড়ানি গানের মতো হবে কেন? এক সাক্ষাৎকারে নবারুণ বলেছেন, 'আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য হল পাঠকের মেন্টাল ডিস্টার্বেন্স ঘটানো। পাঠককে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করা। দুপুরবেলায় খাওয়ার পর আমার বই নিয়ে শুতে গেলে ভাত ঘুমের হিসাবটা পুরো গুলিয়ে যাবে। আমি "ভাতঘুম সাহিত্যে" বিশ্বাসী নই।'[১]। পাঠকের অন্তরে লাগাতার আঘাত করে চেতনার কোষে কোষে অনুরণন তোলার নৈতিক দায়িত্ব নিয়েই তিনি লিখতে এসেছিলেন, লিখে গেছেন আজীবন। তাঁর সাহিত্য পড়ে শান্তি নয়, স্বস্তি নয়, মাথার ভিতরে এক বোধ জন্ম লয়। সংবেদনশীল পাঠক যা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারেননা।

১৯৯৬ এ প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় নবারুণ লিখছেন,- 'যে শতক সবচেয়ে আশা জাগিয়েছিল সেই শতক শেষ হচ্ছে অবসাদে, বিষাদে, যন্ত্রণা জর্জর অবস্থায়। দৈনন্দিনতায়, প্রত্যহ, নিকটে ও দূরে নিয়ত যা দেখতে পাই তা হল পরতে পরতে, স্তরে স্তরে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণ, নতুনতর ঔপনিবেশিকতা ও সংস্কৃতি- সাম্রাজ্যবাদের অমানুষীকরণের দেখা না দেখা হাতকড়া ও চোখভুলোনো ঠুলির

ভার। সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদের বালক বয়সের প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতার চেয়েও এ যেন অধিকতর মারাত্মক, জঘন্য ও অপমানজনক। এই দলিত মথিত মানুষ ও তাদের জীবনের এক বিচিত্র ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে আমার জীবন কাটছে। চারপাশে তাই আমি দেখি। কিন্তু চূড়ান্ত নিরিখে এই বাস্তবকে আমি চিরস্থায়ী বলে মানি না। বাস্তব কে পালটাতে হবে। হবেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চেতনা তৈরির ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবশ্যই একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।'[২] কথাগুলির মধ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর অবস্থান। প্রায় চার দশকের গল্পচর্চায় কমবেশি আশিটি গল্প লিখেছেন নবারুণ। যে অস্থির এবং ঘটনাবহুল সময় পর্বে প্রস্তুত হয়েছে তাঁর গল্পের প্লট, সচেতন নাগরিক হিসেবে সঙ্গত কারণেই তাকে পাঠকবিনোদ্য করে তুলতে চাননি তিনি।

আটচল্লিশে জন্মানো ইস্তক নবারুণ(১৯৪৮-২০১৪) কী দেখেছেন? দেখেছেন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত শিশুরাষ্ট্র ভারতবর্ষ তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে তাঁরই মতো। কৈশোরেই টের পেয়েছেন অপ্রত্যাশিত রকমের স্বাদ হীন আমাদের সাধের সেই স্বাধীনতা! অতঃপর তাঁর যৌবনের উপবনে লেখা হয়েছে নকশালনামা। যে মতাদর্শে তিনি নির্মাণ করে নিয়েছিলেন অপ্রতিরোধ্য অন্তঃকরণ, চোখের সামনে দেখেছেন শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা বানানোর স্বপ্ন অনেকটাই তছনছ হয়ে গেছে সেই মার্কসবাদী আদর্শে দীক্ষিত "বামপন্থীদের আবশ্যিক আত্মসমীক্ষার অভাবে" এবং অবশ্যই "পুঁজি ও প্রতিক্রিয়ার আঘাতে"[৩] বার্ধক্যে পৌঁছনোর বহু আগেই দেখেছেন বিশ্বায়ন নামক বড় ছাতাটির তলায় কেমন করে মাথা গুঁজেছে তৃতীয়বিশ্ব! গ্লোবালাইজেশনের গিলিয়ে দেওয়া বিষকে অমৃত ভেবে বিপুল আমোদে মেতেছে আমজনতা! হতাশ হয়েছেন বটে, তবে হারিয়ে যেতে দেননি নিজেকে। সময় দুর্জয় কিন্তু অজেয় নয়, আজীবন এ বিশ্বাসে স্থির থেকেছেন বিজন ভট্টাচার্যের একমাত্র সন্তান। সুতরাং কল্পস্বর্গবাসী হয়ে কপাল চাপড়ে ভগবানের হাতে তিনি ভাগ্যকে সঁপে দেননি। কোনও অপদেবতা নয়, ভরসা রেখেছেন ইতিহাসে। আত্মপ্রবঞ্চনার পথ ছেড়ে তিনি গল্পগুলিতে আত্মবিশ্বাসের কথা লিখতে চেয়েছেন। চরম দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে তাই তাঁর গল্প হয়ে ওঠেনি নির্বোধ আনন্দের অভিব্যক্তি, অধিকাংশ সময়ই হয়ে উঠেছে দুঃসহ যন্ত্রণার জাদুবাস্তব!

প্রথম গল্প "ভাসান"-এই নবারুণ নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন গতানুগতিক গল্প প্রবাহের বিপ্রতীপ স্রোতে। প্রথম গল্পগ্রন্থ "হালাল ঝাণ্ডা"য় প্রকাশিত গল্পগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর প্রথাবিরোধিতার প্রবণতা। অবশ্য নবারুণের কাছে যা ছিল অনিবার্যতা। 'অভাবনীয়ভাবেই আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে মরিলাম। রাস্তায় সে রাত্রে মহা হট্টগোল। বিজয়া দশমীতে মা তাঁহার ফ্যামিলি কন্ট্রোলের নিয়মের একটি বেশি সন্তান লইয়া, সংগ্রামী সহস্র দণ্ডায়মানকে চোখের জলে ভাসাইয়া ট্রাকে করিয়া যাইতেছিলেন। যে ট্রাকে করিয়া রাত্রির আঁধারে ভূতের ন্যায় দুর্লভ চালের বস্তারা শহর ঘুরিতে বাধ্য হয় সেই ট্রাকে। দিনের বেলায় উহারা

বাহির হইতে পারে না। তাই মধ্যরাত্রই উহাদের গুদাম হইতে গুদামে চালাচালির প্রশস্ত সময়। মা-ও রাত্রিতেই চলিয়াছেন। ঢাক, ব্যাণ্ড, তাসার আওয়াজ এবং পটকার শব্দ মিলিয়া এক আশ্চর্য সিম্ফনির সৃষ্টি করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ঋত্বিকের দল দুর্গা মাতার জয় চারণের ন্যায় লোককর্ণে ঘোষণা করিতেছিল। আমিও মরিলাম এমনই সময়।'[৪]- "ভাসান" গল্পটির এমন আশ্চর্য শুরুয়াৎ গতানুগতিক গোল গল্প পাঠে অভ্যস্ত বাঙালি পাঠককে কেবল অবাক করেনি, আভাস দিয়েছিল প্রথাগতকে সব অর্থে প্রত্যাখ্যান করবেন নবারুণ। গল্পটিকে কেবল মৃত পাগলের অসংলগ্ন প্রলাপ কিংবা এক অদ্ভুত পাগলির ব্যর্থ প্রণয়ের উপাখ্যান ভাবলে ভুল হবে। বাতিল মানুষের বেদনার পাশে দাঁড়িয়ে এ গল্পে নানান সামাজিক গাফিলতিকে অনর্গল ঠাট্টা করে গেছেন তিনি! মৃত ব্যক্তির অন্তর্কথনের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের ছয়ের দশকের সমাজ-রাজনৈতিক অস্থিরতাটি আলোচ্য গল্পে তুলে এনেছেন সন্তর্পণে। ক্ষমতার ক্ষমাহীন অপরাধগুলিকে চিহ্নিত করেছেন কতক। প্রথম গল্পেই প্রভূত ঝুঁকি নিয়েছেন নবারুণ। ব্যঙ্গ আর বেদনার তুখোড় ব্যালেন্স করেছেন সাধু ভাষার ভারিক্কিতেই।

বিপন্ন মানুষের অন্তর্গত বেদনাকে বিপজ্জনক সত্য বলে মেনে নিয়েও গল্পে গল্পে বিপুল উৎসাহে নবারুণ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। আদ্যন্ত মার্কসবাদী মানুষটি অনবরত সে দুঃসময় উতরে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন অগাধ আত্মবিশ্বাসে। অপরিসীম দরদে পাশে দাঁড়িয়েছেন অবহেলিত, উপেক্ষিত, শোষিত, বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া সব অর্থে সমাজের বাতিল মানুষের। একটু একটু করে তাদের হৃদয়েই বানিয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রতিবাদের ইউটোপিয়া! ১৯৭০-এ "সপ্তাহ" পত্রিকায় প্রকাশিত "স্টিমরোলার"-এ এক বিকল্প বিপ্লবের গল্প বুনেছেন লেখক। এ গল্পে অবদমিত আবেগের আক্রমণে দুরমুশ করে দেওয়া হয়েছে আগ্রাসী ক্ষমতার দুর্ভেদ্য দুর্গকে। শ্রমের ভয়ংকর শাসনে আর উচ্চবর্গের উদাসীন অবস্থানে অসম্ভব বৃদ্ধ এক স্টিমরোলার চালক খুঁজে পেয়েছেন প্রতিবাদের শক্তি। আসলে নিয়ত জীবন সংগ্রামে জেরবার এক শ্রমজীবীর অসীম যন্ত্রণার বিপরীতে ভাবলেশহীন নিরুত্তাপ পৃথিবীকে এক হাত নিয়েছেন নবারুণ। অসহ্য গ্রীষ্মের মাঝ দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে নির্মীয়মান রাস্তায় কর্মরত বৃদ্ধ চালক জীবনের প্রতি অসম্ভব বীতরাগে রাস্তার দুধারে সাজিয়ে রাখা সারিবদ্ধ লাল-নীল-কালো গাড়িগুলিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন স্টিমরোলারের দানবিক আক্রমণে। নিমেষে তছনছ করে দিয়েছেন বড়লোকের বৈভবের বিচিত্র প্রদর্শনী। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে সামান্য টাল খেতেই দিবানিদ্রা ভেঙেছে, জেগে উঠেছেন প্রভুরা। অস্তিন গুটিয়ে শুরু করেছেন প্রতিআক্রমণ! অসম যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন নবারুণ এভাবে,- 'একটা বাহারের লম্বা ডানা-বার করা গাড়ি ভাঙতে এগিয়ে এল স্টিমরোলার আর টেলিস্কোপিক রাইফেলের ঢ্যারা দেওয়া লেন্সে বুড়োকে ধরে ফেললো মোক্ষম পুলিশ। কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, ইন্সপেক্টর জেনারেল,

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল চিৎকার করে উঠলো "ফায়ার!!" আর ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, কনস্টেবল, সিপাই সবার হাতেই বন্দুক প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল "ফায়ার!!"...বুড়োর তখন মুখে হাসি, অসংখ্য বুলেটে বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও হাসি, কারণ সে দেখছিল সামনে বিরাট পাহাড়ের মতো চকচকে কুৎসিত একটা কালো গাড়ি ওর মুখোমুখি চোখ রাঙাচ্ছে আর সেই দিকে কামানের গোলার মত আগুয়ান তার স্টিমরোলার।'[৫] আপাতভাবে আজগুবি মনে হলেও এই বীভৎস বাস্তবটাই বানিয়ে তুলতে চান বাতিল মানুষগুলো। যে বাস্তব বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে পারেনা, গল্পে গল্পে সেই বাস্তবকেই বাতিল করে দিতে চেয়েছেন নবারুণ।

বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসন সাধারণ জনগণের জীবন যাপনের দুধে-ভাতে স্বপ্নকে যুগে যুগে চেপে ধরতে চেয়েছে। নবারুণ সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে চাননি কোনওদিন। নৈতিক দায়িত্বে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, - 'আমাদের, যাদের চেতনার উন্মেষ সত্তরে, আমাদের পক্ষে একটা নন-র‍্যাডিকাল অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ এই কলকাতার রাস্তায়, এই স্ট্রিট ফাইটিংয়ে যে আমার সময়টা কেটেছে, আমি তার মধ্য দিয়ে শিখেছি। আমি কোনো বই পড়ে সাধারণ মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হইনি। আমি তার প্লাইট দেখে, তার কষ্ট দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং সেটাই আমায় মোটিভেট করে এবং সেগুলিই হল আসল লেখকের শিক্ষা। আমি যখন দশটা জিনিস দেখি... এই যেমন কিছুদিন পরে আমি দিল্লিতে যাব আমার ছেলের কাছে, ওখানে ভীষণ পলিউটেড কিছু খাল আছে, সেখানে কিছু লোক আছে, যারা রোজ খালের ওপর যে তেলটা ভাসে, তা কাপড়ে করে তোলে, তুলে একটা জায়গায় ভরে, সারাদিন ধরে করে যখন দু-লিটার তিন-লিটার হয় সেইটা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। এবং এই প্রত্যেকটা লোক কিন্তু আর্লি ডেথে মারা যাবে, ভয়ংকর পয়েজনিং ওদের ঘটছে। এটাও তো একটা মানুষের অস্তিত্ব। সেখানে তার পাশে যখন কোটিপতিদের গাড়িগুলো চলে, দোকানে দোকানে যখন কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে, এক একটা শপিংমল... আনথিংকেবল! তখন এই দৃশ্যগুলো আমাকে ভাবায়। এটাই তো আমার ভারতবর্ষ, অন্য কিছু নয়।'[৬] - এই ভারতবর্ষের মাটিতে তাই তিনি পুঁতে দিয়েছেন হালাল ঝাণ্ডা। এই ভারতবর্ষের বুকের ভিতর যে অগণিত বেদনার বৃত্ত অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, তাদের প্রতিটির কেন্দ্রে নবারুণ বুনে দিয়েছেন গল্পের বীজ। এই ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে তিনি পথ খুঁজে নিয়েছেন। বাতিল মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'নো বেগড়বাঁই। পরিত্রাণের পথ একটাই। ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁইসাঁই!'[৭]

ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাকে ঢিলটা খানিক পরে মারাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপাতত নবারুণের আরও কয়েকটি গল্প নিয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক। আসলে যে সময় ও

সমাজের কথা গল্পগুলিতে ধরে রেখেছেন তিনি, তাঁর মতো রাজনীতি সচেতন আদর্শবাদী মানুষকে সেসব কথা বলবার জন্য বানিয়ে নিতে হয়েছে নিজস্ব ফর্ম। খুঁজে নিতে হয়েছে নতুন ভাষা। সমাজের গলিঘুঁজিতে তথাকথিত ভদ্রলোকের চোখের আড়ালে বাতিল মানুষদের যেসব গল্প হামেশাই গড়ে ওঠে, নিতান্ত গড়পড়তা বলে যাকে সাধারণত বাতিল করে দেয় প্রথাগত সাহিত্য আর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের পণ্য মানসিকতা, সাত-আটের অস্থির সময়ে বা বলা যায় আজীবন নবারুণ সেসবই খুঁজে নিয়েছেন অপরিসীম সংবেদনে। বলার ধরনে বদল আনতে হয়েছে সে কারণেই। অমূল্য উপাদান ভেবে যা কিছু তিনি সাগ্রহে সাজিয়ে তুলেছেন গল্পে, পাঠককে তুষ্ট করার সমান্যতম চেষ্টা না করে সে সবকিছুকেই অগাধ আত্মবিশ্বাসে নির্মাণ করেছেন নতুন বিন্যাসে! "খোঁচড়", "হালাল ঝাণ্ডা", "প্রতিবিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক", "মার্ডারের ভাই", "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" প্রভৃতি গল্প পড়লে বোঝা যায় সময়ের উপর কত তীক্ষ্ণ নজরদারি চালিয়েছেন তিনি! নজরদারি চালিয়েছেন লুম্পেনদের মনের আনাচে কানাচে। স্বপ্ন দেখেছেন সাম্যবাদের, শোষণমুক্ত সুস্থ পৃথিবীর কিন্তু মার্কসবাদকে সস্তার সেন্টিমেন্ট বানিয়ে সাহিত্য ব্যবসা করেননি কখনও। দেখিয়েছেন তীব্র অন্তর্দাহ কীভাবে অনিবার্য করে তোলে অন্তর্ঘাত। গল্পগুলিতে অনেক সময়ই আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছেন নবারুণ, সচেতন ভাবে সৃষ্টি করেছেন সন্ত্রাসের পরিবেশ। নানান অবাস্তব অনুষঙ্গে বাস্তবকেই ছুঁয়ে দিয়েছেন দ্বিগুণ বিশ্বস্ততায়।

নবারুণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,- 'যে বাস্তবতা আমাকে ঘিরে রয়েছে, সেই বাস্তবতাকে স্বীকার করে কিছু লেখা যায় বলে আমি মনে করি না। অতএব আমি আমার চিন্তায়, আমার ভাবনায়, আমার সৃষ্টিতে একে আঘাত করার চেষ্টা করি।....গদ্যের আনরিয়াল আসলে রিয়েলিটিকে প্রত্যাখ্যান করা। এই রিয়েলিটির সঙ্গেই লেখকের লড়াই। যে রিয়েলিটি কনসেন্ট পাচ্ছে, যে রিয়েলিটি অ্যাকসেপটেড, সেই অ্যাপারেন্ট রিয়েলিটি থেকে কোন মহৎ লেখা তৈরি করা সম্ভব নয়।'[৮] এই আত্মোপলব্ধি থেকেই আপসহীন ভাবে তিনি বহমান বাংলা সাহিত্যের পরিচিত আদলটি ভেঙেছেন। এই আত্মবিশ্বাস থেকেই একুশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে "পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট" গল্পে লিখে ফেলেছেন আগামীর স্বপ্ন আর সম্ভাবনার কথা। লিখেছেন, - 'সারা দুনিয়া জুড়ে কমিউনিস্টরা ফিরে আসবে। হ্যাঁ। তবে তার জন্য আগামী সতেরো বছর বা তারও বেশি সময়ের প্রত্যেকটা ঘন্টা ও প্রত্যেকটা মিনিট কাজে লাগাতে হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে কমিউনিস্টরা ফিরে আসবে। আসবেই। আর দশ নয়, দশ হাজার দিন ধরে দুনিয়া কাঁপবে।'[৯] এমন আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণে বাংলা সাহিত্যে খুব কম গল্পেরই সমাপ্তি টানা হয়েছে। আসলে মতাদর্শ নিরপেক্ষ হয়ে একটি লেখাও লেখেননি নবারুণ। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অনিশ্চয়তাই যখন একমাত্র বাস্তব, তখন লিখে ফেলেছেন "নেকলেস", "৯/১১", "চিন ২০০২" প্রভৃতি গল্প। জনপ্রিয়তা অর্জনের যাবতীয় টেকনিক

সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে পাঠককে বসিয়ে দিতে চেয়েছেন প্রকৃত বাস্তবের মুখোমুখি। বাস্তব-অবাস্তবের প্রচলিত ধারণা গুলিয়ে দিয়ে মহান অনুভবগুলিকে গেঁথে ফেলেছেন "মহাযানের আয়না" কিংবা "অন্ধ বেড়াল"-এর মতো গল্পে। আসলে অযোধ্যার চেয়ে সত্য মেনে নবারুণ গল্পে গল্পে গুরুত্ব দিয়েছেন মনোভূমির বাস্তবকে।

মোটকথা নবারুণের গল্প পাঠককে নিয়ে গেছে এক অন্য বাস্তবে। যে বাস্তবে মানুষ ডানা মেলে উড়তে পারে এবং সেই সুযোগে ক্ষমতাবানদের নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঢুকে পড়ে বানচাল করে দেওয়া যায় সব বানানো শৃঙ্খল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মুখোশ টেনে খুলে দেওয়া যায় পুরন্দরের কয়েক পংক্তি ভাটের কবিতায়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে প্রয়োজন হয় না রক্তপাতের। নবারুণের গল্পে একটা লড়াই জারি থাকে সবসময়। ফ্যাতাড়ু" গল্পে নবারুণ লিখছেন, '-আজ হল অপারেশন ফ্লোটেল অর্থাৎ ভাসমান হোটেলে হানা।

সেই ভ্যামপায়ার মাছেদের মতো?

-না, না, খুনজখম নয়। ভয় দেখানো। নোংরা করা। ভন্ডুল করে দেওয়া। এতেই তো মজা।

-আচ্ছা, ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর ওই যে প্লেজার রেসর্টগুলো হয়েছে তার ওপরে ইটপাটকেল নিয়ে ভুতুড়ে অ্যাটাক হয়েছিল বলে কাগজে বেরিয়েছিল সেটাও কি...

— হ্যাঁ, ওটাও ফ্যাতাড়ুদের কাজ। তুমি ভালো ফ্যাতাড়ু হয়েছ। তোমায় দিয়ে হবে। ঘাপঘপ সব বুঝে ফেলছ।

-কী করে হলাম সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

প্রপার কোয়ালিফিকেশন থাকার দরকার। বড় বড় অফিসে গেলে, দেখা করছে না, বসিয়ে রাখছে, তুমিও থেমে থাকার পাত্র নয়- মনে মনে খিস্তি করছ, নাক খুঁটে চেয়ারের হাতলে লাগাচ্ছ, নখ দিয়ে চিমটে চিমটে গদি ছিঁড়ছ, বল এমন করনি?

-হ্যাঁ করেছি।

-ড্যামেজ। পারলেই ড্যামেজ করো। এইটা মাথায় থাকতে হবে। এরকম যারা করে তাদের আমরা রিক্রুট করি। একেবারে যেগুলো হোপলেস কেস, আধমরা, লাতখোর ছেলে-এই সবের থেকে বেছে বেছে...'।[১০] নবারুণের হাঁটা কল্লোল নির্দিষ্ট পথে নয়। যদিও বাস্তবের ছোট-ছোট ভূগোলে যাদের বাস, তারাই নবারুণের চরিত্র। তবু সম্পূর্ণ অন্যরকম দৃষ্টিকোণে তাদের দেখেন তিনি, দেখান পাঠককে। আদিবাসী, নদীতীরের মানুষ, সমুদ্রতটবাসী কিংবা শহুরে দরিদ্র বস্তিবাসীরা তাঁর গল্পে উঠে আসে। যে ক্ষমতাবানরা জেলেদের হটিয়ে দিয়ে টুরিস্ট স্পট বানায়, কারখানা গুঁড়িয়ে শপিংমল, বস্তির বদলে হাইরাইজ, তাদের বানিয়ে তোলা বাস্তবের বিপরীতে নবারুণ গড়ে তুলতে চান অ্যাপারেন্ট রিয়েলিটি। "ফ্যাতাড়ু" গল্পের ডি. এস এবং মদনের উপর্যুক্ত সংলাপে সেই বাস্তবেরই সন্ধান মেলে।

নবারুণের গল্পে বারেবারে অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। যেমন- '... ওপরের দিকে তাকিয়ে ডি. এস দেখল...

... চৌকোটে হলদে হ্যালোজেনের আলোর পাশে উড়ন্ত মদন আকাশে থেমে আছে। আস্তে আস্তে হাত নাড়ছে আকাশে এক জায়গায় স্থিতু থাকার জন্যে। দুপাটি নকল দাঁতের ওপরে হলুদ হ্যালোজেন সোনালি আভা তৈরি করেছে।

-মদন

-তোমাকে বলেছিলাম না যে ফ্যাতাড়ুদের বেলায় কোনো হিসেব চলে না। এসো। উঠে এসো।

-কী করে?

ডি এস ডান হাতে অ্যাটাচি নিয়ে ঝটপট করে উড়তে চেষ্টা করে। ঘেমে যায়।

ওরকম করে নয়। ওপর নিচে হাত নামাও ওঠাও। অ্যাটাচিটা দু পায়েই চেপে রাখো। এই রকম। হ্যাঁ। আর বলো.....

কী বলবো?

-ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই... ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই... মদনের ফিনফিনে পাঞ্জাবি ইস্তিরি করা বলে ঠেকছে। ডি এস বলতে থাকে।

-ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই... ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ... প্রথমে ডি এস বুঝতেই পারেনি যে সে উড়তে শুরু করেছে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল যে ফুটপাত থেকে হাত খানেক ওপরে সে ভাসছে। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ডি এস। ফলে একবার ধপকরে পড়েও গেল। ওপর থেকে মদন ধাঁতানি দেয়,

-যেই ড্যাঙা থেকে ঠ্যাং দুটো উঠল অমনি মন্তর বলা ছেড়ে দিল। তেঢ্যামনা কোথাকার। আরো ওপর থেকে পড়লে ভালো হত। বল মন্তর বল

ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই... ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই ... এবার ডি এস স্বচ্ছন্দে উঠে আসে। মদনের পাশে এসে ফড়ফড় করে উড়তে থাকে।'[১১]

তারা "বাওয়াল" করে, "হ্যাটা" করে, "কিচায়েন" লাগায়, "ড্যামেজ" করে। নবারুণের শব্দচয়ন, বাক্যগঠন- প্রচলিত গদ্যরীতিকে দারুণ ধাক্কা দেয়। যাট-সত্তরের গল্প আন্দোলনকারীদের মতোই নবারুণ সৃষ্টিতে উপভোগ করেন উচ্চারণের চরম স্বাধীনতা। ফলে তাঁর গল্প তাঁর সময়পর্বে বিশেষ হয়ে ওঠে।

১৯৯৫ এ "প্রমা" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় "ফ্যাতাড়ু"। তারপর তারাই মূল অস্ত্র হয়ে ওঠে নবারুণের। তাদের নিয়েই আস্ত দুটি বই "ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য" এবং

"ফ্যাতাড়ুর কুম্ভীপাক" প্রকাশিত হয় অল্প সময়ের ব্যবধানে যথাক্রমে ২০০৪ ও ২০০৯ এ। প্রথম বইটির ভূমিকায় নবারুণ লেখেন,- 'ফ্যাতাড়ুদের এই সংকলনটি জরুরি ছিল। যদিও এর মধ্যে তারা "কাঙাল মালসাট" শীর্ষক একটি আখ্যানে জায়গা করে নিয়ে বিস্তর হারামিগিরি করেছে। এবং থিয়েটার ও সিনেমাতে মুখ দেখাবে বলেও থ্রেট করেছে। ফ্যাতাড়ুরা আমার অতীব প্রিয়। সম্ভবত আমি নিজেও ফ্যাতাড়ু।'[১২] আর সেকারণেই "কাঙাল মালসাট", "মসোলিয়াম" উপন্যাসে স্বমহিমায় উপস্থিতি সত্ত্বেও অন্তর্বাস্তবের বার্তা দিতে তাদের নিয়ে "ফ্যাতাড়ু" সমেত মোট আঠারোটি গল্পের অবতারণা করেছেন নবারুণ। ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন প্রচলিত ডিসকোর্স। পাঠকের দিকে রকমারি সাইকোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে পাঠককে গল্পের সঙ্গে ইনভলব হতে বাধ্য করেছেন। ফ্যাতাড়ুরা কিছুটা আলগা করে দিতে পেরেছে ক্ষমতাবানদের মুখে আঁট হয়ে বসা মুখোশ। গল্পগুলি পড়ে পাঠক আমোদ পেয়েছে যত, তার বহুগুণ আঘাত পৌঁছে গেছে সমাজের আনাচে কানাচে জমে থাকা অন্ধকারে।

মান্য মানুষের মান্য ভাষাকে প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন নবারুণ। বোমা মেরে ওড়াতে চেয়েছেন প্রচলিত ভাষাছাঁদ। বরাবরই তিনি বাতিল মানুষদের গল্পে উপস্থিত করেছেন তাদের নিজস্ব বুলি সমেত। স্ল্যাং ব্যবহার করেছেন তাদেরই সম্মানিত করার জন্যে। বলেছেন, 'ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন, প্লাস্টিকগন্ধী ও ড্যামনা করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছেই। আমাদের কাজ হল এই সব সচেষ্টদের বাংলা মতে ক্যালানো। আগে তেরপল চাপা। তারপর খেঁটো বাঁশ।'[১৩] গল্পের শরীরে ভাষা নিয়ে এতখানিই আক্রমণাত্মক তিনি, গতানুগতিক ভাষাকে ভেঙে ফেলতে এতখানিই নাছোড়বান্দা। আগে নিরীহ নিরাপদ ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝে নিয়েছেন, তারপর তাকে ভেঙেছেন আপসহীন ভাবে। আসলে প্রচলিত মূল্যবোধকেই যিনি সব অর্থে মূল্যহীন মনে করেছিলেন, মান্য ভাষাকে তো তাঁর হাস্যকর মনে হতেই পারে। বাংলা ভাষার শক্তিকে তিনি পুনরাবিষ্কার করেছেন। সেই ভাষাতেই চিনিয়ে দিয়েছেন মানব মনের নিস্পৃহ নিষ্ঠুরতাকে। নবারুণের বিধান ছিল, 'আমাদের গুষ্টির নিয়ম হচ্ছে জন্মে জন্মে আমরা একবার করে মহাচক্রের খেলা, মহামন্ডলের ঘুঘুচক্কর দেখিয়ে যাব।'[(১৪)] বাস্তব-অবাস্তবের ঘুঘুচক্করে নবারুণ গল্পগুলিতে দিব্যি জমিয়ে তুলেছেন মহাচক্রের খেলা। যে খেলায় গল্পে গল্পে নির্মিত হয়েছে এক বিকল্প বাস্তব; বাস্তবের কয়েক পরত গভীরে পাঠককে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন বোহেমিয়ান নবারুণ।

**তথ্যসূত্র :**

১। ভট্টাচার্য নবারুণ, আরও কথাবার্তা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৬৩।
২। ভট্টাচার্য নবারুণ, নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ০৭।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ০৭।
৪। ভট্টাচার্য নবারুণ, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২১।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯।
৬। ভট্টাচার্য নবারুণ, আরও কথাবার্তা(২০১৬), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪।
৭। ভট্টাচার্য নবারুণ, ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৫।
৮। ভাষাবন্ধন, নবারুণ সংখ্যা ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৯।
৯। ভট্টাচার্য নবারুণ, শ্রেষ্ঠ গল্প(২০১০), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৪৩।
১০। ভট্টাচার্য নবারুণ, ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য(২০০৮), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩।
১২। ভট্টাচার্য নবারুণ, ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য(২০০৮), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ০৫।
১৩। রবিবারোয়ারি, ১০ আগস্ট ২০১৪, পৃষ্ঠা- ০৫।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ০৩।

অনিমেষ ব্যানার্জী

## পরিবেশবিদ্যার আলোকে মণিশঙ্করের 'কালু ডোমের উপাখ্যান'

William Ruckert প্রথম ইকোক্রিটিসিজম পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মূলত সাহিত্য ও পরিবেশের মধ্যকার বহুমুখী পাঠ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গ্লটফেল্টি যথার্থই মন্তব্য করেছেন —

"Ecocriticism is the study of relationship between literature and physical environment."[১]

অন্যভাবে বলা যায় ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব হল সাহিত্য ও বস্তুজগতের মধ্যে সম্পর্কের নির্ণায়ক। পরিবেশবাদী পাঠ এমন একটি পদ্ধতি যা প্রচলিত পরিবেশভাবনাকে ধারণ করে পরিবেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সাহিত্য ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই তত্ত্বের মধ্যে মানুষের পরিবেশ রক্ষার মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে Michael P. Cohen বলেছেন —

"Expression of human experience primarily is a naturally and consequently in a culturally shaped world- the joys of abundance– sorrows of deprivation– hopes of harmonious existence and fear of loss and disaster."[২]

সুতরাং, ইকোক্রিটিসিজম হল এক বৃহত্তর প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও সাহিত্যের গভীর আলোচনা এবং তা পরিবেশ সম্পর্কিত মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ। পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত উপাদান, যেমন — জল, মাটি, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি যখন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ রক্ষার তাগিদ আলোচিত হয় তখন তা হয়ে ওঠে সার্থক ইকোক্রিটিসিজম সাহিত্য।

### এক

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষণ সমানুপাতিক। বর্তমান সভ্যতায় সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ দূষণ একটি বহুল সমস্যা। পরিবেশ দূষণ এবং অরণ্যচ্ছেদনের সম্মিলিত প্রভাবে মানব সভ্যতাসহ সমগ্র প্রাণীকুল আজ সংকটের মুখোমুখি। নানারকম জটিল ব্যাধির চক্রব্যূহে বিশ্বপ্রাণ আজ আতঙ্কিত। ফলে পরিবেশকে সুস্থ রাখতে আমাদের নতুন করে ভাবার এবং পরিবেশের গুরুত্ব সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করার অবকাশ এসেছে। এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন বর্তমান সাহিত্যে ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে পরিবেশ সচেতনতা এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত ভাবনা কিন্তু আমরা বিশেষভাবেই রবীন্দ্রসাহিত্যে লক্ষ করে থাকি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকটি এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই নাটকে দেখা যায় প্রকৃতি-সংহারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানবিক

সত্তাটিরও অবলুপ্তি ঘটেছে। মানুষের মজ্জা, মন, প্রাণ শুকিয়ে সে হয়ে উঠেছে যন্ত্রসভ্যতার উচ্ছিষ্ট। নন্দিনীর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়ে গেছেন পরিবেশকে নিয়ে সচেতনতার অমোঘ বাণী —

“পৃথিবী আপন প্রাণের জিনিস খুশি হয়ে দেয় কিন্তু যখন তার বুক চিরে মড়া হাড়গুলিকে ঐশ্বর্য্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসেরর অভিসম্পাত নিয়ে আসো।”[৩]

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ‘অরণ্যদেবতা’ (১৯৩৮) প্রবন্ধে পরিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যা ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায়কে চিহ্নিত করেছিলেন বিচক্ষণতার সঙ্গে —

“মানুষ অমিতচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান; ক্রমে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ হারালো; যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে বহন করে এনেছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করার জন্য। দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল যে শ্যামল বনলক্ষী তাকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। অরণ্য নষ্ট হওয়ায় বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষীকে — আবার তিনি রক্ষা করুণ এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিন তার ছায়া।”[৪]

ইকোক্রিটিসিজমের তত্ত্ব রবীন্দ্রযুগে প্রচলিত না থাকলেও, পরিবেশ নিয়ে সচেতন ভাবনা আমরা তাঁর সাহিত্যে প্রভূত লক্ষ করে থাকি। প্রকৃতিপ্রীতি, প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতা আমরা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র সাহিত্য ব্যতীত প্রচুর লক্ষ করে থাকি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) ‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব : ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব : ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব : ১৯২৭ এবং চতুর্থ পর্ব : ১৯৩৩) উপন্যাসটি এই বিষয়ে সার্থক উপন্যাস। শ্রীকান্তের চোখ দিয়ে ঔপন্যাসিক পাঠকের চোখে গ্রাম্য প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যকে যেমন প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, ঠিক তেমনই প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গতাও আমাদের নজর এড়ায় না। পরবর্তী ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক উপন্যাস পাওয়া যায় যেগুলির বিষয় পরিবেশ এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা। এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিখ্যাত উপন্যাসগুলি নিম্নরূপ :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০): ‘উপনিবেশ’ (৩ খণ্ড, ১৯৪৪-১৯৫০), ‘মহানন্দা’ (১৯৫১)

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮): ‘প্রথম প্রহর’ (১৯৫৪), ‘দ্বীপের নাম টিয়ারঙ’ (১৯৮৭)

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০): 'শতকিয়া' (১৯৫৮)

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭): 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), 'বন কেটে বসত' (১৯৬১)

অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২): 'চরকাশেম' (১৯৪৯)

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১): 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১)

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮): 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১), 'জগদ্দল' (১৯৬৬)

গুণময় মান্না (১৯২৫-২০১০): 'জুনাপুর স্টিল' (২ খণ্ড, ১৯৬০-১৯৬২)

মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (১৯৩৩- ): 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি' (১৯৬৫)

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬): 'ক্ষুধা' (১৯৯১)

কিন্নর রায় (১৯৫৩- ): 'প্রকৃতিপাঠ' (১৯৯০), 'মেঘমাতাল' (১৯৯৫)

অমর মিত্র (১৯৫১- ): 'হাঁসপাহাড়ী' (১৯৯১), 'কৃষ্ণগহ্বর' (১৯৯৮)

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮- ): 'বিনোদনের বিপণন (১৯৪৪)

জয়া মিত্র (১৯৫০- ): 'একটি উপকথার জন্ম' (১৯৯৪)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫ -): 'পার্থিব' (১৯৯৪)

সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪ -): 'জলতিমির' (১৯৯৮) ইত্যাদি।

বর্তমান কালের একজন প্রতিশ্রুতিমান কথাকার হলেন মণিশঙ্কর মণি (১৯৭৪- )। তিনি পেশায় শিক্ষক হলেও নেশায় সাহিত্যিক। বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যেই তিনি জনপ্রিয় এক কথাকার। তিনি মূলত তাঁর উপন্যাসগুলিতে একটি বিশেষ জনজাতির জন্মকথা, পেশা, মিথ এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থার সাপেক্ষে তাদের অবস্থানগত পরিচয় উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি জনজাতিগুলির অস্তিত্ব-সংকটের কথা বলতে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারের চালচিত্র উন্মোচিত করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে পরিবেশ সচেতনতার এক একটি দলিল। তাঁর উপন্যাসগুলি হল নিম্নরূপ —

'কালু ডোমের উপাখ্যান' (২০১৮)

'লোহার' (২০২০)

'লাল ডুংরির কোল' (২০২০)

'সুজন বাউরা' (২০২৪)

'মহুলবনের কান্না' (২০২৫)

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মণিশঙ্কর মণির বিখ্যাত উপন্যাস 'কালু ডোমের উপাখ্যান'। এই উপন্যাসটিতে পরিবেশ সচেতনতা এবং পরিবেশের অপব্যবহারের দুঃসহ

ফলশ্রুতির বার্তা প্রদর্শিত হয়েছে। পরিবেশবিদ্যার আলোকে ‘কালু ডোমের উপাখ্যান’ উপন্যাসটিকে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

**দুই**

‘কালু ডোমের উপাখ্যান’ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মধু ডাক্তারের জবানীতে। তিনিই কাহিনির কথক। তিনি কাহিনি শুরু করেছেন ডোম সম্প্রদায়ের উৎপত্তিজনিত লোককথার বর্ণনা দিয়ে। ডোম সম্প্রদায়ের কোন্ উপবিভাগ থেকে উপন্যাসের নায়ক কালু ডোমের উৎপত্তি, তা ব্যাখ্যাদান করেছেন। লোককাহিনি এবং ডোম সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা কালু বীরের পরিচয়ের সূত্র ধরে উপন্যাসের নায়ক কালু ডোমের জন্ম এবং দেহগত সাদৃশ্য — সবেরই অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। কালুর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের চিত্র অসাধারণ শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত করেছেন। এই পর্যায়ে আমরা ধারণা করতে পারি যে, কালু নামক এক মহান অথচ ব্যতক্রমী ডোম যুবকের কাহিনি শুনতে যাচ্ছি, যা একদা আমরা ধর্মমঙ্গলের অন্যতম প্রতিনায়ক কালুডোমের বীরত্বে পেয়েছি। কিন্তু উপন্যাসের গভীরে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন স্তরীভূত বিষয়কে অতিক্রম করে পরিবেশ সচেতনতা প্রধান হয়ে উঠেছে এবং উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ইকোক্রিটিসিজম্-এর সার্থক দৃষ্টান্ত।

‘কালু ডোমের উপাখ্যান’ উপন্যাসে কথাকার মণিশঙ্কর মণি মধু ডাক্তারের জবানীতে সামাজিক ইতিহাস ও জনশ্রুতি মিলিয়ে ডোম জাতির সৃষ্টিতত্ত্ব শুনিয়ে মূল উপাখ্যানে প্রবেশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ডোম সম্প্রদায় চারটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত — আঁকুড়িয়া, বিশদেলিয়া, বাজুনিয়া এবং মঘৈয়া। এদের মধ্যে আঁকুড়িয়া ও বাজুনিয়া বঙ্গজ বংশোদ্ভুত। আবার একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও আঁকুড়িয়া ডোমের সামাজিক অবস্থান বাজুনিয়া ডোম অপেক্ষা উপরে। এই উপন্যাসে কথাকার বাজুনিয়া ডোমের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় যেমন যত্নের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তেমন তাদের জীবিকা-সংকট, বিশ্বাস, সংস্কারকেও উপস্থাপন করেছেন। বাজুনিয়া ডোমেরা সাধারণত বাজনা বাজিয়ে জীবনধারণ করে থাকে। যৎসামান্য উপায়ের মধ্য দিয়ে এবং অভাবী পেটের জ্বালাকে চাপা দিয়ে তারা বাজনার মাধ্যমে গৃহস্থের মঙ্গলকামনা, নবদম্পতির সুখসমৃদ্ধি এবং নবজাতকের দীর্ঘায়ু কামনা করে থাকে। বাজুনিয়া ডোমের এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে বারব্যান্দা গ্রামের পঞ্চপ্রধান বিষাণের ঘরে জন্ম হয় কালু ডোমের। এই কালু কালক্রমে বড় হতে থাকে এবং প্রতিস্পর্ধী নায়করূপে উপনীত হয়ে ওঠে।

কালু বাজুনিয়া ডোমের গোত্রভুক্ত হয়েও আঁকুড়িয়া ডোমের ধর্ম গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়। সে বাজুনে ডোম হয়েও গায়েন হয়ে ওঠার স্পর্ধা দেখায়। সে স্রোতের বিপরীতে অভিযাত্রী হয়ে গুরুর মন জয় করে এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালী গান গাওয়ার তালিম নিয়ে হয়ে ওঠে প্রধান গায়েন। ফলে কালুকে তার প্রতিস্পর্ধী কৃতকর্মের জন্য বাজুনিয়া ডোম

সমাজ মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা কালুকে তার পিতৃদত্ত ঢোল বাজাতে নিষেধ করে। কিন্তু সে তার বংশের আভিজাত্যকে বজায় রাখতে চায়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব — ব্যক্তিসত্তা বনাম সমাজ। এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয় সেই গ্রামের বামুনকর্তার মধ্যস্থতায়। কালুর অসাধারণ শিল্পীসত্তার জন্য সে তাকে গ্রামের ল্যাংটেশ্বরের পূজায় ঢোল বাজাতে নির্দেশ দেয়। কালুর ব্যক্তিসত্তা বনাম বাজুনিয়া ডোম সমাজের দ্বন্দ্ব মিটলেও তার সংসারে ঘনিয়েছিল অশান্তির ঘন কালোমেঘ। কালুকে তার মা কমলি দোষী সাব্যস্ত করে তার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে। কালুর জাত-বিরোধী কর্মের জন্যই অর্থাৎ বাজুনিয়া ডোম হয়েও আঁকুড়িয়া ডোমের ধর্ম পালন করার অভিসম্পাত স্বরূপ তার ঔরসজাত সন্তান গর্ভেই নষ্ট হয়ে যায়। সন্তানহানির সংবাদে ব্যথিত কালু সত্য সত্যই নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকে। সে স্থির সিদ্ধান্ত নেয় যে, আর কখনো সত্যনারায়ণের পাঁচালী গাইবে না। কিন্তু তার মনের ভুল নিরসনে এগিয়ে আসে স্ত্রী লক্ষ্মী। লক্ষ্মী গোপন সত্য প্রকাশ করে বলে যে, তার গর্ভজাত সন্তানহানির কারণ কালুর পিতা বিষাণের আচরণ (গর্ভজাত লক্ষ্মীর পেটে পদাঘাত)। স্ত্রী লক্ষ্মীর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কালু নিষ্পাপ এবং যদি ল্যাংটেশ্বরের দয়া হয় তবে সে আবার গর্ভবতী হবে এবং তার সন্তান কালক্রমে দশ বছরে পড়লে তাদের বংশজাত ঢোল কাঁধে তুলে নেবে। এর জন্য কালুকে আগের মতোই গায়েন হতে হবে।

কালক্রমে সত্য সত্যই লক্ষ্মী গর্ভবতী হয়। কালুও সত্যনারায়ণ পাঁচালীর গানে মায়াবী সুর তোলে এবং আপামর নিঃসন্তান জননীর চোখকে আদ্র করে তোলে। এমনকি তার গুরুও চোখের জলকে বাঁধ মানাতে পারে না এবং শিষ্য কালুর মধ্যে দিয়ে জীবনের সার্থকতাকে উপলব্ধি করে। যখন মনে হচ্ছিল কালুর জীবনে সার্থকতা নেমে আসছে, যখন মনে হচ্ছে শৈল্পিক পূর্ণতা তাকে নিবিড় শান্তিতে বশীভূত করে তুলছে, ঠিক তখনই উপন্যাসটিতে জন্ম নেয় এক ভিন্নতর দ্বন্দ্ব। কালুর মানসিকতার বিপরীতে অবস্থান করে তারই পুত্র হৃদয় হয়ে উঠে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। কালু ও তার পুত্র হৃদয়ের দ্বন্দ্বই এক ভিন্নতর মাত্রা যোগ করে উপন্যাসটিতে এবং উপন্যাসটিকে সার্থক পরিবেশবাদী উপন্যাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে।

**তিন**

মণিশঙ্কর মণির 'কালুডোমের উপখ্যান' সূত্রে জানা যায় বারবেন্দ্যা গ্রামের পঞ্চপ্রধান বিষাণের প্রথমা স্ত্রীর নাম কমলি। তাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম ছিল গভীর। কিন্তু সন্তানহীনতা পরস্পরের সম্পর্কে ফাটল ধরায়। তাদের মধ্যে প্রবেশ করে একে অপরের প্রতি ঘৃণা। সবশেষে কমলি বিষাণের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পিতৃগৃহে ফিরে যায়। পঞ্চের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের মত নিয়ে বিষাণ দ্বিতীয় বিবাহ করে। বছর ঘরতে না ঘরতেই নতুন স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠে। ঘন কৃষ্ণবর্ণের এক স্বাস্থ্যবান পুত্রের জন্ম দিতে গিয়ে সেই

কিশোরী মা মারা যায়। স্ত্রীর শোকে পাগল হয়ে যাওয়া বিষাণ সেই পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু বাসী ডোমনির মধ্যস্থতায় সেই শিশু রক্ষা পায়। শোকে মুহ্যমান বিষাণ গৃহত্যাগ করে। বাসী ডোমনির স্তন্যদুগ্ধে সেই শিশু বড় হয়ে উঠতে থাকে এবং বাসী হয়ে ওঠে তার দুধমা। এ প্রসঙ্গে কথাকার বলেছেন :

"ডোমসমাজে এও এক রীতি। কোনো ছেলে জন্মে মাকে হারালে বা কোনো কারণে মায়ের বুকে দুধ না নামলে যে তাকে প্রথম নিজের বুকের দুধ পান করায় সেই হয় সে-ছেলের দুধমা। জন্মদাত্রীর থেকেও তার অধিকারের দাবীই অগ্রগণ্য হয়।"[৫]

স্বামী মানার বিরোধিতা সত্ত্বেও কালু বাসীর মাতৃস্নেহে পুষ্ট হতে থাকে। এমনকি মানার সঙ্গে তার পুত্রের মত যজমানি করতেও যেতে থাকে। কালুর শৈল্পিক নৈপুণ্যে মানার যজমানি ব্যবসার পশার হয়। কালুর শৈল্পিক দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে তার নিজের তৈরি পাতাবাঁশির মাহাত্ম্য। সে বটপাতার ভাঁজে অসাধারণ মহিমায় সুর সৃষ্টি করে প্রতিবেশীদের অবাক করে দেয়। সামান্য প্রাকৃতিক উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শিল্পসৃষ্টির এরূপ দক্ষতা আসলে প্রকৃতির প্রতি কালুর ভালোবাসারই এক দৃষ্টান্ত।

কালক্রমে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বিষাণ বাদ্যকর প্রথমা স্ত্রী কমলিকে নিয়ে বারবেন্দ্যা গ্রামে ফিরে আসে। শিশু কালুকে দেখে বিষাণ ও কমলির অপত্য-স্নেহ জেগে ওঠে। কালু কিন্তু তাদের স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। কারণ, সে মানা ডোমকে বাবা এবং বাসি ডোমনিকে মা হিসেবে মেনে এসেছে। বাধ্য হয়ে বিষাণ মানা ও বাসির কাছে যায় কালুকে ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে। এখানেও শুরু হয় দ্বন্দ্ব। মানা ও বাসি কালুকে তাদের কাছে ফেরত দিতে অনিচ্ছুক হয়। আসলে কালুর শৈল্পিক নৈপুণ্য ব্যতীত মানার যজমানি ব্যবসা অপূর্ণ এবং কালু বিনা বাসিরও মাতৃস্নেহ অপূর্ণ। শেষে চরম অশান্তির পর পঞ্চসভার মাধ্যমে কালুকে বিষাণ ও কমলির কাছে ফিরে আসতে হয়। নিঃসন্তান কমলি সতীনের পুত্রকে অপার স্নেহে বরণ করে নেয় এবং পৌঢ় বিষাণও কালুর মধ্যে খুঁজে পায় নিরাপত্তা। কিন্তু ছোট্ট কালুর মননে তাদের অপেক্ষা জায়গা করে নেয় প্রকৃতি। প্রকৃতিই হয়ে ওঠে তার সুখ-দুঃখের জগৎ।

প্রকৃতির মধ্যেই কালু পায় তার নিবিড় অন্তরঙ্গতার জগৎ। তার দুঃখ, আনন্দ, সুখ ও সুর-সৃষ্টির আধার হয়ে ওঠে গাছপালা, টিলা-ডুংরিগুলি। বামুনদের পুকুরপাড়ের তালগাছগুলিও ছিল তার সহচর। সে তাদের জড়িয়ে ধরে মনের ভাব প্রকাশ করত। বামুন কর্তা তাদের পুকুরের তালগাছগুলি বিক্রি করে দিতে মনস্থির করলে করাতিরা আসে গাছ কাটতে। গাছ কাটার সংবাদ শুনে ছোট্ট কালু আর্ত চিৎকার করে বলে — "নাঃ! আমি গাছ কাটতে দুব নাই। কিছুতেই দুব নাই।"[৬] কালুর প্রতিবাদ সামান্য হলেও, তা সম্মিলিত রূপ ধারণ করে এবং বামুন কর্তা তাদের দাবী মানতে বাধ্য হয়। তালগাছগুলি মৃত্যুর করাল গ্রাস

থেকে মুক্তি পায়। ছোট্ট কালু অর্থ-মুনাফার উর্দ্ধে উঠে প্রথম পরিবেশ রক্ষায় জয় লাভ করে। উপন্যাসের নিরিখে ঘটনাটি সামান্য হলেও পরিবেশবিদ্যার আলোকে ঘটনাটির গুরুত্ব বিশেষ। এই ছোট্ট কালুর মধ্যে দিয়েই আমরা পরবর্তী সময়ে পাব পরিবেশ-রক্ষার এক অবিসংবাদী নায়ককে।

**চার**

'কালু ডোমের উপাখ্যান' উপন্যাসের একটি পর্যায়ে আমরা নায়ক কালুর জীবন-সম্পূর্ণতার বৃত্তকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। বিঁদি ডোমনির দেহজ মহকের জাল অতিক্রম করে কালুকে আমরা লক্ষ্মী নামে এক কিশোরী ডোমকন্যার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখি। প্রেম-বাসনার স্থান পরিপূর্ণ হলে আমরা কালুকে পেশা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে দেখি। বাজনিয়া ডোম হয়েও কালুকে সামাজিক বিরোধ অতিক্রম করে সফল গায়েন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। আবার লক্ষ্মীর ভালোবাসার অপার শক্তিতে বলিয়ান কালুকে বংশকৌলিণ্যের জয়ঢাককে কাঁধে তুলে নিতে দেখি। ডোম সমাজের বিরোধকে অতিক্রম করে ল্যাংটেশ্বরের পূজায় তাকে ঢাক বাজাতে দেখি। কালু ও লক্ষ্মীর ভালোবাসার ফসল হৃদয়কে জন্মাতে দেখি। পূর্বের গর্ভজাত মৃত সন্তানের শোককে অতিক্রম করে তাদের পরিপূর্ণ হতে দেখি। এমনকি একদা স্বৈরিণী বিঁদি ডোমনী বারবেন্দ্যা গ্রামে বিঁদি ভৈরবী হয়ে ফিরে এসে কালুর কাছে স্বীকার করে যে, সে পুরুষশ্রেষ্ঠ। কারণ, কালুর মত কামগন্ধহীন পুরুষ সে আর দ্বিতীয়টি দেখেনি। বিঁদি ভৈরবী এমন স্বীকারোক্তি সত্যই আমাদের মন ছুঁয়ে যায় — "হে কালাচাঁদ, তুঁই-ই ত আসল সাদক পুরুষ। জগতে অত পুরুষ ঘাঁটিচি। কিন্তুক্ তর পারা এমনটি ত আর কুথাকেও দেখলম নাই!"[৭] অর্থাৎ, একজন পুরুষের মানসিক শান্তিলাভের যা যা প্রয়োজন সবই কালুর মধ্যে পরিপূর্ণ হতে দেখি। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনি এখান থেকেই বাঁক নেই। প্রিয় সন্তান হৃদয়ই হয়ে ওঠে তার জীবনদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী সত্তা। শুরু হয় পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্ব, আর এই দ্বন্দ্বের মূল বিষয় হয়ে ওঠে পরিবেশ রক্ষা বনাম পরিবেশ ধ্বংস।

উপন্যাস সূত্রে আমরা জানতে পারি, কালুর বিপরীত স্বভাবের ব্যক্তিত্ব হল তার পুত্র হৃদয়। কালু নির্লোভি, আস্তিক ও প্রকৃতিপ্রেমি। অন্যদিকে হৃদয় লোভী, নাস্তিক এবং উচ্ছৃঙ্খল। হৃদয়ের এমন বিপরীত স্বভাব কালুকে কষ্ট দেয়। মনে জাগায় অশান্তি। এমনকি যে ল্যাংটেশ্বরের প্রতি কালু পরম নিষ্ঠাবান, সেই ল্যাংটেশ্বরই হয়ে ওঠে হৃদয়ের কাছে অবজ্ঞার পাত্র। যে মূল্যবোধ পুত্রের কাছ থেকে কালু আশা করে তার বিন্দুমাত্র হৃদয়ের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ফলে পুত্রকে প্রকৃত ভালো মানুষ না করতে পারার তীব্র যন্ত্রণা যেমন আছে কালুর মনে, তেমনি পিতা হিসেবে হৃদয়ের মঙ্গলকামনায় আছে একটি আকুতিভরা মন — "হে বাবা ল্যাংটেশ্বর! দোষ লিঅ নাই বাপ্ আমার। উ অবুঝ ছা বটে। উয়ার হঁইয়ে আমি

নাকখত দুব তুমার থানে।"[৮] পিতার আর্তস্বর কিন্তু পৌঁছায় না হৃদয়ের কানে। সে ডোমদের মত দারিদ্রকে সহ্য করতে পারে না, সে সহ্য করতে পারে না নিতান্ত তরঙ্গহীন জীবন। সে চায় অর্থ এবং বৈভব। খুব কম সময়ে অর্থ ও বৈভবকে করায়ত্ত করতে গিয়ে হৃদয় অসততার পথে পা বাড়ায়। সে হয়ে ওঠে শীতল বিশ্বাসের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কারিগর।

শীতল বিশ্বাস ব্যবসাদার। সে বারবেন্দ্যা গ্রামের পরিপার্শ্বস্থ এলাকার জমি লিজ নিয়ে ডিনামাইট দিয়ে ডুংরির পাথর ভাঙার পরিকল্পনা করে। প্রথমেই শুরু করে ডোমসিনির পাথর ভাঙার কাজ দিয়ে। এতে বারবেন্দ্যা গ্রামের ঈশ্বর সম্পর্কিত বিশ্বাস ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কারণ ডোমসিনি তাদের কাছে শুধু ডুংরি বা টিলা না, তাদের ঈশ্বর। তাদের নিবিড় ভরসার স্থান। কালু ও বিন্দি ভৈরবী ডোমদের একত্রিত করে ডোমসিনি বাঁচাতে তৎপর হয়। তাদের সঙ্গে কাক্‌তলীয়ভাবে যোগ দেয় মধু ডাক্তার। কিন্তু পাথর ভাঙার সরকারী ছাড়পত্র দেখায় শীতল বিশ্বাস। ফলে ডোমসিনি বাঁচে না। মুনাফা ও স্বার্থের সামনে প্রকৃতি মাথা নত করতে বাধ্য হয়। আবার ব্যক্তিগত লোভের সামনেও ভেঙে পড়ে সম্মিলিত মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস। ডোমসিনিকে বাঁচাতে কালু তীব্র আন্দোলন করলেও ব্যর্থ হয়। যে একদা শিশু অবস্থায় বামুনদের পুকুরপাড়ের তালগাছগুলি বাঁচাতে পেরেছিল, এখন সেই সচেতন কালুই ডোমসিনিকে বাঁচাতে পারে না। তীব্র অসহায়বোধ নিয়ে কালু অনুভব করে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ই মুনাফার কাছে হয়ে ওঠে মূল্যহীন।

কালুর এই পরাজয় শুধু মুনাফার সামনে পরাজয় না, এই পরাজয় লোভী পুত্র হৃদয়ের কাছেও পরাজয়। প্রিয় পুত্র হৃদয়ই শীতল বিশ্বাসের প্রকৃতি ধ্বংসের মূল সেনাপতি। ধর্মপ্রাণ কালু ঐশ্বরিক মহিমায় হৃদয়কে বোঝায় টিলা-ডুংরির মাহাত্ম্য। কিন্তু আধুনিক চিন্তাভাবনায় মানুষ, লোলুপ হৃদয় ডুংরিগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক সারবত্তা কিছুই পায় না। তার পরিবর্তে সে যে কথা কালুকে শোনায় তা একবিংশ শতাব্দীরই বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা — "তরা যে ক্যানে অমন করে মড়াকাঁদনা জুড়লি সেটাই ত বুঝতে লাচ্চি ক্যালা। ই বাবা, উ পাথরগুলান ত সেই কন আদ্যিকাল থাকে সোব পড়ে রইচে। তা উয়াতে আমার কীটা লাভ হঁইছে তরাই বল্ ক্যানে? যেমন — হাড়-হাভাত্যা ছিলম সেইরকমেই অখনঅ হুটুরে বুলটি দুটা ভাতের লাগে। তার থাকে ত ই বরং ভালই হচ্ছে। খাদান হলে ত সেখ্যানে আমরাই কাজ পাব নকি! লগদ টাকাও ঢুকবেক ঘরকে। হে-হে, একেবারেই কড়কড়্যা! থুতু দিয়ে গুনে লিবি সোব।"[৯] এমনকি কালুর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে তাচ্ছিল্য করে বলে — "ঠাকুর বটে? বটে ঠাকুর? তা কন শালায় দেখেচুস্ বল, যে উ ঠাকুর বটে? নকি উয়ারা শুদু তর কানেকানেই বলে গেইচে, উয়ারা ঠাকুর বটে?"[১০] হৃদয়ের দেখানো সহজ উপার্জনক্ষম পথে অনেকেই পা বাড়ায়। ফলে বারবেন্দ্যা গ্রামের পরিস্থিতি বদলে যায়। বারবেন্দ্যা গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ

নির্বিচারে ধূলিসাৎ হতে থাকে — "দু'বছর পেরোতে না পেরোতেই জায়গাটা যেন ভাঙাচোরা মানুষের লাশ হয়ে গেল। একটা ডুংরিকেও বাদ দিল নাই। কোনো পাথরচাঁই বাকি থাকল নাই। ডিনামাইট ফাটিয়ে সবকে গুঁড়ো করে দিল। ডাঙাগুলোতে চলল বুলড্রজার-জিম্পি। বসল তিনখানা ক্রেসার মেশিন। শীতল বিশ্বাসের দেখাদেখি আরও জনাদুয়েক নামল ও ব্যবসায়। তারাও বসাল ক্রেসার। সারাদিন তাদের ঘরঘর শব্দে প্রাণ টেকান দায় হয়ে উঠল।"[১১] পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ কালুকেও পাওয়া যায়। সে সহজে মাথা নত করতে চায় না। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে আশ্রয় নিল পালাগানের। হৃদয়ের আর্তি মিশিয়ে সে গাইতে লাগল —

"অ আমার বঁধু হে কতেক মধু আছে ই জেবনে
তুঁই করুস্ বাঁশের কাজ আমি ধরি ঝুমুর লাচ
খাটেলুটে আনন্দেতে ভরাই আমরার মনে
অ আমার বঁধু হে
আহা ই জগতের টিলা-ডুংরি তারাই আমরার সহচরি
কে বলেছে পাথর শুদুই পাথর হঁইয়েই ঘনে
অ আমার বঁধু হে "[১২]

মুনাফার বিরুদ্ধের কালুর পরিবেশ রক্ষার একক সংগ্রাম কল্কে পায় না। যে ডোমেরা নগদ অর্থ কাকে বলে জানত না, সেই ডোমেরাই নগদ অর্থের সুখে অভ্যস্ত হতে থাকল। পরিবেশের গুরুত্ব তাদের কাছে সামান্য হয়ে উঠল। অন্যদিকে লিজ নেওয়া জমির সমস্ত ডুংরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর শীতল বিশ্বাসের চোখ পড়ল খাসেরডাঙার পাথরগুলির উপর। কালু সেই পাথরগুলিকে রক্ষা করতে একা ঢাল হয়ে দাঁড়াল। ফলে শীতলের চ্যালা তথা হৃদয়ের সঙ্গে কালুর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। পিতা ও পুত্রের তর্কবিতর্ক হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেল। নবযুবক পুত্রের কাছে কালু পরাজিত হল। কিন্তু কালুও তাতে দমল না। সে কাঁধে তুলে নিল জয়ঢাক। প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে কালু তাদের পূর্বপুরুষ কালুবীরের অভ্যর্থনা জানাল। এই পর্যায়ে কালুর রুদ্র রূপ আমাদের মনে মুগ্ধতার আবেশ আনে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের নির্নিমেষ অত্যাচার যেন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। এবার আসতে চলেছে প্রকৃতির রুদ্র রূপ। যা মানুষের লোভ-লালসাকে খণ্ডন করতে চলেছে মৃত্যুর করাল গ্রাসের মধ্য দিয়ে। এই পাপে যেন কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না, মৃত্যুই একমাত্র অবলম্বন। কালুর রুদ্র মেজাজ যেন প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপকেই ইঙ্গিত করল। এই পর্যায়ে কথাকার মণিশঙ্করের কৃতিত্বকে সত্যই অভিবাদন জানাতে হয়।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের নির্নিমেষ অত্যাচারের প্রথম প্রতিশোধ লক্ষণ দেখা গেল

হৃদয়ের মধ্যে দিয়েই। সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে মধু ডাক্তারের কাছে এল চিকিৎসা করাতে। প্রাথমিক পরীক্ষা করেই মধু ডাক্তার বুঝতে পারল হৃদয় সিলিকোসিস নামক মারণ রোগে আক্রান্ত। যে রোগের উৎপত্তি হয় বায়ু দূষণ থেকে। নিরুপায় মধু ডাক্তার হৃদয়কে গোবিন্দনগর হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিল। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে সে উপলব্ধি করল বারবেন্দ্যা গ্রাম পরিপার্শ্বস্থ মানুষগুলির জন্য অপেক্ষা করলে ভয়ঙ্কর বিপদ। ডুংরি ধ্বংস করতে গিয়ে যে পাথরগুঁড়ো বাতাসে মিশে গেছে এবং প্রতিনিয়ত মিশছে তা থেকে মুক্তি নেই। পাথরের গুঁড়োয় রুদ্ধ ফুসুফুসে বিশুদ্ধ অক্সিজেনই হয়ে উঠছে দুর্লভ। তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অসহায় মানুষের মৃত্যুই হবে ভবিতব্য।

মধু ডাক্তার মরিয়া হয়ে ডোমপাড়ার সমস্ত মানুষকে একজোট করতে তৎপর হল। সে তাদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হল। তাদের সামনে হৃদয়ের শারীরিক অসুস্থতার কারণ হিসেবে সিলিকোসিস রোগের বৃত্তান্ত এবং উৎপত্তিজনিত কারণ ব্যাখ্যা করল। মধু ডাক্তারের এই সচেতনতা সবশেষে ডোমপাড়ার মানুষজনদের একসূত্রে গ্রথিত করল। পুত্রের মরণরোগের খবর শুনে কালু সাময়িকভাবে বিষন্ন হয়ে পড়লেও আপামর সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে সে হয়ে উঠল ত্রাতা। সাধারণ মানুষের মৃত্যুভয়কে কাজে লাগিয়ে সে যন্ত্রদানবের বিরুদ্ধে গড়ে তুলল সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ। আর প্রতিবাদের ভাষা গান হয়ে ধ্বনিত হল —

“কত আশা ছিল মনে শুনাব জনে জনে
কত বেদনা পাল মনে দুখিনী গেরাম
শয়তানের ভুখ মেটালাম দিয়ে বুকের দাম
বসে বসে কাঁদে দেখ দুখিনী গেরাম
দুখিনী গেরাম গো আমরার দুখিনী গেরাম।।
গাছগাছালি যত ছিল পাখপুখুড়ি তত ছিল
সকল কিছু হরে লিল, লিল গায়ের চাম
পথে পথে কাঁদে বুলে দুখিনী গেরাম।।
হায় বন্ধু একি হল পাথর ভাঙার কল বসিল
লোভ দেখাঁইয়ো দাগা দিল বুকে করিল খাদান
জোছনাতে কাঁদে বুলে দুখিনী গেরাম।।
উঠ জাগ বন্ধুজনা মরণফাঁদে পা দিওনা
জাগে দেখ সব ললনা ফেল গায়ের ঘাম
পথেঘাটে কাঁদে বুলে দুখিনী গেরাম।।”[১৩]

শুধু শারীরিক অসুস্থতা না, টিলা-ডুংরি ধ্বংসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিল তীব্র

জলসঙ্কট। পুকুর, খাল, নালা, জোড়ের জল সব খাদানের গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল। ভৌম জল আরো গভীরে হারিয়ে যেতে লাগল। গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়তে লাগল। গ্রামীণ মানুষ অনিশ্চিত কৃষিকাজের চিন্তায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। শারীরিক অসুস্থতার ভয় তথা মৃত্যুভয় এবং জলসঙ্কটের দরুন পেশাসঙ্কটের আতঙ্কে সাধারণ মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হলেও শীতল বিশ্বাসের মত মুনাফাবাজদের কর্মকাণ্ড তারা বন্ধ করতে পারল না। অসুস্থ হৃদয়ের জায়গায় সে সাকরেদ হিসেবে নিয়োজিত করল তাপস নামে আর এক ডোম যুবককে। তাপসের সঙ্গে সঙ্গে একদল ডোম যুবককে নিজের তত্ত্বধানে রাখতে ক্লাবঘরে কিছু উপঢৌকনও দান করল। শীতলের মত মুনাফাবাজদের কাছে মানুষ মূল্যহীন। তাই হৃদয় বা তাপস কেউই তার কাছে আপন না, আপন মুনাফা। আর হৃদয় বা তাপস শুধু তার কাছে মুনাফা অর্জনের সোপান। সিলিকোসিস রোগাক্রান্ত হৃদয়ের দুঃসহ মৃত্যু পাঠকের চেতনায় জাগায় প্রশ্ন। এই প্রশ্ন আসলে জীবনবোধের অন্বেষণ সম্পর্কিত। আমরা যা পেতে চাইছি তা কী আমাদের প্রয়োজন? তা পেতে গিয়ে আমরা যা প্রতিনিয়ত হারাচ্ছি তার মূল্য সম্পর্কে আমরা কী সচেতন?

**পাঁচ**

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানসহ পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের পাথুরে শিল্পাঞ্চলে সিলিকোসিস নামে একটি মারাত্মক পেশাগত ফুসফুসের রোগ লক্ষিত হয়। পাথর খোদাই ও পাথর ভাঙার সময় নির্গত সিলিকার ধূলিকণা নাক-মুখ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এই রোগের সৃষ্টি করে। আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে এই রোগাক্রান্ত রোগীর কথা জানতে পারি। বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার[১৪] বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বীরভূম জেলার রামপুরহাটে[১৫], পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল শিল্পাঞ্চলের[১৬] সালানপুর, বারাবনি ও জামুড়িয়া নামক পঞ্চায়েত অঞ্চলে, আবার জঙ্গলমহলের[১৭] বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গরীব মানুষ যারা শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে পাথরভাঙার কাজে যায় তাদের সিলিকোসিসে আক্রান্ত হতে দেখি। এই রোগ কোনো স্বাভাবিক রোগ না, এই রোগের উৎপত্তি মানুষের লোভ-লালসা ও পরিবেশ দূষণ থেকে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশ বর্ধনশীল। সাধারণ দরিদ্র শ্রমিক সম্প্রদায়ের মানুষজন জীবিকা নির্বাহের তাগিদে খাদান, কলকারখানায় কাজ করতে গিয়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়। তারা হয়তো জানেও না এই রোগের করুণ পরিণতির কথা। আবার এই সাধারণ মানুষগুলিকে বাঁচাতে যে সচেতনতার প্রয়োজন তার নামমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। ফলে সাধারণ দরিদ্র মানুষগুলি জানতেও পারে না তাদের শরীরে বাসা বাঁধা মারণরোগের কারণ ও তা থেকে মুক্তির উপায়।

মণিশঙ্করের 'কালু ডোমের উপাখ্যান' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে এই সচেতনতা প্রচারের মাধ্যম। তিনি উপন্যাসে অমোঘ বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন প্রকৃতির মাহাত্ম্য। তিনি

কাহিনির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, পৃথিবী যতই আধুনিক হয়ে উঠুক, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যতই অব্যাহত থাকুক, প্রকৃতির কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতি-সম্পদকে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে মুনাফা লাভের মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। বরং প্রকৃতিকে রক্ষা এবং তাকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই মানবসভ্যতার জয়যাত্রা।

বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম বারবেন্দ্যার ডোমসমাজের মানুষজন টিলা-ডুংরিগুলিকে ঈশ্বর মহিমায় আঁকড়ে ধরে আছে আবহমান কাল থেকে। তাদের সরল বিশ্বাসে এই টিলা-ডুংরিগুলিই তাদের রক্ষাকর্তা। এই ঈশ্বরবিশ্বাস শুধু বারবেন্দ্যার চালচিত্র না। এই বিশ্বাস ভারতবর্ষের প্রাণসত্তা। এই বিশ্বাসেই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন মহিমায় পূজিত হয়ে আসছে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে। এই ঈশ্বরবিশ্বাস প্রকৃতিপ্রেমেরই এক ভিন্নতর রূপ এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার এক মাধ্যম। এই ঈশ্বরবিশ্বাসে আপাতদৃষ্টিতে আছে অন্ধবিশ্বাস, কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যায় এই বিশ্বাসই আধুনিক এবং তা মানবসমাজের জন্য সত্য-শিব-সুন্দর। মানুষের প্রকৃতিকে ইশ্বরবিশ্বাসে আরাধনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিবাদ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতার অমোঘ বাণী নিহিত আছে। মণিশঙ্করের উপন্যাসে কালুবীর এই প্রকৃতিচেতনাকেই ঈশ্বরবিশ্বাসের খোলস থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বিশেষকরে শীতল চৌধুরীর মত ব্যবসায়ী মানুষ যখন মুনাফার নেশায় টিলা-ডুংরিগুলি ভাঙতে প্রবৃত্ত তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কালুর চিন্তাধারা একান্তভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়পুত্র হৃদয়ের মৃত্যুজনিত শোককে সামলে উঠে নিরাসক্ত সাধকের মত কালুর প্রকৃতিরক্ষায় নিবেদিত সংগ্রাম বর্তমান সমাজে একান্তভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। দূষণের করাল গ্রাস থেকে মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে কালুর চিন্তাধারাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। প্রকৃতি নিধন ও তৎজনিত কারণে সৃষ্ট দূষণের প্রকোপে মানবসভ্যতার ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে মণিশঙ্করের 'কালু ডোমের উপাখ্যান' নামক উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ইকোক্রিটিসিজম্ সাহিত্যতত্ত্বের সার্থক দৃষ্টান্ত।

**তথ্যসূত্র :**


১. C. Glotfelty and H. Fromm (Edited)– (The Ecocriticism Reader- Landmarks in Literary Ecology)– 1996– University of Georgia Press– UK– Page XVII

২. Michael P. Cohen– (Blues in the Green- Ecocriticism under Critique)– "Environmental History 9.1"– 2004– Page 9-36

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, "রক্তকরবী", ২০০৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৯

৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'পল্লীপ্রকৃতি', ত্রয়োদশ খণ্ড, "রবীন্দ্র রচনাবলী", জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৬১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ৫৩১

৫. মণিশঙ্কর, “কালু ডোমের উপাখ্যান”, ২০১৮, প্ল্যাটফর্ম প্রকাশন, হুগলী ৭১২১৩৯, পৃ. ৩৯
৬. তদেব, পৃ. ১০৬
৭. তদেব, পৃ. ২১৬
৮. তদেব, পৃ. ২৪২
৯. তদেব, পৃ. ২৪৯
১০. তদেব, পৃ. ২৫০
১১. তদেব, পৃ. ২৫৩
১২. তদেব, পৃ. ২৫৫
১৩. তদেব, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬
১৪. ‘Silicosis: জীবন ঝাঁঝরা করে দেয় সিলিকোসিস রোগ!’, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, https-//bengali.news18.com
১৫. ‘ফের খোঁজ ৬০ জন সিলিকোসিস রোগীর’, ১৮ জুলাই ২০২৪, https-//www.anandabazar–com
১৬. ‘শ্রমিকদের সিলিকোসিস পরীক্ষায় আগ্রহ নেই কারখানা কর্তৃপক্ষের’, ২৫ অক্টোবর ২০২৫, https-//eisamay–com
১৭. ‘সিলিকোসিস আক্রান্ত হচ্ছেন জঙ্গলমহলের মানুষ, চিন্তায় স্বাস্থ্য দফতর’, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, https-//www.thewall.in

**অভিজিৎ শীট**

## সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে বাঁকুড়া অনুষঙ্গ

লাল মাটির দেশ বাঁকুড়া। রাজ্যের মানচিত্রে পশ্চিমের জেলা বলে পরিচিত। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে যার জন্ম। কলকাতার বাবু বিবিদের অন্য চোখে দেখা একটি জেলা। যদিও এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন অনেক মণিষী। চিত্রকর যামিনী রায়, ভাষাতাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক ক্ষুদিরাম দাস, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সংগীতশিল্পী যদুভট্ট প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তি। তবে এঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে কোন উপন্যাস রচিত হয়েছে কিনা? তা জানা নেই।এই বাঁকুড়ার আর এক কৃতি সন্তান শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ যাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে সমরেশ বসু রচনা করেছেন আস্ত একটা উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'। যদিও তা অসমাপ্ত।

সমরেশ বসু শিল্পী রামকিঙ্করের জীবন নিয়ে উপন্যাস কেন লিখলেন তা 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের ভূমিকাতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ' এই (বিংশ) শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম লেখক সমরেশ বসু। অথচ এত নিন্দা, মন্দ, বিরোধিতা আর কোনও লেখকের ভাগ্যে জোটেনি। মধ্যবিত্ত ভন্ডামি ওঁকেও আঘাত করেছে নির্মমভাবে। রামকিঙ্করের মতই অপমান, লাঞ্ছনায় হার মানেননি সমরেশ। একদা দারুন লড়াই করেছেন দারিদ্রের সঙ্গে। রামকিঙ্কর যেমন শিল্পকে, সমরেশ তেমনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করে লড়াই করে গিয়েছেন যা একালের আর কোন লেখক করতে পারেননি। তাই রামকিঙ্করের মধ্যেই সমরেশ খুঁজে পেয়েছিলেন তার মনের মানুষকে, বোধ হয় নিজেকেও 'সমরেশ বসুর মৃত্যুর পর অসমাপ্ত 'দেখি নাই ফিরে' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন বইটির যিনি অলংকরণ করেছিলেন সেই বিখ্যাত শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের অভিব্যক্তি ছিল এইরকম 'রামকিঙ্কর দা আর সমরেশ দা দু'জনকেই আমি জানি। দু'জনের মধ্যে সমান প্যাশন, ভিগার, দৃপ্ত পৌরুষ। দেখেছি দু'জনের মাথার আকার সমান। দু'জনেই প্রিমিটিভ, ওয়াইল্ড হেড। দু'জনেরই সহজ সুস্পষ্ট হাসি। রচনার মধ্যে পাচ্ছিলাম রামকিঙ্করের জীবন আর সমরেশের আত্মস্মৃতিচারণ অভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি বদলে দিচ্ছিলাম মুখাবয়ব।এরপর রামকিঙ্করের মধ্যে পুরো মিশিয়ে দিতাম সমরেশের আদল। হায়, হলো না আর'।[১]

'দেখি নাই ফিরে' নামকরণে আছে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে একদিন রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করকে ডেকে বললেন 'শোন, কাছে আয়। তুই তোর মূর্তি আর ভাস্কর্য দিয়ে আমাদের সবখানে ভরে দে। একটা শেষ করবি আর সামনে এগিয়ে যাবি -সামনে'[২] গুরুদেবের এই আদেশ স্মরণ করে রামকিঙ্কর বললেন 'হ্যাঁ আমি আর ফিরে দেখি নাই' এরপর তিনি আকাশ ফাটিয়ে হাসতে থাকলেন। এখান থেকেই সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসের নামকরণ করলেন -'দেখি নাই ফিরে'। ১৯৮৭ সালের ৩রা জানুয়ারী থেকে 'রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলার একদিন' উপশিরোনামে প্রথম কিস্তির প্রকাশ শুরু হয়।

পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে যখন এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি প্রকাশ হয় তখন এতেছিল একটি উপশিরোনামএবং তিনটি শিরোনাম -'রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলার একদিন', 'আরক্ত ভোর', 'সকালের ডাক বিশ্ব অঙ্গনে', 'রৌদ্র দগ্ধ দীর্ঘ বেলা'। উপন্যাসটি যাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা সেই রামকিঙ্করের জন্ম থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত কেটেছে বাঁকুড়ায়। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আসেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে তখন তিনি পরিণত শিল্পী। তাই তাঁর বাল্য ও কৌশরকে জানতে সমরেশ বসুকে আসতে হয়েছে বাঁকুড়ায়, জানতে হয়েছে বাঁকুড়ার অলিগলি ও মানুষজনকে যার সঙ্গে রামকিঙ্কর জড়িত। তিনি এসেও ছিলেন রামকিঙ্কর কে সঙ্গে নিয়ে 'স্বভূমে দাঁড়িয়েই স্মৃতিচারণে অনর্গল রামকিঙ্কর। ছবির মত ফুটে উঠতে লাগলো শিল্পীর শৈশব-কৌশর'।

শিল্পী রামকিঙ্করকে নিয়ে সমরেশ বসু লেখার কথা প্রথম ভেবেছিলেন ১৯৭৮সালে। এই সময় রামকিঙ্কর নানা রোগে আক্রান্ত। জীবন আয়ু প্রায় শেষের দিকে। সমরেশ বসু রামকিঙ্করের সঙ্গে দেখা করলেন, তিনি লেখককে মাত্র দুটি বৈঠকের সম্মতি দিলেন। পরে উৎসাহের সঙ্গে বললেন 'তোমার যতবার যতক্ষণ দরকার আমি বসব, যত কথা জানতে চাও বল'[৩]। সমরেশ বসু রামকিঙ্করকে নিয়ে এলেন স্বভূমি বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার আঞ্চলিক 'বাঁকড়ি' ভাষা রপ্ত করার চেষ্টা করলেন। রামকিঙ্করের জন্ম বাঁকুড়া শহরের যুগীপাড়ার একখ্যাত ক্ষৌরকার পরিবারে। পাঁচ পুরুষ আগে ইন্দাস থানার কৃষ্ণবাটি থেকে এই ক্ষৌরকার পরিবার বাঁকুড়া শহরে এসেছিল গোপাল জীউর মন্দিরে ফুলমালা যোগানোর শর্তে। পিতা চন্ডীচরণের জাত ব্যবসা ক্ষৌরকর্ম। ওভাবে তাড়নায় মা সম্পূর্ণাও স্বামীর সাথে কাজে হাত লাগান। নরুণ হাতে বেরিয়ে যেতেন যুগীপাড়া, পাঠকপাড়া, কায়েত পাড়াতে। এমনকি বৌদি বসন্ত বালা ও বোন ইন্দিও মায়ের সাথে কাজে হাত লাগাত। দাদা রামপদও পারিবারিক পেশায় যুক্ত ছিল। একমাত্র রামকিঙ্করই জাত ব্যবসায় নিয়োজিত হননি। বাবা চন্ডীচরণ তাকে ভর্তি করে দেন বড়-যোলআনায় সুরীন মাস্টারের পাঠশালায়। পাঠশালায় গেলেও মনোযোগী পাঠক তিনি ছিলেন না। বরং রঙের প্রতি তাঁর অনুসন্ধিৎসা, আর ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ ছিল প্রবল। রঙের সন্ধানে উঠোনের মাচান থেকে ছিঁড়ে আনতেন পুঁইয়ের মেটুলি, কখনো হলুদ বেঁটে ছেঁকে রস নিংড়ে বের করতেন। কাগজের অভাবে পুরানো ক্যালেন্ডারের সাদা পৃষ্ঠায় ছবি আঁকতেন। তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত দেওয়ালে টাঙানো রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

রামকিঙ্কর প্রায় বলতেন 'আমরা বাঁকড়োর লোক,একটা বিষয়ে খুব পারদর্শী, চাঁপাইচি কি নামাইছি। লেখাটেখা খুব একটা আসেনা'[৪] লেখা টেখা না আসলেও ছবি আঁকাটা যে তাঁর ছিল সহজাত সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ফবি আঁকার উন্নতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার আর এক কৃতি সন্তান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে শান্তিনিকেতনে

আসার আগে পর্যন্ত বাঁকুড়ায় তার ছিল অবাধ বিচরণ। বাঁকুড়া ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। নদী-মাঠ-ঘাট-ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রামকিঙ্করকে মাতিয়ে দিয়েছিল, নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁর মনে। তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন বাঁকুড়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শিল্পী দৃষ্টি নিয়ে দুচোখ ভরে দেখেছেন বাঁকুড়াকে, অনুধাবন করেছেন বাঁকুড়ার মানুষজনের সান্নিধ্য। গন্ধেশ্বরী নদী, সতীঘাট তাঁর ছিল ক্রীড়াক্ষেত্র। তাঁর শিল্পী জীবনের প্রথম গুরু অনন্তজ্যাঠা বা অনন্ত সূত্রধরের বাড়িও ছিল যুগীপাড়ায়। তাঁরই কথায় 'অনন্তমিস্ত্রি মূর্তি গড়তেন। স্কুল ছুটি হলেই চলে যেতাম সেখানে। তার কাজের ঢঙ-ই আলাদা। জব্বর লাগত। পরে বড় হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে বাড়ি ফিরেও গিয়েছি সেখানে। পুজোর আগে। তিনি তখন বুড়ো হয়েছেন। প্রতিমার চোখ দিতে বলতেন আমাকে। কখনও মাটির কাজে হাত লাগাতাম। আমি গড়তাম গণেশ। চার হাত, শুঁড়, ভুঁড়ি এইসব মিলিয়ে বেশ একটা ছন্দ আছে। বেশ লাগত। উনি উপরে দুর্গা নিয়ে ব্যস্ত। ওঁর দুটো চেলা, তারা গড়ত লক্ষ্মী সরস্বতী। মূর্তির নানা অঙ্গ নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করত ছোকরা দুটো। তখন আমাকে দেখিয়ে বলতেন, দেখ কেমন কাজ করে ও মন দিয়ে কাজ করা কাকে বলে দ্যখ। দেখে শেখ ছোকরা দুটোর রাগ হত আমার ওপর'[৫]। রামকিঙ্কর ছোটবেলা থেকেই মূর্তি গড়ত। মূর্তি না বলে পুতুল বলাই ভালো। সেই পুতুলগুলো নিয়ে রামকিঙ্করের বাবা চণ্ডীচরণ বিক্রির জন্য যেতেন চৈত্রমাসের এক্তেশ্বরের শিবের গাজনে। বাঁকুড়া শহরের অদূরে দ্বারেকেশ্বর নদীর পাড়ের গ্রাম এক্তেশ্বর।' এক্তেশ্বরের বিশাল উঁচু-মন্দির,পাথরের মন্দির। কিন্তু মন্দিরের মাথা ভাঙা। মন্দিরের চারিদিকে পরিখা। দক্ষিনে দ্বারেকেশ্বর। উত্তর-পশ্চিমের তোরণ দরজা দুটো প্রধান। দরজার-পাহারায় দ্বারপালের মূর্তি। তার ওপরে শিবদুর্গা আর নহবত খানা। তোরনের গায়ে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি। আর একটু ফাঁকে আরো কয়েকটি ছোটখাটো মন্দির। এক্তেশ্বরে শিব আছেন মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার গর্ভ গৃহে। কুন্ডের মধ্যে।' এই শিব কে কেন্দ্র করে এখানে এখনো মেলা বসে। এখানকার গাজন খুব বিখ্যাত। এই মেলায় পুতুলগুলো বিক্রি হত দু-পয়সা চার-পয়সা দামে। খুব যে বিক্রি হতো এমনটাও নয়। তবে তখনকার দিনে দু-চার পয়সাও কম নয়। তাছাড়া ছিল শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি।

সুরীন মাস্টারের (সুরেন্দ্রনাথ দত্ত) পাঠশালার পড়া শেষ করে রামকিঙ্কর বাঁকুড়ার এম.ই (মিডিল ইংলিশ) স্কুলে ভর্তি হন। যা বর্তমানে 'বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। তারপর কিছুদিন যুগীপাড়ার নিকটবর্তী দোলতলায় একটি নৈশ বিদ্যালয় পড়তেন। ১৯২০সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সারাদেশ উত্তাল হলে তার ঢেউ এসে লাগে বাঁকুড়াতেও। বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজ(বর্তমানে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ) এর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অনিলবরণ রায়(১৮৮৯-১৯৭৪) অধ্যাপনা ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রামকিঙ্করও তাতে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঁকুড়া

জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা হলে তাতে রামকিঙ্কর ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থাতেই রামকিঙ্কর স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর লেখাপড়া আর বেশিদূর এগোয়নি,তাঁরই কথায়' ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত হয়েছিল। 'অনিলবরণ বাবু রামকিঙ্করের শিল্পের কথা জানতেন,তাই তিনি তাঁকে মিছিল, মিটিং, চরকাকাটা বা চরকা বিলি ইত্যাদির দায়িত্ব না দিয়ে কংগ্রেসী নেতাদের ছবি উল্লেখযোগ্য নানা উদ্ধৃতি বড় বড় করে লেখা,পোস্টার আঁকা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব দেন। সেই সময় বাঁকুড়ায় ব্রাহ্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে আসেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে এসে রামকিঙ্করের আঁকা ছবি দেখে খুশি হয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পরামর্শ দেন। 'তিলক স্বরাজ ফান্ড' এর অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঁকুড়ায় আসলে রামকিঙ্কর দেশবন্ধুর ছবি এঁকেও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। রামকিঙ্করের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের ও সম্পর্ক ছিল গভীর। তার কারণ তাঁকে ছবি আঁকায় সবথেকে বেশি যিনি উৎসাহ দিতেন তিনি হলেন তাঁর মা সম্পূর্ণা।সম্পূর্ণা দেবীর বাপের বাড়ি ছিল মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর শহরের কাদাকুলি (বর্তমানে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন)।তাই রামকিঙ্করের ছেলেবেলা থেকেই বিষ্ণুপুরে যাতায়াত। পরিণত বয়সেও বিষ্ণুপুরে এসেছেন, ১৯৬৭সালে কলাভবনের ছাত্রদের নিয়ে এসেছেন বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'বিষ্ণুপুরে যেতাম মাঝে মাঝে,মামাবাড়ি। ওখানে মন্দিরের পোড়ামাটির দারুণ সব কাজ। কপি করেছি তো কম না। অনন্তর মাটির কাজ আর বিষ্ণুপুরের নাম না জানা শিল্পীদের পোড়ামাটির কারুকাজ ছেলেবেলাকে একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল।' রামকিঙ্কর ছিলেন স্বশিক্ষিত। এই স্বশিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বাঁকুড়ার মাটি থেকেই। অনন্ত সূত্রধরের কাজ দেখে তিনি মূর্তিগড়ার কাজ শিখেছিলেন। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার কাজের কপি করে তিনি অনেক কিছু শিখেছিলেন। বাঁকুড়ার মাড়েয়ারী ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে রবি বর্মার আঁকা ছবি দেখে তিনি তেল রঙের প্রতি আকৃষ্ট হন। রামকিঙ্কর বাঁকুড়া থেকেই যে তাঁর শিল্পী জীবনের রসদ নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন সে কথা স্পষ্ট,তাঁরই কথায় 'অয়েল পেইন্টিং তখন শান্তিনিকেতনে কেউ করতেন না। আমি প্রথম শুরু করি।'

রামকিঙ্কর বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের আশুমহারাজের সংস্পর্শে এসে জেনেছিলেন রামকৃষ্ণদেব ও সারদা দেবী সম্বন্ধে। খোলা আকাশের নিচে গন্ধেশ্বরী নদীর পাড়ে বসে এঁকেছেন রামকৃষ্ণের ছবি। যা দেখে শুধু আশু মহারাজেই নন, লালবাজারের বিভূতিভূষণ বাবুও মুগ্ধ হয়েছিলেন। সারদা দেবীর ছবি আঁকতে বসে রামকিঙ্করের মনে নিজের মায়ের মুখ ভেসে ওঠে। তাই মায়ের ছবি আঁকতে গিয়ে মার মুখে বসিয়ে দেন সারদা দেবীর মুখ। রামগতি ভট্টাচার্যের কোষ্ঠীতে ছবি এঁকে দেন, বিনিময় পান স্নেহ ভালোবাসা। অর্থের প্রয়োজনে রামদাস মাড়োয়ারির দোকানের সাইনবোর্ড এঁকেছেন। রজব আলীর নির্দেশে ঘোড়ার গাড়িতে ফুল বেল পাতা এঁকেছেন। শরৎ চাটুয্যের নির্দেশে "মাদার অ্যান্ড চাইল্ড"এর

ছবি আঁকতে গিয়ে নিজের কল্পনায় এঁকে ফেলেন জননী সীতার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে পুত্র লব ও কুশ। শরৎ চাটুয্যে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছবি ছুঁড়ে ফেলে দেন, সজনীকান্ত দাস মুগ্ধ হয়ে সেই ছবি পাঠিয়ে দেন কলকাতায় - ছাপা হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, পারিশ্রমিক পান পাঁচ টাকা। রামকিঙ্কর তখন ছবি আঁকার নেশায় মাতাল, রঙের সন্ধানে উন্মাদ। তাঁর এই উন্মাদনা দেখে অনন্তজ্যাঠা তাঁকে নিয়ে যান রঙের সন্ধানে শুশুনিয়া পাহাড় থেকে নডিহি, সুবাসা, ভৈরবপুর গঙ্গাজলঘাটি হয়ে তাঁরা যান দুর্গম করো পাহাড়ে। শাবল দিয়ে পাথরের বুকে আঘাত করে তাঁরা রঙ খুঁজে বের করেছেন।

রামকিঙ্করের শিল্পী জীবনে বাঁকুড়ার প্রভাব উপলব্ধি করতে হলে পাঠ করতে হবে সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাস। যদিও সমরেশ বসু উপন্যাসটি শেষ করে যেতে পারেননি। অসমাপ্ত উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে যত বাঁকুড়ার মাটির গন্ধ আছে তা যে কোন দেশের পাঠককে মুগ্ধ করবে। সমরেশ বসুকে রামকিঙ্করের শৈশব থেকে কৌশর পর্যন্ত বাঁকুড়া পর্ব কে জানতে যিনি বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি বাঁকুড়ারই বিশিষ্ট কবি ও সমাজ কর্মী অবনী নাগ। তিনি বাঁকুড়ার বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে সেগুলি লিখে পাঠাতেন সমরেশ বসুকে। সমরেশ বসু তা থেকে উপাদান নিয়ে নিজের দেখা বাঁকুড়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে লেখায় রূপ দেন। তাই সমরেশ বসু রামকিঙ্করকে জানাতে উপন্যাসে যেমন বাঁকুড়ার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন বারবার তেমনি রামকিঙ্করও দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে বাস করেও বাঁকুড়াকে ভুলতে পারেননি। তাই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন -'বাঁকুড়ায় জন্মালাম, বড় হলাম। কিন্তু ওখানে কোন কাজ নেই আমার। কিছু একটা থাকত যদি,কিছু করে আসতে পারতাম আমাদের যুগীপাড়ায় কিংবা পাঠকপাড়ায় রামানন্দ বাবুর বাড়ির কাছাকাছি। কিংবা বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরে, আমার মামাবাড়িতে"[৬]। 'বাঁকুড়াবাসীও রামকিঙ্করকে মনে রেখেছি চিরকাল। তৎকালীন বাঁকুড়াবাসী তাঁকে তিনবার সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। তবে আক্ষেপ বাঁকুড়া শহরে যুগীপাড়াতে জন্ম ভিটে ছাড়া রামকিঙ্করের স্মৃতিবিজড়িত আর কিছুই নেই।

**তথ্যসূত্র :**

১) সমরেশ বসু -দেখি নাই ফিরে (আনন্দ)
২) বসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারিতা (দে'জ পাবলিশিং)
৩) 'সমাজ ও সময়-সচেতক সমরেশ বসু'-'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক সাধন বড়ুয়া।
৪) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' নীহারঞ্জন বাগ, স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত)
৫) 'দেখি নাই ফিরে' নির্মাণ ও কিছু কথা-পার্থ গোস্বামী,বহুরূপে বাঁকুড়া - কণাদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)
৬) 'বাঁকুড়ার রামকিঙ্কর'-সুখেন্দু হীরা,বহুরূপে বাঁকুড়া -কণাদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)

পিন্টু দাস মোদক

## স্বাধীনতা উত্তর দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব ও জটিল মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বের আলোকে সুমথনাথ ঘোষের মধুকরী উপন্যাস

কথাসাহিত্যে 'প্রেম'এমন একটি বিষয় যা সর্বকালের সাহিত্যিকদের কাছে প্রেরণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে প্রতিনিয়ত।কথাসাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই সমাজে নর-নারীর প্রেম, ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যবোধ, পুরুষতান্ত্রিকতার স্পর্শে নারী প্রেমের উত্থান-পতন এমনকি সমাজ বাস্তবতার জটিল মনস্তাত্ত্বিকতার আলোকে নর-নারীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের দিকগুলি কথাসাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ বিভাজন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সমকালে লিখতে বসে কথাসাহিত্যিকেরা সমাজের নিগূঢ় রস আত্মস্থ করে সরল ও জটিল প্রেমভাবনার পরকাষ্ঠা উল্লেখ করেছেন তাদের রচনাবলীতে। পঞ্চাশের দশকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, মানব সত্ত্বার কৃত্রিম ভালোবাসা ও বিবেকহীনতা যেন নারী-পুরুষের প্রকৃত প্রেমের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়! নর-নারীর জটিল মনোবিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কথাসাহিত্যিকেরা বাস্তব বোধের সাথে কল্পনার সাজুয্য রেখে কথাসাহিত্যের ধারাকে নবরূপ দান করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর সমকালে জীবনের পোড় খাওয়া মানুষ সমাজ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে প্রেমকে কখনোই বিলাসিতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি।অবশ্য জীবন যন্ত্রনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলেও সমাজ জীবনে বেঁচে থাকার রসদ হিসেবে প্রেমের প্রয়োজনীয়তাকেওঅস্বীকার করতে পারেননি সাহিত্যিকেরা, তাই অনেক সময় সাহিত্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নর- নারীর দাম্পত্য প্রেম, সম্পর্ক বহির্ভূত প্রেমকে পাথেয় করে কথাসাহিত্যে রচিত হয়েছে মানব জীবনের জটিল মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব। কথাসাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষ(১৯০৯-১৯৮৪) প্রেমের উপন্যাস লিখতে বসে মনস্তাত্ত্বিকতার জটিল রূপকে প্রেমিক- প্রেমিকার চরিত্রের মধ্যে অঙ্কিত করে সাহিত্য প্রেমি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সুমথনাথ ঘোষের "মধুকরী" (১৯৫৭) উপন্যাসটি পর্যালোচনা করলে প্রত্যক্ষ করা যায় দাম্পত্য, নর-নারীর প্রেমের মাঝখানে অতীত জীবনের স্মৃতি, বর্তমান সংসারে নর-নারীর মনে উদিত হলে সেই সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কথাসাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষের 'মধুকরী' এমনই এক দাম্পত্য প্রেমের কাহিনি যেখানে প্রত্যক্ষ করা যায়- উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চিত্রিতা বিবাহের পূর্বে প্রণয়কে কেন্দ্র করে বর্তমান স্বামী রমেনের মনের মধ্যে যে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের তিক্ততা ও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চিত্রিতা আসলে স্বাধীনচেতা। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার শিক্ষা, চেতনা, অনুভব তার

মনের মধ্যে বর্তমান। রমেন তার জীবনসঙ্গী অর্থাৎ স্বামী। আসলে নারী যেমন বিবাহিত সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পর তার প্রিয় পুরুষকে অন্য কোন নারীর সংস্পর্শে যেতে দিতে তার মন মানে না তেমনি আবার পুরুষও ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

নারী পুরুষ প্রেমের মায়া ও মোহের বেড়াজালে আজীবন একে অপরকে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। কিন্তু সেই সম্পর্কে যখন দ্বিতীয় কোন নারী বা পুরুষ তাদের জীবনে এসে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করে ঠিক তখনই প্রিয় মানুষগুলি একে অপরের বিরাগ ভাজন হয়ে ওঠে।

কাহিনির শুরুতেই দেখা যায় চিত্রিতা বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ করে পূর্বে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়ার পরও যে পুরুষ মানুষটিকে সে আপন করে বরণ করে নিতে পারেনি তার সাথে প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎ চিত্রিতার মনের সুপ্ত ক্ষতকে বারবার জাগিয়ে তোলে। অবিনাশের সঙ্গে তার প্রথম বিবাহের সম্বন্ধ হলেও তা বাস্তব রূপ লাভ করেনি। অবশ্য বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার মূল কারণ "পণপ্রথা"। টাকা এবং উপঢৌকন যদিও অবিনাশ চায়নি, চেয়েছিলেন তার বাবা। কিন্তু একজন স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে চিত্রিতা পণপ্রথাকে নিজের প্রতি ও কন্যা দায়গ্রস্থ পিতার প্রতি অপমান বলে মনে করে সেই বিবাহ স্বেচ্ছায় বাতিল করে দেয়। কিন্তু মনের মনিকোঠায় সুপ্ত আকারে থেকে যায় অবিনাশ! অবিনাশ তাকে যেদিন প্রথম দেখতে এসেছিল সেদিনই চিত্রিতার কথাবার্তা ও চালচলনে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং দু'জনের মধ্যে প্রেমের বীজ সেখান থেকে অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু যেদিন চিত্রিতা বাবার কাছে জানতে পারে পাঁচ হাজার টাকা সর্বসমেত দেনাপাওনা ঠিক হয়ে যাবার পরও অবিনাশের বাবা কন্যার পিতার ঘাড় যথেষ্ট শক্ত মনে করে আরও কিছু টাকা ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন সেদিন বেঁকে বসে চিত্রিতা। চিত্রিতা আসলে পণপ্রথা নামক অন্যায়কে মেনে নিতে পারেনি,পারেনি বলেই পিসতুতো দাদা বিষ্টুর কাছে সেই অপমানের জ্বালা অগ্নির বাণের মতো নির্গত করে। বিষ্টুদা অবিনাশের বন্ধু। চিত্রিতার মনে হয়েছে অতিরিক্ত পণ চেয়ে তার মনে যে ক্ষোভের জ্বালা সৃষ্টি করেছে তা প্রশমিত করার জন্যই অবিনাশের উদ্দেশ্যে বিষ্টুদার সামনে মনের ক্রোধাগ্নি যেমন উগরে দিয়েছে, তেমনি আবার পুরুষতান্ত্রিকতার বিষময় সংস্কার পনপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে চিত্রিতা বলেছে -

"এই ত তোমার অবিনাশবাবুর কালচার- এ শিক্ষাদীক্ষার বড়াই তিনি যেন আর কখনো না করেন কারুর কাছে। এতই যদি রেডিও শোনার সখ ত নিজের পয়সায় কিনলেই পারতেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে যে পুরুষ তার সখ মেটাতে চায়, তাকে আমি পুরুষ বলি না, স্ত্রীলোকেরও অধম মনে করি। ভেবেছিলুম, খেলোয়াড় পুরুষদের

মনটা বুঝি বেশী উদার হয়, কিন্তু এখন দেখছি আমার সব ধারণা ভুল নারীর কাছ থেকে কোন সম্মান পাবার উপযুক্ত তিনি নন। শুনেছিলুম, এককালে আবার ভাল ছেলে বলে ওঁর নাকি কলেজে খ্যাতিও ছিল। এই যদি শিক্ষার নমুনা হয় তা হ'লে এর চেয়ে শতগুণে ভাল, অশিক্ষিতরা, গলায় দড়ি এমন শিক্ষার।"

প্রতিবাদের এই ভাষা বিষ্টুদা, অবিনাশকে বলেছিল কিনা চিত্রিতা জানতে পারেনি। কারন অবিনাশের সাথে বিয়ে ভাঙার পর চিত্রিতার বিয়ে ঠিক হয় রমেন নামক এক ব্যক্তির সাথে। রমেনের সাথে বিয়ের পর বিষ্টুদার সাথে আর কখনো সাক্ষাৎ ঘটেনি। তবে অতীতের অপমানের জ্বালা সে আজও ভুলতে পারেনি। ভুলে যেত হয়তো যদি না প্রায়শই অবিনাশ তার দৃষ্টিপথে এসে পড়ত। কিন্তু চিত্রিতার সেই পূর্বের ক্ষত জায়গাটায় আরও বেশি আঘাত করে কারন, অবিনাশের তাকে দেখেও চিনতে না পারার মধ্য দিয়ে'। রমেনের সাথে বিয়ের পর অতীত জীবনের কাহিনি চিত্রিতা কখনও স্বামীকে জানায়নি, কারণ সে চায়নি, অকারণ তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোন সন্দেহ দানা বাঁধুক। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে যে পার্কস্ট্রীটের ফ্ল্যাটে রমেন তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখের সংসার বাঁধতে চেয়েছিল, সেই ফ্ল্যাটেই অবিনাশের উপস্থিতি তার মনকে বিচলিত করে তুলেছিল। যে অবিনাশ তার জীবনে একদিন সুপ্ত প্রেমের বীজ রোপন করেছিল সেই প্রেমেরই তাড়নায় অবিনাশ সম্পর্কে বারে বারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে চিত্রিতার মন। বাহ্যিকভাবে সে চেয়েছে অবিনাশের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে, কিন্তু পারেনি কারণ অবিনাশের চাকরের কাছ থেকে চিত্রিতা গোপনে জানতে পেরেছিল তার দাদাবাবুর প্রথম বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাবার পর দ্বিতীয় বিবাহের কথা আর কখনো ভাবেনি। একসময় অবিনাশ মানসিক আঘাত পাওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারবাবু তার পরিবারকে জানায় যে ব্যক্তির দ্বারা তার মানসিক আঘাত ঘটেছে, সেই ব্যক্তি তার জীবনে এলে অবিনাশ বাবু পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। একথা চিত্রিতা জানতে পারলে নিজেকে সে স্থির রাখতে পারেনি। তাই স্বামীর সঙ্গে ঘর করেও অন্য পর পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করা যে পাপ সেই শোভনতার গণ্ডীটুকু চিত্রিতা রক্ষা করতে পারেনি। রমেন একথা জানতে পারার পরই তার মনে সন্দেহের বীজ দানা বাঁধতে শুরু করে। যদিও অতীত ইতিহাসের পাতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে রমেন বার বার চিত্রিতার উচ্চাকাঙ্খা, স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং পর পুরুষের প্রতি আসক্তির এই সমস্ত স্পর্শকাতর বিষয়গুলি তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। রমেনের মনে পড়ে যায় বালিগঞ্জে চিত্রিতার অফিসের কলিক দিলীপের কথা, মনে পড়ে যায় প্রেমের বাঁধনকে রক্ষা করতে গিয়ে বালিগঞ্জ ছেড়ে যেদিন প্রত্যন্ত গ্রাম কাকোলিয়ায় তারা সংসার পাতে সেখানে নিজের রূপ ও জৌলুস দিয়ে কৃপণ দত্তবাবুর মত লোকের কাছেও টাকা বার করে নেয়। যদিও চিত্রিতার

উদ্দেশ্য অসৎ ছিল না। স্কুল, মহিলা সেবা সমিতি, শিশুমঙ্গল, প্রসূতি সদন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জনসেবা করায় তার মূল লক্ষ্য ছিল। একজন পুরুষ হয়ে নারীর এই স্বাধীনচেতা মনোভাব মেনে নিতে পারেনি রমেন। কিন্তু যেদিন অর্থের অনটনে তার সুখের সংসার ভেঙে যেতে বসেছিল সেদিন একজন নারী হয়ে অসহায় স্বামীর পাশে চিত্রিতাকে দাঁড়াতে দেখা যায়। কিন্তু অফিসের অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা রমেন মেনে নিতে পারে না। বিশেষত দিলীপের প্রতি তার সন্দেহ সবচেয়ে বেশী। যে কারণে নারীর পায়ে অদৃশ্য বেড়াজাল পরাতে দ্বিধাবোধ করেনি। অভাব অনটনের সংসারের মধ্যে থেকেও রমেন স্ত্রী চিত্রিতাকে উদ্দেশ্য করে একদিন বলে-

'সামনের মাস থেকে আর তোমায় চাকরী করতে দেবো না আমি। টাকার বদলে আমি তোমাকে হারাতে পারবো না।"[২]

নারী হিসেবে চিত্রিতা এই কথার ক্ষীণ প্রতিবাদ করলে রমেন ঝাঁজালো স্ত্রে পুনরায় বলে- তুমি আমার স্ত্রী আমার কথা শুনতে তুমি বাধ্য। এ কথা শোনার পর চিত্রিতা নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি। প্রতিবাদী কণ্ঠে হৃদয়ের সমস্ত জড়তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে বলে ওঠে—"বিয়ে করেছো বলে আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই করবে? সুখ শান্তি যদি নিজে উপার্জন ক"রে আসতে চাই - তাতেও তুমি বাধা দেবে! আমি পারবো না আর দুঃখ সইতে! তাও তোমায় সাফ বলে দিলুম। চাকরী তুমি করো বা না করো আমি কিছুতেই ছাড়বো না চাকরী।"[৩]

চিত্রিতা জানে সে সৎ। যে সমস্ত পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক তাদের মধ্যে কেউ তাকে নাতনি বলে ডাকে, কেউবা মনে করে মেয়ে, কেউবা আবার বৌদি। বিশ্ব সংসারে স্বামী ছাড়াও একজন নারীর বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সমাজে পুরুষ-নারীর সমন্বয়ে এই জগৎ সংসার সচল থাকে। তাই স্বামীর দেওয়া মিথ্যে অভিযোগ গুলো চিত্রিতা মেনে নিতে পারেনি। তার মনে জেদ চেপে যায় রমেনকে সে দেখিয়ে দেবে তার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। আর অবিনাশ সম্পর্কে যে বদ্ধমূল ধারণা রমেনের মনের মধ্যে জন্মেছে তা দূরীভূত করার জন্য একদিন রমেনকে তার অতীত ইতিহাসের সমস্ত সত্য জানায়। নারী হৃদয়ের এই গোপন রহস্যের সন্ধান রমেন কতটুকু রাখে বা জানে, ভাই ভুল বোঝে চিত্রিভাকে বারংবার। তাকে আফিস থেকে ছাড়িয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখতে গিয়ে তার চির আকাঙ্ক্ষিত নারীত্ব যা বহুরূপে বহু সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছিল, তার পথ যেন রুদ্ধ করে দিয়েছে সে। চিত্রিতার সেই পিপাসা মিটবার আগেই যেন রমেন তার মুখ থেকে জলের পাত্র কেড়ে নিয়েছে। এভাবেই সন্দেহের বাতাবরণ এমন এক জায়গায় পৌঁছোয় যেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় রমেন একসময় সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করে এলাহাবাদ,

লক্ষ্ণৌ, কাশী প্রভৃতি শহরে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোথাও তার মন শান্তির সন্ধান পায় না। তাই একসময় শহর ছেড়ে সিংভূম জেলার মধুঝোরাতে এসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে তার মন আটকে যায়। এখানেই পরিচয় হয় ঘোষালদা বলে একজন ব্যক্তির সাথে। যার বাড়ি সুবর্ণরেখার তীরে। সেই ঘোষাল দা অপরিচিত জায়গায় রমেনকে আশ্রয় দেয়। ঘোষালদার পরিচয় প্রসঙ্গে জানা যায় স্ত্রী অল্প বয়সে দুটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেননি। ছেলে মেয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত ভারা তাদের বাবাকে কাছে রেখে সেবা করতে চাইলেও তিনি কারও মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে চাননি। ঘোষালদা জীবনের মূল মন্ত্র পরের অধীনে বেঁচে থাকার চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশী। বেশ কয়েকদিন ঘোষালদার আশ্রয়ে থাকার পর রমেন বাড়ি ফিরতে চাইলে সুবর্ণরেখার পূর্ণিমার রাত্রিটুকু উপভোগ করার জন্য তিনি রমেনকে আরও কয়েকটি দিন থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পূর্ণিমার দিন সুবর্ণরেখার অমোঘ সৌন্দর্য রমেনের মনকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে চিত্রিতার রূপ-সৌন্দর্য্য এবং তাদের জীবনে নিত্য নতুন ভাঙা গড়ার খেলা তার মনে পড়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে পূর্ণিমার সৌন্দর্যময় রাত্রিতে ঘোষালদার চোখেমুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করে, রমেন মনে মনে ভাবতে থাকে এমন অপরূপ রাত্রিতে ঘোষালদার এরূপ ভাবান্তর হওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোন অতীত কাহিনি রয়েছে। এ বিষয়ে রমেন ঘোষালদাকে প্রশ্ন করলে ঘোষালদা রমেনের কাছে তার অতীত জীবনের এক ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করে। সেখানে জানা যায় পাটনা থেকে এক ভদ্রলোক বহুকাল পূর্বে তার মেয়েকে নিয়ে হাজির হয় ঘোষালদার বাড়িতে। ভদ্রলোক জানায় মেয়ের শরীর অসুস্থ তাই হাওয়া বদলের কারনেই তারা এখানে এসেছে। তাই মধুঝোরাতে কোথাও ঘর খুঁজে না পেয়ে তার বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। যদিও মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া বরাদ্দ করেন। ঘোষালদার কাছ থেকে জানা যায় মেয়েটির শরীর একটু সুস্থ হলে তার বাবা কাজের দোহায় দিয়ে এক সাঁওতাল রমণীকে মেয়ের কাছে রেখে চলে যায়। মেয়েটি সুস্থ হওয়ার ফলে তার স্বাস্থ্য ও যৌবন ফিরে এলে একদিন ঘোষালদার সঙ্গে মেয়েটি পূর্ণিমার রাত্রিতে সুবর্ণরেখার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণে বের হয়। ঘোষালদা জানাই সেই পূর্ণিমার রাত্রিতেই মেয়েটি ঘোষালদাকে আপন করে নেওয়ার জন্য এমন চঞ্চলা হয়ে ওঠে যেখানে ঘোষালদা নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি। একসময় তাদের মিলন হয়। পরের দিন মেয়েটির সন্ধান না পেলে ঘোষালদা পরিলক্ষন করে একটি চিঠি তার জন্য রেখে গেছে মেয়েটি। সেখানে মেয়েটি তার জীবনের সমস্ত সত্য প্রকাশ করে জানিয়েছে এবং তৎসঙ্গে এও জানিয়েছে তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য নারী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য স্বেচ্ছায় তাকে সে দান করেছে। রমেনের এ কাহিনি প্রথম অবস্থায় চমকপ্রদ মনে হলেও যখন ঘোষালদার

কাছ থেকে পুনরায় জানতে পারে এই ঘটনার দশ বছর পরে সেই মেয়ে তিনশ টাকার মানি অর্ডার তার নামে পাঠায়। স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সে মানি অর্ডারের রসিদ এবং একটা চিঠি রমনকে দেখালে রমেন চমকে ওঠে। কারণ সেই চিঠিতে তার স্ত্রী চিত্রিতার নাম লেখা ছিল এবং চিত্রিতা যেখানে চাকরি করত সেখানকার ছিল ঠিকানা। হাতের লেখাও যে চিত্রিতার তাও রমেন বুঝতে পারে। একথা বুঝতে পারার পর রমেন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি। সেদিন রাত্রিটা কোনভাবে ঘোষালদার বাড়িতে কাটলেও পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ কলকাতায় ফিরে নিজ বাসায় হাজির হয়। চিত্রিতা দীর্ঘদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে আপন করে নিতে চাইলে রমেন তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ক্ষোভের সাথে বলতে থাকে-

'তুমি শুধু কলঙ্কিনী নও, তুমি বেশ্যারও অধম।'[৪]

চিত্রিতার অতীত জীবনের প্রসঙ্গ তুলে রমেন স্ত্রীর কাছে প্রথমে জানতে চায় মধুঝোরায় সে কখনো গিয়েছিল কিনা! চিত্রিতা নির্দিধায় এর যথাযথ উত্তর দেয় এবং সত্যতা স্বীকার করে। আর এখানেই রমেন সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্ত্রী চিত্রিতার উদ্দেশ্যে বলে ওঠে-

"ঘোষালদার সঙ্গে বাসরশয্যায় কাটাবার সময় বুঝি ঘৃণা বা ভয় হয়নি! কুলটা লম্পট কোথাকার! দূর হও, বেরিয়ে যাও শিগগির আমার ঘর থেকে। আজ থেকে কোন সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে। আমার জীবন থেকে তুমি মরে গেছো।"[৫]

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে রমেনের উদ্দেশ্যে একজন নারী হিসেবে চিত্রিতা যে প্রশ্ন রমেনের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে তা পুরুষতান্ত্রিকতার পিঠে সপাটে চাবুক মারা ছাড়া আর কিছু নয়। চিত্রিতা জানায় চলে যাওয়ার আগে তার একটা প্রশ্ন রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিকতার রক্ত যদি তার বুকের মধ্যে থাকে তাহলে যে কক্ষে যেন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়। চিত্রিতা রমেনের কাছে জানতে চায়-

"আমার সঙ্গে জীবন জড়িত হবার আগে কোনদিন কোন মেয়েকে কি তুমি ভালবাসনি, কখনো তার দেহ স্পর্শ করো নি? যদি তা ক'রে থাকো তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার চরিত্রের তফাৎ কোথায়? আমি যদি কুলটা হই, তাহ'লে তুমি কি নিজেকে সাধু মনে কর? শুধু এইটুকুই ভেবে দেখো।"[৬]

চিত্রিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু একজন পুরুষের কাছে অতীত জীবনে ফেলে আসা স্মৃতির সত্যতা জানতে চেয়ে যে প্রশ্ন করেছে! তা যে সত্য সেকথা রমেন নিজের মনের কাছে গোপনে স্বীকার করে। তার যখন বোধোদয় হয়, অতীত জীবনের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে সামনের পথে এগোনো যায় না, তখন হতভম্বের মত খুঁজে বেড়ায় তার আপন মনের মানুষটিকে। অপমান, লাঞ্ছনা, সন্দেহ, স্বাধীনতা হীনতায় কোন মানুষ আরেক মানুষের সাথে সম্পর্ক রেখে বেঁচে থাকতে পারে না। একথা প্রমাণ করার জন্যই

চিত্রিতা আজ নিরুদ্দেশ। কথাসাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষের "মধুকরী"র চিত্রিতা জয়ী। সংসারের বদ্ধমূল হতাশা, বেদনা, হাহাকার, যন্ত্রণা থেকে চিত্রিতাকে মুক্ত করে বাংলার নারী জীবনের স্বাধীনচেতা মনোভাবকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পঞ্চাশের দশকে কাহিনির প্রেক্ষাপট হলেও সুমথনাথ ঘোষের দূরদর্শীতা এবং ভবিষ্যতের নারী স্বাধীনতার নতুন দিগন্তের পথ খুলে দিয়েছে তাঁর রচিত "মধুকরী" উপন্যাস।

**তথ্যসূত্র :**

১. "মধুকরী", (১৯৫৭) সুমথনাথ ঘোষ, এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ/৯ কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২ পৃ: ৩
২. তদেব পৃ: ৬৬
৩. তদেব পৃ: ৬৭-৬৮
৪. তদেব পৃ: ১৬৮
৫. তদেব পৃ: ১৬৯-১৭০
৬. তদেব পৃ: ১৭০

মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা

## শবর নারীর ক্ষমতায়ন : প্রেক্ষিত মহাশ্বেতা দেবীর গল্প

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের এক অনন্য ভাষ্যকার। বিশেষত তাঁর শবর কেন্দ্রিক গল্পে শবর সম্প্রদায়ের নারী চরিত্রগুলি কেবল নিপীড়নের শিকার নয়, বরং প্রতিরোধ, আত্মপরিচয় ও ক্ষমতায়নের প্রতীক। তাঁর গল্পে শবর সম্প্রদায়ের নারীরা একদিকে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যবস্থার দ্বারা নিপীড়িত, অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে বন্দি। এই গবেষণা প্রবন্ধে শবর রমনির ক্ষমতায়নের ধারণাকে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ও আদিবাসী নারীবাদের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত গল্পসমূহে শবর নারী কীভাবে নিপীড়নের মধ্য দিয়েও প্রতিরোধ, আত্মপরিচয় ও রাজনৈতিক চেতনা নির্মাণ করেতা অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের উন্নয়ন রাজনীতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে যে গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে, মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য তার অন্যতম শক্তিশালী দলিল। বাঁধ, খনি, বন আইন ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ ও নিপীড়ন তাঁর লেখার কেন্দ্রীয় বিষয়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন এই উপেক্ষিত ইতিহাসের প্রতিস্বর হিসেবে। এই বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শবর সম্প্রদায় এক চরম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যাদের ইতিহাস দীর্ঘদিন রাষ্ট্র ও মূলধারার সাহিত্য দ্বারা উপেক্ষিত। শবর নারীর অবস্থান এই প্রান্তিকতার মধ্যেও আরও প্রান্তিক। জাতিগত পরিচয়, দারিদ্র্য ও লিঙ্গএই তিনটি অক্ষের ছেদবিন্দুতে দাঁড়িয়ে শবর রমনি এক দ্বৈত নিপীড়নের অভিজ্ঞতা বহন করে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে এই নারীদের নিছক সহানুভূতির বস্তু হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে নির্মাণ করেছেন। বিশেষত শবর নারী চরিত্রগুলি তাঁর গল্পে ক্ষমতায়নের এক বিকল্প সংজ্ঞা নির্মাণ করে।

**শবর সম্প্রদায় : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট**

শবর সম্প্রদায় যারা স্থানীয়ভাবে খেড়িয়া নামে পরিচিত, তারা অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে আদিম উ শবররা বাস করেন পশ্চিম বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর আর উড়িষ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাদের বাস। শবর কথাটির উৎপত্তি হয়েছে 'সগর' থেকে। স্কাইথিয়ান ভাষায় 'সগর' শব্দের অর্থ হলো কুঠার। অর্থাৎ শবররা কুঠার হাতে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন এবং সেখান থেকেই শবর শব্দটির প্রচলন।[১] শবরদের অতীত যে গৌরবের তার প্রমাণ প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, হর্ষচরিত, চর্যাপদ এবং পুরাণে শব্দের উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ 'ঐতেরেয় ব্রাহ্মনে' শবরদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়.[২] বাল্মিকীর রামায়ণে

শবরদের সবচেয়ে মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ উপস্থাপন দেখা যায়। রামায়ণে বর্ণিত শবরী একজন শবর নারী, যিনি ভগবান রামকে ভক্তিসহকারে ফল নিবেদন করেন। প্রাচীন গ্রিক ও চীনা পর্যটকদের লেখাতেও (যেমন টলেমি) শবরদের উল্লেখ মেলে। সহজিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য সম্ভার "চর্যাপদ" এ শবরপাদ ও দেবী পর্ণশবরীর কথা বলা হয়েছে। শবরপাদানাম গীতিতে বলা হয়েছে 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহিঁ বসই সবরী বালী'।

এককালে মাথা উঁচিয়ে বেঁচে থাকা শবরদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে ব্রিটিশ শাসন আমলে, এই সময়ে শবরদের জাতিগত অস্তিত্বে প্রথম আঘাত আসে। বন থেকে বিভিন্ন আদিবাসী ও নৃ-গোষ্ঠীদের উচ্ছেদ করতে থাকে ইংরেজরা। অরণ্যের গভীরে বাস করা শবররা তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কেউ বেছে নেয় যাযাবর জীবন। কেউ বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং চা বাগানে কাজ নেয়। তবে অভাব-অনটন আর কাজের অভাবে অনেকেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ ইংরেজরা ১৯১৬ সালে শবরসহ বেশ কিছু জাতিকে 'অপরাধপ্রবণ আদিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত করে। সেই চিহ্ন তারা আজও বয়ে বেড়াচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই। শবররা যে শুধু ইংরেজদের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে তা নয়। তারা নিপীড়িত হয়েছে নিজেদের মানুষদের দ্বারাই। বর্ণবাদী হিন্দু, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী শক্তির সাথে শবরদের লড়তে হচ্ছে নিত্যদিন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত সরকার তাদের 'ডিনোটিফাইড ট্রাইব' বা বিমুক্ত জাতি হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয় না। অস্পৃশ্য হিসেবে আখ্যায়িত করে শবরদের সমস্ত সামাজিক কার্যক্রম থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। তাই মূল সমাজ থেকে তারা এখন অনেক দূরে। জঙ্গলনির্ভর শবররা এখন বেশিরভাগই কর্মহীন, কেননা গাছ কাটা বেআইনী। তারা বেশিরভাগই কৃষিকাজ বা পশুপালনের কাজ পারেন না। ফলে অধিকাংশই অনাহারে জর্জরিত জীবনযাপন করে।

ঐতিহাসিকভাবে বিচ্ছিন্ন, অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রায়শই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত শবর নারীরা তাদের উপজাতি পরিচয়, লিঙ্গ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে সম্মিলিত নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনটি ক্ষমতায়নের একটি বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ, যা শিক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহজতর হয়েছে। পুরুলিয়ার শবর নারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন, চিরাচরিত লিঙ্গ বৈষম্য গুলোকে চ্যালেঞ্জ করছেন এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করছেন। তাদের ভূমিকা মূলত গার্হস্থ্য কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং শিক্ষা বা আয়বর্ধক কাজের সুযোগ খুব কম ছিল। গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক রীতিনীতি প্রায়শই

তাদের সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ঠেলে দিত, যেখানে তাদের কণ্ঠস্বর খুব কমই শোনা যেত এবং তাদের চাহিদাগুলো মূলত উপেক্ষা করা হতো। ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থায়, শবর নারীদের কাছ থেকে গৃহস্থালির কাজ করা, সন্তান লালন-পালন করা এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যূনতম অবদান রাখার প্রত্যাশা করা হতো, যা প্রায়শই জীবনধারণের জন্য কৃষিকাজ বা দৈনিক মজুরির কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাল্যবিবাহ, সীমিত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের অভাবের মতো সামাজিক প্রথাগুলো তাদের মুখোমুখি হওয়া অসুবিধাগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও, শবর নারীদের সহনশীলতা একটি অবিচল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং পরিবর্তন ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলিতভাবে ঘটছে।

**ক্ষমতায়নের ধারণা**

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীরা নিজের জীবন, শরীর, শ্রম, সম্পদ ও সিদ্ধান্তের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে সক্রিয় ও সমান অংশগ্রহণের অধিকার অর্জন করে। এটি কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়; বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক মুক্তির সমন্বিত রূপ।

**১. ক্ষমতায়নের ধারণাগত ভিত্তি**

ঐতিহাসিকভাবে অধিকাংশ সমাজেই ক্ষমতার কাঠামো ছিল পুরুষকেন্দ্রিক। ফলে নারীকে দেখা হয়েছে নির্ভরশীল, গৃহস্থালী কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাইরে। নারীর ক্ষমতায়ন এই কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে:

**অধিকার (Rights):** শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, কাজের সুযোগ, নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

**ক্ষমতা (Agency) :** নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সামর্থ্য।

অর্থাৎ কেবল সুযোগ পেলেই হবে না, সেই সুযোগ ব্যবহার করার সামাজিক ও মানসিক শক্তিও তৈরি হতে হবে।

**২. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন**

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর ক্ষমতায়নের একটি মৌলিক স্তম্ভ। আয় উপার্জনের সুযোগ নারীর পারিবারিক ও সামাজিক দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ায়। নিজস্ব সম্পদ বা সঞ্চয় থাকলে সে নির্যাতনমূলক সম্পর্ক থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে জাতীয় অর্থনীতিও শক্তিশালী হয়। তবে শুধু চাকরি পেলেই সমতা আসে না। সমান

কাজের জন্য সমান মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, মাতৃত্বকালীন সুবিধাএসব নিশ্চিত না হলে ক্ষমতায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

**৩. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন**

রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীর উপস্থিতি জরুরি। সংসদ, স্থানীয় সরকার ও নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে নারীবান্ধব আইন ও নীতি তৈরি সহজ হয় কেবল প্রতীকী উপস্থিতি নয়, কার্য্যকর ভূমিকা দরকার। দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে স্থানীয় সরকারে নারীর সংরক্ষিত আসন নারীর নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যদিও এখনো প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগে নানা বাধা আছে।

**৪. শিক্ষার ভূমিকা**

শিক্ষা নারীর আত্মবিশ্বাস, যুক্তিবোধ ও সচেতনতা বাড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষা তাকে মৌলিক দক্ষতা দেয়। উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা তাকে পেশাগতভাবে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে। শিক্ষা তাকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। শিক্ষাগ্রহণের ফলস্বরূপ শবর নারীরা তাদের মৌলিক অধিকার সর্মকেসচেতন হবে এবং তা আদায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষিত নারী সাধারণত দেরিতে বিয়ে করে, কম কিন্তু সুস্থ সন্তান নেয় এবং সন্তানের শিক্ষায় বেশি বিনিয়োগ করেযা দীর্ঘমেয়াদে পুরো সমাজকে উপকৃত করে।

নারীর ক্ষমতায়ন কেবল নারীর উন্নয়নের প্রশ্ন নয়; এটি ন্যায়, গণতন্ত্র ও টেকসই উন্নয়নের প্রশ্ন। যে সমাজ নারীর সম্ভাবনাকে বিকশিত হতে দেয়, সেই সমাজই বেশি মানবিক, উৎপাদনশীল ও স্থিতিশীল হয়। তাই ক্ষমতায়নকে আলাদা কোনো "নারী ইস্যু" হিসেবে নয়, সামগ্রিক সামাজিক রূপান্তরের কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসেবে দেখতে হবে।

**মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি**

শবর নারীর ক্ষমতায়নকে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে যে এখানে "ক্ষমতায়ন" শব্দটি মূলধারার উন্নয়ন-ভাষ্যের অর্থে ব্যবহৃত নয়। এটি এনজিও-নির্ভর স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সরকারি প্রকল্পের সাফল্যের কাহিনি নয়; বরং বহুবর্ষজীবী দমন, অনাহার, রাষ্ট্রীয় অপরাধীকরণ এবং সামাজিক বর্জনের বিরুদ্ধে এক নিত্যদিনের অস্তিত্ব-সংগ্রামের ভিতর থেকে জন্ম নেওয়া ক্ষমতা। তাঁর লেখায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম, নারীর শোষণ ও দলিত শ্রেণীর প্রতি সমাজের অমানবিক আচরণ গুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে যা শুধু সাহিত্য নয় বরং বলা যায় শোষিত শ্রেণীর হয়ে লড়াই করা আন্দোলনের অংশ ঊ তার "দ্রৌপদী", "শিকার" "হাজার চুরাশির মা", "রুদালী" প্রভৃতি বলিষ্ঠ লেখায় দলিত শ্রেণীর প্রতি উচ্চ বর্ণের মানুষের অত্যাচার যেমন দেখা যায়, একইভাবে দেখা যায় শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী রমণীর সরব ও নীরব প্রতিবাদ।

ঔপনিবেশিক আমলে ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট (১৮৭১) বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো লোধা-শবরদেরও "জন্মগত অপরাধী" হিসেবে চিহ্নিত করে। স্বাধীনতার পর আইনটি তুলে নেওয়া হলেও সামাজিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা বদলায়নি। ফলে শবর পুরুষরা যেমন পুলিশের নজরদারি, মিথ্যা মামলার শিকার হন, তেমনি শবর নারীরা ভোগ করেন অর্থনৈতিক বঞ্চনা, যৌন সহিংসতা এবং সাংস্কৃতিক অপমানের ত্রিমুখী আঘাত। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য এই ঐতিহাসিক অন্যায়কে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখায়। মহাশ্বেতা দেবী মাঠে ঘাটে ঘুরে, লোধা-শবর গ্রামে বসে তাঁদের জীবন শুনে লিখেছেন। তাই তাঁর গল্পে শবর নারী কোনো রোমান্টিক 'অরণ্যকন্যা' নয়; তিনি ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত, কিন্তু ভাঙেন না। তাঁর চরিত্ররা দেখায়ক্ষমতায়ন শুরু হয় বেঁচে থাকার জেদ থেকে।

"শিকার" নামক গল্পে নারীদের প্রতি সমাজের অমানবিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে । এই গল্পের প্রধান চরিত্র ওঁরাও আদিবাসী উপজাতির নারী মেরি, যে কিনা সোচ্চার প্রতিবাদের প্রতিভু । মেরি প্রথম থেকেই তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ঊ তার কথাবার্তায়, কাজকর্মে ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আদিবাসী সমাজের গতানুগতিক জীবন তার পছন্দ নয়, তাই প্রসাদ গিন্নি তার বিয়ের কথা বললে মেরি মুখের উপর বলে দেয—

'ঝোপড়িতে থাকবো, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, অমন জীবন আমি চাই না।'[৩]

মহাশ্বেতা দেবীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী শরীরকে রাজনৈতিক পাঠে রূপান্তর করা। "দ্রৌপদী" গল্পের দোপদি মেঝেন সরাসরি শবর না হলেও, তার অভিজ্ঞতা শবর নারীর অবস্থানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সেনাবাহিনীর গণধর্ষণের পর দোপদি যখন পোশাক পরতে অস্বীকার করে এবং উলঙ্গ দেহেই অফিসারের সামনে দাঁড়ায়, তখন সে ভয়ের বস্তু নয়, ভয়ের উৎস হয়ে ওঠে। তার দেহ আর লাঞ্ছনার নয়, প্রতিরোধের ভাষা। লেখিকার ভাষায়-

'কাপড় কি হবে,কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?....... দ্রোপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।'[৪]

এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে প্রান্তিক আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন অনেক সময় আইনি সুরক্ষা নয়, বরং প্রতীকী ও নৈতিক উল্টে দেওয়ার শক্তিতে নিহিত।

শবর সমাজে নারীর শ্রমই পরিবার ও সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখে, কারণ শবর পুরুষদের অধিকাংশ মাদক দ্রব্যে আসক্ত। বন থেকে জ্বালানি কাঠ, শালপাতা, ফল (কেন্দ ভেলা,

হরিতকী), কন্দমূল সংগ্রহ, বাজারে বিক্রি, সন্তান পালনসবকিছুর কেন্দ্রে নারী। অথচ রাষ্ট্র যখন বনকে 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ঘোষণা করে, তখন এই নারীরাই প্রথম জীবিকা হারায়। মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন গল্পে দেখা যায়, এই বঞ্চনার মুখে নারীরা বিকল্প পথ খোঁজেকখনও গোপনে বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করে, কখনও মজুরির কাজে যায়, কখনও প্রতিবাদে সামিল হয়। অর্থাৎ তারা নিষ্ক্রিয় নয়; তারা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিত্যদিনের কৌশল নির্মাণ করে। এই দৈনন্দিন প্রতিরোধই ক্ষমতায়নের বাস্তব ভিত্তি।

"অরণ্যের অধিকার" উপন্যাসে মুন্ডা বিদ্রোহের পটভূমিতে আমরা যে নারীদের দেখি, তারা ইতিহাসের ফুটনোট নয়। তারা লড়াইয়ের রসদ জোগায়, আহতদের সেবা করে, গোপন বার্তা পৌঁছে দেয়। শবর বা অন্যান্য আদিবাসী সমাজেও একই চিত্রনারী সংগ্রামের পরিকাঠামো নির্মাণ করে। এই কাজকে মহাশ্বেতা দেবী রাজনৈতিক কাজ হিসেবেই দেখান, গৃহস্থালি কাজ হিসেবে নয়।মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো ভাষা ও কণ্ঠের প্রশ্ন। শবর নারীরা প্রায়ই রাষ্ট্রের ভাষায় কথা বলতে পারে না; তাদের ভাষা, উপভাষা, গান, গল্পকে 'অশিক্ষিতের বুলি' হিসেবে খাটো করা হয়। কিন্তু তাঁর গল্পে এই মৌখিক ভাষাই সত্যের প্রধান বাহক। ফলে ক্ষমতায়ন মানে কেবল সাক্ষরতা নয়; নিজের ভাষায় নিজের ইতিহাস বলার অধিকার।

গবেষণামূলক দৃষ্টিতে বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় শবর নারীর ক্ষমতায়ন চারটি স্তরে গড়ে ওঠে

**১. অস্তিত্বগত ক্ষমতায়ন:** অনাহার, উচ্ছেদ ও সহিংসতার মাঝেও বেঁচে থাকার অনমনীয় ইচ্ছা।

**২. শরীরগত ক্ষমতায়ন:** লাঞ্ছিত শরীরকেও প্রতিবাদের মাধ্যম করে তোলা (দোপদির দৃষ্টান্তে)।

**৩. সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন:** গান, গল্প, স্মৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের পরিচয় রক্ষা।

**৪. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:** বন, জমি ও মর্যাদার অধিকারের লড়াইয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

এই ক্ষমতায়ন কোনো সরল রেখায় অগ্রসর হয় না; কখনও তা পিছিয়ে যায়, কখনও নতুন রূপ নেয়। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর গল্প আমাদের দেখায় যে প্রান্তিক আদিবাসী নারী নিছক করুণা পাওয়ার বিষয় নয়; তিনি জ্ঞান উৎপাদন করেন, ইতিহাস রচনা করেন এবং ক্ষমতার ভাষাকে চ্যালেঞ্জ করেন। অতএব, শবর নারীর ক্ষমতায়নকে বুঝতে হলে উন্নয়নের পরিসংখ্যানের বাইরে এসে সাহিত্যের এই জীবনঘন পাঠ জরুরি। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে শবর নারী শেষ পর্যন্ত এক রাজনৈতিক সত্তাযার ক্ষুধা যেমন বাস্তব, তেমনি বাস্তব তার প্রতিরোধ; যার শরীর যেমন ক্ষতবিক্ষত, তেমনি অদম্য তার আত্মমর্যাদা। এই দ্বৈত বাস্তবতার

মধ্যেই ক্ষমতায়নের প্রকৃত বীজ নিহিত। তিনি তার গল্পে যেভাবে বঞ্চিত শোষিত দলিত মানুষের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছেন তা ভিন্নমাত্রা দান করেছে বাংলা সাহিত্য জগতের ছোট গল্পকে। এই সাহিত্যিক উপস্থাপনাগুলোর একটি বড় তাৎপর্য হলো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আগে যেখানে শবর নারী ছিল 'অন্য' ও 'অজানা', এখন সে ইতিহাস ও রাজনীতির সক্রিয় অংশ। তার শ্রমকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে, তার রাগ ও ক্ষোভকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে, তার ভালোবাসা ও স্বপ্নকে মানবিক মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এগিয়ে এসেছে রমণিতা শবর, ললিতা শবরের মতো মেয়েরা, যারা শিক্ষাকে সিঁড়ি করে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখছে, তাদের নিজের সমাজের অন্ধকার দিকগুলিকে সরিয়ে। সাথে সাথে মহিলাদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ শবর খেড়িয়া কল্যাণ সমিতির পরিচালক প্রশান্ত রক্ষিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন "এক শবর মেয়ে যদি সবার কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চান তার উপযোগিতা আছে। আর পাঁচজন মেয়েও অনুপ্রেরনায় এগিয়ে আসবে"।

**তথ্যসূত্র:**

১। https--archive.roar.media-bangla-main-world-savara-tribe-history
২। রক্ষিত প্রশান্ত, শবর পুরাণ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, ডাক বাংলা, ৯ অগাস্ট, ২০২৫
৩। দেবী মহাশ্বেতা, শিকার, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০২ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, পৃ-৪৬
৪। তদেব, পৃ- ৩৯

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১) দেবী মহাশ্বেতা, শিকার, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০২ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া,
২) ভক্তা প্রহ্লাদকুমার। লোধাশবর জাতির সমাজজীবন, ২০০৯, মারাংবুরু প্রেস
৩) https-daakbangla.com-category-non-fiction-page-18.
৪) মুর্মু মন্দিরা, "শবরচরিত" উপন্যাসে আদিবাসী নারী কর্মজীবন ও সমাজজীবন পঞ্চম খন্ড, ২য় সংখ্যা, ২০২৫, Trisangam International Refereed Journal(TIRJ)
৫) https-archive.roar.media-bangla-main-world-savara-tribe-history
৬) https--www.sabarsamity.in.
৭) https-journal.panchakotmv.ac.in-published-paper_full_ text 96940166 8329252.pdf

শিখা কর্মকার

## স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে ব্যতিক্রমী চরিত্র (১৯৫০-১৯৬০)

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষত ছোটোগল্পে যে সমস্ত চরিত্র নারী-পুরুষ পরিচিত ছকের মধ্যে পড়ে না, যাঁরা গল্পে বা সমাজে সে ভাবে গুরুত্ব না পেলেও, গল্প বা সমাজের গতিকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। আসলে বাস্তব সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু মানুষ থাকে যারা সমাজের আলোয় প্রতিভাত না হয়ে জীবনে বেঁচে থাকাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। যাঁদের স্থিতাবস্থার থেকে বিপ্লব পছন্দ। যাঁদের প্রেম পরিচিত সূত্র মেনে চলে না। যাঁরা চিরাচরিত সামাজিক পরিসরে থেকেও নিজেকে আলাদা করে চেনাতে পারেন আমাদের আলোচনায় তাঁরাই ব্যতিক্রমী চরিত্র। ব্যতিক্রমী চরিত্র বলতে বোঝায় একটু আলাদা ধরনের চরিত্র। এই ধরনের লোকেরা যখন সময় কঠিন হয় তখন হাল ছাড়েন না এবং যখন জিনিসগুলি তাদের পথে যায় না তখন তারা অন্যদের সাথে ভয়ানক আচরণ করে না। ব্যতিক্রমী চরিত্রের লোকেরা মুখের কথায় সমর্থন করে এবং তাদের খ্যাতি প্রচার করে যেমন অন্য কারো কাছ থেকে শেখার কাজ করার জন্য বিনিয়োগ করা উচিত। স্ব-নিয়ন্ত্রণ হল ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের মানুষেরা খুব সহজেই অন্যদের অনুপ্রাণিত করে, সংযম ক্ষমতাও খুব বেশি এবং খুব কম সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'তন্বী' (১৯৫২) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'অপূর্ব কৌশল' গল্পের ব্যতিক্রমী চরিত্র বলা যেতে পারে সাত ফুট লম্বা লোকটিকে। তিনি যখন প্রথম গ্রামে এসে উপস্থিত হন তখন ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে সকলের সেবার জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেন অর্থাৎ সকলের মনের মতো হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই সেই ব্যক্তির চরিত্রের বদল ঘটে।

একজন নিম্ন শ্রেণির মানুষ অর্থাৎ বলা যেতে পারে কুলি-মজুর শ্রেণির মানুষ যে দিন রোজগার করে আর সংসার চালায় এমনি একটি মানুষের পরিচয় আমরা পাই 'প্রতিবাদ' গল্পে। সাধারণত এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের কাজের বিনিময়ে যে টাকা উপার্জন করে তার থেকে দু-এক টাকা বেশি বকশিস হিসেবে চেয়ে নেয়। গল্পে লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এইরকম একজন কুলির সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি লেখকের বিভিন্ন জিনিসপত্র সব জাহাজে তুলে দিয়েছেন আবার পরবর্তীকালে জাহাজ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাসে তুলে দিয়েছেন। এরই মধ্যে লেখকের মানিব্যাগটি হারিয়ে গেলে সেই সময়ে কোন ভদ্রলোক লেখককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি, এসেছিলেন একজন মানুষ তিনি হলেন সেই কুলি। কুলিটি তার সারাদিনের উপার্জনের টাকা দিয়ে লেখককে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয় লেখক বেশি টাকা দেওয়ার ফলে কুলিটি পরদিন লেখকের বাড়িতে এসে বাড়তি টাকা ফেরত দিয়ে গেছেন। এই

কুলি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে নিম্ন শ্রেণির মানুষের আচার ব্যবহার। যে কিনা নিজে গরীব হলেও কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করলেও সে নিজের প্রাপ্য টাকার থেকে এক টাকাও বেশী নিতে রাজি হয়নি। এখানেই এই কুলি চরিত্রটি সম্পূর্ণ আলাদা।

নরেন্দ্রনাথ নিজের জীবন চালানোর জন্য নকল সার্টিফিকেট জোগাড় করে একটি মফস্বলের স্কুলে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। সে 'যোদ্ধা' গল্পের শুরুতেই নিজের সঠিক পরিচয় কে গোপন রেখেছে। এমনকি নিজের আসল নাম পরিবর্তন করে ফেলেছে যাতে কেউ তার আসল পরিচয় জানতে না পারে। লোককে ঠকিয়ে কীভাবে নিজের জীবনকে বাঁচানো যায় প্রতি মুহূর্তে তার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এমনকি অনায়াসে সেই পরিচয় নিয়ে বিবাহ করেছে। বিবাহের পর যখন তার শ্বশুরমশাই তার আসল পরিচয় জানতে পেরেছে নিজের মেয়ের জীবনকে বিপাকে ফেলতে চাননি সব জেনেও সেই কারণে তিনি চুপ করে থেকেছেন। একজন মানুষ কতটা অসহায় হলে এই ধরনের মানুষকে মেনে নিতে বাধ্য হয় সেটাই ফুটে উঠেছে উক্ত গল্পে।

সাধারণত শিল্পী বলতে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে যে পারদর্শী তাকেই বোঝায়। 'শিল্পীর ক্ষোভ' গল্পে মদন ঘোষাল একজন শিল্পী কিন্তু তিনি কোন কবিতাও লেখেন না আর কোন ছবিও আঁকেন না। আসলে তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে শিল্পীর মতন আনন্দ সহকারে উপভোগ করেছেন। রেস খেলাতে আগ্রহ থাকলেও টাকার লোভ তার একেবারেই ছিল না। তবে সমস্ত বিষয়ে তিনি একটু অন্যদের থেকে পৃথক কিছু করতে ভালবাসতেন। গল্পে লক্ষ্য করা যায় তিনি মেয়ের বিয়েতে বেয়াই মশাইকে একটি একমন ওজনের পানতোয়া পাঠিয়েছিলেন। সাধারণত বিয়ের তত্ত্ব হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি পাঠানো হয়ে থাকে। মদন ঘোষাল আলাদাভাবে সবকিছু করতে পছন্দ করেন। পাড়ায় কন্যাদায়গ্রস্থ ভদ্রলোক অর্থ সাহায্য চাইলে তিনি সেই মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ করে নিয়েছেন। গল্পের পরবর্তী অংশে লক্ষ্য করা যায় তিনি নিজের হাওয়াই রঙিন ফানুসের মত উড়িয়ে দিয়েছেন সবকিছু, যা তার কাছে ছিল। যখন তিনি ফতুর হয়ে গেছেন তখন তিনি যেন নাটকীয় গতিতে নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন। অবশেষে যখন মদন ঘোষালের অর্থের প্রয়োজন হয় তখন জনার্দন গোস্বামী নামে একজন প্রজা এসে সেই মুহূর্তে তাকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে তার বাকি থেকে যাওয়া পঞ্চাশ টাকা ফেরত দেন। এই ঘটনাতেও তিনি যেন নাটকের আভাস দিয়েছেন। দেখা যায় ঠাকুরের সিংহাসনে গৃহদেবতা জনার্দন নেই আর সেই মুহূর্তেই জনার্দন গোস্বামীও এসে মদন ঘোষালকে টাকাটা দিয়ে যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় ওই নামে তার একজন প্রজা রয়েছেন। মদন ঘোষাল তখন কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বসে থাকেন। এই ভাবেই নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে গল্পটির পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং একটু অন্যধরনের চরিত্র হিসেবে মদন ঘোষালের চরিত্রটিও ফুটে উঠেছে।

অহঙ্কার কারো নাম হতে পারে সেটা বনফুলের 'অহঙ্কার পাঁড়ে' গল্পটি পাঠ না করলে কোনমতেই বোঝা সম্ভব নয়। সমাজে তিনি বিনয়কুমার ভদ্র, সুশোভন মিত্র, এবং সুব্রত দাস সাধারণত এই নামেই পরিচিত। তবে লেখক জানেন যে তাঁর নাম অহঙ্কার পাঁড়ে। সাহিত্য, রাজনীতি, বাজারদর, প্রতিবেশী, ফেরিওলা, শিক্ষা, সমাজ সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তৃতা শোনা যায়। তাকে নিয়ে মানুষের সমালোচনার অন্ত নেই, অর্থাৎ তার চরিত্রের মধ্যে দুটি রূপ রয়েছে। একদিকে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি নম্র এবং ভদ্র অপরদিকে তিনি নিজের সমালোচনা শোনার জন্য ফুলকো লুচি, মোহনভোগ আর ভালো চায়ের ব্যবস্থা করেছেন। লক্ষ্য করা যায় যিনি সৎ ব্যক্তি তার সমালোচনা করার জন্য কোন কিছুর লোভ দেখানোর প্রয়োজন হয় না মানুষ নিজের থেকে তার কর্মে উদ্দীপ্ত হয়ে সমালোচনা করে। অহঙ্কার পাঁড়ে চরিত্রের মানুষটি সেই ধরনের নয় সেই জন্য নিজের আত্মঅহঙ্কার প্রকাশ করার জন্য নিজেকে জাহির করার জন্য তিনি কিছু ভক্ত জোগাড় করেছেন যারা তার গুনগান গায়। এইভাবে একদিন কিছু চিত্রশিল্পী এসে অহঙ্কার পাঁড়ের ছবি আঁকতে চায় শেষ পর্যন্ত তিনি রাজিও হয়ে যান। কিন্তু নিজের ছবি দেখে তিনি জোরে চিৎকার করতে লাগলেন। পরের দিন সেই চিত্রশিল্পী দুটি ছবি নিয়ে আসে। তার মধ্যে একটি ছিল অহঙ্কার পাঁড়ের ছবি আর একটি ছিল আয়না যাতে অহঙ্কার পাঁড়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায় এবং নিজের মনের ভুল বুঝতে পারে, যে শিল্পীরা ঠিক ছবিই এঁকেছেন। এখানে আমরা অহঙ্কার পাঁড়েকে একজন অহঙ্কারী এবং অন্য ধরনের মানুষ বলেই উল্লেখ করতে পারি যিনি স্বার্থপর এবং অহং সর্বস্ব।

'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' গল্পে কাপালি হলেন ব্যতিক্রমী চরিত্র। গল্পে দেখা যায় একজন সাপের কামড়ে মৃত মানুষকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজেই মৃতদেহের কাছে এগিয়ে এসেছেন আর পাঁচটা মানুষের মত দূরে দাঁড়িয়ে দেখে চলে যাননি। তিনি নিজেই সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন অর্থাৎ বলা যেতে পারে স্বার্থান্ধ মানুষের মতো তিনি আচরণ না করে অন্য মানুষের উপকারের চেষ্টা করেছেন যেন স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গল্পকার যে কাপালিক চরিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে স্বাধীন মানসিকতাকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

যারা গৃহত্যাগী, ধ্যান করেন, সংসার সম্পর্কে উদাসীন তাদের সাধু বলা হয়ে থাকে। 'সাধু' গল্পে সাধু হল এমন একটি চরিত্র যার নিজের কোন সংসার ছিল না। এছাড়া সাধুসুলভ কোন আচরণই সাধু চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। সেও আর পাঁচটা মানুষের মত সাধারণ মানুষ। তিনি দুস্থ রোগীদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসেবা করেন। ডাক্তারের ভাই জীবু তাকে সাধারণ মানুষ থেকে সাধুতে পরিণত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে ওই সাধু নামের লোকটিকে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বকথা, প্রাণায়াম, শাস্ত্র নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, তাতে শেষ পর্যন্ত সাধু রেগে যায়। হঠাৎ একদিন

কোন অঞ্চলে ডাক্তারবাবুর সাথে রোগীর অবস্থা দেখার জন্য সাধু গেলে জীবুও সাধুর মহত্ত্ব প্রচার করার জন্য সকলকে বলে দেয় যে তার পায়ের ধুলো নিলে সকল রোগ দূর হয়ে যাবে। এই কথা শোনা মাত্র রোগীর বাড়ির গৃহিণী থেকে শুরু করে আরো সাধারণ মানুষ এসে ভিড় করে। কিন্তু সাধু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি সেজন্য সেইস্থান সে ত্যাগ করে চলে এসেছে কাউকে কিছু না জানিয়ে। অর্থাৎ তিনি সত্যিকারের সাধু না হলেও তার এই আচরণের জন্য চরিত্রের দিক থেকে তিনি একজন সাধু ব্যক্তি। তার গুনেই সে আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা।

চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায় সুবোধ ঘোষের 'থিরবিজুরি' (১৯৫৫) গল্পের একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। নিখিল রায়কে কোন সময়ে কোন পরিস্থিতিতেই রাগান্বিত বা চিত্রার প্রতি বিরক্ত হতে দেখা যায়নি। একটি মানুষ এত শান্ত এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে কি করে নিজেকে এত সংযত রাখতে পারে তা এই নিখিল রায়কে এই গল্পে না দেখলে বোঝা যায় না। চিত্রা সুন্দরী শুধু নয় অসাধারণ রূপবতীও। অফিসে ও রাস্তাঘাটে যে যাই বলুক তার স্ত্রীর সৌন্দর্য বা চালচলন সম্পর্কে নিখিল রায় কিন্তু সবসময় নিশ্চুপ থাকে। এই ধরনের মানুষ সাধারণত দেখা যায় না, চিত্রা রায় তাকে কোন গুরুত্ব না দিলেও সে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। এমনকি চিত্রা যদি মিস্টার সরকারকে একটি চিঠি দিয়ে দিতে বলে তখনও নিখিল রায় পাল্টা প্রশ্ন করেনি কিসের চিঠি? মনের মধ্যে কোন কৌতূহলও প্রকাশ করেনি গোপনে সেই চিঠি পাঠ করার জন্য। এসব সত্ত্বেও নিখিল কোনদিন চিত্রাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে বা কর্তব্য পালনে পিছপা হয়নি। চিত্রার কোন কাজে কোনদিন বাধাও দেয়নি। গল্পের শেষে দেখা যায় অফিসের পার্টিতে কিছু এমন ঘটনা ঘটে যেটা হয়তো না হলেই ভালো হত। তবু শেষ পর্যন্ত নিখিল চিত্রারই সঙ্গ দিয়েছে। নিখিল রায়ের মতো চরিত্র খুব কমই আমাদের চোখে পড়ে।

সুবোধ ঘোষের 'কুসুমেষু'(১৯৫৬) গল্পে হেমার কালিম্পং এর ছোট দাদু একটু অন্য ধরনের চরিত্র। ছোটদাদু সব সময় চাই কিভাবে হেমা ও নীহার দুজনকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। নীহার ও হেমার রেজিস্ট্রির দিন দাদু এসে উপস্থিত হয় হেমাদের বাড়িতে। এই দাদু আসলে হেমার জেঠিমার ছোট কাকা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল দত্ত চৌধুরী, আই এম এস, তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। মাঝে মাঝে হেমাদের বাড়িতে আসেন এবং উৎপাত সৃষ্টি করে চলে যান। এই দাদুর বাড়ির কোন নাম নেই। হেমার মতানুযায়ী যদি কোন নাম দিতে হয় 'রূঢ়া' কারণ হেমার মা স্নিগ্ধার জীবন যে নিয়মে চলে ঠিক তার বিপরীত নিয়মে চলে কালিম্পং এর দাদুর বাড়ির জীবন। তাদের বাড়ির খাবার টেবিলে ভূমিকম্পের মতো ব্যাপার চলে। তার মেয়েরাও খুব মার্জিত নয়। এমন কি এই ছোটদাদু পিয়ানোর বুকের উপর কফির পেয়ালা রাখতে দ্বিধাবোধ করেন না। গল্প পাঠে জানা যায় তিনি শিকার করতেও ভালোবাসতেন। বিয়ের পর হেমা নীহারের কাছে না গিয়ে বাইরে

বসে থাকে। সেই মুহূর্তে ছোটদাদু এসে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দেয় এবং হেমাকে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে যায় নীহার যে ঘরে আছে সেই ঘরে। ছোট দাদুভাই হেমার মধ্যে সম্পর্কটি ছিল মধুর। সাধারণত বিয়ের পর থেকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির মহিলাদের সহযোগীতায় কিন্তু এই গল্পে লক্ষ্য করা যায় সেই কাজটি সম্পন্ন করেছে ছোটদাদু। পরদিন ভোরে হেমা যখন ঘরের বাইরে এসেছে তখনও তার চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হয়েছে হেমা গম্ভীর হয়ে গেছে অর্থাৎ ছোটদাদুর তার নাতনি হেমার সাথে এতটা সখ্যতা ছিল যে হেমাকে দেখেই বুঝে যেত তার মনের অবস্থা। বিয়ের পরেও ছোটদাদু হেমাকে তার জীবন সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। গল্পের শেষেও দেখা যায় হেমা যখন দেখছে তার কি করা উচিত সে বুঝতে পারছে না তখন সে ছোটদাদুকে তার বাড়িতে আসতে বলেন। ছোটদাদু আসেন এবং হেমা বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি ঘরে ছোটদাদুর চোখের সামনে বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত হেমা ও নীহারের একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা মিলিত হয়। আর এই সাফল্যের পিছনে যে মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন ছোটদাদু। এখানেই ব্যতিক্রমী চরিত্রের অভিনবত্ব, যারা পিলসুজ হয়ে সমাজের সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়ের উপর আলোকপাত ঘটায়, কিন্তু নিজেরা থেকে যায় অন্ধকারে, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়েও ব্যতিক্রমী হয়ে যায় সমাজের কাছে, সাহিত্যিকদের গল্পে।

**তথ্যসূত্র :**


১. মণ্ডল তপন, বাংলা ছোটোগল্পচর্চা দ্বিতীয় খণ্ড, দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১ এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

২. মুখোপাধ্যায় চিরন্তন, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

৩. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩

৪. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

৫. নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, গল্প সমগ্র প্রথম খণ্ড।

দেবপ্রিয়া সেন

## ‘গহিন গাঙ’-এ আবদ্ধ মাছমারা

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। দেশভাগের সময় মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে তিনি এপার বাংলায় আসেন। পিতা রমণীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা বিরজাবালা দেবী। তিনি পদার্থবিদ্যা স্নাতক করেছিলেন এবং এই বিষয়েই শিক্ষকতা করতেন। একদিন লাইব্রেরি গিয়ে বই না পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’ (১৯৫৩ খ্রি.) বইটি। এই বইটি পড়েই তিনি সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীতে সাহিত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগে সাহিত্যচর্চাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন। লেখকের কৈশোর যৌবন মূলত শিশুকাল থেকেই তিনি চোখের সামনে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী থেকেছেন। এপার বাংলায় এসে বিভিন্ন আত্মীয়দের বাড়ি থাকার ফলে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে থেকে। শহরের ঝা-চকচকে পরিবেশ তাকে আকৃষ্ট করে না, তাই তাঁর রচনার মধ্যে উঠে এসেছে শহর থেকে দূরে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ, যাদেরকে অ্যাকাডেমিক ভাষায় সাবলটার্ন বা প্রান্তিক বলা যেতে পারে। সেই সব মানুষদের জীবনের নানা বিপর্যয় তিনি বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি একজন গল্পকার হিসেবেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প হলো ‘বন্যা’ (১৯৬৬ খ্রি.)। এছাড়া ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন ‘অগ্নিদগ্ধ’ উপন্যাসটি। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটটি খাদ্য আন্দোলনে ওপর ভিত্তি করে রচিত। এরপরে তিনি রচনা করেন ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসটি। এটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ‘ক্রান্তিক’ শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তারপরে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ‘ক্রান্তিক’ প্রকাশনা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের মধ্যে উঠে এসেছে সুন্দরবনের গ্রাম জীবনের এক প্রতিচ্ছবি। সেখানকার মানুষরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে। উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণে ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন, “বিশেষ প্রয়োজনে সুন্দরবন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। প্রত্যক্ষ করেছিলাম অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবিকার সংগ্রাম। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি ধর্ম, লোকাচার, স্বপ্ন ও বিশ্বাসের দোলাচলে যে মানুষ বাঘ, কুমির-কামোট ও ‘মনুষ্য-দাপট’ বুকে নিয়ে নোনা গাঙ-এর ‘গোন’ ‘বেগোন’-এর মতো, ইতিহাস তৈরি করছে-আধুনিকতা যাকে বলে সাব-অলটার্ন -এ উপন্যাস তাদের জীবনের কয়েকটা দিন। ‘কয়েকটা দিন’ -কিন্তু খণ্ডকালের আভাস। সমাজ-বিন্যাস বদলাচ্ছে। বদলাবার পথে সাহিত্য-ইতিহাস হয় জনজীবনের। গহীন গাঙ-এর উদ্দেশ্যও তাই।”[১]

সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা মধু সংগ্রহ বা মাছ ধরা। মাছ ধরতে গিয়ে বেশিরভাগ মানুষকেই পড়তে হয় বাঘের কবলে। কখন, কিভাবে, কার প্রাণ যাবে তা সকলের কাছেই অজানা। তার সাথে আছে জমিদার ও মহাজনদের ভ্রূকুটি। এই উপন্যাসেও সেই সকল ঘটনায় উঠে এসেছে। এর পূর্ববর্তী সময়ে আমরা অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬ খ্রি.) বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রি.) উপন্যাসে এই সকল মাছমারা সম্প্রদায়ের কথা পেয়েছি। কিন্তু নিঃসন্দেহে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি একটি ভিন্ন দিক পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে। এখানে যে নদীটিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে তার নাম বেতনা। শান্ত ও নিরীহ নদী। তীরবর্তী মানুষরাও ঠিক তেমনি। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই এক বার্তা আসার খবর, "গাঙের বাতাসে নৌকোটা খবর নিয়ে ফিরছে।"[২] কিন্তু এই খবর কোনও আনন্দের খবর নয়, এ এক মৃত্যুর খবর। সেখানকার এক ব্যক্তি ললিত তার পুত্র শ্রীপদ ও বন্ধু হারানকে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল নদীতে। সেখানেই বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় ললিতের। সুন্দরবনে বাঘের হাতে মৃত্যু এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এ খবর আসার পরে মালোপাড়ায় শোকের পরিবেশ নেমে আসে। ললিতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে তা অবস্থিত হয় এক বৃহত্তর পরিবেশে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে আনলেন গ্রাম জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ক্ষমতার কদর্য রূপটি। গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থিত উচ্চপদস্থ মানুষেরা কিভাবে প্রতিনিয়ত দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষদের লুঠ করছে সেই দিকটিই তিনি তুলে ধরেছেন। মালোজীবনে বসে খাওয়ার রীতি নেই, তাদের জীবন অনিশ্চিত তা জেনেও তাদেরকে প্রতিদিন সকালে জীবিকার টানে বেরিয়ে পড়তে হয়। একদিকে থাকে অরণ্যের ডাক, অন্যদিকে খটিদার, মহাজনদের দাদনের বোঝ, তার মধ্যে আছে বাঘের উপদ্রব, এইভাবেই মালোদের জীবন চলতে থাকে। 'গহিন গাঙ' উপন্যাস প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "মালোসমাজের অন্য নাম বিধবা পল্লী। মালোদের মধ্যে এমন কোনও পরিবার নেই, যাদের কোনও বউয়ের দেহে কালো পাড়ের থান ওঠেনি, শোকের শেল তোলেনি হাহাকার। এমন কোনও কুটির নেই যার বড়ো ছেলে অশৌচ পোষাকে খটিদার, মহাজনদের পায়ের তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টার বদলে দু-দশ টাকার সাহায্য পেয়ে সুদের গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েনি।"[৩]

স্বামী পুত্র জীবিকা অর্জনের জন্য বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরের মেয়েরা চিন্তায় ও আতঙ্কে সারাটা দিন কাটায়, কোনও খারাপ খবরের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে থাকে। এখানকার মালো সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেতনা নদী থেকে মাছ ধরে তা গঞ্জের খটিদারের কাছে বিক্রি করে এবং খটিদাররা সেই মাছ সংগ্রহ করে শেষ লঞ্চের মাধ্যমে ক্যানিংয়ে পাঠিয়ে দেয়।

কোনও কারণে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে খটিদাররা মাছ কেনা বন্ধ করে দেয়। এমত সময়ে মালোরা যদি নিজেরাই বিক্রি করতে যেতে চায় তখন তাদের মহাজনদের রোসের মুখে পড়তে হয়। এই সকল মানুষের কুচক্র থেকে মালোরা কোনওদিনই বাঁচতে পারে না। এছাড়াও সুদের কারবারে তারা পুরুষানুক্রমে মালো সম্প্রদায়কে ঋণে জর্জরিত করে রাখে। এই গঞ্জের অন্যতম ব্যবসায়ী হল আব্দুল ও ঈশ্বর। ঈশ্বরের বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, সে সুদের কারবারি করত। একদা সবকিছু হারিয়ে সে এই অঞ্চলে এসেছিল। প্রথমে লঞ্চে খাবার ফেরি করত, পরে চায়ের দোকান দিয়েছিল, পুনরায় সুদের কারবারি তার ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়। সে ধার দেয় মালো ও চাষীদের। এছাড়া আব্দুল মহাজন মাছ ধরার জন্য মালোদের দাদনও দেয়। ফলস্বরূপ মালোরা তার কাছে কম দামে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। ললিত একসময় এই মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তার পরিণামে তাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। ললিতের মৃত্যুর পর সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে শ্রীপদ ওপরে। কিন্তু তার পরিবারের অনেকেই শ্রীপদর উপর অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হয়েছিল। মালোদের দীর্ঘদিন ধরে এক ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, সুদ, দাদন, রিলিফ অথবা সাহায্য ছাড়া তারা বেঁচে থাকতে বা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না, এছাড়া উচ্চবর্গের চাপানো এই নাগপাশ থেকে তারা কিছুতেই বেরোতে পারবে না তা তারা জানত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন এভাবেই তাদেরকে চলতে হবে। অনেক কষ্ট করে ললিত কিছু জমি কিনেছিল কিন্তু সেদিকেও আব্দুলের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। যখন সে কিছুতেই সেই জমিটি আয়ত্তে আনতে পারছিল না তখন নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে শ্রীপদদের ওপর। ললিতের মৃত্যুর পর সে ভয় আরও বেড়ে যায়। তাদের একটা নিয়ম আছে যে, বাঘের হাতে কারোর প্রাণ গেলে এবং মৃত মানুষের দেহ যদি না পাওয়া যায় তাহলে তার কুশপুত্তলিকা বানিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হবে। এর ফলে তাদের পুনরায় মহাজনের কাছে ধার নিতে হয়। ঋণের বোঝা আরও বেড়ে যায়। এইজন্যই শ্রীপদ ঠিক করে আবারও যাতে তাকে ধারে জর্জরিত না হয়ে পড়তে হয় তাই শ্রীপদ ললিতের ক্রিয়াকর্ম করতে রাজি হয়নি। যখন সে রোজগার করতে পারবে তখন ক্রিয়াকর্ম করবে। শ্রীপদ জানায় "না জ্যাঠা, জঙ্গলে আমি যাব না। বেতনায় বিন-জালে যা উঠবে, কো-অপারেটিপে বেচলে টাকা বেশি আসে।... নৌকো আর জালের টাকা আবদুলকে তা দিয়েই শুধব।"[৪]

লগ্নিপুঁজির ক্ষমতায়নকে সে ভাঙতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং সেজন্যই সে গড়ে তোলে কো-অপারেটিভ। তার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন ভূপতি বর্মন। তিনি একজন আদর্শবাদী ডাক্তার কিন্তু তাকে নিয়ে রটনা অনেক। ইংরেজ আমলে অনেকে ভেবেছিল স্বদেশী ডাকাত, গা ঢাকা দিতে এখানে এসেছে। পরবর্তীকালে কেউ মনে করে ইনি পুলিশের লোক, কারও মতে তিনি রাজনৈতিক দলের কর্মী, আবার কেউ কেউ মনে করেন ইনি ধর্ম প্রচারক। তবে

তিনি যাই হোক না কেন তিনি মাছমারাদের এক মুক্ত স্বাধীন জীবন দিতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু প্রথমে মালোরা এই কো-অপারেটিভে যুক্ত হলেও, পরবর্তীকালে সকলে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীপদ যখন এখানে যোগদান করে তখন পুনরায় এই প্রতিবাদ মাথা চাড়া দেয়। শ্রীপদর এই ভাবনা চিন্তায় তাকে মালোপাড়ার অন্যান্য মানুষদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। বাকিরা তাকে সম্বোধন করে 'নতুন যোবক' নামে। শ্রীপদও গ্রামের এই সকল মানুষদের এড়িয়ে চলে। সে গ্রামের খৃস্টান এক ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে, যার নাম মধু। এই কারণেও শ্রীপদকে অনেকে পছন্দ করেনা। তাছাড়াও শ্রীপদ একটু উগ্র। সে সংস্কার মানে না, অলৌকিকত্বে তার বিশ্বাস নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় যদি সে মালোপাড়ার কর্তা হয়ে উঠত, তাহলে কেউ তাকে মেনে নিত না। কিন্তু ললিতের মৃত্যু সকলকেই আঘাত করেছিল। ফলস্বরূপ শ্রীপদ যখন বিদ্রোহ করে তখন সকলে তাকে কর্তা বলে মেনে নেয়। তাদের সকলকে নিয়ে শ্রীপদ যখন ভূপতি ডাক্তারের কাছে যায় এবং কো-অপারেটিভ তৈরি করার কথা জানায় ডাক্তারবাবু তাদের সাবধান করে দেয়। তিনি জানান, " 'শ্রীপদ, তোমরা কিন্তু ঘোড়াটা জোরেই ছোটাচ্ছ, গাড়ি উল্টে যাবার ভয় আছে। তোমার বেতনার চেয়েও এ-গাঙ কিন্তু গহিন।' আঙ্গুল উঁচিয়ে গঞ্জের এই সমাজটাকে নির্দেশ করেছিলেন সেদিন। শ্রীপদ সেদিন তর্ক করেনি, হেসে জবাব দিয়েছিল, 'আপনার ঐ আলুনি পান্তা আর পেটে রোচে না আমার।......কো-অপারেটিভে কি দেশটা পাল্টে যাবে?"[৫]

যে ঋণের বোঝা এই মালোপাড়ায় পুরুষানুক্রমে চলে আসে শ্রীপদ কিছুতেই চায় না সেই একই বোঝা, সে তার সন্তানের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে যাবে। তাই সে ঠিক করে খটিদার আব্দুলের হয়ে নৌকা বা জাল সে বাইবে না, সে নিজে রোজগার করবে এবং সুদ সমেত নগদ টাকা সে শোধ করে দিয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে যারা বসে থাকে তারা কখনোই অধস্তন কর্মীদের মুক্তি দিতে চায় না। এতে তাদেরই ক্ষতি। আব্দুলও তাই যেন তেন প্রকারেণ শ্রীপদকে বাধা দিতে চায়। শ্রীপদ যখন মধুর হাত দিয়ে কো-অপারেটিভে মাছ বিক্রি করতে পাঠায় আব্দুল তাকে জোরপূর্বক আটকে নেয়। এই মাছ সে বিক্রি করতে চেয়েছিল সন্তানের ছয় ষষ্ঠীর উৎসব পালন করার খরচ যোগাড় করার জন্য। কিন্তু আব্দুল তা আটকে দেয়। উপরন্তু শ্রীপদর ভাই লগাইকেই তার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। উৎসবের দিনই লগাই এবং শ্রীপদর মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং তা বৃহৎ আকার ধারণ করে। লগাই পুলিশের কাছে দাদার বিরুদ্ধে নালিশ করে, এমনকি পিতার খুনি হিসেবে সে শ্রীপদকে দায়ী করে, এছাড়াও আরও নানান মিথ্যে অপবাদ তাকে দেওয়া হয়। শ্রীপদ চেয়েছিল মাথা উঁচু করে বাঁচতে, কিন্তু তা সে পারেনি। ক্ষমতার সামনে তাকে মাথা নোয়াতেই হয়েছিল। ধারের বোঝা কমাতে যে শ্রীপদ বাবার কুশপুত্তলিকা পোড়াতে নারাজ ছিল। থানা থেকে ফিরে

এসে সে নিজেই নিজের কুশপুত্তলিকা পোড়ায় এবং আব্দুলের অধীনে থেকে পুনরায় নদীতে যায় মাছ ধরতে। শ্রীপদর স্ত্রী কড়ি তাকে অনেকবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু মালোপাড়ায় বসে খাওয়ার নিয়ম নেই, একদিন বসে গেলে পরের দিন তাদের খাওয়া জুটবে না। তাদের অবস্থা দিন আনা দিন খাওয়া। শ্রীপদর মনে ভয় কিন্তু রয়েই যায়, সে ভাবে কোনদিনও যদি সে তার বাবার মতই ফিরে আসতে না পারে তাহলে তার সন্তান এবং স্ত্রীর কি অবস্থা হবে। হয় তাদের ভিক্ষে করে খেতে হবে নয়তো শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই তিতাস তীরবর্তী মালোদের অবস্থা। তিতাস নদীকে ঘিরেই তাদের জীবন চলতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিতাসের জল যখন শুকিয়ে যায় পাশাপাশি এই মানব সম্প্রদায়ের মানুষদেরও জীবন শেষ হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। সেখানে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছিলেন শুধুমাত্র একটি পেশাকে নির্ভর করে বেঁচে থাকলে চলবে না। কিন্তু সেখানকার মানুষ শুধুমাত্র 'জাল' নিয়েই নিজের জীবন কাটাতে চেয়েছিল, 'হাল' বাইতে তারা শেখেনি। ঔপন্যাসিক সকলের উদ্দেশ্যে বলেছেন বাড়িতে জালের সাথে হাল মজুত রাখাও প্রয়োজন। অপরদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও আমরা পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষদের কথা দেখতে পায়। বিশেষ করে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না উপন্যাসের মধ্যে উঠে এসেছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় কোনও ব্যক্তি মানুষকে তুলে ধরার থেকেও বিশেষভাবে দেখিয়েছেন তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ক্ষমতায়নের কাছে কিভাবে নিম্নবিত্ত মানুষেরা নিজেদের জীবন বাজি রাখতে বাধ্য হয়। শ্রীপদর মতো মানুষেরা নিজের জীবনটাকে বাঁচিয়ে রেখে স্ত্রী সন্তানদের সাথে সুখে দিন কাটাতে চায়। কিন্তু ক্ষমতাতন্ত্র তাদেরকে সেই স্বাধীনতাটুকুও দেয় না। উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রায় কুড়ি বছর পর। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা এলেও তার সেই স্বাধীনতা উচ্চবিত্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের। গরিবেরা যে তরিতে ছিল সে তরিতেই রয়ে গেল। চিরটাকাল তাদের পিষে মরতে হচ্ছে ক্ষমতার ঘানিতে। উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি এক বার্তা আসার খবর। সেই বার্তা আনন্দের নয় সেই বার্তা মৃত্যুর। নরখাদক বাঘ যেমন ললিতকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়েছিল, ঠিক সেইরকমই এই সকল খটিদার, মহাজনরা তাদের ধারালো থাবা বসিয়ে রাখে শ্রীপদদের মতো সাধারণ মানুষের ওপর। মালো পাড়ার প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই এইরকম একটা না একটা ঘটনা থাকে। যারা মাছ, মধু, কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। তারা জানে যেকোনও মুহূর্তে তাদের জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু তারা এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। মূলত তাদেরকে বেরিয়ে আসতে

দেওয়া হয় না। কিছু নরখাদকরূপি মহাজন, খটিদার নিজেদের লোভ লালসা পূর্ণ করার জন্য এই সকল অন্তেবাসি, দারিদ্র মানুষদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দুবার ভাবে না। উপরন্তু তারা যদি বেঁচে থাকতে চায় স্বাধীনভাবে, নিজস্ব রোজগার করতে চায়, তখন তারা বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে আরও আরও বেশি করে বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ করে, ঠিক মাছের চারা গেলার মত। শ্রীপদ চেয়েছিল বাবার ঋণের বোঝা যেভাবে তার ঘাড়ে এসে পড়েছিল সেই একইভাবে তার ঋণের বোঝা যেন তার সন্তানের উপর গিয়ে না পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একই পথে চলতে বাধ্য হয়। দোহাই দেয় নিজের ভাগ্যের। আসলে গোটা উপন্যাস ধরে ঔপন্যাসিক একটা কথাই বারবার বুঝিয়েছেন এই সকল দরিদ্র মানুষরা কোনওদিনই ক্ষমতাধারী মানুষদের আধিপত্য থেকে মুক্তি পায় না, উল্টে এই ঋণের বোঝা পুরুষানুক্রমে বাড়তে বাড়তে তাদের আরও বেশি চেপে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে এবং তাদের মুক্তির আশা করাও যেন বৃথা। ক্ষমতা চিরকালই যেন তাদের গলা চিপে ধরতে তৎপর। ক্ষমতায়নের যে কুৎসিত রূপটি ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয় এবং বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। এখানেই তিনি সার্থক।

**তথ্যসূত্র :**

১. সাধন চট্টোপাধ্যায়, গহিন গাঙ, ১৯৯৬ বইমেলা, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ৭

২. সাধন চট্টোপাধ্যায় , সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র ১, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১৮, পৃঃ ৯,

৩. তদেব, পৃঃ ১৬

৪ তদেব, পৃঃ২৩.

৫. তদেব, পৃঃ ২৮

শুভেন্দু রায়

## অরণ্যের অধিকার : আদিবাসীদের অধিকারের লড়াইয়ের এক তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল

বিশ্ব পরিবেশ আজ বিপন্ন। এই সঙ্গীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন পরিবেশবিদরা শঙ্কিত। এর সাথে সাথে পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত ছিল সাহিত্য গোষ্ঠী। বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের পর থেকে এই পরিবেশ ভাবনা ধীরে ধীরে সাহিত্য অধিকার করেছিল। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এই পরিবেশ সচেতনতা , তার লালন-পালন তথা বৈচিত্র্যতা বারে বারে বিভিন্ন উপন্যাসিকের রচনায় গুরুত্ব লাভ করছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব গুহ ,শিবশংকর মিত্র, মনোজ বসু , সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় , সমরেশ বসু প্রভৃতি নানা উপন্যাসিক সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আর বিশ শতকের সাতের দশকে বাংলা উপন্যাসে অরণ্য পরিবেশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা স্পষ্ট বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। এই দশকে যারা এই অরণ্য পরিবেশ নিয়ে ভাবিত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তার লেখা 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটির প্রস্তাবনা অংশটুকু পাঠ করলেই তার এই উপন্যাসটি রচনার মূল কারণ বা তার পরিবেশ চেতনা সম্পর্কে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তার কথায়—

'কলকাতার দিকে তাকালে বুঝি জল নেই গাছ নেই পাখি নেই। একেবারে শ্মশান। উঠেছে শুধু হাইরাইজ।'[১]

বনসৃজন এর নামে কিভাবে প্রকৃতির উপর অত্যাচার চলছে সেই কথাও আমরা এই প্রস্তাবনা অংশে জেনেছি।। ব্যক্তিগত জীবনে মহাশ্বেতা দেবী আজীবন আদিবাসীদের ভাল মন্দ নিয়ে ভেবেছেন, তাদের জন্য লড়াই করেছেন, তাদের কাছাকাছি গিয়েছেন তাই তাকে আদিবাসীরা আপনজন বলে মনে করে।—

'আদিবাসী রাও আমাকে তাদের আপনজন মনে করে।।'[২]

তিনি উপন্যাস জুড়ে একথাই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যে, আদিবাসী ছাড়া অরণ্য কেউ বোঝে না।

প্রসঙ্গক্রমে মহাশ্বেতা দেবী এই প্রস্তাবনা অংশে অনেকগুলো অরণ্য নিধনের চিত্র তুলে ধরেছেন। কখনো মহারাষ্ট্রের অমরাবতী অঞ্চলের অরণ্য নিধন করে সেখানকার আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করা আবার কখনও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর- এর অরণ্যনিধন, সেখানকার কাঠ কেটে ট্রাকে বোঝাই করে দূর দূরান্ত চালান করা। এরকম কিছু অল্পবিস্তার নমুনা লেখিকার কলমে ধরা পড়েছে।

ব্রিটিশরা ভারতে এলে আদিবাসীদের যে নিজস্ব আইন ছিল তার পতন হয়। তারা

অসহায় হয়ে পড়ে শুরু হয় ধর্মান্তরন। তথাকথিত দীকুরা নানাভাবে আধিবাসীদেরকে ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে জমিজমা সমস্ত কিছু কেড়ে নিতো। ইংরেজ প্রণীত নানা আইন দিয়ে তারা আদিবাসীদেরকে লুণ্ঠন করত। আদিবাসী ছিল গাছের মতই অসহায়।

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি লেখার সমকালীন বিশ্বে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সমগ্র সুশীল সমাজ জেগে উঠেছিল। এই ক্ষেত্রে বিরসাকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছেন লেখিকা। তিনি মনে করেন—

'বিরসা একজন মডার্ন ম্যান'[৩]

'অরন্যের অধিকার এ বিরসার অরণ্য প্রাণে তার কথা আছে।'[৪]

বিরসার মত আদিবাসী মানুষদের কাছে জঙ্গল মায়ের মত। এই মা তাদের কোলে আগলে রাখে। সে মানুষদের মনে আজ আগুন। "উলগুলান "অর্থাৎ বিপ্লব। আর বিরসা মুন্ডা এ অরণ্যের অধিকার চেয়েছিল। বিরসা মুন্ডার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সরকারের কাছে একটা ভয় ধরনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ তা না হলে সে সত্যি ভগবান হয়ে যাবে। যার কোন মৃত্যু নেই। তার দ্বারা সংগঠিত বিদ্রোহকে দমন করে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা হত্যা করার কাহিনী উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়।

উপন্যাসে আমরা দেখব তা বন্দুকের ঘা, লাঠির ঘা কোনও কিছুই 'উলগুলান' স্তব্ধ করতে পারে না আর বিরসা ভগবান আমার ভগবানের মৃত্যু নেই ফুলগুলানের শেষ নেই বীরশার ও শেষ নেই।এভাবেই বিপ্লব এক থেকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিরসা মুন্ডা লড়াই একার নয় সমগ্র মুন্ডা জাতির লড়াই এবং মুন্ডা জাতির বঞ্চনা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। যাদের কাছে ভাত খাওয়াও একটা স্বপ্ন। ছোটবেলায় কিন্তু এরকম ছিল না ছোট থেকে ইচ্ছে লেখাপড়া করার।

'আমারও ইচ্ছা লেখাপড়াই করি।'[৫]

বিরসা ছোট থেকেই বাইরের জগতের ডাক শুনেছিল। এই ডাক সংকীর্ণ থেকে বিশালের দিকে যাত্রার ডাক।—

'বিরসা বুঝলো, ভাগ্য ওকে বাইরে টানছে। মুন্ডারী ধারার সংকীর্ণ জগতের বাইরে।'[৬]

ছোটবেলা থেকেই বিরসা অন্যান্য মুন্ডাদের থেকে আলাদা ছিল। ছোট থেকে সে বিচার বিবেক যুক্ত মানুষ ছিল। তার মত মুক্ত মনের মানুষ মুন্ডাদের মধ্যে দুর্লভ। মিশনে আসার তার একটাই কারণ ছিল সেটা হল জমির অধিকার ফিরে পাওয়া। ছোটনাগপুরের অধিকার পুনরুদ্ধার করা। তাদের আর তাদের মাতৃভূমির মাঝের প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল মিশন ও মিশনের সাহেবরা। তাদের লড়াই ছোটনাগপুরের ভূমির সত্ত্ব আইন মাফিক সব জমি তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। ধীরে ধীরে বুঝে ছিল মিশনারিদের ভরসা করা যায় না। ভরসা কেবল জুগিয়েছিল জেকব সাহেব। তিনি মুন্ডা দের শেখালেন আইনি লড়াইয়ের কথা।

বিরসা বরাবর সভ্য ছিল তার মধ্যে ধৈর্য ছিল সেই ধৈর্য্য ভাঙল তখন যখন ফাদার নট্রট বললেন—

'মুন্ডা -মুন্ডা এক সমান। মিশনের কাছে আসে ভিখারির মতো। ভিতর ভীতর সর্দাদের কথা মনে। সকল মুন্ডা বেইমান।'[৭]

বিরসার চোখ জ্বলে উঠেছিল রাগে বিরসা বললো—'সাহেব সাহেব একটোপি।সরকার সব এক সমান।'[৮]

এই ঘটনা বিরসা হৃদয়ে আগুন জেলে দিয়েছিল, মিশনারী সাহেবদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ বিরসা মিশন ত্যাগ করে ছুটে গিয়েছিল সকল অন্যায়ের জবাব দেয়ার পথ খুঁজতে। বিভ্রান্ত বিদ্যা ছুটে গিয়েছিল আনন্দ পাড়ের কাছে। হিন্দুদের সব পুরান পড়েছিল। কিন্তু কিছুতেই মতার মন শান্ত হচ্ছিল না। ছুটে গিয়েছিল জঙ্গল অফিস সেখানে গিয়ে বলেছিল—'জঙ্গলের অধিকার দিতে হবে।'[৯]

সে বুঝেছিল-

'অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রর অতলে ঘুমোচ্ছিল তখন থেকেই কৃষ্ণ ভারতের কালো মানুষরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।'[১০]

ছোটবেলার বাঁশি বাজানো বিরসা আর নেই আজ তার শিরায় শিরায় আগুন লেগেছে।সকল মুন্ডাদের থেকে বিরসা একদম স্বতন্ত্র। তার ভাবনা চিন্তাও স্বতন্ত্র, সে নিরাশ হয়ে বসে থাকে না বন্ধুদের নিরাশ হতে দেখে তাদের বলে—

'তবে কি হবে নিজেরা ভাব গা। কেউ ভাববি না। সবসময়ই আরেকজন ভেবে দিবে। তোরা যে তার কাছে সামিল হবি, শেষ হয়ে গেলে যে হেলে পড়বি?........ নিজেদের জীবনে আগুন লেগে যায়! জঙ্গলে যাবার হক চলে যায়। তোরা চেতে উঠিস, আবার একটু বাদে মদ খেয়ে সব ভুলে যাস!'[১১]

এই সমস্ত কিছু দেখে রাগে অভিমানে সে চালকার ফিরে গেছিল। সেখানে গিয়ে জানতে পারে সেই নির্মম সত্য কথা, যে জঙ্গলে ঢোকার আর তাদের কোনও অধিকার নেই। সব কিছু দেখে বিরসার মনের মধ্যে পরিবর্তন আস্তে শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে তার বিশ্বাস ভাঙতে শুরু করল। জীবনের কঠিন সত্যের সম্মুখীন হচ্ছিল সে। খিদে পেটে আংটি আর পয়সা নিয়ে রাত ভিটে পালিয়ে গিয়েছিল বোড়া বাকির বাজারের দিকে।

বাস্তব বড়ই কঠিন। এই খিদে তাকে একজন মরা মানুষের কবর খুঁড়ে হাতের আংটি খুলে হাটে বিক্রি করায়। শ্মশান থেকে চালকির কবর থেকে আংটি বের করে বাজারে গিয়ে চাল ডাল কিনে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। তার মা মানকি সমস্ত কিছু লাথি মেরে ফেলে দেয় সেই রাগে সে জঙ্গলে চলে যায়। এখান থেকেই লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী জঙ্গল অরণ্য ও বিরসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন কে এক অদ্ভুত আশ্চর্য বাঙ্গিতায় ব্যাখ্যা করেছেন। বীরসার এই

অবস্থা সকল পাঠক হৃদয় কে অশ্রুসিক্ত করে দেয়। জঙ্গলের জংগল তার আসল মা সে মায়ের শৃংখল মোচন সে করবেই এ বিষয়ে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

"জঙ্গল তো সকল মুন্ডার মা! বিরসা বুঝতে পারছিল ফোর অরন্য জননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিপুদের হাতে আইনের হাতে বন্দি নেই। জননী অরণ্য বলেছিল মোরে বাঁচাবৃৎসা আমি শুদ্ধসূচি নিষ্কলঙ্ক হব।"[১২]

এখান থেকেই বিরসার জীবন এক নতুন মোড় নেয়। এখান থেকেই ভগবান বিরসা র জন্ম ও যাত্রা শুরু।—

'মাটিতে মুখ ঘষছিল বিরসা, গাছের গায়ে গা ঘস ছিল। শিশুর মতো অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল অরন্যকে,"দিব দিব তোমায় শুদ্ধ করে হাঁ তুমি মোর মা বটো সকল মুন্ডার মা বটো তুমি তোমা হতে ঘরের চাল ঘরের দেওয়াল খোদায় গন্ধ ফলু হরিণ পাখির মাংস মাগো!"[১৩]

বিরসার এই প্রতিশ্রুতি বাণী থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় এদেশের আদিবাসী মুন্ডা দের জীবন যে সম্পূর্ণ অরণ্য নির্ভর ছিল, তাদের বেঁচে থাকা তাদের অস্তিত্ব লড়াইয়ের কথা এখান থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। অরণ্য প্রকৃতি একটা সমগ্র জাতিকে কিভাবে ধরে থাকে, তাকে বাঁচিয়ে রাখে তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে এর চেয়ে বড় উদাহরণ কোথায় পাওয়া যায় না। এখান থেকে আমাদের স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে অরণ্যই আমাদের মানব জীবনের ধারক ও বাহক।

বিরসার ভগবান হয়ে ওঠা এই সত্যকে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রবল বজ্রাঘাতে চিৎকার করে ঘোষণা করেছিল—

'দিব সকলের সুখ, হ্যাঁ আমি ভগবান, হব বিরসা ভগবান!'[১৪]

অন্যদিকে বীরসার মা কাতর হয়ে পড়ে। সে ভগবান চায় না সে চায়না তার ছেলে ধরতি- আবা হোক। সে তার ছেলেকে শুধু বুকের ভেতর চায়।—

'এত ছেলা থাকতে আমার ছালার দিকে তারা চায় কেন?'[১৫]

বিরসার আশ্বাস বাণী—

'বিরসা বলিস না মা। আমি ভগবান। আমিই ভগবান। আমি মুন্ডারের ছেলে ভুলাবো না, কোলে দুলাবোনা। আমি সকলের জন্য এই জঙ্গল মাটি জেনে এনে দেবো। এরা ভগবান চেয়েছিল মা, আমি ভগবান হয়ে ফিরে এলাম!'[১৬]

বিরসা ফিরে এসেছিল সেই ভগবান হয়ে যে ভগবান রোগীকে বাঁচাবে, মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলবে, ক্ষুধার্তের মুখে ভাত তুলে দেবে। সে আর সুগানার সন্তান নয় সে আজ ধরতির সন্তান। সুগানার ঘর আজ তীর্থ হয়ে উঠেছে। সকল মুন্ডা দের আশা আজ পূরণ হয়েছে, তার জন্মের সময় আকাশে তিন তারা দেখা সার্থক হয়েছে।

সকল মুন্ডা, ওরাও, কোল, খরিয়া বিশ্বাস করতে শুরু করল বিরসাই সেই ভগবান যে ভগবান—

'শুধু জাদু আর অপদেবতা আর অভিশাপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখে না।'[১৭]

বিরসার ভগবান হওয়ার খবর পালামৌ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হিন্দু , বেনে মুসলিম সকলেই চালকাড় তীর্থক্ষেত্রে যেতে চায় দুচোখে দেখতে তাকে। সকালে মুখে এক—

'চলো হে মিতা চালকাড়ে যাই বনের বুকে চালকাড়ে যাই'।[১৮]

এ বিরসা ভগবান কে পূজার প্রয়োজন পড়ে না। সে বলে—'রোগীকে আলাদা রাখো, লবণ সিজিএ জল খাওয়াও। ভাত পান্তা, ঘাটো, আমানি, তেজা খাও, ঢেকে রাখো গা, বাঁশি পচা খেওনা।'[১৯]

"ওতেই আমার পূজা হে"।[২০]

সকলের হৃদয়ে শক্তি যুগিয়ে ছিল, বলেছিল যখন তোরা মরবি তখন ডরবি কেন। তার একটাই চাওয়া। ধর্মে গোঁড়ামি স্থূলতা সংকীর্ণতা অন্ধ বিশ্বাসকে কাটিয়ে উঠে অধিকারের লড়াই করা।—

"মন্ত্র তন্ত্র বিশ্বাস করো না, মনের আঁধার কাটাও সামনে বড় দুর দিন।"[২১]

মুন্ডা সমাজ কে অন্ধকার অবিশ্বাস থেকে বের করে  না আনতে পারলে তাদের মুক্তি নেই , তাই বসন্তের মতো মহামারীতে তাদের সিং বোঙ্গার কাছে ঠাঁই না দিয়ে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি মেনে চিকিৎসার পথ বাতলে দিয়েছে সে। বিরসা বুঝতে পেরেছিল যে শুধু এভাবেই ভগবান হওয়া যাবে না—

'এ পর্যন্ত ও যা যা করেছে তারও পেছনে আছে মিশন জীবনের শিক্ষা। হয়তোবা বৈষ্ণব ধর্মের কিছু শিক্ষাও। পরিচ্ছন্ন থাকা নিয়মিত স্নান করা শুদ্ধসূচি দেহ মনে প্রার্থনা করা এর পেছনে আছে ওর জীবনের গত ছয় সাত বছরের অভিজ্ঞতার ইতিহাস।'[২২]

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মিথ্যা অপরাধী বিরসাকে গ্রেপ্তার হতে হয়। এ বিদ্রোহ কোনও সরকারের বিরুদ্ধে নয়। মুন্ডাদের কাছে দীকু আর সাহেবরা সবাই বিদেশি। অরণ্য বনাঞ্চল তাদের স্বদেশ। এখানে শুধু তাদেরই অধিকার। এই অধিকার ফিরে পাওয়াই এখন বিরসার লক্ষ্য।সকল মুন্ডা অধ্যুষিত গ্রামে অসম্ভব বিক্ষোভ জমতে শুরু করলো। এমনকি দুর্ভিক্ষে দিনেও তারা সরকারের কাছে মাথা নত করে নি, দরকার হলে ঘাসের দানা খেয়েছে, যখন মিলছে তখন খাচ্ছে আবার কখনো খাচ্ছেনা, ধার চাইছে না ভিক্ষে করছে না। তাদের এই মৌন প্রতিবাদ সরকারকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বড়লাট অব্দি সে খবর পৌঁছে গিয়েছে। সব শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেই কেউ না কোন না কোন ব্যতিক্রম চরিত্র থাকে গুন্ডাদের মধ্যে বিরসা যেমন ব্যতিক্রমী চরিত্র ঠিক তেমনি তথাকথিতের মধ্যে অমূল্য ছিল একজন ব্যতিক্রমী ইংরেজ সাহেবের মধ্যে সেরকমই ব্যতিক্রমের যুদ্ধ ছিল যে কব সাহেব ডঃ রোজার্স। রোজ আজ বুঝেছিলেন মুন্ডাদের প্রতি অবিচার, আন্তরিক ভালবাসার কথা।

তাইতো ডক্টর রোজারস কমিশনার কে বলেন—'এই প্রথম দেখা যাচ্ছে মুন্ডা মুন্ডা হয়ে জন্মেছে বলে গর্ববোধ করছে , গর্ববোধ করছে এতদিন মুন্ডা জন্মের জন্য নিজেকে দোষ দিত দুঃখ করত।'[২৩]

মুন্ডা রা কিভাবে সরকারের আইন দ্বারা মিথ্যে সাজা পেয়ে এসেছে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ এখানে আমরা পাই—

'বিচারক কোন দিন মুন্ডারী শিখে মুন্ডাদের বিচার করেন না কোর্টে কেস উঠলে আসামি কি বলছে বিচারক তা বোঝেন না দোভাষী যথেচ্ছ মিথ্যা বলে বিচারককে বুঝিয়ে দেয় ফলে কি হয় আপনি জানেন একানার মূল্যের অপরের ক্ষেত থেকে তোলার অপরাধে মুন্ডার এক বছরের জেল হয় হরদম হয়।'[২৪]

বীরসার গ্রেপ্তার হওয়ার আগে যা যা কোটা যা যা কথা রটে ছিল তার বেশিরভাগটাই সর্দার দ্বারা রটালো হয়েছিল। 'কোনটা বিরসার কথা আর কোনটা সর্দারের কথা তা তফাত করা বড় কঠিন ছিল।'[২৫]

কমিশনার সাহেব নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে বিদ্রোহ কখনোই সমর্থন করা যায় না। তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন মুন্ডাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো বিদ্রোহ। তিনি ঠিক করলেন সকলের সামনে সকল মুন্ডা সামনে বিরসা মুন্ডার বিচার হবে তিনি যে কোন দেবতা দান তিনি যে সাধারণ একজন মানুষ সে কথা দ্বারা প্রমাণ করে দেবে।

বিচারে জায়গা হিসেবে ঠিক করা লক্ষণটিতে প্রথমে ছিল রাঁচি তারপর খুন্তি। দলে দলে মুন্ডারা সব এসে উপস্থিত বিরসার বিচারের জায়গায়। তাদের বিশ্বাস তাদের যে দেখে গঠন সাহেব বিচার বন্ধ করে চলে গেলেন। পুলিশ এসে নিয়ে গেল রাঁচি, চতুর্দিক থেকে ভেসে এলো একটাই কথা—'মোর হাতে করে দাও আমি ভগবানের সঙ্গে জেলে থাকবো।'[২৬]

ভাষাগত দুর্বোধ্যতা বা ভাষাগত দূরত্বের কারণেই যে মুন্ডা দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার ভুল বার্তা পেয়েছিল সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল রাচির নবীর ডেপুটি বাবু কালী কৃষ্ণ মুখার্জির এজলাসে। তিনি রায় দিলেন—

'মুন্ডাদের গন্ডগোল পাঠাবার কোন অভিযোগ দিয়েছিল না তাদের কথাবার্তা ডেপুটি কমিশনার বোঝেন নি, অনেকের অভিযোগ ভিত্তিহীন।'[২৭]

যদিও কমিশনার এই রাতে পছন্দ হয়নি তাই তিনি ডেপুটি কমিশনারকে বদলি করে দিলেন।

যদিও কমিশনার এই রাইট পছন্দ হয়নি এবং নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে সে রায়টি লাখচ করলেন এবং সকল মুন্ডারের গ্রেফতার করলেন এই বলে যে—

'বিরসা প্রচারক, বিক্ষোভের স্রষ্টা।'[২৮]

'সর্দার আন্দোলনে আর তার আন্দোলনে যোগ আছে।'[২৯]

'১৮৯৫ সালের ১৯শে নভেম্বর বিরশাকে দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল অন্য মুন্ডাদের ২০ টাকা করিম জরিমানা অনাদায় তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হল।'[৩০]

এই গ্রেফতারের পরের চিত্রটা পুরো পাল্টে যেতে শুরু করল। দলে দলে মুন্ডারা সব আবার মিশনে যোগদান করল। সবকিছু স্বাভাবিক বলে মনে হতো শুরু করলে সরকারের। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধানি ,সালী -রা চালিয়ে গেল বিদ্রোহের প্রস্তুতি। অন্যের গভীরে গুহার মধ্যে তারা তীর সঞ্চয় করতে শুরু করল। শাড়ি ছিল ক্ষুধার বুদ্ধিসম্পন্ন। দারোগাকে ভুজুং ভাজাং বুঝিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে চলে এলো গুহার কাছে। আবার অন্যদিকে ধানের হাতে বলোয়া চলতো খুব সুন্দর। ধানি সালী, ডোনকা এরা ছিল বিরসাইত। বিরসা হয়তো এদের জন্য স্বাধীনতা এনে দিতে পারেনি, হয়তো তাদের চাষের জমি ফেরত দিতে পারেনি তাদের অরণ্যের অধিকার ফেরত দিতে পারেনি কিন্তু তাদের হৃদয়ে সাহস আর গর্বের সংসার করেছিল। যাতে তারা মুন্ডা হিসেবে গর্ববোধ করতে পারে।

বিরসার অনুপস্থিতে—'শিং বোঙার থানে আবার মুরগি বলি পড়ল, আবার পহান রক্তভরা নিয়ে অন্ধকারে ছুটে গিয়ে শুকনো কুয়ায় নদীর মরা খাতে ঢেলে দিল। আবার সুখী ডাইনি এসে তুকতাক মন্ত্র তন্ত্র শুরু করল।'[৩১]

জেল থেকে ফেরার পরে বিরসা দেখে মুন্ডারা আবার একই ভাবে শোষণের শিকার হচ্ছিল।চারদিকে অত্যাচার আর অসহায়তা দেখে বিরসা মনে সাহেবদের দেওয়া কথা রাখবে না বলে স্থির করল। এ অন্যায় অত্যাচার আর মেনে নেওয়া যাবে না সেম তার মাকে প্রতিশ্রুতি দিল—'আবার আমাদের দেশ আমাদের হবে। স—ব পেয়ে যাবি তুই।'[৩২]

ধরতি -আবার ঘোষণা—'মোদের কাল এসে গিয়েছে হে! তোমাদের আমি দেশটা ফিরাই দিবো। আমার রাজে খেতে খেতে আল রবে না। সকল মাটির সকলের। সকল চাষ একসঙ্গে। সকল ফসল সকলের।.... মোর রাজে যুদ্ধ হবে না। ধর্মরাজ হবে।'[৩৩]

এ কথা শুনে নানকরা পুরানকরা সবাই বিরসার ভগবানের জয়জয়কার করতে লাগলো সবচেয়ে বড় দিক হলো সাম্যবাদ। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"এই তার মূলভাব। হাজার হাজার মুন্ডা সেই সাদা সাহেবদের সামনে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত আজ। বিচার হুংকারে আকাশ বাতাস কম্পমান।—'আমি ধরতি চোটায়ে পাতারের জল বহে দিব। পাহাড় ভেঙ্গে সমান করে দিব। দুশমনের সৈন্য যেথা হতে যেথা পলাক আমি টেনে বাহির করা আনব!'[৩৪]

হাজার হাজার মুন্ডা ইংরেজদের তোপের সামনে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত।

সমস্ত গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা বিরশালী লড়াই শামিল হল। বিরসা দুহাত তুলে "উল গুলান" এর সূচনা করলো। শত শত সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো—'হাটে বাজারে শুধু একটাই মন্ত্র—'দুজন অচেনা মুন্ডা এক সঙ্গে হলে একে বলে "উল!" ও বলে "গুলান"'[৩৫]

সবাই মিলে আশ্রয় নিল ডোমবারি উপত্যকায়। ঘন অরণ্য দুর্গম পাহাড়ে ঘেরা এই উপত্যকা, এখানেই বিরসাইতরা সবচেয়ে সুরক্ষিত। এখনও যেখানে কোন গাছে কুড়ুল পড়েনি। এ দৃশ্য আমাদের আনন্দমঠ উপন্যাসের সন্ন্যাসীদের আত্মগোপনের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে হয় যেন অরণ্য মাতা তথা দেশ মাতৃকা তার করে সন্তানদের দুষ্ট শক্তির থেকে অঁচলে আড়াল করে রেখেছে। এখানে অরণ্যের বিচিত্র রূপ আমরা লক্ষ্য করি, একদিকে তার জননীর রূপ অন্যদিকে তার শোভা ও ভয়ঙ্কর রূপ—'দুর্গম দূর অভিগম্য পাহাড়ে পাহাড়ে আকীর্ণ ডোমবারির উপত্যকা। এখানে জঙ্গল ভীষণ ও দুর্ভেদ্য।— প্রাচীন সাল-পিয়াশাল।। বয়রা তেতুল- ছাতিম-পলাশ-কুসুম-শিমুল গাছের বন।'[৩৬]

'এ জঙ্গলে বাঘ— ভালুক -চিতা-বাঘ-বুনো শুয়োর—হরিণ—নেকড়ে-হায়না নির্ভয়ে ফেরে।'[৩৭]

ধীরে ধীরে বিরসারও ধৈর্য ভাঙছিল। মুন্ডা রাজের দিন কবে আসবে সে নিজেও জানেনা, মুন্ডারাজ এনে দিতে না পারলেও সে যা পেরেছে তা এই জাতিকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

'মুন্ডাদের সে এখনো স্বাধীনতা দিতে পারেনি। কিন্তু তাদের জীবন থেকে কতকগুলো নাগ পাশ তো খুলে নিয়েছে। সেই অসুর পুজো দেওরা ও পরানের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস সহস্র সংস্কার, সে বন্ধন গুলো তো খুলে দিয়েছে।'[৩৮]

'বিরসা মুন্ডাদের লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকার পেরিয়ে আধুনিক সময় আনতে চায়। কিন্তু এ আধুনিক সময়ে পৌঁছে মুন্ডাররা যেন তাদের আদিম সরলতা ন্যায় বোধ সামনতি অটুট রাখতে পারে, এক নতুন মানব ধর্মে আশ্রয় পায়।'[৩৯]

পরিকল্পনা মতো ২৪ শে ডিসেম্বর রাতে। চারদিকের মিশনে মিশনে তারা তীর ছুড়তে লাগলো, কয়েকজনকে আহত করল। তাদের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখানো। পরের দিন সবাই চুপ, মেয়েরা সব স্তব্ধ। এ যেন কালবৈশাখী আসার পূর্ব মুহূর্ত। সরকারের বাহিনী জঙ্গলে ঢুকে তাদের খুঁজতে শুরু করল, সন্ধান পেয়ে গুলি ছুড়তে লাগলো। প্রথমে এমনি এমনি গুলি ছুটলো, সেটা দেখে বিরসাইতরা গুলি বুঝি জল হয়ে গেল। এরকম একটি চিত্র সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরপর একের পর এক গুলিতে অন্ততপক্ষে ৪০০ বিরসাইত নিহত হয়েছিল। শশীভূষণ রাই ও আরও ৬ জন মুন্ডার বেইমানিতে বিরসার গ্রেফতার হয়েছিল। জেলের ভেতর বিরসা শুধু ভাবছিল যে পারলাম না কাউকে তো লক্ষ্যে পৌঁছতে উপন্যাসের বাকি অংশ রয়েছে কিভাবে চক্রান্ত করে বিচারের আগেই বিরসাকে আর্সেনিকের মতো বিষ খাইয়ে হত্যা করার চক্রান্ত করার পুরো উপন্যাস জুড়ে বিরসা চরিত্রটি লেখিকা যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন সত্যি অনবদ্য তার এই চরিত্রের অবতারণা। আবার এই সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে তার অরণ্য চেতনা বা

পরিবেশ। 'অরন্যের অধিকার' উপন্যাসটিকে একটি তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল বললে অত্যুক্তি হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য বহ্নি' উপন্যাসটি স্মরণ করতে হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য বহ্নি' ও মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের কাহিনীর একটা মিল রয়েছে। একটি সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে রচিত , আরেকটি মুন্ডা বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে রচিত। দুটি উপন্যাসেই আদিবাসীদের মহাজন, জমিদারদের ও ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত বিদ্রোহ চিত্রিত হয়েছে। কোথাও "হুল" আবার কোথাও 'উল গুলান'।

অমূল্য বাবুর নোট বইয়ের পাতায় লেখা কাল্পনিক ভাষ্য দিয়ে উপন্যাসের উপসংহার টেনেছেন মহাশ্বেতা দেবী। বিরসা মুন্ডার লড়াই ও তার অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি—

'আমাদের যেমন চিরকালের সংগ্রাম, বিরসার সংগ্রামও তাই। কিছুই ফুরায় না, পৃথিবীতে -মুন্ডারী দেশ-মাটি -পাথর-পাহাড়-বন-নদী-ঋতুর পর ঋতুর আগমন-সংগ্রামও ফুরায় না। শেষ হতে পারে না। পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না। থেকে যায়। কেননা মানুষ থাকে। আমরা থাকি।....... এখন শুধু শুনি তবে? উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই।'[৪০]

এই অংশটিই উপন্যাসের মূল সুর।

**তথ্যসূত্র ঃ**

১) অরন্যের অধিকার,মহাশ্বেতা দেবী,করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৭০০, ০০৯,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯
২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১
৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩
৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩
৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৮
৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫
৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৫
৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৫
৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯
১০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯
১১) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭০
১২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৩
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৩
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৪
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৫

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৬
১৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৮
১৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৯
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০
২০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০
২১) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮২
২২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৩
২৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯২
২৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯১
২৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬
২৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৩
২৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৩
২৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৩
২৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৩
৩০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৪
৩১) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৩
৩২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৮
৩৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৭
৩৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৮
৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২২
৩৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৮
৩৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৮
৩৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৮
৩৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৮
৪০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২